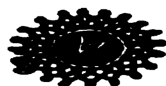
গান্ধী-গবেষণা

পান্নালাল দাশগুপ্ত



ন ব প ত্র   প্র কা শ ন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট/কলিকাতা-৬

GANDHI—GABESANA
by
Pannalal Dasgupta

কৈফিয়ৎ

আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে, ১৯৫৪-৫৫ সালে, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী থাকার সময় এই পাণ্ডুলিপিটা লিখেছিলাম। আমার পরম বিশ্বস্ত সহকর্মী, শ্রী মনোরঞ্জন সাধুখাঁও তখন আমার সাথেই জেলে ছিলেন। তিনি এই পাণ্ডুলিপির বানানাদি শুদ্ধ করে একটা মোটা বাঁধানো খাতায় তা লিপিবদ্ধ করেন এবং জেল থেকে পাচার করে বাইরে পাঠিয়ে দেন। কুড়ি বছরের উপর এই পাণ্ডুলিপিটা একটা স্টীলের আলমারিতেই আবদ্ধ ছিল, এবং বাইরে কাউকে পড়তেও দিতে উৎসাহ পাইনি। কেননা, গান্ধীজী সম্বন্ধে বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের যেন বিশেষ কোন ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু অ্যাটেনবারোর "গান্ধী" ছবিটা প্রকাশ হবার পর হঠাৎ যেন মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বাঙালির উৎসাহ দেখা গেলো। তখন মনে হল, আমার এই "গান্ধী গবেষণা" লেখাটাও লোকে পড়তে পারেন। কিন্তু সেই মোটা খাতাটা খুলতে গিয়ে দেখি তার সব পাতাই বিবর্ণ ও জীর্ণদীর্ণ হয়ে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। এর পুনরুদ্ধার করা অথবা ফের তার কপি করা আমার শক্তি ও ধৈর্যের বাইরে। এমতাবস্থায় আমার স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী নমিতা দাস ওটাকে টাইপ করে ফেলার দায়িত্ব নেন। তিনি নিজে স্ট্যানোগ্রাফার, অফিসে কাজ করেন, অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অনেক ধৈর্যের সঙ্গে এটার পুনরুদ্ধার করেন। এ একরকম প্রায় অসাধ্য গোছের কাজ বটে।

তারপর এলো প্রকাশক খুঁজে বের করার ব্যাপার। এত বড় বাংলা বই ছাপবার খরচ অনেক এবং সঙ্গতিসম্পন্ন কোন সাহসী প্রকাশক ছাড়া এটার দায়িত্ব কেউ নিতে চাইবেন না। যাই হোক, বর্তমান প্রকাশক শ্রীপ্রসূন বসু এই ঝুঁকি নিয়েছেন।

এই বইয়ের শেষ দিকে পরিশিষ্ট বলে যে অধ্যায় আছে সেটাই হলো আসল ভূমিকা। অথচ তার বয়সও প্রায় পঁচিশ বছর। কাজেই সেটাকে আর সামনে আনলুম না। তার বদলে আজ এই কৈফিয়ৎটুকু দিচ্ছি।

গান্ধীজী সম্বন্ধে দেশী বিদেশী ভাষায় বইয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার হয়ে গেছে। ইংরেজী ভাষায় গান্ধী সম্বন্ধে এবং অন্যান্য ভাষাতেও আমার এই গান্ধী গবেষণার চেয়ে ভালো বই বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায়, আমার জানামতে কোন প্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ তেমন বই বের হয়নি। অথচ বাঙালিরাই, যে কারণেই হোক, গান্ধীজীর সব চেয়ে কঠোর সমালোচক—অনেক কারণে—ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। আমার মতে, গান্ধীজী সম্বন্ধে বাঙালিদের এই বিরূপ মনোভাব বাঙালিদেরই বেশী ক্ষতি করেছে, বিশেষ করে বামপন্থী কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন দলগুলির। বাঙালিদের কাছেই গান্ধীজী সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য বই উপস্থাপিত করার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী আছে বলে আমি মনে করি।

"গান্ধী-গবেষণা" নামটির দু'টি তাৎপর্য আছে ; এক, গান্ধীজীর সত্যানুসন্ধানের গবেষণা, দুই— গান্ধীজী সম্বন্ধে অন্যদের গবেষণা। আমি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মাবলী দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা যে আমি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কি তা জানি। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রট্স্কী,

মাও-সে-তুং, ফিদেল কাস্ত্রো, এমনকি চে গুয়েভারা—এদের সকলের লেখাই পড়েছি, এবং বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রয়োগ করেছি। আমার জীবনের বেশীর ভাগ সময়টা এই পথেই কেটেছে, বাইরে ও জেলের ভিতরে। আবার আমি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সব ক্ষেত্রেই যুক্ত ছিলাম বলে কংগ্রেস ও গান্ধি-আন্দোলন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলাম। দীর্ঘ জেল-জীবনে নানা মতবাদের নানা কথা পড়া ও শোনার আমার অবকাশ হয়েছিল।

কাজেই আমার মনে হয় যে আমি যেমন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গান্ধিবাদকে দেখাতে পারি, তেমনি গান্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কসবাদী চিন্তা চেতনা ও কর্মাবলীকেও দেখাতে পারি। এদেশের মার্কসবাদীরা কখনই গান্ধীজীকে ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করেন নি। আবার এদেশের গান্ধিবাদীরাও মার্কসবাদকে ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করেন নি। কাজেই আমার মনে হয়েছিল বিভিন্ন পক্ষকে ইদানীং-কালের দুটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত করানো একটা কাজ। নইলে পরস্পরকে বোঝবার কোন ক্ষেত্রই থাকে না, অন্ধ সংস্কার, অন্ধভক্তি ও অন্ধবিদ্বেষ যুক্তির আকাশ অন্ধকার করে রাখে। এই থেকেই আমার এই প্রচেষ্টার জন্ম হয়েছিল। বহুদিন আগে লেখা সত্ত্বেও, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আজও প্রযোজ্য, কেননা গান্ধীজী সম্বন্ধে লোকের ধারণা বিশেষ কিছু স্পষ্ট হয়নি। গান্ধী এমন একটি বিচিত্র চরিত্র এবং এমন জটিল অবস্থায় তাঁর সংগ্রাম, কর্মকাণ্ড ঘটে, যা আজও অনেকের নিকটই অনেক কারণে দুর্বোধ্য। অথচ গান্ধিকাণ্ড বা গান্ধীজীকে ভারত অথবা পৃথিবী ভুলেও যেতে পারছে না, পারবেও না। অ্যাটেনবারোর ছবিতে যে বিপুল ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়, তাতে গান্ধীজী সম্বন্ধে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হতে দেখি। যতই তর্কবিতর্ক করিনা কেন, গান্ধীজীকে ভোলা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ঋষি-বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন গান্ধীজীর মৃত্যুর পর যে সংক্ষিপ্ত উক্তিটি করেন সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি ব'লেছিলেন, আজ থেকে হাজার বছর পরে মানুষ অবাক হয়ে ভাববে যে এমন ধরণের একটি লোক একদা এই পৃথিবীর ধূলিতে বিচরণ করেছিলেন—আশ্চর্য! বস্তুত গান্ধী অবান্তর হয়েতো যান-ই নি, বরং আজকের পৃথিবীতে গান্ধীজী ও তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দিনকে দিন বেড়ে যেতে বাধ্য। গান্ধীজী এমন কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন উপস্থিত করেছিলেন, যার কোন সদুত্তর আজও পর্যন্ত কোন "মতবাদ" দিতে পারে নি।

আমি আর এবিষয়ে বেশী কিছু বলতে যাবো না। পাঠক-পাঠিকাদের ঔৎসুক্য যদি জাগাতে পারি, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

এই বইয়ের প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজে "কম্পাসের" কর্মীরা প্রায় সবাই খুব খেটেছেন। শ্রীমতী নমিতা দাস ছাড়াও, অমিয়া সেনগুপ্ত, রণজিৎ সেনগুপ্ত, শম্ভু ঘোষাল, বরুণ দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন বাবুতো বটেই, অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। বস্তুত তাঁদের উৎসাহ না থাকলে, এই বই বের হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

তাঁদের সকলের উদ্দেশে, যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে নিজেদের জীবন ও যৌবন বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

সূচীপত্র

গান্ধী ও সত্য

সত্যের সন্ধান বৈজ্ঞানিকদের প্রধান ধর্ম। যত গবেষণা বিচার, অনুসন্ধান সবই সত্যকে লক্ষ্য রেখে। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার পথেও সত্যকে আবিষ্কার করাতে কখনো কোন বৈজ্ঞানিক অবহেলা করতে পারেন না। কোন কিছু আগে থেকেই ধরে নিয়ে তার প্রমাণ করাও তাঁর কাজ নয়। বৈজ্ঞানিককে হতে হয় যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক বা ইমপারসোন্যাল ও অবজেক্‌টিভ। তাঁর নিজস্ব অনুভূতি, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনটার উপরই তাঁকে নির্ভর করলে চলে না। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার চেষ্টা যত থাকবে ততই তাঁর বিচার ও বিজ্ঞান নির্ভুল হবে। এদিক থেকে দেখা যাক্ গান্ধী কতটা বিজ্ঞানধর্মী ছিলেন, আর কতটা ছিলেন বিশ্বাসধর্মী।

গান্ধী-আরুইন প্যাক্‌ট-এ আলোচনা শেষ করে বিলেত থেকে ফিরবার পথে গান্ধীজী জনৈক বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিকের কাছে গোটা কয়েক কথা বলেন, যার তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, একসময়ে তিনি মনে করতেন যে ভগবানই সত্য। কিন্তু তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন—তিনি এখন জানেন যে, সত্যই ভগবান। পূর্বে ভগবান কথাটার উপরই জোর ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী সত্য কথাটার উপরই জোর পড়লো। অর্থাৎ সত্যের চেয়ে বড় কিছুই নেই। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী গান্ধীজী বৈজ্ঞানিকদের দলে ভিড়ে গেলেন—কেন না বৈজ্ঞানিকেরাও সত্য ছাড়া অপর কিছুকে প্রধান স্থান দেন না। গান্ধীজী বলেন, "আমার এই বর্তমান প্রস্তাবনা দ্বারা আমি বৈজ্ঞানিক এমন কি নাস্তিকদেরও ঘায়েল করে দিয়েছি—তাঁরাও এখন আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না, কেন না তাঁরাও মূলতঃ সত্যসন্ধানী।" অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজী মূলতঃ সত্যকে এত বড় স্থান দেবার জন্যই বৈজ্ঞানিক না হয়ে পারেন নি।

কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানধর্মী বললেও ভুল হবে। কেন না ভগবান তাঁর কাছে একটা বড় সত্য। যদি কোন নাস্তিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, যদি সত্যকে সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে ভগবান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তবে কি তিনি ভগবানকে ত্যাগ করবেন? গান্ধীজী তাহলে নিশ্চয়ই মুশকিলে পড়তেন। কেননা তাঁর সারা জীবনে এবং প্রতিদিনের সাধনায় ভগবান সর্বত্র এবং সদা বর্তমান, ভগবানকে ছাড়া তাঁর বাঁচা মুশকিল ছিল। ভগবানে এই ভক্তি তাঁর সমস্ত কর্মের মধ্যে প্রকাশিত। প্রতিদিনের ভজন-পূজন, প্রার্থনা, গান্ধী চরিত্রের একটা বিরাট দিক। এই দিকটা সম্বন্ধে চোখ বুজে, কেবলই তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন

মাত্র, এ বললে নেহাৎ ভুল হবে। ফলে আমরা কি দেখি? সাধারণ বিজ্ঞানসেবীদের মত তিনি একাধারে সত্যসন্ধানী ও সত্যাগ্রহী। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তাঁর এই সত্যের সন্ধান কখনই ক্ষান্ত হয় নি। সত্যের জন্য নিজেকে যে কোন সময়ে ও সব সময়ে বলি দেবার জন্য প্রস্তুত। অহরহ সত্যকে খুঁজবার জন্য তাঁর চেষ্টার অবধি নেই। জীবনের সকল কাজে প্রতিটি ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সত্যের জন্য গবেষণা করে চলেছেন—নিজের জীবনটাকেই একটা গবেষণাগার রূপে পরিণত করে ফেলেছেন। অথচ অপরদিকে তিনি একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব। তিনি বলতেন যে খাদ্য ছাড়া তিনি অনেককাল কাটাতে পারেন, এমনকি জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন—কিন্তু প্রার্থনা ছাড়া, ভক্তি ছাড়া, তাঁর একটি দিনও চলতে পারে না। এই দুই পরস্পর বিরোধী মনোভাব থেকে তাঁর জীবনচরিত এমন জটিল রূপে দেখা দিয়েছে, তাঁকে বুঝতে এত ভুল হয়েছে লোকের। এই বিচিত্র দ্বিমুখী ধারা থেকে তাঁকে কখনও মনে হয়েছে যে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক, আবার কখনও কখনও মনে হয়েছে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্ধভক্ত বা গোঁড়া মাত্র। গান্ধীজীর ধর্ম সম্বন্ধে যেখানে আলোচনা করবো সেখানে এবিষয়ে আলোচনার অবকাশ উপস্থিত হবে। এখন তাঁর বৈজ্ঞানিকতার দিকটা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সত্যের জন্য যে কোন দাম দিতে তাঁর কোনোদিন কোন কুণ্ঠা দেখা যায় নি। তিনি লিখেছিলেন: "I have been a gambler in all my life. In my passion for finding truth, I have counted no stake too great. In doing so I have erred, if at all, in the company of most distinguished scientists of any age and clime." (Young India 20.2.30)—অর্থাৎ "আমি জীবনভর জুয়াড়ীর মতো বাজি ধরে চলেছি। সত্যকে পাবার তীব্র প্রেরণায় আমি এমন কিছু দেখি না যা আমি পণ করতে পারি না। এই সত্য সন্ধানের পথে সর্বস্ব পণ করাতে যদি আমি কোন ভুল করে থাকি তবে সে ভুল সকল দেশের সর্বকালের সকল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরাও করে থাকেন।" একথা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁর সারা জীবনের নানা কাজে এর দৃষ্টান্ত ভরা রয়েছে। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "Life and its problem have thus become to me so many experiments of truth and non-violence. By instinct I have been truthful but not non-violent. As a Muni once rightly said, I was not so much a votary of Ahimsa as I was of truth, and I put the latter in the first place and the former in the second. For, as he put it, I was capable of sacrificing Ahimsa for the sake of truth. In fact it was in the course of my pursuit of truth that I discovered non-violence." (Harijan : 1936)। অর্থাৎ "জীবন ও তার সমস্যাবলী আমার কাছে সত্য ও অহিংসার গবেষণা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজাত গুণেই সত্য আমার কাছে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় জিনিস ছিল চিরকাল—কিন্তু অহিংসা আমার সহজাত প্রেরণা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি এই সত্যের সন্ধান করতে গিয়েই আমি পরে

অহিংসাকে আবিষ্কার করি" ঃ (হরিজন ঃ ১৯৩৬)।

ভগবান-ভক্তদের মধ্যেও নানা ভেদ আছে। কারো কাছে ভগবান প্রেমময়—যেমন শ্রীচৈতন্যের কাছে। কারো কাছে ভগবান শিব বা শান্তিময়—যেমন সাধু-সন্ন্যাসী সংসারের যাবতীয় ঝঞ্ঝাট পরিত্যাগ করতে ব্যস্ত, হিমালয়বিলাসী। কারো কাছে ভগবান শক্তিমাত্র। শক্তির আরাধনাই তাদের কাজ। কিন্তু গান্ধীর ভগবান সত্য। সত্য রূপে ভগবানকে পাবার এই সাধনা গান্ধীতে বিদ্যমান থাকায় তিনি বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পেতে বাধ্য। ১৯৪৮ সালে দিল্লীতে তাঁর শেষ অনশনের সময় তিনি বলছেন, "I embarked on this fast in the name of truth whose familiar name is God. Without living truth God is nowhere. In the name of God, we have indulged in lies, massacred the people without caring whether they are innocent or guilty, men or women, children or infants. We have indulged in abduction, forcible conversions and we have done these shamelessly. I am not aware if anybody has done this in the name of truth". (Harijan : 25. 1. 48)। অর্থাৎ "আমি তারই নাম করে এই অনশন শুরু করেছিলাম যার নাম সত্য—যার প্রচলিত নাম ভগবান। জীবন্ত সত্যকে বাদ দিয়ে ভগবান কোথাও নেই। ভগবানের নাম করে আমরা কত মিথ্যা কথা বলেছি, কত নরহত্যা করেছি—খেয়াল করে দেখিনি যাদের মেরেছি তারা দোষী না নির্দোষ, পুরুষ না নারী, নাবালক না শিশু। মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছি, জোর করে ধর্মান্তর করিয়েছি এবং এসব করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করি নি। ধর্মের দোহাই দিয়ে এসব করেছি কিন্তু আমি জানি না সত্যের নাম করে কেউ এসব কাজ করেছে কিনা।" উপরের এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা উচিত কেন তিনি একদিন god is truth কথাটাকে পালটে truth is god বলেছিলেন। ভগবানের নামে ধর্মের নামে পৃথিবীতে কত অধর্ম ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারই জন্য ভগবানের সংজ্ঞা শুদ্ধ করার দরকার হয়েছিল গান্ধীজীর কাছে। তারই জন্য তিনি দেখেছেন সত্যই সেই শুদ্ধিকরণের মূল অস্ত্র। সত্যের আঘাতে সকল কিছুকে পরীক্ষা করে নিতে হবে—এমন কি ভগবানকে সত্যের যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা যেতে পারে না। প্রেমময় ভগবান সাধারণ কামনা বাসনাতে পর্যবসিত হতে পারে, সুন্দরময় ভগবান ধনীর বিলাসিতাতে পরিণত হতে পারে, শিবময় ভগবান নির্বীর্যতা ও অকর্মণ্যতা ও পলায়নপরতাতে পরিণত হতে পারে, শক্তির ভগবান অত্যাচারী ও অহংকারীর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সত্যের ভগবানকে সত্যই থাকতে হবে—তা যত নিষ্ঠুরই হোক, যত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ভক্তকে ফেলুক। সত্যের আলোকেই ভগবান ও ভক্ত সত্যিকার রূপে পরস্পরের নিকট প্রতিভাত হতে বাধ্য। এই হলো গান্ধীজীর 'সত্যই ভগবান' এই উক্তির ব্যাখ্যা। কাজেই তিনি ভগবানই সত্য এই কথার মধ্যে যে ভয়ানক ফাঁকি লুকানো আছে তা ধরতে পেরেছিলেন।

গান্ধীর কাছে সত্যের সন্ধান একটা নীতিগত কথা হিসাবেই ছিল না বা

কালেভদ্রে তার প্রয়োগ ঘটতো না। তাঁর সমস্ত জীবনটাই একটা গবেষণা মাত্র। কোন বিষয়কেই তিনি জিজ্ঞাসা না করে ছাড়েন নি। কনফ্যুসিয়াস বলতেন—"If a man does not constantly ask himself what is the right thing to do, I really don't know what is to be done with him." অর্থাৎ যে মানুষ সর্বদা এই প্রশ্ন করতে শেখে নি যে, 'এখন সত্য পথ কি' তাকে নিয়ে কি করা যায় আমি তা জানি না। অর্থাৎ কনফ্যুসিয়াস তাকে মানুষ বলেই স্বীকার করতেন না, যে মানুষ নিজেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে ব্যস্ত না করে তোলে। যে মানুষ সত্যকে পেয়ে গেছে বলে নিশ্চিন্ত আছে, তার পতন অনিবার্য। এই জিজ্ঞাসা, এই প্রশ্ন, এই অনুসন্ধানপ্রবণতাই সকল প্রকার বিজ্ঞান ও বিপ্লববাদের জন্মকথা। সত্যকে বারে বারে, অহরহ আবিষ্কার করতে হবে—কেন না কোন সত্য সর্বকালে এক রূপ নয়। অতএব মানুষের কখনও ঘুমাবার উপায় নেই—তাকে সর্বদাই সচেতন ও সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়। গান্ধীজীর মধ্যে এই সদাসতর্ক, সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখতে পাই। তাই অহরহই তাঁর এক্সপেরিমেন্ট বা গবেষণা, খাদ্যের গবেষণা, শিক্ষার গবেষণা, নরনারীর সম্পর্কের গবেষণা, ব্রহ্মচর্যের গবেষণা, স্বাস্থ্যের গবেষণা, চিকিৎসার গবেষণা, চাষবাসের গবেষণা, চরকার গবেষণা, কুটিরশিল্পের গবেষণা, সমাজের গবেষণা, ধর্মের গবেষণা, রাজনীতির ও সংগ্রামের গবেষণা—জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন গবেষণাপ্রিয় ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই দেখা দিয়েছে—এবং সর্ববিষয়ে সত্যকে নিজের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুন নন। তাই দেখি নিজের জীবনচরিতের নাম রেখেছেন : 'The Story of My Experiments With Truth'। অমন সার্থক শিরোনাম আর হয় না। ওই একটি মাত্র নামের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনের মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধনার তাৎপর্য প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। সারা জীবন গবেষণা করতেই তাঁর কেটে গেছে। এই হিসাবে তিনি একজন পাকা বৈজ্ঞানিক। তাই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তাঁর স্থান হতে বাধ্য। এবং বৈজ্ঞানিকদের যাবতীয় মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে বর্তাতে বাধ্য।

সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কি উপায়ে করা যায়? সত্যের সাহায্যে সত্যকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এইজন্য তিনি সর্বদাই Truthful means-এর উপর এতো জোর দিতেন। যে কোন উপায়ে, ছলে বলে কৌশলে কাজ—যত সৎ কাজই সে হোক, তা তিনি করতে রাজি নন। তাই তাঁর সংগ্রামের নাম সত্যাগ্রহ। অবশ্য তিনি বলেছেন যে অহিংস না হলে সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহ করা সম্ভব নয়—সত্য ছাড়া অহিংসার কোন মূল্য নেই। সত্যের সন্ধান করতে গিয়েই তিনি অহিংসা আবিষ্কার করেছিলেন, এ কথাও তিনি বলেছেন। যখন অহিংসা ও উপায় এবং আদর্শ নিয়ে আলোচনা করবো তখন এসবের বিশদ ব্যাখ্যা করা যাবে। এখানে কেবল সত্য সম্বন্ধেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যাক। সত্যের জন্য লড়াই সবাই করে—মানে সব বৈজ্ঞানিক, সব সাধকই করে থাকেন। এবিষয়ে কোন নতুন কথা নেই। কিন্তু সত্যকে উপায় বা একমাত্র হাতিয়ার বা অস্ত্র করে, সত্যকে আবিষ্কার করার অভিযানে কিছু নূতনত্ব আছে। গান্ধীজীর কাছে সত্য এমন শক্তিমান জিনিস যে তার কোন মিথ্যা আবরণ বা মিথ্যা

শক্তির সাহায্য দরকার পড়ে না আত্মরক্ষার জন্য। সত্য দুর্বল শিশু নয়, বা অরক্ষণীয়া অবলা নয়। সত্যই সর্বশক্তিমান কেন না সত্যই ভগবান। অতএব সত্যের জন্য কারো অসহায় হবার বা ভয় পাবার কারণ নেই। যে বিন্দুমাত্র সত্যকেও জেনেছে তার শক্তি অশেষ। অতএব এককণা সত্য পর্বত প্রমাণ মিথ্যার চেয়েও ওজনে ভারি। তিনি পর্বত প্রমাণ মিথ্যার রাজাও হতে রাজি নন। কণামাত্র সত্যকে বুকে ধরে জীবনভর ভিখারী থাকতে পারলে সুখী। কথাটা খুব সাধারণ হলেও ব্যাপারটা অত সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা নয়। আমরা সাধারণত কি করি? আমরা আমাদের জীবনে এতো ভীতু যে নিজেদের সত্যকে বড় দুর্বল মনে হয়। তাকে অতিরঞ্জন করে বাড়াতে চাই। তাকে মিথ্যা ভড়ং দিয়ে শক্তি দিতে চাই, তাকে গোপন করে রক্ষা করতে চাই। সত্যের প্রতি আমাদের আস্থা বড় কম, যার ফলে বাইরের আবরণ দিয়ে তাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকি। মিথ্যা কথা দিয়ে সত্যকে রক্ষা করতে চাই, ছলনা দিয়ে জয় করতে চাই, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যেন একটি দুর্বল শিশুকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। গান্ধীজী তা মনে করেন না। তিনি বলতে চান যে, যে-সত্যকে মিথ্যা দণ্ড দিয়ে রক্ষা করতে হয়, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাছাড়া যদি গায়ের জোর, ছলনা, মিথ্যা ও গোপনীয়তা দিয়ে সত্যকে রক্ষা করতে হয় তবে কোন স্বার্থ ও অসৎ জিনিসকেও ওই সমস্ত হাতিয়ার দিয়েও রক্ষা করার যে সাধারণ প্রথা আমরা দেখি, তার সঙ্গে সত্যরক্ষার কোন প্রভেদ থাকে না। ফলে Might is Right গায়েরই জোরই সত্য—এই ধারণা পৃথিবী থেকে দূর হয়েও হতে চাইবে না। Might is Right, এই কথাটাকে যদি সত্য সত্যই পৃথিবীতে অচল করতে হয় তবে Right বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা আলাদা উপায় বের করতে হবে। অতএব সত্যকে সত্যের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইজন্যই তিনি সত্যবাদিতা, সৎসাহস ইত্যাদির উপর এত জোর দিতেন। গোপনীয়তা ও ছলাকলা ঘৃণা করতেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে তার সংগ্রামে গোপনীয়তা ও অপকৌশল প্রয়োগ অন্যায় মনে করতেন। সহিংস বা সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাঁর যে নৈতিক আপত্তি তা এই গোপনীয়তা, মিথ্যাচার, ছলনার জন্যই বেশী। মৃত্যু দেখে তিনি অহিংস হন নি। তাঁর নিজের অহিংস সংগ্রামে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষকে অহরহ মোলাকাৎ করাতে কোন দ্বিধা ছিল না। রক্তারক্তিটাও তাঁর কাছে এত সাংঘাতিক অপরাধ নয়—যত তার পিছনে জিঘাংসার প্রবৃত্তি, গোপন ষড়যন্ত্র, ছলনা ও মিথ্যাচার আছে সশস্ত্র সংগ্রামের আশেপাশে—তার বিরুদ্ধে তাঁর ভীষণ আপত্তি। কেন না এইসব গোপনীয়তা ও মিথ্যাচার মানুষকে শেষ পর্যন্ত নীচের দিকে টানতে থাকে—অধঃপতন ঘটায়। যে আদর্শের জন্য এই সংগ্রাম সেই আদর্শ ওইসব মিথ্যাচারের প্রভাবে দূষিত হতে থাকে। প্রচারে সত্যবাদিতা, ব্যবহারে সত্যভাষণ, সংবাদে সত্যানুসন্ধান—ইত্যাদি হোল তাঁর পথ। অতিরঞ্জিত সংবাদ দেওয়া তিনি ঘৃণা করতেন। নিজের শক্তিকে বাড়িয়ে বলতে তাঁর অপরিসীম ঘৃণা ছিল। নিজেদের দুর্বলতাকে সকলের সামনে—শত্রুর সামনে খুলে বলতে তাঁর কোন ভয় বা কুণ্ঠা ছিল না। কোন শক্তি তিনি গোপনে তৈরি করতেন না, বরং বলতেন, গোপন করার চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। ভীরু ভারতবাসীদের

তিনি যে এত তাড়াতাড়ি জাগাতে পেরেছিলেন ও সাহসী করে তুলতে পেরেছিলেন তার কারণ—তাঁর সম্মুখ সংগ্রাম নীতি। 'সত্য কথা বলতে শেখো, শত্রুর আদেশ অমান্য করার আগে 'না' বলতে শেখো, শত্রুর ভয়ে লুকিয়ে চলো না, দেখিয়ে চলো খদ্দরখানা গায়ে চড়িয়ে—এমনি করে তিনি জাতিকে সত্যের সাহায্যে শক্ত করতে চেষ্টা করেন। সত্যের আশ্রয় নিলে আমরা দুর্বল হবো না—এই ছিল তাঁর কথা। এইজন্য তিনি একদিন কংগ্রেসের motto-'Peaceful and Legitimate means'-এর পরিবর্তে 'Non-violent and truthful means' শব্দগুলি বসিয়েছেন।' সত্যের চেয়ে শক্তিমান আর কি আছে? সত্যমেব জয়তে। সত্যকে সম্বল করে অকূল পাথারে নৌকা ভাসিয়ে দিতে তাঁর কোন ভয় ছিল না। সত্যের দ্বারা যে শক্তিমান তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কেননা সত্য হল ভিতরের শক্তি। বাইরের যা শক্তি, অস্ত্রবল, লোকবল, সংগঠন বল তা থেকে হয়তো আমাকে বঞ্চিত করা সম্ভব—কিন্তু যেগুলি আমার ভিতরের শক্তি তা কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। এই রকম ছিল গান্ধীজীর যুক্তি। কাজেই গান্ধীজী কেবল সত্যের সন্ধানী ছিলেন না, তিনি সত্যকেই সত্যসন্ধানের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

অথচ গান্ধীজী কখনও সমগ্র সত্যকে আবিষ্কার করেছেন বা করতে পেরেছেন এমন বড়াই করেন নি। তিনি বারবার বলেছেন, "আমি সত্য খুব সামান্যই দেখেছি। সত্য এত বড় জিনিস যে কেউ তাকে সমগ্রভাবে পেতে পারে না। কেবল ক্ষণিকের চকিতের দেখা, তাও আমি কতবার ভুল করেছি। I have grown from truth to truth। কোন একটা কথা আমি পূর্বে বলেছি বলেই তা সত্য এবং তাকে ধরে রাখতেই হবে অথবা সত্য বলে প্রমাণ করতেই হবে, এমন অন্যায় জেদ আমার মধ্যে নেই। ফলে অনেকে আমাকে মাঝে মাঝে বলে আমার কোন পারম্পর্য-বোধ (consistency) নেই, আমি উল্টোসিধে বলে থাকি। কিন্তু তা সত্য নয়। আমি একজন নগণ্য সাধক মাত্র, আমার মন সর্বদা অনুসন্ধিৎসু। সমগ্র সত্য (absolute truth) তো স্বয়ং ভগবান। তাঁকে আমি জেনেছি এ মিথ্যা অহংকার অতি লজ্জার কথা।" এখন ভেবে দেখুন অন্যান্য সত্যসন্ধানীদের কথা। তাঁরা প্রায়ই বলবেন, সব সত্য তাঁরা জেনে বসে আছেন—কেউ এদিকে ওদিকে তাকালে ধমকে চোখ বন্ধ করিয়ে দেবেন। তাঁরা যেন সত্যের sole agent বা একমাত্র ঠিকাদার। সব সত্য তাঁদের জানা হয়ে গেছে। ফলে তাঁরা অযৌক্তিক মত বা dogma সৃষ্টি করতে কোন ইতঃস্তত করেন না। এই থেকেই dogmatism বা মোল্লাগিরি শুরু হয়। তাঁরা সবাই খোদার শেষ নবি, তারপরে আর কেউ নূতন সত্য, নূতন কথা আবিষ্কার করতে পারবেন না এমনি বড়াই। এ কত হাস্যকর! গান্ধীজীর মতো নিউটনও একদিন বলেছেন অকূল সমুদ্রের উপকূলে তিনি কয়েকখানা নুড়ি সংগ্রহ করেছেন মাত্র। গান্ধীজীর এই বিনয় শুধু একটা ব্যবহারের বিনয় নয়—গান্ধীজী সত্যি সত্যি মনে করতেন যে তিনি বিরাট সত্যের ক্ষণিক দর্শন ও আংশিক দর্শন পেয়েছেন মাত্র। এই বিনয় (modesty) সত্যিকার বিজ্ঞানী মনের পরিচয়। এই বিনয় এবং বিরামহীন জিজ্ঞাসাই সকল বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা।

এই সম্বন্ধে গান্ধীজীর অনেক উক্তি আছে। আমরা একটি উক্তির উধৃতি দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। "The little fleeting glimpses, therefore, that I have been able to have of truth hardly convey an idea of the indescribable lustre of truth, a million times more intense than that of the sun we daily see with our eyes. In fact what I have caught is only the faintest glimmer of that mighty effulgence." (The Story of My Experiments With Truth ; p. 615). 'জীবনভর গবেষণা করে আমি এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে মহান সত্যের অতি সামান্য, ক্ষণিক, আংশিক চকিত দর্শনই আমার মিলেছে—এই সত্যের অবর্ণনীয় জ্যোতি ও তেজ স্বয়ং ভাস্করের তেজের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ তীব্র। সত্য বলতে কি আমি সেই পরম জ্যোতিষ্ক সত্যের অতি সামান্যই দেখেছি।"

আরও একটা কথা আমরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানি। বৈজ্ঞানিক নিজেকে তাঁর বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চান—তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাসক্ত (objective) হতে হয়। আত্মবাদী (subjective) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সম্ভব নয়, কবি বা শিল্পীর দৃষ্টিই আত্মবাদী (subjective)। এই মানদন্ড দিয়েই যদি গান্ধীজীর বৈজ্ঞানিক চেতনার বিচার করা যায় তাতেও দেখা যাবে গান্ধীজী একটা জায়গায় এই নৈব্যক্তিক সাধনার কিরূপ একাগ্র পথিক ছিলেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, তাঁর সত্য ও ভগবান জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে আছে। ফলে যে কথা তিনি ভগবান সম্বন্ধে বলতে চাইছেন, সেটা তাঁর সত্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি গীতার আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চাইতেন। গীতার আদর্শ হলো স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ। স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ হলো আসল স্থিতধী মানুষ—যার সুখে দুঃখে, লাভ ক্ষতিতে, সম্মানে অপমানে, জীবন মৃত্যুতে কোন পরোয়া নেই, কোন মোহ বা ভয় নেই। এই সাধনার পথে নিজেকে, নিজের স্বার্থকে সম্পূর্ণ বলিদান দিতে হয়—নিজেকে সবচেয়ে মূল্যহীন করতে হবে, নিজের কথাটা ভুলে যেতে হবে। তাঁর কাজ নিজেকে আবিষ্কার করা নয়—সত্যকে আবিষ্কার করা। তাই তাঁর আত্মসমালোচনার শেষ নেই। গান্ধীজীর মত নির্মম আত্মসমালোচক জগতে বিরল। এই প্রসঙ্গে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেটা বলা দরকার: "But truth is at least for an individual what he himself feels and knows to be true. According to this definition I don't know of any person who holds to the truth as Gandhiji does. That is a dangerous quality in a politician. For he speaks out his mind and even lets the public see its changing phases". "সত্য সম্বন্ধে বিচার মানুষ তার নিজের অনুভূতি দিয়েই করে থাকে এবং সত্যের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখতে গেলে আমি গান্ধীজীর সত্যের প্রতি ধারণার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা পাই না। এই ধরণের সত্যনিষ্ঠা একজন রাজনীতিকের পক্ষে কতই না বিপজ্জনক। কেন না গান্ধীজী সর্বদাই নিজের মনের সকল কথা খোলাখুলিভাবে

বলেন এবং জনসাধারণ তাঁর মনের গতি দেখতে পায়, তাঁর পরিবর্তনগুলিও দেখতে পায়।" অর্থাৎ তিনি কিছুই লুকিয়ে চিন্তা করতেন না—যা ভাবতেন তা সবাই শুনতে পেতো। মতের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ভুলত্রুটি স্বীকার, মনের প্রতিটি অন্তর্দ্বন্দ্ব দশ জনের কাছে পরিবেশন করাতে তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল না। নিজের চিন্তার ভুল বা কাজের ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়াতে তাঁর যেন একটা নেশা ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজনীতিকেরা সেগুলো চেপে যেতে চান—দশজনে আমার মনের কোণের কোন দুর্বল সংবাদ যেন না জানে, তারই চেষ্টা আমার থাকে—কেন না আমাকে সর্বদাই বীর ও নির্ভুল প্রমাণ না করলে আমার নেতৃত্ব থাকে না যে! কিন্তু গান্ধীজী এই সহজ নেতৃত্বের লোভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন সত্য ছাড়া—তা যত নির্মমই হোক—প্রকৃত শক্তি অসম্ভব। কাজেই প্রচলিত রাজনীতিকদের থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। তিনি বার বার বলেছেন, I must reduce myself to zero—নিজেকে আমি শূন্য করে দিতে চাই। নিজের আমিকে, অহং-কে যে পরিমাণ আমি শূন্য করতে পারবো—সেই পরিমাণে সত্য বা ভগবান আমার ভিতরে প্রকাশিত হবে। তাই তাঁর জীবন গবেষণা (My Experiments With Truth) এই দিয়ে শেষ করেছেন, "I must reduce myself to zero, so long as a man does not do this of his free own will but himself last among his fellow creatures, there is no salvation for him."

এই যে humility, এই যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার, শূন্য করে, উজাড় করে দেবার প্রেরণা, এতে হয়তো তাঁর ধর্মীয় আবেগটাই বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু দেখতে হবে এই আবেগ যাঁর জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, তাঁর সাধারণ জীবন ও জিজ্ঞাসা কি জাতীয় হওয়া স্বাভাবিক। অন্তত একথা নিশ্চয় বলা যায় যে তাঁর এই আবেগ, তাঁর মনোজগত থেকে স্বার্থকে ও নিজেকে তুচ্ছ করে দিয়েছে—ফলে তাঁর পক্ষে objective হওয়া অনেক সহজ হয়েছে! কোন একটি সত্যকে পেয়েই তিনি অহংকারে, দেমাকে মত্ত হতে পারেন নি। তাঁকে নিরন্তর সত্যের পিছনে ছুটিয়ে মেরেছে। অতএব বৈজ্ঞানিক হতে হলে যে নৈর্ব্যক্তিক (objective) দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার এই মানদণ্ডও গান্ধীজীর বেলায় তাঁকে সহজেই পরীক্ষোত্তীর্ণ করে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক চেতনার মূল সূত্রটা তাঁর মধ্যে অতি সহজেই গড়ে উঠেছিল।

ব্যবহারিক রাজনীতিতে গান্ধীজীর এই সত্য নীতি বাস্তব অবস্থার বিচারে খুবই সাহায্য করতো। কোনো অন্যায় অত্যাচারের খবর পেলেই তিনি সত্য-সংবাদ গ্রহণ না করে কোনো উক্তি করতেন না। অতিভাষণ, অতিরঞ্জন, অবরঞ্জন ইত্যাদি আতিশয্য দোষ থাকতে পারে না যদি সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বর্তমান থাকে। প্রতি সংবাদের পিছনে সত্য কতটুকু, প্রতি কর্মীর সত্যিকারের দোষগুণ কি, প্রত্যেক বাক্যের সারবস্তু কি, প্রতিটি রিপোর্টের সত্যতা কতটুকু, প্রত্যেক শক্তিপ্রকাশের দুর্বলতা কোথায় ইত্যাদির সত্যবিচারে একটা অভ্যাস সৃষ্টি হবার ফলে গান্ধীজীর পক্ষে বাস্তববাদী হওয়া খুব সহজ হয়েছিল এবং চট্ করে একগাদা ঘটনার মধ্য থেকে মূল সত্যটুকু বা

সত্যের মর্মটুকু বের করে ফেলতে পারতেন। যাকে বলে objective study of any situation, যার ভিতরে subjective error-এর মাত্রা যথাসম্ভব কম থাকে—সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই এতকাল ধরে এতকাজ করতে পেরেছিলেন। লোক চিনতে তাঁর এইজন্যই অসুবিধা হতো না—সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রতারিত বা আহত হতেন না এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকতো অটল। বাইরের ব্যাপারেই সত্য-নিষ্ঠা শুধু নয়—নিজের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি প্রেরণার বিচারও তিনি এই সত্যদণ্ড দিয়ে তৈরী করতেন। ফলে প্রতারণার অবকাশ ছিল না। "Truth rules out prejudice, evasion, secrecy and deception as well as exaggeration, suppression or modification of the reality. It requires that we should never be afraid of confessing our mistakes or retracing our steps". (The Political Philosophy of Mahatma Gandhi—Prof. G. N. Dhawan, p. 55).

আবার কাউকে সত্যকথা বলতেও তাই কোন কুণ্ঠা নেই গান্ধীজীর। কিন্তু বলতে হবে এমনভাবে এবং এমন অহিংসার শক্তি (spirit) নিয়ে যেন সে বুঝতে পারে যে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা তাঁর নেই। অন্যায়কারীকে অন্যায়ের কথা বলতেই হবে এবং তাকে তোয়াজ করার কথা ওঠে না। "But non-violent truth or gentle speech does not mean hypocrisy or circumlocutory speech. Harsh truth may be uttered courteously and gently, but the words would read hard. To be truthful you must call a liar a liar—harsh words perhaps but the use is inevitable. Jesus knew the genera tion of vipers, minced no words in describing them but pleaded for mercy for them."

(Gandhiji—ibid p. 55.)

নেহরু ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজীর বিচারে অথবা গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁদের বিচারে হয়তো দ্বিমত বা বহুমত থাকতে পারে, তার মধ্যে একবার ঢুকলে আমরা খামোখা বিতর্কের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারি। সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্যই "গান্ধী ও সত্য" এই অধ্যায়টি এখানেই শেষ করা যাক। এই অধ্যায়ের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ গান্ধীজীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, আশা করি তা হয়তো দেখাতে পেরেছি। অবশ্য কেবল থিওরি হিসাবে তাঁর লেখা বা বলা থেকেই যা কিছু দেখানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু যাঁরা গান্ধীজীর জীবন সংগ্রামের ঘটনাবলী জানেন, তাঁরা এই উপপাদ্য জিনিসটা আরও সহজে বুঝতে পারবেন। কেন না ঘটনাবহুল তাঁর দীর্ঘজীবনে এজাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই এবং প্রতি ব্যাপারে তাঁর স্বকীয় জিজ্ঞাসা কিভাবে কাজ করতো তা বুঝতে কারও কোন কষ্ট হবে না। ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে কথাগুলি বিচার করলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কষ্ট হবে না।

গান্ধীজীর ভগবান ও ধর্ম

এবারে গান্ধী চরিত্রের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল দিকটা দেখতে চেষ্টা করবো। ইতিহাসের যত প্রগতিশীল ধারাই তিনি বহন করে থাকুন না কেন, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বানুসন্ধান তাঁর ভিতরে যত প্রবলই থাকুক—তাঁর জীবনে বিশ্বাসটাও একটা প্রচন্ড বিষয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-অনাশ্রয়ী বিশ্বাস কি করে একই সাথে পাশাপাশি চলেছে ও চলতে পারে, এ নিয়ে ঘোরতর বিতর্ক ও সন্দেহের কারণ হয়েছে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী বামপন্থীদের কাছে। এ কথা আমরা সবাই জানি ভগবান ও ধর্ম গান্ধীচরিত্রে কত বিস্তৃত স্থান অধিকার করে ছিল। গান্ধীজী নিজেই তাঁর My Experiments With Truth-এ বলেছেন, "What I want to achieve, what I have been striving and pining to achieve these thirty years, is self-realisation, to see God face to face, to attain *moksha*. I live and move and have been in pursuit of this goal. All that I do by way of speaking and writing, and all my ventures in the practical field, are directed to this same end." অর্থাৎ তিনি বলেছেন আমি যা চাই, আজ ত্রিশ বছর ধরে আমি যার জন্য সাধনা ও প্রার্থনা করে আসছি, তা হলো আমার মুক্তি, ভগবানের দর্শন পাওয়া, মোক্ষ অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যের পিছনেই আমি বেঁচে আছি, কাজ করে চলেছি। আমি লিখি, বলি, যে রাজনীতি করি—সব কিছুই এরই জন্য। অতএব গান্ধীজীর এ বিষয়ে কোন সংকোচ নেই, তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলে থাকেন যে তিনি একজন সাধক বা ভগবানভক্ত লোক। ভগবানভক্ত আমরা ভারতে অনেক রকম দেখেছি। অনেক রকম সাধনার মধ্যে গান্ধীজীই বোধ হয় একমাত্র লোক যিনি রাজনীতির মধ্য দিয়ে দেশসেবার মধ্য দিয়ে ভগবান দর্শন করতে চেয়েছিলেন। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায়, এই সূত্র গীতায় আছে। গীতা তাঁর প্রতিদিনের পাঠ্য ছিল।

কথিত আছে পুরাকালে রাজর্ষি জনক রাজকাজের মাধ্যমে ভগবানকে পেয়েছিলেন। তিনি এসব কথা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন। গীতার ভিতরে ভগবানকে পাওয়ার আরো অনেক মার্গ বা পথ দেখানো আছে—যদিও সেসব পথ পরস্পর বিরোধী নয়। তথাপি একই গীতাকে অনুসরণ করেই অরবিন্দ রাজনীতি ছেড়ে চলে গেলেন। একই গীতাকে অনুসরণ করে কেউ বা ভক্তি পথেও চলেছেন। একই গীতাকে অনুসরণ করে অতীতে বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামে ও যুদ্ধের পক্ষে উৎসাহ সংগ্রহ করতেন। আবার সেই গীতারই এক অহিংস, কর্মযোগী ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী তাঁর পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিলক তাঁর গীতারহস্যে সন্ন্যাস ও ভক্তি মার্গকে খন্ডন করে কঠোর

কর্মযোগ প্রমাণ করেছেন—যদিও তাতে অহিংসার নামগন্ধও দেখতে পান নি। মোটকথা এই সমস্ত বৃহৎ ব্যক্তিরা বোধহয় নিজেদের বিশ্বাস ও শক্তির জোরে একই জিনিসের বিভিন্ন দিকগুলি যার যার রুচিমতো অত্যধিক জোর দিয়ে গেছেন। যাক্, গান্ধীজীকে বিশ্লেষণ করাই বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য, গীতার বিশ্লেষণ নয়। কিন্তু গান্ধীর জীবনে, বিশেষ করে তাঁর ধর্মের বিশেষ বিশ্লেষণ করতে হলে, গীতারও গভীর বিশ্লেষণ করা দরকার—কেন না গীতা তাঁর জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। তিনি শুধু শুধুই প্রতিদিন গীতা পাঠ করতেন না—গীতা থেকেই তাঁর চরিত্রের বল প্রতিদিন সংগ্রহ করতেন—বিশেষ করে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' পুরুষের যে চরিত্রটি গীতাতে আছে, সেটি তাঁর নিত্যকার সাধনা। স্থিতপ্রজ্ঞতা জিনিসটি যে কেবল ধার্মিকদেরই দরকার তা নয়, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের যদি মনের শিক্ষার প্রয়োজন কোনদিন হয় তবে স্থিতপ্রজ্ঞা অর্জন করানো একটি বিশেষ দরকারি শিক্ষা বলে সবাই মেনে নেবেন—এমন কি যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী, তাঁরাও একথা স্বীকার করে নিতে পারেন। স্থিতপ্রজ্ঞ চরিত্র জিনিসটি কেবল ভারতবর্ষই বুঝেছে বা বুঝতে চেষ্টা করেছে এমন নয়। কমবেশী সব দেশেই মানুষকে এই গুণটি অর্জন করতে বলা হয় বা হয়েছে—কেন না সুখে দুঃখে অতিরিক্ত কাতরতা, লাভক্ষতিতে অত্যন্ত বেশি স্পর্শকাতরতা, জয়পরাজয়ে লাফালাফি করা—এরকম দুর্বলতা নিয়ে জীবনে চলা অসম্ভব। 'সাইকোলজি' যেদিন প্রত্যক্ষভাবে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের কাজে অগ্রসর হবে তখন স্থিতপ্রজ্ঞতার আদর্শকে কাজে লাগাতে হবে—তাতে কোন ধর্মান্ধতা বা কোন সংস্কার দেখানো হবে না। গীতার মানুষ অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ হতে পারাটা কোন ক্ষতিকর জিনিস হবে না। Abstract ideal হিসাবে না হোক—যতটা সম্ভব দৃঢ় চরিত্র সবারই পক্ষে বরণীয় হওয়া উচিত। দুঃখকে বাহ্য ব্যবস্থার দ্বারা একদম দূর করা যাবে—এমন কি সাম্যতন্ত্রে অথবা সর্বোদয় সমাজে মৃত্যু, শোক, জরা, ব্যাধি, ঈর্ষা সব কিছু চলে যাবে এমন ধরণের হাস্যকর দাবি কেউ করে না। দুঃখের কারণ মানুষের কোন কালেই একদম মুছে যাবে না এবং অনেক দুঃখ যে সুখ থেকেই জন্মাতে পারে অথবা সুখের পিছনে অন্ধভাবে ছুটেও মিলতে পারে—এসব কথাও, একটু ভাবলেই স্বীকার করতে হবে। বাইরের বা সমাজের ব্যবস্থা (external environment) যত সুন্দর করতে পারি, তা করতে হবে। তাহলেও মানুষের মনের ভিতর, inner equanimity-টাকেও তৈরি করতে হবে। সেই আগামী স্বর্ণযুগের ও স্বপ্নযুগের কথা না হয় ভবিষ্যতের জন্যই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আজ তো চলতে হবে, লড়তে হবে, মরতে হবে, ভাঙতে হবে, গড়তে হবে। এবং এই জীবন-সংগ্রাম কঠিন, এখানে সুখ দুঃখের তাড়নাকে অগ্রাহ্য করতে না পারলে আমাদের কোন লড়াইই চলতে পারে না। অতএব গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ আদর্শের মধ্যে সেই লড়াইয়ের শক্তির যোগান আছে। এ কথার উপর গান্ধীজী খুব জোর দিয়েছেন এবং এর থেকেই তাঁর জীবনভর সংগ্রামের শক্তি ও সাহস পেয়েছিলেন। এতটা অনুমতি বোধহয় নিঃসন্দেহে তাঁকে দেওয়া যায়।

কথা হচ্ছে গান্ধীর যদি ভগবানকেই একমাত্র দরকার ছিল তবে তাঁর এসব দেশসেবা রাজনীতি ইত্যাদিতে আসার কি দরকার ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস, কবীর, তুকারামদের

মত সাধনা করলেই তো হতো। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে ফেলে তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি জিইয়ে রেখেছেন, এই অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কেন না আমরা ইউরোপের ইতিহাস থেকে দেখেছি প্রগতিবাদীদের ও বিপ্লবীদের একটা মস্ত লড়াই ছিল চার্চ থেকে স্টেটকে আলাদা করার জন্য, ধর্ম থেকে রাজনীতিকে উদ্ধার করার জন্য। কেন না সেখানে দেখেছি প্রতিক্রিয়াশীলতার যাবতীয় শক্তি ধর্মের আড়াল থেকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার কত সুযোগ নিয়েছে, জনতাকে মোহান্ধ করে রাখার জন্য কি জঘন্যভাবে ধর্মের দোহাই দেওয়া হয়েছে। এ কেবল ইউরোপের ইতিহাসেরই সাক্ষ্য নয়। সর্বদেশের ইতিহাসে এর নজির আছে, এবং আমাদের এই ভারতভূমিতেও তার কম দৃষ্টান্ত নেই। গান্ধীজী নিজেও অনেকবার বলেছেন ধর্মের নামে, ভগবানের নামে এত অত্যাচার, বীভৎস অন্যায় ঘটেছে যাতে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়—এত হত্যা, লুণ্ঠন, দাঙ্গা, বলাৎকার ঘটেছে ধর্মের নামে যা নিজেও তিনি উল্লেখ করেছেন, এবং তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, এই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি মরণপণ অনশন করেছেন অনেকবার। অনেকবার তাঁকে মরণের সম্মুখে আসতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিয়েছেন তিনি এক ধর্মান্ধ হিন্দু যুবকের হাতে। এতৎসত্ত্বেও তিনি ভগবান ও ধর্মকে একদিনের জন্যও, এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন নি। তাঁর কার্যকলাপের দোষস্খালন করা নয়, তাঁর কাজটাকে ও চিন্তাধারাকে বুঝবার চেষ্টা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

My Experiments With Truth-এর ১৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—"If I found myself entirely absorbed in the service of the community, the reason behind it was my desire for self-realisation. I had made the religion of service my own, as I felt that God could be realised only through service. And service for me was the service of India, because it came to me without my seeking, because I had an aptitude for it. I had gone to South Africa for travel, for finding an escape from Kathiawad intrigues and for gaining my own livelihood. But as I have said, I found myself in search of God and striving for self-realisation." "আমি যে সমাজ সেবায় একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেলাম তার কারণ, তার ভিতরে আমি আমার মোক্ষেরই সন্ধান করেছি বলে। জনসেবাকেই আমার ধর্ম করেছি, কেন না আমি জেনেছি একমাত্র সেবাধর্মের সাহায্যেই ভগবানকে পাওয়া যায়। এই সেবা আমার কাছে ভারতের সেবা রূপেই অতি সহজে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কেন না সেই ভারতের সেবা আমি না চাইতেই আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল, কারণ এ বিষয়ে আমার স্বভাবধর্মের মিল ছিল—আমার স্বধর্ম রূপে দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি গিয়েছিলাম বেড়াবার জন্য, রোজগারের জন্য, আর তৎকালীন কাথিয়াওয়ারের কূট ও কপট আবহাওয়া থেকে রেহাই পাবার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার অজ্ঞাতেই আমি দেখি যে ভগবানের সন্ধানে আমি লেগে গিয়েছি, আমার মুক্তির সাধনায় আমি নিযুক্ত হয়ে পড়েছি।"

গান্ধীজীর প্রিয় সেক্রেটারি ও শিষ্য প্যারেলাল লিখেছেন, "Asked what his motive in life was, whether it was religious, or social or political, "Purely religious," replied Gandhiji. "This was the question asked of me by late Mr. Montagu when I accompanied a deputation which was purely political. 'How have you, a social reformer,' he exclaimed, 'found your way into this crowd ?' My reply was that it was only an extension of my social activity. I could not be leading a religious life unless I identified myself with the whole of mankind, and that I could not do so unless I took part in politics. The whole gamut of man's activities today constitutes an indivisible whole. You cannot divide social, economic, political and purely religious work into water-tight compartments. I do not know any religion apart from human activities which they would otherwise lack, reducing life to an image of 'sound and fury signifying nothing."

"কয়েকজন বিশিষ্ট দর্শনপ্রার্থী গান্ধীজীকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি ধর্ম, না সমাজনীতি, না রাজনীতি ?

"গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, সম্পূর্ণভাবে ধর্ম। ঠিক একই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মন্টেগুসাহেব, যখন আমরা কয়েকজন তাঁর কাছে একটা রাজনৈতিক ডেপুটেশন নিয়ে যাই। তিনি বলে উঠলেন, 'আপনার মতো একজন সমাজসেবক কি করে এই রাজনৈতিক জোটের মধ্যে এসে পড়লেন ?' আমার উত্তর ছিল এই যে এটা আমার সমাজ সেবার কাজেরই বিস্তার মাত্র। আমি কিছুতেই ধর্ম পথে চলতে পারি না, যদি না আমি সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, এবং সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয় যদি না আমি রাজনীতিতে অংশ না নিই। মানবজাতির কর্মজীবনের সমগ্র আকাশটা আজ এক অবিভাজ্য বস্তু। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা কক্ষে ভাগ করা যায় না। জীবনের কাজকর্ম থেকে আলাদা কোন ধর্মের অস্তিত্ব আমি দেখতে পাই না। তা যদি হোত তবে জীবন এমন জিনিষ হারিয়ে ফেলতো যার অভাবে জীবনটা একটা অর্থহীন শব্দবাদ্য, উত্তাপ উত্তেজনাপূর্ণ ভোজবাজী ছাড়া কিছুই হোত না।"

অতএব এই হলো গান্ধীজীর ভগবান ও ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা। রাজনীতি বা সমাজনীতিতে ধর্মকে আনতে তিনি লজ্জা বা সংকোচ অনুভব করতেন না—বরং সমাজের মুক্তির জন্য, সেবার জন্য, ধর্মের সাহায্য নেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করতেন।

এখানে দুটি কথাকে জড়িয়ে ফেললে চলবে না। বিশ্বজগতের নিয়মকানুনে ভগবানের প্রয়োজন আছে কি নেই—তক্ক হিসেবে ভগবানের অস্তিত্ব আছে কি নেই, সেই দার্শনিক তত্ত্ব—অর্থাৎ Idealism ও Materialism-এর তর্ক একটা শাশ্বত জিজ্ঞাসা। এখানে গান্ধীজীর মনে কোন সন্দেহ নেই, কেননা ভগবানই আছেন,

আর কিছু নেই, এই যাঁর বিশ্বাস তাঁর কাছে কোন তর্কই নেই। আর যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁদেরও কোন সন্দেহ নেই—তাঁদের কাছে বস্তু জগত আছে—ভগবান নেই। কিন্তু আরেকটি কথা আছে যার মীমাংসাও খুব সহজ নয়—কেননা সেটা ইতিহাসের দলগত-শ্রেণীগত স্বার্থের উত্তাপে উত্তেজিত। সে হলো ইতিহাসের বিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা। এবিষয়ে বোধহয় কেউ আপত্তি করবে না যে মানুষের ইতিহাসে ধর্ম একটা প্রকান্ড অংশ নিয়েছে, যেখানে ধর্ম মানে কেবল ভগবানের অস্তিত্ব বা নাস্তিকদের কথাই নয়। ধর্ম জীবনযাত্রার নানা রূপ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ভালোমন্দ জ্ঞান, শুভ-অশুভের প্রশ্ন, ন্যায়-অন্যায়ের কথা, সুন্দর-কুৎসিতের মানদন্ড, সৎ-অসতের বিচার, ভুল-শুদ্ধের বিতর্ক থেকে আরম্ভ করে পাপ-পুণ্য, আচার-বিচার, আমোদ-আহ্লাদ, কলা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি হাজারো প্রকার সামাজিক ব্যবহার ধর্ম কথাটির আশ্রয় নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে, সেখানে ভগবান ব্যাপারটাই সর্বস্ব নয়। এমন কি এমন এমন ধর্ম ছিল যা ভগবানশূন্য—যেমন বৌদ্ধধর্ম। এই ভগবানহীন বৌদ্ধধর্ম একদিন পৃথিবীতে কম কান্ড করে নি—পরে অবশ্য বুদ্ধকেই ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। মানুষের আচার, বিচার, ব্যবহারের ধারা নিয়ে যে লৌকিক ধর্ম তা তো ভগবানহীনভাবে চলতে পারে এবং অতীতে চলেছে। এমন কি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যে সমস্ত ভগবৎপ্রধান ধর্ম—তাদের অন্তর্গত লোকেরা কজনা সত্যি সত্যি ভগবানের জন্য সাধনা করে বেড়ায় তা খুঁজে বের করতে হয়—বেশীরভাগ লোকই লৌকিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যাপৃত, ভগবানটা একটা কথার কথা মাত্র। তাদের নিত্যকার জীবন ভগবান-বর্জিত একথা বললেও হয়তো ভুল হয় না। কিন্তু তারা হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান বটে। কেন না যদি হিন্দুর মতো খায়দায়, বিয়ে-থা করে হিন্দুর মতো শ্মশানে চরে তাহলেই যথেষ্ট—তাহলেই তাকে হিন্দু বলে ধরা হয়। হিন্দু বংশে জন্ম নিয়েও আমি যদি ভগবান না মানি—তথাপি আমার হিন্দুত্ব দূর হয় না। হিন্দু বলতে যে সভ্যতার ছাপ আমার উপরে রয়েছে, ও যে ব্যবহারিক জীবন রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ বদলাবার পূর্বে বলা যায় না যে আমি কার্যত আর হিন্দু নই। এমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধেও খাটে। এর অর্থ কি তবে ধর্ম তাঁদের কিছুই নেই—যেহেতু তাঁরা সত্যিকার কোন ভগবানের সাধনা করেন না? মোটেই নয়। লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম তাঁদের জীবন বেশ কিছু নিয়ন্ত্রিত করে থাকে—এবং যতটা করে থাকে তা অবহেলার বস্তু নয়। সবকাজেই theoretical question হিসাবে ভগবানের চর্চা ও ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের ভূমিকা দুটি আলাদা কথা—যদিও সম্পর্কহীন নয়।

তাছাড়ো আরও একটা ঐতিহাসিক সত্যকে অগ্রাহ্য করলে ভুল হবে। কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে শাসকশ্রেণী যেমন ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে, আবার নিপীড়িত, শাসিত শ্রেণীদেরও দেখেছি যুগে যুগে ধর্মের পতাকা উড়িয়ে তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। বরং দেখা যায় শাসকশ্রেণী যেখানে দোর্দন্ড, সেখানে নিপীড়িত শ্রেণীগুলি প্রথমে ধর্মের আবরণেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নিয়েছে। ধর্মে ধর্মে লড়াই এবং একই ধর্মের মধ্যে সংস্কারের আন্দোলন এবং

সংগ্রাম—এইসব শ্রেণী-স্বার্থ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের অগ্রগতির অভিযানে ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে—কেবল বাধাই সৃষ্টি করে নি। বরং বলা যেতে পারে পৃথিবীতে যত বৈপ্লবিক আন্দোলন হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর আগে, তা প্রায়ই কোন না কোন ধর্ম সংস্কারের পতাকা হাতেই ঢুকেছে। একমাত্র ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই এবং মার্কসবাদের পরিপুষ্ট পতাকার তলেই সামাজিক বিপ্লব ধর্ম ও ভগবানকে অস্বীকার করে শুরু করেছে। কিন্তু সে তো কেবল দুশো বছরের কথা মাত্র—কিন্তু মানুষের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। এসব কথার মানে কি? মানে এই, বলা চলে যে ধর্মের নাম করে হলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হতে বাধ্য, এমন কোন ঐতিহাসিক নজির নেই। যেমন বন্দুকধারী বললেই বোঝায় না যে সে ডাকাত, রক্ষীও হতে পারে, তেমনি ধর্ম নাম শুনলেই বুঝতে হবে না যে সে প্রতিক্রিয়াশীল, পুঁজিপতির চর, অথবা সাম্রাজ্যবাদী। দেখতে হবে তার বিশ্বাস, ও ধর্মকে সে কোন কাজে লাগাতে চায়—সে কি প্রগতির কাজে সাহায্য করতে চায়, সে কি মুক্তির কাজে লাগাতে চায়, না অন্যায়ের, অত্যাচারের, শোষণের কাজে লাগাতে চায়। আমরা বলতে চাই গান্ধীজী ধর্ম ও তাঁর ভগবানকে প্রগতির কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, মানুষের মুক্তির কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, মানুষের দুঃখ লাঞ্ছনা, অপমান দূর করার কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সমান অধিকার স্থাপনের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সর্বোপরি অন্যায়ের ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংযোজিত করতে লাগিয়েছিলেন। বলতে পারেন যে একটা ভুল ধারণাকে, যা নেই তাকে আছে বলে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ-ও বলতে হবে তাঁর ধারণা ভুল হলেও সেই ধারণাকে তিনি প্রগতির কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

আমরা যদি একটু বিচার করে দেখি তিনি কিভাবে ধর্মকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাহলে তক্ষুনি এই সত্যকে মেনে নিতে হবে যে তিনি কখনও ধর্মকে প্রগতির বিরুদ্ধে লাগান নি। যেমন তাঁর ধর্ম কুসংস্কারের ধর্ম নয়, নৈতিক ধর্ম বা ethical religion. সনাতনী ধর্ম তাঁর নয়। হিন্দু ধর্মের অনেক জিনিসই তিনি মানতেন না। হরিজনদের মন্দিরে ঢুকতে দেয় না বলে তিনি কখনও কোন মন্দিরে যেতেন না। বলতেন যেখানে হরিজনরা যেতে পারেন না, সেখানে ভগবান নেই। বিধবাবিবাহ তিনি সমর্থন করেছেন। নারীদের সমান অধিকার আজ যে ভারতে এমন সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁরই দান তাতে বেশীর ভাগ। বর্ণাশ্রমধর্ম তিনি এক সময়ে সমর্থন করতেন, কিন্তু তিনি তার এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাতে সব বর্ণই সমান সম্মানের। কাজের বিভাগ ছাড়া, সম্মান, পুরস্কার, লাভলভ্যে বিভেদ তিনি মানতেন না। পরে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজন তিনি একদমই অস্বীকার করেন। সব ধর্ম সমন্বয়ে ও সকল ধর্মের সমান আসন ও মর্যাদা তিনি দিতেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি কত কি করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না—শেষপর্যন্ত তাতেই জীবনদান করে গেছেন। তিনি ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন লড়াই করে গিয়েছেন। মানুষের সমান অধিকারও ধর্মের দোহাই দিয়েও জানিয়ে গেছেন। খুঁটিয়ে বিচার করলে

ধর্মের মধ্যেও বিপ্লব তিনি করে গেছেন, একথা বলা যায়। অতএব বলা যায় ধর্ম দিয়ে তিনি প্রগতি রোধ করতে চান নি—প্রগতির পথ খোলসা করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজী বলেছেন, "My scheme of life, if it draws no distinction between different religionists in India, also draws none between different races. For me man is a man for all that. I embark upon the campaign as much out of my love for the Englishman as for the Indian. By suffering I seek to convert him, never to destroy him." (Harijan : 20.2.30) অর্থাৎ আমার জীবনদর্শন যেমন ভারতবর্ষের ধর্মে ধর্মে বিভেদকে স্বীকার করে না তেমনি জাতিতে জাতিতে বিভেদও স্বীকার করে না। আমার কাছে, "মানুষ মানুষ"—এই যথেষ্ট। আমি আজ যে অভিযান শুরু করেছি তাতে যেমন ভারতীয়দের উপর ভালোবাসা আছে, তেমনি আছে ইংরেজদের প্রতি ভালোবাসা। নিজের উপরে দুঃখ টেনে এনে আমি তাদের পরিবর্তন করাতে চাই, কখনও তাদের (ইংরেজদের) ধ্বংস কামনা করি না।" এই মানব ধর্ম কোনপ্রকার সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার সাহায্য করতে পারে না। এই উদার মতের দ্বারা আশু কাজ কি হয় তা নিয়ে হয়তো তর্ক হতে পারে, হয়তো এই উদার মতের বাস্তব ব্যবহার কি হবে তা নিয়ে প্রচুর তর্ক হতে পারে, কিন্তু এই উদার মতে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্থান নেই।

তাঁর জীবনে বিশ্বাস বা faith-এর এই প্রাধান্য দেখে আমরা চমকে উঠি বটে। কিন্তু বিশ্বাস বা faith মানুষের জীবনে একটা প্রধান উপাদান। যুক্তির সমর্থনে বিশ্বাসকে কখনও বর্জন করি না। কিন্তু সাধারণ মানুষ যুক্তিও যখন খুঁজে পায় না, বিশ্বাস তখন তাকে রক্ষা করে, এমনটি দেখা যায়। রাশিয়ার বলশেভিকদের যদি আমরা নাস্তিক বলি তবে ভুল হবে। নাস্তিক মানে যার জীবনে না-টাই সব, না-টাই প্রধান। কমিউনিস্টদের জীবনে না-টা প্রধান কথা নয়, হ্যাঁ-টা প্রধান কথা। সেখানেও তাদের জীবনে বিশ্বাস প্রগাঢ় যুক্তি শক্তি যুগিয়ে চলেছে। ভগবানের উপরে বিশ্বাস সেখানে নয়, abstract কোন conception-এর উপর বিশ্বাস নয় বটে—কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস তেমনি অটল, ক্রমবর্ধমান। যে মানুষ—কোন একটি মানুষ নয়—সকল কালের মানুষের এক সামগ্রিক সত্তা বা abstract humanity, সেখানে ভগবানের স্থান অধিকার করে আছে। নাস্তিকতা সেখানে কথা নয়। এমন কি চেকভ একখানে বলেছেন,—"Russian life presents itself as a series of faiths, that a Russian does not believe in God is merely a way of saying that he believes in something else."—"রাশিয়ার জীবন যেন কতগুলি বিশ্বাসের ইতিহাস, রাশিয়ানেরা ভগবানে বিশ্বাস করে না এই কথার অর্থ এই যে তারা অন্য কিছুকে বিশ্বাস করে।" অর্থাৎ বিশ্বাস তাদের জীবন থেকে মুছে যায় নি ; ভগবানের উপর বিশ্বাস থেকে নিজেদের উপর ও মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। বিশ্বাস বা faith-কে বাদ দেয় নি। তাছাড়া সবদেশের মানুষই হয়তো ভগবানকে বাদ দিতে পারে কিন্তু দেবত্ব বা divinity-কে বাদ দিতে পারে না।

অর্থাৎ মানুষ—রক্তমাংসের মানুষকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বানর যেমন বানর থেকেই খুশী, গরু যেমন গরু থেকেই খুশী, গাধা যেমন গাধা থেকেই খুশী, মানুষ নিছক মানুষ থেকেই খুশী হয় না। মানুষের যেন দেবত্ব চাইই-চাই। মহাপুরুষ হওয়া চাই, অতি-মানুষ হওয়া চাই, মানুষকে অতিক্রম করে যাওয়া চাই, এমন ধরণের এক নেশা মানুষের আছেই আছে, এবং থাকবেই থাকবে। মানুষ তার নিজের সীমানাকে অতিক্রম করবেই করবে—এরই বৃহত্তর নাম হলো মুক্তির অভিযান—যুগে যুগে। মানুষ দেবতার মতো হবে অথচ দেবতা তো কেউ দেখেনি, স্বর্গও কেউ কখনও দেখে নি। দেবতা ও দেবত্বের ছবি মানুষেরই মনের ছবি। তার ধ্যানের ছবি, কল্পনার ছবি, তার আকাঙ্ক্ষার ছবি, তার মুক্তির স্বপ্ন। এই দেবত্বের স্বপ্নকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন কালেই চলবে না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে মানুষের মনুষ্যত্ব হলেই যথেষ্ট, দেবত্বের দরকার নেই। কিন্তু মনুষ্যত্ব কি—তা যখন খোঁজ করা যায় তখন দেখা যায় মনুষ্যত্বের উপাদান তথাকথিত দেবত্ব দিয়েই তৈরী। বরং দেবতাদের বেলায় মানুষ অনেক কনসেশন দিয়ে থাকে—মনুষ্যত্বের কোন কনসেশন বা indulgence নেই। সেখানে ক্ষমাহীন নির্মম আদর্শ বিরাজমান। মানুষ নিছক মানুষের বিরুদ্ধে বারে বারেই বিদ্রোহ করবে। যদি আমরা মানুষের এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও দেবত্বের প্রতি অভিযানকে স্বীকার করি তবে মহাত্মা গান্ধীর অনেক 'অপরাধ' ক্ষমা করতে পারবো—যদি জানি মহাত্মাজী মানুষের এই বিশ্বাসের দিকটা ও দেবত্বের দিকটার উপর বড্ড বেশী জোর দিয়েছিলেন।

ভগবানের আরাধনা মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে করতে হবে এই হলো গান্ধীর কথা। এই মানুষ কে বা কারা? সকল মানুষ—বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষ। সবার পিছে, সবার নীচে সকলের শেষে দাঁড়িয়ে যে, তার দাবি আগে—এই ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। নরনারায়ণ শুধু নয়—দরিদ্রনারায়ণ। দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবার মাধ্যমে ভগবানকে পেতে হবে—এই ছিল তাঁর জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। দরিদ্র-নারায়ণের কথা বিবেকানন্দও বলেছিলেন। এই দরিদ্রনারায়ণের সেবক হিসেবে গান্ধীজী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই মার্কসবাদী দলগুলির Proletarian আনুগত্যের যাবতীয় কামান-বন্দুকের আওয়াজ তিনি তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেকথা বারান্তরে বিশদভাবে বলা যাবে। শুধু এটুকু এখানে মনে রাখা দরকার যে গান্ধী এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যা সমাজের দীনতম শ্রেণীগুলির সংগে তাঁর identification বা একাত্মতা ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ class হিসেবেও তিনি নির্যাতিত শ্রেণীগুলির সাথেই যুক্ত হতে পেরেছিলেন তাঁর দরিদ্রনারায়ণের ধর্ম দিয়ে।

অতএব ধর্ম গান্ধীজীর হাতে বিদ্রোহ ও প্রগতিশীলতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"True religion is the greatest disturbing factor in life whether individual or collective. A religious awakening constitutes a revolution, a transformation, a regeneration." (Self-Restraint Vs. Self-Indulgence p. 34) অর্থাৎ সত্যিকার ধর্ম ব্যক্তিগত

জীবনেই হোক আর সমষ্টিগত জীবনেই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টিকারী শক্তি। ধর্মের জাগরণ এক একটি বিপ্লব বিশেষ যাতে আমূলে পরিবর্তন ও পুনরুত্থানের ধারা বয়ে আনে। ইতিহাসের দিকে তাকালে এই উক্তি অস্বীকার করা যায় না—যদিও ধর্মের নামে আজকাল আর সেই বৈপ্লবিক জাগরণ বড় একটা দেখা যায় না। তথাপি ইদানীংকালের ভারতবর্ষেও রাজা রামমোহন রায়, বিপিন পাল, স্বামী দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন ইত্যাদি ধর্মনেতাদের আন্দোলনে একথার কিছুটা প্রমাণ আমরা পাই না কি?

আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে নাস্তিকতা বা আস্তিকতা, idealism বা materialism কোন কিছুকে প্রমাণ করানো আমাদের এই বিচারের বিষয় নয়। আমরা দেখতে চাইছি গান্ধীজীর মতো লোকের মাধ্যমে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও প্রগতির অভিযান কি করে সম্ভব হয়েছিল। একে একে তাঁর চরিত্র ও চিন্তার প্রধান প্রধান বিষয়গুলির বিচার করে দেখতে চাইছি যে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল ধারার বাহক না বন্ধন ছিলেন গান্ধী এবং কেন? এখানে আমরা চেষ্টা করেছি গান্ধীজী অসম্ভব রকম ভগবান-ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রগতিশীলতার নেতৃত্ব তাঁর ধর্মবিশ্বাসে কোন কিছু আটকায় নি। অর্থাৎ তিনি ভগবানভক্ত ছিলেন বলেই সত্যের ও বিজ্ঞানের ও যুক্তির পূজারী ছিলেন না—এমন ধরণের যান্ত্রিক বিচার চলে না। যেমন হিটলার ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, হিটলারকে কখনও চার্চে যেতে কেউ দেখে নি। তিনি ভগবানে অবিশ্বাস করতেন এবং চার্চ বিরোধী ছিলেন বলেই তো কেউ তাঁকে প্রগতির বাহক বলবেনা! Simple logic অনেক সময় simpleton-এর logic-এ পরিণত হতে পারে। নাস্তিক হলেই সে প্রগতিশীল হবে, কমিউনিষ্ট হবে, আর আস্তিক হলেই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী হতে হবে এমন সূত্র ইতিহাস বা যুক্তি থেকে পাওয়া যায় না। তবে যে কোন প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শক্তি সর্বকালেই প্রচলিত ধর্মকে আঘাত করেছে ও প্রত্যাঘাত পেয়েছে। সেই হিসাবে গান্ধীজীও প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মান্ধতাকেও কম আঘাত করেন নি এবং সেই ধর্মান্ধতার প্রত্যাঘাতেই তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল—একথাও যেন স্মরণ থাকে। একই সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে লড়াই করেছেন আবার ধর্মের জন্যও লড়াই করেছেন। তারই জন্য তিনি বলেছেন, I am both an idolator and an iconoclast in what I conceive to be the true sense of the term. (Young India : 28. 8. 24)

আবার একথাও একদম অস্বীকার করা যায় না যে গান্ধীজী ধর্মবিশ্বাসের অতিরিক্ত তাড়নায় কখনও কখনও ভোগেন নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুসংস্কারকেও সাহায্য করেন নি। যেমন বিহারের ভূমিকম্পের বেলায় যখন তিনি বলেছিলেন যে হরিজনদের প্রতি অত্যাচারের জন্যই ভগবান ভূমিকম্প পাঠিয়েছিলেন তখন মহাত্মার গুরুদেব, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, তক্ষুনি তাঁকে তীব্র সমালোচনা করলেন এবং বললেন, প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে মানুষের ও ভগবানের সংস্রব দেখিয়ে গান্ধীজী বড্ডো অন্যায় করছেন এবং কুসংস্কারের সাহায্য করছেন। গান্ধীজী কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি, কেবল এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হন যে ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটা ঘাসের পাতাও নড়ে

না, আমার মনে যা ডাক দিয়েছে তাই বলেছি। এই যুক্তি একেবারে অচল। এই জাতীয় অর্থহীন বিশ্বাস একমাত্র এই ভেবেই ক্ষমা করা যেতে পারে যে গান্ধীজী তখন হরিজন আন্দোলন নিয়ে (তার কিছুদিন পূর্বে দীর্ঘ অনশন থেকে উঠেছেন) এতো নিমগ্ন যে হরিজন ছাড়া তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন মনে আর কিছুরই হদিশ ছিল না। মনের সেই অবস্থায় এমনি ধরণের একটা বিভ্রান্তকারী ভাবনা তাঁর মনে এসে উপস্থিত হতে পারে। তাঁর inner voice-এর ব্যাখ্যা হয়তো এই জাতীয় একটা psychological phenomenon। মনস্তাত্ত্বিকেরা এবিষয়ে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা দিতে পারেন—কেন না মানুষের মনের অনেক রকম স্তর ও বিচিত্র অবস্থার খবর তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। মানুষের মনের সম্পূর্ণ চেহারাটা আজও জটিল, অনেক রহস্যময় ঘটনার ও অবস্থার সম্যক ব্যাখ্যা আজও হয় নি। অপর একটা সংস্কারের ক্ষেত্র প্রচন্ডভাবে গান্ধীজীর চিন্তায় বর্তমান ছিল—সে হলো মানুষের যৌন জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে। ব্রহ্মচর্য, আত্মসংযম—জন্মনিয়ন্ত্রণ—ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন ও যে-সমস্ত গবেষণা করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে অন্ধ সংস্কারের অনেক বীজ আছে বলে প্রগতিবাদীরা আক্রমণ করেছেন। এ বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো—কিন্তু সেখানেও গান্ধীজী বৈজ্ঞানিক উপায়েই অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছেন—কিছু না জেনে ভুয়ো কথার উপরেই তার সবটা কুসংস্কার বলে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কিন্তু গান্ধীজী কোন ভুল করেন নি একথা কেউ বলে না। তিনি নিজেই কতবার ভুল স্বীকার করেছেন। গান্ধীজী রাজনীতিতে এতো যে ধর্ম এনেছিলেন তথাপি তিনি রাষ্ট্রকে ধর্মের ব্যাপারে হাত দেওয়াতে একদম নারাজ ছিলেন। সে-হিসাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখার নীতিতে তিনি সম্পূর্ণ একমত—প্রগতিশীলদের সাথে। এরই জন্য ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এমন কি গো-হত্যা আইনের সাহায্যে বন্ধ করার তিনি বিরোধী ছিলেন—গো-সেবা ও মুসলমানদের গরুর প্রতি হৃদয়ের টান ও হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে পারলেই তিনি প্রকৃত গো-রক্ষা হবে বলে মনে করতেন। তিনি নিজে একদিন একটি গো-বৎসকে ইনজেকশনের সাহায্যে মৃত্যু ঘটিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন কারণ সেটির কঠিন রোগ হয়েছিল এবং বাঁচবার কোন আশা ছিল না—অথচ অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছিল। ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবে না—এই ছিল তাঁর নীতি। জাকির হোসেনের একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন—"I do not agree that the government should provide religious education. If there are some people to give religious education of the wrong type, you cannot prevent it. If you try to do so, the result can only be bad. Those who want to give religious education may do so in their own way, so long as it is not subversive of law and order or morals. The government can teach ethics based on the main principles common to all religions and agreed to by all parties. In fact ours is a secular state."

(Harijan 9-11.47) অর্থাৎ "সরকার ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করুক এ আমি চাই না। কেউ যদি ধর্মের বিকৃত শিক্ষা দেয় তবে তা বন্ধ করা মুশকিল। যদি তা বন্ধ করতে চাও ফল তার খারাপই হবে। যারা এই ধর্মশিক্ষা দিতে চায় তাদের মত করে তারা অবাধে শিক্ষা দিতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দেশের আইন-শৃংখলা ও নৈতিক জীবনকে আঘাত না করবে। সরকার কেবল সাধারণ নীতির শিক্ষাই দিতে পারেন—যেসব নীতি সর্বধর্ম ও সর্বদলসম্মত নীতি। মনে রাখতে হবে আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার।" এই কথায় বুঝতে পারা যায় যে গান্ধীজী কখনও ধর্ম ও রাষ্ট্রকে একত্রিত করতে চান নি কেন না তাঁর মতে তাতে ধর্মেরও ক্ষতি হবে এবং রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হবে।

গান্ধীজীর ধর্মপ্রচার প্রতিদিনই ছিলো—বিশেষ করে জীবনের শেষ দিকে। প্রতিদিনকার প্রার্থনাসভাগুলি তাঁর এক বিশেষ ব্যাপার। বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নরনারী তাঁর সভায় যোগ দিত—প্রার্থনা সংগীত ও রামধুনে অংশ গ্রহণ করতো। আবার সেই আসরেই বসে যাবতীয় রাজনীতির কথা সোজা সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন এবং সকলের সাথে একসাথে দুরূহ রাজনীতির জটিল কথার মনন করতেন। এগুলিকে ধর্মসভা না বলে রাজনৈতিক সভাই বলা উচিত। একটা উত্তেজিত পরিসর সৃষ্টি করে তিনি কোন রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করতেন না—কোন প্রকার উত্তেজক ভাষা তাঁর রাজনীতি শিক্ষায় ছিল না। একমাত্র রাজনৈতিক অধিবেশনে ও খবরের কাগজেই দরকারের সময় তাঁর আবেগময় দৃপ্ত সংগ্রামী আহ্বান প্রকাশ পেতো। কিন্তু প্রতিদিনের রাজনৈতিক কাজে তাঁর প্রচারের চেয়ে শিক্ষার প্রতি (education not propaganda) ঝোঁকই বেশী ছিল। বিশেষকরে যে সময়ে তাঁর বিরাট বিরাট প্রার্থনা সভা চলেছে—তখন ভারতে এক বিরাট পরিবর্তন চলেছে, ভাঙন চলেছে, দেশ ভাগাভাগি, দাঙ্গা কত কি কান্ড চলেছে—ঠিক সেই সময়ে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত লোকদের কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়। এইসব প্রার্থনা সভাতে প্রথমে প্রথমে গান্ধীজী একটা শান্ত ভাব আনার জন্য ধর্মের আশ্রয় নিতেন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় একমাত্র গান্ধী ছাড়া আর কেউ সে আগুন নেভাবার কোন উল্লেখযোগ্য কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেন নি—তাঁর সমস্ত নৈতিক শক্তি, আকুল আবেদন, ব্যাকুল প্রার্থনা—"সবকো সুমতি দে ভগবান"—রামধুনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতো। তত্ত্বের দিক থেকে তা যতই আক্রমণযোগ্য হোক না কেন, কাজের দিক থেকে বিচার করলে গান্ধীর প্রার্থনাসভাগুলি মস্ত বড় কল্যাণের ও শুভ কাজ করেছে। এমন কি রাজাগোপালাচারী বলেছেন প্রার্থনাসভাই গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ দান। একথা অবশ্য স্বীকার্য নয়—তবে এই প্রার্থনাসভা একসময়ে অনেক কাজ করেছে।

গান্ধীজীর সঙ্গে নাস্তিক নিরীশ্বরবাদীদেরও যোগাযোগ হতো। সকল মতের লোক তাঁর কাছে গিয়ে দরবার করেছে। এমন একজন নাস্তিকের সঙ্গে গান্ধীজীর কথাবার্তার সারাংশ আমরা তুলে দিচ্ছি। গোপরাজু রামচন্দ্র রাও (গোরা) একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তাঁর নাস্তিকতা ও বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য তাঁকে কলেজ

ছাড়তে হয়। তিনি তখন হরিজনদের মধ্যে কাজে লেগে যান। রামচন্দ্র রাও মহাত্মা গান্ধীকে অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানতেন, এমন কি ভক্তি করতেন। কিন্তু তাঁর ধর্মমত ও ঈশ্বর ভক্তি একেবারেই স্বীকার করতেন না। হরিজন আন্দোলনের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন বলা যায়। কয়েকবার জেলও খেটেছেন—গান্ধী আন্দোলনে। কিন্তু নাস্তিকতার সাহায্যে হরিজন সেবাই তাঁর পথ। নাস্তিকতা তাঁর কাছে কেবল একটা দার্শনিক তত্ত্বই নয়—তিনি মনে করেন মানুষের ধর্মান্ধতা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি যদি দূর করতে হয় তবে ভগবানের ধারণাকেই তুলে দিতে হবে। মানুষ শুধু মানুষ—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও নানা উচ্চনীচ জাতি রেখে সর্বধর্ম সমভাব তৈরী করার চেষ্টা কোন কাজে লাগবে না। ধর্মকেই যদি উড়িয়ে দেওয়া যায় তবে মানুষের মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোন পরিচয় থাকবে না। তাহলেই সকল মানুষ তাদের ঐক্য বুঝতে পারবে। তাছাড়া ভাগ্যের উপর, ভগবানের দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষের উপর জুলুম করে ও জুলুম সহ্য করে। ভগবানের উপর বিশ্বাসটা দূর করে দিতে পারলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে, কোন অন্ধশক্তির সাহায্যের জন্য হাত-পা ছেড়ে পড়ে থাকবে না। কাজেই তিনি মনে করতেন হরিজনদের উন্নতি করতে হলে ধর্মকে আঘাত করা দরকার এবং ভগবানের ধারণা ভুলিয়ে দেওয়া দরকার।

গান্ধীজী এই অধ্যাপকের খবর পেয়েছিলেন। রামচন্দ্র রাও ১৯৩০ সাল থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ও দেখা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিরীশ্বরবাদ তাঁর কাছে অতি অপাংক্তেয় জিনিষ বলে তিনি রামচন্দ্র রাওকে দেখা করতে ডাকেন নি—চিঠির উত্তরে লিখেছেন তাঁর তর্ক করার ইচ্ছা ও সময় নেই। কিন্তু রামচন্দ্র রাও কেবল তার্কিক নন, আসলে তিনি একজন অসাধারণ ও নিষ্ঠাবান কর্মী। বছরের পর বছর জনসেবার কাজ করেই চলেছেন—তাতেই গান্ধীজী ১৯৪৪ সালে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং ডেকে এনে তাঁর বক্তব্য সব শুনলেন। রামচন্দ্র রাও গান্ধীজীর সাথে যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক তর্ক শুরু করতেই গান্ধীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে যদি তর্ক করতে হয় তবে তিনি উপযুক্ত লোক নন, তবে তাঁর পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের কাছে যাওয়া উচিত। রামচন্দ্র রাও তক্ষুণি গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝে ফেললেন। গান্ধীজীর কাছে practical বা বাস্তব দিকটাই প্রধান। মানুষের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, সে কাজে যা কিছু দরকার তাই তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত—সে কাজে আসবে না এমন কিছুতে তাঁর লোভ নেই। সে যত ভালো জিনিষই হোক। রামচন্দ্র রাও তখন তাঁর নাস্তিক দর্শনের বাস্তব প্রয়োজনের কথাটা বোঝাতে লাগলেন। গান্ধী তখন খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে লাগলেন। এইখানেই গান্ধী চরিত্রের একটা দিক স্পষ্ট হলো। বস্তুত রামচন্দ্র রাও-এর পুস্তিকা An Athëist With Gandhi (Navajiban Press) একখানা মনোজ্ঞ বই। যদিও বইখানা গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বের হয়েছে, যদিও গান্ধীজীর কথা যে ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ হয়েছে এমন সার্টিফিকেট গান্ধীজী দিয়ে যেতে পারেন নি—কারণ আলোচনা সম্পূর্ণ হবার আগেই গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটে

এবং অনেক আলোচনা অসমাপ্তই থেকে যায়—তবুও বইখানার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নেই। কেন না গান্ধীজীর যোগ্য শিষ্য ও টিকাকার শ্রীমশরুওয়ালা স্বয়ং তার দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এবং রামচন্দ্র রাও যে একজন যা-তা লোক নন, সেকথাও বলে দিয়েছেন এবং 'নব জীবন' প্রেস থেকেই ওই পুস্তিকার মুদ্রণ ও প্রকাশন হয়। রামচন্দ্র রাও গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ও তাঁকে নিজ সংসারের মধ্যে একজন বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে রাও আস্তিক হন নি—বরং তাঁর বিশ্বাস তিনি গান্ধীজীর নাস্তিকতা সম্বন্ধে যে বিরূপ ভাব ছিল তা কাটাতে পেরেছেন এবং তিনি এমনও বলেছেন যে গান্ধীজীর মৃত্যুও নাস্তিকতাবাদের একটা প্রকান্ড ক্ষতির কারণ হয়েছে। তিনি আশা করতেন গান্ধীজীকেই নিজ মতে আনতে পারবেন, কেন না গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা, মানুষের জন্য প্রেম, বৈজ্ঞানিকতা এতো ছিল যে তাঁর পক্ষে নাস্তিক হওয়াও অসম্ভব ছিল না। গান্ধীজী ধীরে ধীরে নিজ মত অনেক পরিবর্তন করেছিলেন, তাঁর আরও পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব ছিল না ইত্যাদি। এটা হয়তো তাঁর অমূলক বিশ্বাস —তবে তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর কথোপকথন খুবই মনোজ্ঞ। সত্যানুসন্ধানকারী দুই ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে চাইছে—এই চিত্র মনোজ্ঞ না হয়ে পারে না। কথোপকথনের কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ করে দেবার লোভ সম্বরণ করা গেলো না।

"বাপুজী অনেকক্ষণ ধরে আমার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আমরা হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলে যাচ্ছিলাম—গান্ধীজী হঠাৎ শক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'যদি এভাবে নাস্তিকতা দেশের মধ্যে বেড়ে যেতে থাকে তবে নাস্তিকতার বিরুদ্ধেই আমার অনশন করতে হবে।'

আ। আপনার অনশনের বিরুদ্ধে তবে আমি অনশন করবো (আমি তক্ষুনি বলে উঠলাম)।

গা। তুমি অনশন করবে? (গান্ধীজী আমার চোখে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন)।

আ। হ্যাঁ বাপুজী, কিন্তু কেন আপনি অনশন করবেন? নাস্তিকতা কেন খারাপ? আমাকে বলুন, আমার মত পরিবর্তন করবো।

গা। তোমার বিশ্বাস সত্যিই গভীর (গান্ধীজী ধীরে ধীরে বললেন) আজকাল লোকের ধর্মের অপব্যবহারেই নাস্তিকতা বেড়ে চলেছে, একথা সত্যি।

সেদিন আর কোন কথা হলো না—কারণ অন্য লোক এসে গেলো।"

তিনদিন পরে আবার আধঘন্টার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মিললো। এ দিন নাস্তিকতা নিয়ে কোন কথাই তিনি তুললেন না। তিনি কাজকর্ম কেমন করে চলে, তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের খবর, তাঁর সহকর্মীরা কিভাবে জনতার মধ্যে কাজ করে ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন। কিছুদিন আশ্রমে থাকতে বললেন—কিন্তু

সেবারে তাঁর আর সময় ছিল না। জনসেবা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা ছাড়া আর কোন কথাই তুললেন না।

* * * * * *

১৯৪৫ সালে গান্ধীজী আবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন, এবারে আর অতিথি হিসেবে নয়, আশ্রমবাসী হিসেবেই তাঁকে গ্রহণ করা হলো।

"দাওয়াখানাতে আমাকে নার্সদের বিজ্ঞানশিক্ষা দেবার কাজে লাগিয়ে দিলেন। আমি আশ্রমের সব কাজেই থাকতুম—কিন্তু আমাকে প্রার্থনাতে যোগ দিতে হতো না। তিনটি ঘটনা সেবারে আমাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে।

"এক ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীজীর আশীর্বাদ চাইছেন। এই বিদ্বান ডাক্তারটির চিকিৎসা সম্বন্ধে নতুন তত্ব বা থিওরি আছে এবং তিনি তা গান্ধীজীকে বোঝাতে চান। তিনদিন অপেক্ষার পর মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য তাঁর সাক্ষাতের সময় মিললো। কিন্তু ডাক্তারকে পাঁচ মিনিটের পূর্বেই সাক্ষাৎ সেরে ফিরতে হলো। ডাক্তারকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে বাপুজীর সময় অত্যন্ত কম বললেন এবং এতো তত্ব খুঁটিয়ে শোনবার মতো সময় চাই। তাই গান্ধীজী বলেছেন যে আশ্রমে একটি পুরাতন রোগী আছে, ডাক্তার যেন তাঁর উপর তার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে গান্ধীজীকে বুঝিয়ে দেন, তিনি কি করতে পারেন।

এই ঘটনা থেকেও আমি বুঝতে পারি যে গান্ধীজী সকল তত্বের বাস্তব ফলাফল দিয়ে বিচার করতেন।

* * * *

"আর একদিন এক ভদ্রলোক দশ মিনিটের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন। সেদিন নীরব সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা, কারণ সেদিন গান্ধীজীর মৌনদিবস। গান্ধীজী শ্লেটে লিখে উত্তর দিচ্ছিলেন।"

"ভদ্রলোক সাত মিনিট ধরে বাগ্মিতার সঙ্গে তাঁর সমস্যা বুঝিয়ে বললেন এবং গান্ধীজীর উপদেশ চাইলেন। বাপুজী উত্তরে লিখলেন, 'তোমার সমস্যা সম্পর্কে এতো দীর্ঘ কথা যখন বলেছ তক্ষুনি বুঝেছি তুমি সমস্যাটা এখনও ধরতে পার নি।"

"ভদ্রলোক তো হতভম্ব। বাপুজী আবার লিখলেন, 'একজন কর্মীকে সোজা বাস্তবের মুখে ঢুকে পড়তে হবে, তাকে কেবল থিওরী করলে চলবে না।'

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বলতে চেষ্টা করলেন—'বাপুজী আমার সমস্যা যে অনেক।'

"উত্তরে আবার বাপু লিখলেন, যাও কাজ করো গে, বাস্তব কাজই তোমার সমস্যার মীমাংসা যুগিয়ে দেবে।"

দশ মিনিট পার হয়ে গেলো, বাপুজী তাঁর নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

বাপুজী যাকে যখন শাসন করতেন, তখন বেশ শক্ত হতে পারতেন।

* * * *

"আরেকদিন আমি একটা ব্যাঙকে চিরে নার্সদের হার্টের বীট বোঝাতে চাই। নার্সরা অহিংসার খাতিরে তাতে আপত্তি করে। কথাটা গান্ধীজীর কানে যায় এবং

তিনি আমাকে বললেন, যদি হার্ট-বীট বোঝাবার অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে তুমি ব্যাঙটাকে চিরতে পারো।" আমি ব্যাঙ চিরে হার্ট-বীট বোঝাই। গান্ধীজীর অহিংসা লোকে যা ভাবে সেরকম নয়—একথা আমি বুঝলাম।"

* * * *

এদিকে গান্ধীজী নিজের কাজে ব্যস্ত। একদিন প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা করার আহ্বান এলো। আমি ঠিক সময়ে হাজির। গান্ধীজী খাটিয়ার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমি যেতেই আমাকে সেদিন খাটের উপরেই পাশে বসালেন। আমি খুব সহজভাব ফিরে পেলুম এবং মনে হলো যে আমি আমার পিতার সঙ্গে কোন ঘরের কথা নিয়ে আন্তরিক আলোচনায় বসেছি।

এখন বল তো, কেন তুমি নাস্তিকতা চাও? বাপুজী খুব শান্ত ও স্নেহের সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বাপুজীর স্বর ও প্রশ্নের ধরণে কিছুটা অবাক হলুম। এ সেই সাধারণ প্রশ্ন নয়—নাস্তিকতা কি? নাস্তিকতার প্রয়োজন? এ রকমের প্রশ্নে তত্ত্বগত তর্ক ওঠে। কিন্তু কেন আমি নাস্তিকতা চাই এই প্রশ্নটির মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ও বাস্তব ইঙ্গিত আছে। বাপুরই মতো প্রশ্ন বটে। অপর কেউ আমাকে এধরণের প্রশ্ন করে নি, যদিও নাস্তিকতা নিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। আমি বলতে লাগলুম, "দুর্ভিক্ষের সময় আমি কোলকাতায় ছিলুম। রাস্তায়, ফুটপাথে মানুষকে পড়ে পড়ে মরতে দেখেছি। খাবারের দোকানের সামনেও মরতে দেখেছি। একটা ক্ষুধিত কুকুর বা ষাঁড় কি ওভাবে মরতে রাজি হতো? মারুন, পেটান, সে জানোয়ার তার খাবার আদায় করার জন্য শেষ চেষ্টা করতো। কেন নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত লোকেরা তা করলো না? তারা সংখ্যায় এতো ছিল যে সবাই যদি দোকানে খাবার জন্য ঢুকে পড়তো, কোলকাতায় এত পুলিশ ছিল না যে তাদের ঠেকায়। ওরা কি কতগুলি নিরেট কাপুরুষ? তা নয়, ওরা সরল ধর্মভীরু লোকমাত্র···দোকানদারেরাও কি সত্যিই খুব নিষ্ঠুর, শয়তান গোছের লোক—তা-ও নয়, তাদেরও দয়ামায়া আছে, তারা সাহায্য সমিতিতে, লঙ্গরখানাতে সাহায্য করেছে—তারাও ধর্মভীরু লোক।··· আসল গলদ হচ্ছে আমাদের জীবনদর্শনে···ভাগ্য ও ভগবান করে আমাদের এই নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বীর্যতা এসেছে···ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই দিয়ে অত্যাচার করা ও অত্যাচার সহ্য করা হচ্ছে। অতএব এই ভাগ্য ও ভগবানের ধারণা উড়িয়ে দিতে না পারলে মানুষেরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে না···ভগবান বলে যদি কোন কিছু সত্যি থাকতো, তবে তাঁকে আমি নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিতে পারতাম না। কিন্তু সেটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। অনেক মিথ্যার মতো অতীতে এই মিথ্যাটাও হয়তো কিছু কাজ দিয়েছে। কিন্তু তাদেরই মতো এই মিথ্যাটা জীবনকে নানাভাবে কলুষিত ও পঙ্গু করেছে। এই কেন্দ্রীয় মিথ্যাটাকে দূর করতে না পারলে মানুষের আত্মশক্তিতে, নিজবুদ্ধিতে বিশ্বাস আসবে না, এবং মানুষের সত্যিকারের মুক্তি আসবে না। এইজন্যই আমি নাস্তিকতাবাদের প্রয়োজন বোধ করি।"

বাপ্‌জী আমার কথা চুপ করে শ্‌নলেন এবং উঠে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'তোমার বক্তব্যের মধ্যে একটা আদর্শ আছে দেখতে পাচ্ছি। আমি একথাও বলতে পারি না যে তোমার নাস্তিকতা ভুল, অথবা আমার আস্তিকতা শ্‌দ্ধ। আমরা সত্যের সন্ধানী মাত্র। যখন আমাদের ভুল ধরা পড়ে, তখ্‌নি আমরা আমাদের মত বদলাই। আমার জীবনে এমন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ব্‌ঝেছি, তুমি একজন কর্মী। গোঁড়ামী নেই। তুমি নিশ্চয়ই মত বদলাতে পারবে, যদি তোমার ভুল হয়েছে জানতে পারো। তুমি যখন গোঁড়া নও, তখন এতে ক্ষতি নেই। তুমি ঠিক, কি আমি ঠিক, তা কেবল ফল দিয়েই জানা যাবে। তখন হয়তো আমি তোমার পথ নিতে পারি, অথবা তুমি আমার পথ নিতে পারো, অথবা উভয়েই তৃতীয় কোন পথে অগ্রসর হতে পারি। অতএব তুমি তোমার বিশ্বাস মতোই তোমার পথে এগোও। আমি তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও তোমার পথ আমার বির্‌দ্ধেই যাচ্ছে।"

ঠিক ইংরেজীটাই তুলে দিচ্ছি—Yes I see an ideal in your talk. I can neither say my theism is right nor your atheism wrong. We are seekers after truth. We change whenever we find ourselves in the wrong. I changed like that many a time in my life. I see you are a worker. You are not a fanatic. You will change whenever you find yourself in the wrong. There is no harm as long as you are not fanatical. Whether you are in the right or I am in the right, results will prove. Then I may go your way or you will come to my way ; or both may go a third way. So go ahead with your work. I will help you, though your method is against mine.

গান্ধীজীর উদারতায় আমি অভিভ্‌ত হয়ে পড়লাম। আমি বলল্‌ম—বাপ্‌জী, আপনি আমাকে উৎসাহিত করছেন। আপনার কাছ থেকে আমি কিছ্‌ উপদেশ চাই, যাতে আমি আমার যাত্রা পথে ভুল না করে বসি—আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক চোরা গর্ত থেকে বাঁচাবে।

বাপ্‌জী উত্তরে বললেন, 'ভুল করাটা ভুল নয়, কেন না ভুল জেনে কেউ ভুল করে না। কিন্তু তখনই ভুল হয় যখন ভুল ব্‌ঝতে পেরেও লোকে সংশোধন করতে চায় না। যদি ভুল করতে তোমার ভয় হয়, তাহলে জীবনে কোনো কাজেই হাত দিতে পারবে না।'

*　　*　　*　　*

রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক আরও নিকটতর হতে থাকে। যেহেতু দ্‌জনেই নিষ্ঠাবান, সত্যসন্ধানী—সেহেতু একজনের ভগবান ও অপরের নাস্তিকতা তাঁদের দ্‌রে ঠেলে দিত না। এক জায়গায় তাঁদের অত্যন্ত মিল ছিল—প্রতিদিনের জনসেবার প্রেরণায়।

রামচন্দ্র রাও তাঁর কন্যার বিয়ে একজন হরিজনের সাথে দেবার পণ করেন। গান্ধীজীকে একথা জানানো হলে গান্ধীজী খ্‌ব খ্‌শী হন এবং তাঁর আশ্রমেই এই

বিয়ে তিনি দেবেন বলে. প্রস্তাব করেন। কিন্তু রামচন্দ্র বললেন, সবই ভালো কিন্তু ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমার কন্যা ও জামাতার বিয়ে আমি দেবো না।' গান্ধীজী বললেন, 'সে আমি জানি, আমি সত্যের নামে (in the name of truth) শপথ করাবো।' অবশ্য এবিয়ে গান্ধীজী দিয়ে যেতে পারেন নি—তার পূর্বেই তাঁর জীবনান্ত হয়। পরে আশ্রমবাসীরা গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী সত্যের নামে শপথ করিয়েই এই বিয়ে দিয়েছিলেন।

* * * *

পরমসত্য ও আপেক্ষিক সত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী একদিন বললেন ঃ সত্য সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতা আছে। কিন্তু সবাই সত্য আছে একথা মনে করে ও তাকে সম্মান করে। সেই সত্যকেই আমি বলি ভগবান। এককালে আমি বলতুম, 'ভগবানই সত্য, কিন্তু তাতে আমার সন্তোষ হয় নি। কাজেই আজকাল সত্যকেই ভগবান বলে জানি।'

আমি প্রশ্ন করলুম ঃ যদি সত্যই ভগবান, তবে রঘুপতি রাঘব ইত্যাদি না বলে সত্যম্‌…এসব বলেন না কেন? রঘুপতি বলতে আপনি যে অর্থ বোঝেন, সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা সে অর্থ করে না।

গান্ধীজী ঃ তুমি কি মনে করো, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন? আমি একজন মহান নাস্তিক। (I am a super-atheist)

যাই হোক, এই নাস্তিক বলতে তিনি কি বোঝাতে চান, তার বিশদ আলোচনার ইচ্ছা আমার জাগলো—কিন্তু সে সুযোগ আর মেলে নি। যদিও তিনি আমাকে পরে দশ দিন সময় দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম একখানা বই লিখে গান্ধীজীকে দিয়ে তা পড়াবো এবং তিনি রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তা ঘটতে দিল না।"

* * * * * *

যাক্‌, রামচন্দ্র রাওয়ের বই থেকে যে খন্ড চিত্রগুলি দিলুম, তা থেকে গান্ধীজীর বৈজ্ঞানিক মনের সাহসিকতা দেখতে পাওয়া যায়।

তবে রামচন্দ্র রাওয়ের Humanity-র abstract idea যে কার্যত অবাস্তব বা impractical একথা সহজেই বোঝা উচিত। সব মানুষ মানুষ হয়ে যাক্‌, তাদের সম্প্রদায় ধর্ম ত্যাগ করুক এবং এই পথেই ধর্মকে দূর করা যায়—এজাতীয় চিন্তার লেনিনও প্রতিবাদ করে গেছেন। ধর্মের জোরে অথবা ধর্মবিরোধিতার জোরে সমাজে সাম্য ও 'এক—মানুষ—একজাতিত্ব' সৃষ্টি করা যায়, এ ধারণা ভুল। গান্ধীজী ধর্মের সাহায্যে সমাজের পরিবর্তন করতে চান নি—তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর নির্ভর করেই সমাজ ও মানুষের পরিবর্তন ঘটাতে লেগেছিলেন—কিন্তু ধর্মের সাহায্যও স্থানে স্থানে নিয়েছেন। আবার যারা মনে করে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই সমাজ পালটায় তাদের চেষ্টাও ফলবতী হয় না—একটা নাড়াচাড়া দেয় মাত্র—অর্থনৈতিক ভিতকে না ধরে শুধু ধর্মকে দিয়ে অথবা ধর্মবিরোধিতা করে কোন আমূল পরিবর্তন কেউ করে যেতে পারে নি। যখন আমরা গান্ধীজীর বাস্তব

কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো তখন দেখাবো তিনি কোন কোন শক্তির উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Communities-এর দরকার নেই, অথবা Communal harmony-ও অবান্তর —সোজা Humanity-র উপর মানুষকে দাঁড় করাও, এক কর, রামচন্দ্র রাওয়ের এই দাবি অবান্তর ও অনৈতিহাসিক। অতো তাড়াতাড়ি ও রাতারাতি ধর্মবিশ্বাস উঠিয়ে দেওয়া যায় না, এবং আগামী বহুকালেও তা সম্ভব হবেনা হয়তো। আগের আগের যুগে আমরা দেখেছি এক একটা ধর্ম অপর ধর্মকে অস্বীকার করে সমস্ত পৃথিবীতে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেই ভগবানের ও মানুষের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করতো। এক ধর্মের মোহ বহু লড়াই, দাঙ্গা, অত্যাচার ও অধর্মের কারণ হয়েছে। এইজন্যই বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসম্মেলনে এক নতুন কথা এনে সকলকে আশ্চর্যান্বিত করলেন। তিনি বললেন, একটা কোন ধর্মের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জয় করা সম্ভব হয়নি, হবেও না, সর্বধর্মকে মিলিয়ে একটি ধর্ম তৈরী করাও সম্ভব হয় নি এবং হবেও না। বরং সকল ধর্মেই সত্য আছে এবং সকল ধর্মেই মুক্তি আছে, এই কথা যদি আমরা স্বীকার করতে পারি তবেই ধর্মের লড়াই শেষ হবে এবং সর্বধর্ম সমন্বয় হবে। একথা কেবল ধর্ম বিষয়েই যুক্তিযুক্ত তা নয়—জীবনের, সমাজের, অর্থনীতির, রাজনীতির নানা দিকেই এই সহাবস্থান তৈরী করার একটা প্রয়োজন আছে—নাহলে সত্যিকার গণ-তান্ত্রিকতা ও সহঅস্তিত্বের আদর্শ কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। সকল জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করতে গেলে সেই চেষ্টাটা শেষ পর্যন্ত একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারে। যেমন চৈতন্য শিষ্যরা জাতি মানতো না, সব জাতকে এক করে বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত যা হলো তা এই,—বৈষ্ণবরাই আরেকটা জাত হিসাবে সৃষ্টি হলো। Unity in diversity—এই পরস্পর বিরুদ্ধতার মধ্যেও ঐক্যকে বোঝাবার মধ্যে সভ্যতার চরম বিকাশ অপেক্ষা করছে। অতএব রামচন্দ্র রাও গান্ধীজীকে Communal harmony-র জন্য চেষ্টা না করে সোজা ও সরল humanity গঠনের জন্য যে দাবি করেছিলেন—সমস্ত ধর্মকে ও জাতিকে অস্বীকার করে—সেটা অবান্তর প্রস্তাব মাত্র। হিন্দুর মন্দির মুসলমানের হাতে নিরাপদ ও মুসলমানের মসজিদ হিন্দুর হাতে নিরাপদ করার মধ্যে যে সহ অস্তিত্ব ও সহযোগিতার বাণী আছে, তাই বরং বেশী সম্ভব ও বেশী আকর্ষণীয়।

এখানে মশরুওয়ালার ভূমিকা থেকে তাঁর বক্তব্যের সামান্য আলোচনা দরকার। মশরুওয়ালাজী রামচন্দ্র রাওকে আসলে একজন বিশ্বাসপ্রবণ লোক হিসাবেই ধরেছেন যিনি সৎ সত্যসন্ধানী মূলতঃ ধর্মপ্রবণ—যদিও তাঁর ভগবান হলো No-God. শাস্ত্রে এই নেতিবাচক ভগবানের কল্পনাও যে অতীতে মেলে, তার অনেক প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। তাঁর মতে রামচন্দ্র রাওয়ের কথাগুলি লোকে বিচার করবে না, করবে তাঁর হৃদয় ও কাজকে। এই হৃদয় ও কাজের আকর্ষণেই রামচন্দ্র রাও গান্ধীজীর কাছে প্রিয় হয়ে ছিলেন। মশরুওয়ালার মতে নাস্তিক হলেই খারাপ

লোক হতে হবে, আর আস্তিক হলেই ভালো লোক হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কোন লোকের জনপ্রিয়তা তার নাস্তিকতা বা আস্তিকতা দিয়ে সৃষ্টি হয় না—হয় তার মানুষের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সেবার গুণে।

মশরুওয়ালাজী বলেছেন, "And yet there are among them (theists) whose life is very impure, selfish, and violent. There is no evil deed which they might not commit.

On the other hand, there are atheists (Jains and the Budhists might also claim to be included among them), who deny God, but who lead and constantly endeavour to lead a very righteous and moral life, and a life of service and self-sacrifice. And when they work among the people, the people forget whether they are theists or atheists, but look to their sincerity, moral character, spirit of service and sacrifice and accept their leadership and guidance. Jawaharlal is not a theist, and makes no mention of God or the soul in any of his speeches. But his popularity is next to none Sardar was a theist, and many a time devoutly spoke of Him and he too was equaly popular."

"ভগবদ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের জীবন নোংরা, স্বার্থপর এবং হিংসাপূর্ণ, তারা এমন কদর্য কাজ নেই যা করতে পারে না।

"অপরদিকে এমন সব নাস্তিক আছেন (যেমন জৈন ও বৌদ্ধরাও তা দাবি করতে পারেন), যাঁরা ভগবান অস্বীকার করেন বটে কিন্তু সর্বদা সৎ ও সাধু জীবন যাপন করার চেষ্টা করেন এবং মানব কল্যাণের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। জনতার মধ্যে যখন তাঁরা কাজ করেন, জনতা তাঁদের আন্তরিকতা, নৈতিক চরিত্র, সেবাপরায়ণতা ও আত্মোৎসর্গের ছবিটাই দেখে এবং তাঁদের নেতৃত্ব ও উপদেশ মেনে চলে—তাঁরা আস্তিক না নাস্তিক এসব কথা ভুলে যায়। জওহরলাল কোন ভগবৎ-বিশ্বাসী নন, কথাবার্তায় বক্তৃতায় কখনও ভগবানের নামও করেন না—কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তার তুলনা নেই। আবার সর্দার প্যাটেল ভগবৎবিশ্বাসী, অনেক সময় ভগবানে ভক্তির কথা বক্তৃতায় বলে থাকেন এবং তিনিও কম জনপ্রিয় নন।"

অবশ্য এগুলি ব্যবহারিক জীবন নিয়েই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিচার হয়েছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে বস্তুতন্ত্রবাদ ও ভাববাদের যে চিরকালের লড়াই, এই বিচারভঙ্গীতে তার কোন মীমাংসা হয় না।

অহিংসা

গান্ধীজী বলেছেন ছোটবেলা থেকেই সত্যের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ ছিল—কিন্তু অহিংসা তাঁর সহজাত ধর্ম নয়। সত্যের সন্ধান করতে করতেই তিনি অহিংসা আবিষ্কার করেন। আত্মজীবনীতে দেখা যায় তিনি ছোটবেলা লুকিয়ে মাংস খেতেন। কেন না তাঁর সহপাঠিরা তাঁকে বুঝিয়েছিল মাংস না খেলে গায়ের শক্তি হয় না এবং ইংরেজের সঙ্গে পারাও যায় না। কিন্তু মাংস খাওয়া একদিন ছেড়ে দিলেন, মাংস খাওয়াতে দোষ, এ বুঝে নয়—লুকিয়ে খেতে হয় বলে, মিথ্যেকথা বলতে হয় বলে—সেই লজ্জায়। অহিংসার প্রতি দৃষ্টি তাঁর জীবনের গভীরতম সংকট ও সংগ্রামের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।

কি এই অহিংসা? গান্ধীজী বলেছেন, "তত্ত্ব হিসেবে অহিংসা কি তা কেউ জানে না। ভগবানকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায় না, অহিংসাকেও তেমনি বোঝানো শক্ত। কিন্তু এর বাস্তব ব্যবহারের সময় আমরা তার চকিতদর্শন পাই—যেমন চকিত দর্শন পাই ভগবানের—তাঁর কাজের মধ্যে, আমাদেরই মারফৎ।" Ahimsa in theory, no one knows. It is as indefinable as God. But in its working we get glimpses of the Almighty in His working, amongst us and through us.—(Mahatma by Tendulkar Vol V-p. 307)

মহাত্মা নিজেই অহিংসার সংজ্ঞা পরিষ্কার করে দিতে পারছেন না, আমরাই বা কোন সাহসে তার definition তৈরী করতে যাবো। তবে আমরা তাঁর কার্য ও লেখা থেকে যথাসম্ভব একটা চেহারা তৈরী করবার চেষ্টা করবো। সোজাসুজি অহিংসার ব্যাখ্যা না করে অহিংসার বাস্তব বিকাশ ও ব্যবহারের নমুনা থেকে তার ছবিটা ঘুরিয়ে ধরবার চেষ্টা করবো। হিংসার উল্টো অহিংসা একথা বললেও অর্থ সম্পূর্ণ হবে না। গায়ের জোর নয়, মনের জোর বললেও কোন অর্থ হবে না—কেন না এই দুই জোরের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করে, তারা সবাই হিংস্রক এমন কথা বলা অন্যায়—কারণ ইতিহাসে সশস্ত্র সংগ্রামে মানুষের মহান চরিত্রের ও আত্মোৎসর্গের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার সত্যাগ্রহীমাত্রেই হিংসাশূন্য—একথা দাবি করা যায় না। তাদের মধ্যেও গোপন হিংসা ও ঈর্ষা ও নানা দুর্বলতা, এমন কি ভয়ও লক্ষ্য করা গেছে—অন্ততঃ গান্ধীজী নিজেই তা স্বীকার করেছেন। কাজেই অহিংসা কথাটার চট করে সংজ্ঞা দেওয়া সত্যিই সহজ নয়। অথচ কঠিন বলেই ধরে নিতে হবে না যে, অহিংসা বলে বুঝি তবে কিছু নেই—সেটা একটা কাল্পনিক শক্তি মাত্র, একথা আর বলার জো নেই।

ভালোবাসাও বা প্রেমই অহিংস নয়—এ যেন বীর্যবান ভালোবাসা বা ভালোবাসার

শক্তি—অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের সর্বস্ব জীবন-ধন সব কিছু উৎসর্গ করে এক লড়াই—অথচ এতে শত্রুতা নেই। অনেক গুণ ও বাণীর কথা আমরা অতীতের মহামানবদের কাছ থেকে বা তাঁদের জীবনে পেয়ে থাকি—নীতির কথা, আদর্শের উদারতা, প্রেমের মহিমা, আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা তাঁদের জীবনে ছিল বলে ধরা হয়—বুদ্ধের করুণা, খৃষ্টের প্রেম ও ক্ষমা ইত্যাদি আমরা শুনি। কিন্তু এগুলো কোন বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করি না। গান্ধীজী সেগুলো বিশ্বাস করতেন এবং এইসব মহান গুণসমূহকে বর্তমানের পৃথিবীতেও ঘোরতর সংকট থেকে মানুষের মুক্তির কাজে লাগাতে পারেন কিনা, তার বাস্তব গবেষণা বা experiment প্রথমে নিজের উপরে, তারপর নিজের আশু পরিবেশের উপরে, পরিশেষে সমগ্র দেশের উপর প্রয়োগ করেন এবং দেখতে পান, তার কার্যকারিতা আছে। কাজেই তিনি বলেন, অহিংসাকে আমি পুনরুদ্ধার করেছি, নতুন কিছু আবিষ্কার করি নি। Ahimsa is as old as hills এই তাঁর মত। তিনি কেবল তার প্রয়োগ যতদূর সম্ভব mass scale বা large scale-এ করেছেন—তাঁর সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে সত্যাগ্রহের হাতিয়ারটি অহিংসা-ধর্মের দ্বারা সঞ্জীবিত। ইনি এই অস্ত্রটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুঠাম ও অমোঘ করার জন্য লেগে যান। তিনি বলেছেন, "Thousands, indeed tens of thousands, depend upon their existence on a very active working of this force. Little quarrels of millions of families disappear before the exercise of this force. Hundreds of nations live in peace. History does not and cannot take note of this fact. History is really a record of every interruption of the even working of the force of love on the soul...soul force, being natural, is not noted in history" (Satyagraha. pp 10 & 11) অর্থাৎ "হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী এই শক্তির উপরই প্রতিদিন নির্ভরশীল। লক্ষ-কোটি লোকের প্রতিদিনকার সাংসারিক ছোট ছোট কলহ-বিবাদ-বিসম্বাদ তারা এই শক্তির সাহায্যেই মিটিয়ে নেয়। শত শত জাতি শান্তিতে বাস করে, কিন্তু ইতিহাস তাদের শান্তির খবর লেখে না বা লিখতে পারে না। বাস্তবে দেখি যে এই ভালোবাসার শক্তি বা আত্মার শক্তির সহজ শান্তিতে যখন বিঘ্ন ঘটে তখনই ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হয়।...আত্মার শক্তি অতি স্বাভাবিক জিনিষ বলেই ইতিহাসে তার ঠাঁই হয় নি।" গান্ধীজী বলতে চান, অস্বাভাবিক খবর, যুদ্ধের খবর, অশান্তির খবর, গৃহযুদ্ধ ও শ্রেণীযুদ্ধের খবরেই ইতিহাসের সৃষ্টি—কিন্তু মানুষ যেখানে শান্তিতে আছে সেখানে ইতিহাসের আদর নেই—অর্থাৎ ইতিহাস শান্তির বর্ণনা করে না বলেই পৃথিবীতে, সমাজে, সংসারে শান্তির ও ভালোবাসার ক্ষেত্র নেই, এমন কথা বলা যায় না। বরং মানুষেরা, নিজেরা নিজেদের কলহ বিনা যুদ্ধেই অহরহ মিটিয়ে থাকে—এবং তা অহিংসার শক্তি ও প্রয়োগ দিয়ে—যেখানে অস্ত্রের সাহায্য নেই, আছে ভালোবাসা, আত্মদান, আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি আত্মার শক্তিগুলি। এই শক্তিকেই পরিমার্জিত করে গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যাগ্রহের একটা পূর্ণরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

অহিংসা ও হিংসা কথাটা ইংরাজী non-violence ও violence-এর অর্থে ব্যবহার করছি। হিংসুটেপনা ও ঈর্ষা ও নোংরামীর কথা এখানে আনা হচ্ছে না। দৈহিক শক্তি বা গায়ের জোর প্রয়োগ করে শত্রুতা করা বা না করার কথাটাই এখানে প্রধান বিবেচ্য।

প্রথমেই বলতে হবে অহিংসা হিংসাকে এড়িয়ে চলে না। অহিংসার সাথে অহিংসার লড়াই হতে পারে না। ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এবং হিংসার সঙ্গেই অহিংসার লড়াই। অতএব যে অহিংস সে হিংসাকে এড়ায় না—হিংসাকে চ্যালেঞ্জ করাতেই অহিংসার বাহাদুরী ও কার্যকারিতা। তার অর্থ এই যে, যারা ঝঞ্ঝাট এড়াতে চায়, যারা যুদ্ধবিগ্রহকে এড়াতে চায়, যারা অত্যাচারীকে এড়াতে চায়, যারা 'শান্তিবাদী' তারা যদি মনে করে যে তারা অহিংস, তবে গান্ধীজীর কাছে তারা অতি হাস্যকর জীব। আর যারা ভয়ে শান্তির পথ, স্বোয়াস্তির পথ অন্বেষণ করে ও অহিংসার আশ্রয় নিতে চায়, তারা গান্ধীজীর কাছে করুণার পাত্র। গান্ধীজী বলেছেন, দুর্বলের অহিংসার কোন অর্থই হয় না। একটি মূষিক বেড়ালের কাছে কখনও অহিংস হতে পারে না—আসলে মূষিক কোনো কালেও অহিংস হতে পারবে না—কারণ সাহসের অভাবই তার মস্ত কথা। যারা সহিংস বিরোধিতা করতে পারে তারা বরং অহিংস হতে পারে—কিন্তু দুর্বল ও ভীরুরা অহিংস হতে পারে না। দুর্বলের অহিংসা বলে কোন জিনিষ নেই। আর অহিংসা হিংসার বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যই ব্যবহার হতে পারে ও জন্ম হতে পারে। বনে জঙ্গলে তপোবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে কোন সংগ্রাম নেই—সেখানে অহিংস হবার কোন অর্থ নেই। সৎলোকের সঙ্গে সৎব্যবহারেও কোন অহিংসা নেই, ভালো লোকের সঙ্গে ভালো-ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—কিন্তু মন্দলোকের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করার মধ্যেই সত্যিকার ভালোর পরিচয় হতে পারে। যেখানেই হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যেখানে অত্যাচার উদ্ধত মূর্তিতে এসে ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, যেখানে কপটতা, হীন ষড়যন্ত্র করে চলেছে—সেখানেই অহিংস সত্যাগ্রহীর স্থান—অহিংস সৈনিক কখনো কোন পরিস্থিতিতেই হিংসার মূর্তি দেখে পলায়ন করবে না—বরং হিংসাই অহিংসার আকর্ষণ। গান্ধীজীর ভাষায়, "Marching right into the jaws of himsa means (that-and) nothing else, nothing else. (Tendulkar's Mahatma, Vol-V, P-115) হিংসার করাল মুখব্যাদনের মধ্যে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়ে যাবার নামই অহিংসা—অন্য কিছু নয়। দুর্বলের নিষ্ক্রিয়তা বা Passivity of the weak-ও অহিংসা নয়। অহিংসা একটা প্রচন্ড সক্রিয় শক্তি। এখন আমরা তাঁরই কথা দিয়ে এই উপরোক্ত কথাগুলোকে প্রমাণ করবো।

যারা মনে করে মৃত্যুকে এড়াবার জন্যই বুঝি অহিংসার প্রয়োজন—যারা মনে করে দেশের স্বাধীনতা আনতে চাই কিন্তু মরতে চাই না—তাদের সুবিধাবাদ ও ভয়কে আশ্রয় দেবার জন্য গান্ধীজী অহিংসা আবিষ্কার করেছেন—তারা অতি মূর্খ। আর যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী, তাঁরা যদি মনে করেন, গান্ধী মৃত্যুকে ভয় করতেন বা দেশে রক্তারক্তি এড়াবার জন্যই একটা নরম পথ আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরাও

অতিশয় ভ্রান্ত। গান্ধীজী ১৯৩১ সালে বোম্বের আজাদ ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "I would not flinch from sacrificing even a million lives for India's liberty. I told so to the English people in England" (Tendulkar-Mahatma, Vol-III, P. 186) অর্থাৎ "স্বাধীনতার জন্য আমি ১০ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ বলিদান দিতে প্রস্তুত। আমি একথা ইংল্যান্ডে ইংরেজদেরও বলে এসেছি।" আমরা জানি গান্ধী-আন্দোলনে কত হাজার হাজার লোক শহীদ হয়ে গেছেন—কত লক্ষ লক্ষ লোক কত নির্যাতন সহ্য করেছেন।

গান্ধীজী তাঁর হিন্দস্বরাজ নামক বইতে লিখেছেন—"That nation is great which rests its head upon death as pillow. Those who defy death are free from all fear."

অর্থাৎ "সেই জাতিই মহান যে জাতি মৃত্যুর বালিস মাথায় দিয়ে বিশ্রাম করে। যারা মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করতে পেরেছে তারা সব কিছুর ভয় থেকেই মুক্ত।" তিনি বলেছেন—"People committed the mistake of thinking that all that did not involve killing was non-violence. Sometimes killing is the cleanest part of violence." (Tendulkar-Mahatma, Vol-VII p. 30). মেদিনীপুরে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "লোকের ভুল হয় এই যে বুঝি হত্যা না করাটাই অহিংসা। কখনো কখনো হিংসা-আন্দোলনের মধ্যে হত্যাটাই শুদ্ধতম কাজ, এমন দেখা যায়।" ১৯২৪ সালে গান্ধীজী বলেছেন, "I like to die for India's freedom and would die for it, because it is a part of truth, only a free India can worship the true God." অর্থাৎ "আমি ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে চাই এবং তারজন্য প্রাণ দেবোও, কেন না ভারতের মুক্তি সত্যেরই অংশ। একমাত্র মুক্ত ভারতই সত্যিকার ভগবানের আরাধনা করতে পারে।" আবার শুনুন—"Man does not live but to escape death. If he does so, he is advised not to do so. Man is adviced to learn to love death, as well as life, if not more so. Indeed, a hard saying, harder to act up to, one may say. Every worthy act is difficult. Ascent is always difficult. Descent is easy, and often slippery. Life becomes livable, only to the extent death is treated as a friend, never as an enemy. To conquer life's temptations, summon death to your aid. In order to postpone death, a coward surrenders his honour, his life, his daughter and all. A courageous man prefers death to the surrender of self-respect. When the time comes, as it conceivably can, I would not leave my advice to be referred, but it will be given in precise language. That, today, my advice might be followed only by one or none, does not detract from its value. A beginning is always made by few, even one". (Mahatma—Vol. VII, page 249)

অর্থাৎ মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার জন্যই মানুষ বেঁচে নেই। যদি কেউ তা করে তবে আমার উপদেশ এই যে, সে যেন তা না করে। জীবনকে যত ভালোবাস, সেরকম, এমন কি তারও চেয়ে বেশী, মৃত্যুকে ভালোবাসতে শেখো, এই হলো আমার কথা। কেউ হয়তো বলবে এ বড় কঠিন উপদেশ, পালন করা আরও কঠিন। প্রত্যেক মহৎ কাজই শক্ত। উপরে ওঠা সর্বদা কষ্টকর। নীচে নামা সহজ ও প্রায়ই পিচ্ছিল। জীবন উপভোগ্য তখনই হয় যখন মৃত্যুকে বন্ধুর মতো দেখা সম্ভব হয়, শত্রুর মতো নয়। জীবনের নানা প্রলোভনকে জয় করতে হলে মৃত্যুর সাহায্য নিতে হবে। মৃত্যুকে স্থগিত রাখার জন্য ভীরু তার নিজের সম্মান, স্ত্রী, কন্যা, সমস্ত কিছু বিসর্জন দেয়। কিন্তু সাহসী লোক জীবন দেয় তো ইজ্জত দেয় না। যখন সময় আসবে, এবং সে সময় হয়তো আসছে, তখন আমার এই উপদেশ কিভাবে পালন করতে হবে তা অনুমান করতে হবে না। আমি স্পষ্ট ভাষায়ই তা জানিয়ে দেব। আজ আমার কথা শোনবার জন্য কত জনা আছে, কি একজনই আছে, এতে আমার বক্তব্যের মূল্যামূল্য বিচার হবে না। আরম্ভ চিরকালই মুষ্টিমেয় লোকের, এমন কি একজনের হাত দিয়েও শুরু হয়।" এই উদাত্ত বাণীর মধ্যে যে বজ্রনির্ঘোষ ইঙ্গিত রয়েছে, তা ছিল মহাত্মার non-violence of the brave বা বীরের অহিংসা কি, তার অনুসন্ধান ও বাস্তব ব্যবহারে। তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন এই তত্ত্বেরই নির্ভেজাল রূপ আবিষ্কারের উদ্বেগময় সাধনায় কেটেছে। এর কিছুকালের মধ্যেই তাঁর জীবন নাথুরাম গডসের হাতে অস্ত হয়। কাজেই উপরোক্ত কথার মর্যাদা তিনি নিজের জীবন দিয়েই দেখিয়ে গেলেন। এই মৃত্যুর সাধনা গান্ধীজীর জীবনে একটা পরম আকর্ষণীয় দিক। তিনি বারে বারে নিজের জীবন বিপন্ন করে যে সমস্ত অনশন করেছেন, অথবা যেসব বিপদসঙ্কুল পথে বিচরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত দেখাবার কোন দরকার করে না। সেগুলি ভারতের ইতিহাস রচনা করে গেছে। কাজেই অহিংসার সঙ্গে মৃত্যুবরণ কথাটা অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে, মৃত্যু বা বিপ্লব এড়াবার কোনও ইঙ্গিত তাতে নেই। আবার শুনুন তিনি কেমন করে তাঁর এই নির্ভীকতাকে শক্তিমান করার জন্য ভগবানের তত্ত্ব দিয়েও জোর দিয়েছেন। "Nations have progressed both by evolution and revolution. The one is as necessary as the other. Death, which is an eternal verity, is revolution at birth and afterwards it is slow and steady evolution. Death is as necessary for man's growth as life itself. God is the greatest revolutionist the world have ever known or will know. He sends deluges. He sends storms where a moment ago there was calm. He levels down mountain which he builds with exquisite care and infinite patience.

"প্রত্যেক জাতি ক্রমবিকাশ ও বিপ্লব—এই উভয় শক্তির দ্বারাই উন্নত হয়ে থাকে। উভয়েরই সমান প্রয়োজন হয়। মৃত্যুও একটা চিরন্তন সত্য এবং জন্মের মতো মৃত্যুও একটা বিপ্লব, যেমন জন্মের পর আবার ধীরে ধীরে চলে তার ক্রমবিকাশ। মানুষের বিকাশের জন্য মৃত্যু জীবনের মতো সমান প্রয়োজনীয় ঘটনা। ভগবান হলেন শ্রেষ্ঠ

বিপ্লবী। তাঁর চেয়ে বড় বিপ্লবীকে কেউ জানে না ও কোন কালেই জানবে না। তিনি দরকার মতো তাঁর সৃষ্টিতে প্রলয় ঘটিয়ে দেন। এক মুহূর্ত পূর্বে যেখানে সমস্ত কিছু শান্ত ছিল, সেখানে পর মুহূর্তেই প্রবল ঝঞ্ঝা পাঠিয়ে দেন। কত দীর্ঘকাল ধরে যে পর্বত তিনি কত যত্ন ও ধৈর্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনি গুঁড়িয়ে সমতল করে ছেড়েছেন।" এইভাবে তিনি তাঁর ভগবানকে বিপ্লবী ভগবান বানাতে ছাড়েন নি।

এই সঙ্গে আরও একদল লোক সম্বন্ধে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। যাঁরা constitutionalist তাঁরা গান্ধী আন্দোলনকে একটা constitutional আন্দোলন বলে এখন চালাতে চাইছেন। গণআন্দোলন বা গণবিপ্লবের যে সব মৃত্যুঞ্জয়ী দিক গান্ধীজীর উপরোক্ত কথা ও কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি তাঁরা এখন লুকোতে চাইছেন। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের কোন মিল ছিল না। তিনি ১৯৩২ সালে এক অনশন কালে বলেছেন, "Those who have to bring about radical change in human conditions and surroundings cannot do it except by raising a ferment in society. There are only two methods of doing this—violent and non-violent". অর্থাৎ যাঁরা সমাজের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চান, তাঁদের পক্ষে সমাজের জনমনে বিরাট বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে তা কখনোই করা সম্ভব নয়। তা করতে হলে দুটি মাত্র পথ আছে—এক সহিংস, অপরটি অহিংস। অর্থাৎ তিনি বিপ্লবই আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অহিংস বিপ্লবে তিনি বিশ্বাস করতেন। অতএব বিপ্লব যে করতে হবে এ বিষয়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের মতই সমান উৎসাহী ছিলেন কিন্তু তাঁর পথ ও উপায় ছিল ভিন্ন। তিনি একবার বলেছেন, "Constitutionalism, legality and such other things are good enough within their respective spheres, but they become a drag upon the human progress immediately the human mind has broken these artificial bonds and flies higher." (Mahatma Vol. V, page—31.)

"নিয়মতান্ত্রিকতা, আইনানুগত্য এবং এই জাতীয় কার্যকলাপ তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের মধ্যে কার্যকরী সন্দেহ নেই—কিন্তু মানুষের মন যখন তার সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চতম স্তরে অগ্রসর হতে চায়, তখন সেগুলি বিরক্তিকর পিছু টান বা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।" প্রত্যেক গণআন্দোলনের সামনে তিনি যখন এগিয়ে যাবার জন্য নির্ভীক ডাক দিতেন—বলতেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—যখন বলতেন কোন কিছুর ভয় করো না —সেই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক যে আইনভঙ্গ করতে এগিয়ে আসতো তাকে কি আমরা নিয়মতান্ত্রিকতা বলে চালাতে পারি? অথচ আশ্চর্য এই, আজকাল অনেক গান্ধীভক্ত গান্ধীজীকে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা বলেই চালাতে চান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাজদূত শ্রীজি. এল. মেহতা সেদিন ওয়াশিংটনে গান্ধীজীকে আমেরিকান ধনীদের কাছে কি সাজে সাজিয়ে দিতে চাইছেন দেখুন— "Our national movement has been described as non-violent. And

constitutionalism is but non-violence translated in political terms."

"আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে বলা হয় অহিংস আন্দোলন। আর অহিংসা হচ্ছে তাই, যার রাজনৈতিক রূপ হলো (আপনাদের ভাষায়) নিয়মতান্ত্রিকতা।" ভারতের রাজদূত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী করার জন্যই হোক অথবা নিজের অতীত নিষ্ক্রিয়তার রাজনীতির সাফাই গাইবার জন্যেই হোক, গান্ধীবাদকে নিয়মতান্ত্রিকতা ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারেন না। আর এই সংবাদ ভারতে পরিবেশন হচ্ছে কার মারফত? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র A. I. C. C.-র পত্রিকা 'Economic Review'—15th Aug. 1954 মারফৎ। তার মানে শুধু জি. এল. মেহতারই এই মত নয়—এ. আই, সি. সি.-র মুখপত্রও সেই মত পোষণ করেন নিশ্চয়, তা নাহলে তাঁরা তা ছাপাতেন না। গান্ধীবাদের এই জাতীয় ব্যাখ্যাকারীরা গান্ধীজীর কম ক্ষতি করছেন না। এই জাতীয় লোকেরাই গান্ধীজীকে বিপ্লবীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

এখন দেখা যাক্ গান্ধীজী সহিংস সংগ্রামীদের কি চোখে দেখতেন? পূর্বে বলেছি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চলতেন, তাঁদের তিনি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন—যদিও তাঁরা ভুল করছেন, একথা বলতে ও বোঝাতে তাঁর কোন সংকোচ ছিল না। তিনি তাঁদের বিষ চোখে দেখতেন বা ঘৃণা করতেন বা জব্দ করতে চাইতেন, একথা এতটুকু ঠিক নয়। কত ফেরারী বিপ্লবী তাঁর কাছে গিয়ে নির্ভয়ে কথাবার্তা, তর্কাতর্কি করতেন। বিপ্লবীদের ফাঁসী থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি কম চেষ্টা করেন নি। ভগৎ সিংদের ফাঁসী থেকে বাঁচাতে পারেননি বলে তাঁর মনে বিশেষ দুঃখ ছিল। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের সময় ভগৎ সিংদের ফাঁসী রদ করার দাবিকে কেন তিনি একটি সর্ত হিসেবে রাখেন নি, এ নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে হয়েছে এবং একদিন লাহোর স্টেশনে বিক্ষোভকারীদের কালো পতাকা ও জুতোর মালা নিজ হাতে নিয়ে তিনি গলায় পরেছিলেন এবং সেখানেই বলেছিলেন যে, ভগৎ সিং-এর ফাঁসী রদ করার দাবি তিনি সর্ত হিসেবে রাখতে পারেন নি কারণ সে সর্ত রাখতে গেলে প্যাক্ট হতো না "কিন্তু আমি প্যাক্টটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করাতে দুঃখের সঙ্গে সেই সর্ত তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ভগৎ সিং-এর জীবনকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর জীবন রক্ষা না করতে পারার জন্য যে অপরাধ, তাতে জুতোর মালা আমার প্রাপ্য হতে পারে। আমি তোমাদের জুতোর মালা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছি।" কিন্তু হয়তো এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের প্রয়োজন কি ছিল? গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের কোন মর্যাদা তো ইংরেজ শেষ পর্যন্ত দেয় নি। এই জাতীয় সমালোচনা নিশ্চয়ই চলতে পারে এবং তৎকালীন বিপ্লবীরা ও চরমপন্থীরা সেদিন এ যুক্তি দিয়েছিলেন। আপোষের পথে পা না দিয়ে যদি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যেতো তবেই ছিল ভালো। প্যাক্ট করে নিজেদের আন্দোলনকে খর্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল মাত্র—এই জাতীয় সমালোচনা চলতে পারে। কিন্তু গান্ধীজী বলতে পারেন যে, ঘটনা ঘটে গেলে পরে সবাই বিজ্ঞ

হতে পারে কিন্তু আগে থেকে সবকিছুর পরিণাম বোঝা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাছাড়া গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা ও জনসাধারণের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অসাধারণ রকম বেড়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণের এই আত্মপ্রত্যয় হয়েছিল যে ভারতবর্ষ তাহলে সত্যি সত্যিই স্বাধীন হতে পারে। জগত সভায় ভারতের দাবিও এই প্যাক্টের ফলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। আরও একটা কথা ভুললে চলবে না। যাঁরা সহিংস ও সশস্ত্র বিপ্লব করতে চান—তাঁরা অহিংস সত্যাগ্রহী নেতা গান্ধীজীর ভরসায় আন্দোলন করবেন কেন? কেন তারা আশা করবেন যে গান্ধীজী শেষপর্যন্ত তাঁদের—বিপ্লবীদের—ফাঁসীর মঞ্চ থেকে বাঁচিয়ে দেবেন? তাহলেও একথা সত্যি যে গান্ধীজী অহিংস হয়েও বিপ্লবীদের কারামুক্ত করার জন্য এবং ফাঁসীর আসামীদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ও মামলায় উকিল ব্যারিষ্টার লাগাবার জন্য অনেক কিছু করতেন—যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কেন না গান্ধীজী বলতেন, "কংগ্রেসকে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি হতে হবে। যারা কংগ্রেসে বিশ্বাস করে না এবং এমন কি যারা সম্ভব হলে কংগ্রেসকে চূর্ণ করে দিতে চায় তাদের স্বার্থও কংগ্রেস অবহেলা করতে পারে না।" বিরোধী-অবিরোধী সকলেরই মঙ্গল তিনি চাইতেন বলে তাঁকে সত্যি সত্যি 'জাতির পিতা' বলা যায়। পিতা যেমন সকল সন্তানকেই ভালোবাসেন, যে ছেলেটা অবাধ্য হয়ে গেছে, তার প্রতি কর্তব্য পালনেও অবহেলা করেন না—তিনি তেমনি জাতির সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করতেন। Father of the nation-এর এই সত্যিকার পরিচয়।*

গান্ধীজী হিংসার মধ্যেও পার্থক্য বিচার করতেন। সব সহিংস-আন্দোলনকেই তিনি এক চোখে দেখতেন না। আত্মরক্ষার জন্য সহিংস প্রতিরোধকে তিনি ন্যায্য অধিকার বলেই মনে করতেন। আক্রমণকারীর হিংসা বা প্রবলপক্ষের হিংসাকে তিনি কখনো ক্ষমা করতেন না। তিনি বলেছেন, "If a man fights with his sword single-handed against a horde of dacoits armed to the teeth, I should say that he is fighting almost non-violently. Have I not said to our women that if in defence of their honour they used their nails and teeth and even a dagger, I should regard their conduct non-violent?.........In the same way, for the Poles to stand violently against the German hordes, vastly superior in number, millitary equipment and strength, was almost non-violence. (Mahatma Vol-V. P. 388-9)

অর্থাৎ, একদল সশস্ত্র ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কোন ব্যক্তি একা একখানা তলোয়ার নিয়েও লড়াই করে তবে তাকে আমি প্রায় অহিংস সংগ্রাম বলবো। নারীরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য যদি তাদের নখ, দাঁত, এমন কি একখানা ছোরাও ব্যবহার করে তবে তাদের সেই প্রতিরোধকেও আমি প্রায় অহিংস সংগ্রাম

* ইতিহাসের এই অধ্যায়টি খুবই বিতর্কের। বিশদ আলোচনা "গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র" অধ্যায়ে করা আছে।

বলবো।······এইভাবে বহুগুণে শক্তিশালী আক্রমণকারী হিটলারের দোর্দন্ড দলের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা কামীরা যে সশস্ত্র প্রতিরোধ করছেন তাকেও আমি প্রায় অহিংসার মধ্যেই ধরি।" এই থেকে বোঝা যায় গান্ধীজীর চিন্তাধারা কত সংস্কারমুক্ত ছিল। ন্যায্য সংগ্রামকে, স্বাধীনতার সংগ্রামকে, আত্মরক্ষার সংগ্রামকে তিনি এতটা মর্যাদা দিতেন যে, তাদেরকে তিনি অহিংসার গৌরবই দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের সশস্ত্র প্রতিরোধকেও তাঁর নৈতিক সমর্থন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তিনি কখনো কট্টর, গোঁড়া বা fanatic ছিলেন না, কোন একটা মন্ত্র বা formula-কে আঁকড়ে থাকতেন না, মানুষের উন্নতি ও মুক্তির মানদন্ড দিয়েই তাঁর আদর্শের বিচার চলতো। কাজেই তিনি সত্যের জন্য সংগ্রামী হিংসাবাদীদেরও ভালোবাসতেন। তিনি একদিন বিপ্লবীদের বলেছিলেন, "If you can reach your goal by any other way, do so by all means. You will deserve my congratulations. For, I cannot in any case stand cowardice. Let none say when I am gone that I taught the people to be cowards. If you think my ahmisa amounts to that or leads you to that, you should reject it without hesitation. I would rather think that you died in abject terror. (Mahatma Vol. V. Page 141.)

"যদি তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে অন্য কোন উপায়ে পেঁছাতে পারো, নির্ভয়ে সেই পথে চলো। তোমরা আমার অভিনন্দন পাবে। কেন না, আমি কোন অবস্থায়ই কাপুরুষতা সহ্য করতে পারি না। আমার মৃত্যুর পরে কেউ যেন এই অভিযোগ না করে যে আমি কাপুরুষতার শিক্ষা বা প্রশ্রয় দিয়ে গেছি। যদি তোমরা মনে করো যে আমার শিক্ষা সেদিকেই নিয়ে যায়, তবে তোমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করো না আমাকে বর্জন করতে। আমি বরং চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা ঘুষির বদলে ঘুষি খেয়ে মরো—কিন্তু কখনো ভয়ে ভীত হয়ে মরো না।" অতি পরিষ্কার কথা। কোন ব্যাখ্যার দরকার করে না।

নোয়াখালিতে থাকা কালে পুরোনো বিপ্লবীদের সাথে তাঁর এক বৈঠক হয়, কি করে আত্মরক্ষা করা যায়, নারীদের ইজ্জত রক্ষা করা যায়, হিন্দুদের মনে বল ফিরিয়ে আনা যায়, বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল এই। "You will note, added Gandhiji, that for purpose of our present discussion I have not asked you to discard the use of arms. It is not for me to provide arms for the Chittagong Armoury Raid men. The most tragic thing about the Armoury Raid people, is that they could not even multiply themselves, their bravery was lop-sided. It did not infect others." "No wonder, it could not" exclaimed a worker. "The Armoury Raid people were condemned."

"By whom ?" he asked. "I may have—that is a different thing."

"The people did so. I am myself an Armoury Raid man."

"They did not, you are no armoury raid man or you should not have been here to tell these things. That so many of them should have remained living witness of the things that have happened is in my eyes a tragedy of first order. If they had shown the same feerlessness and courage to face death in the present crisis, as they did when they made that raid, they would have gone down in history as heroes. As it is, they have only inscribed a small footnote in the page of history. You will see I am not, as I have already said, asking you just how to unlearn the use of arms, or to follow my type of heroism. *I have not made it good, even in my own case.* I have come here to test it in East Bengal. I want you to take up the conventional type of heroism. You should be able to inject others both men and women—with courage and fearlessness to face death when the alternative is dishonour and humiliation. Then the Hindus can stay in East Bengal, not otherwise. After all Muslims are blood of our blood and bone of our bone. (Mahatma, Vol. VII Page. 301.) গান্ধী বললেন, "তোমরা দেখছো আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তুতে আমি অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা করছি না। অস্ত্র তোমাদের সংগ্রহ করে দেওয়া আমার কাজ হতে পারে না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের অস্ত্র আমাকে যোগাড় করে দিতে কেউ নিশ্চয়ই বলবে না। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, তারা তাদের দল বাড়াতে পারলো না। তাদের বীরত্ব বড্ড একপেশে ছিল। তাদের বীরত্ব সংক্রামক হতে পারে নি।

একজন কর্মী বলে উঠলেন, "তাতে আর আশ্চর্য কি। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের নিন্দা করা হয়েছিল।"

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কে নিন্দা করেছিল? হয়তো আমি করেছিলাম কিন্তু সে কথার অর্থ ভিন্ন রকমের।"

"জনসাধারণও নিন্দা করেছিল। আমি নিজেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের একজন।"

"না, দেশ কখনো তাঁদের নিন্দা করে নি। তাছাড়া তুমি সেই বিপ্লবীদের মধ্যে একজন নও। তা যদি হতে তাহলে তোমার পক্ষে আজ আমার কাছে এইসব মর্মন্তুদ ঘটনার সংবাদ নিয়ে আসার অবসর হতো না। তোমাদের মধ্যে আজও সেই দলের এত লোক জীবিত আছে নোয়াখালির এই কলংকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য দেবার জন্য—এ আমার কাছে অতি শোচনীয় ঘটনা বলে মনে হয়। তাঁরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করার সময় যে সাহস দেখিয়েছিলেন, আজ যদি তাঁরা নোয়াখালির হিন্দুদের এই সংকটে তেমনি নির্ভীকতা দেখাতে পারতেন, তবে তাঁরা ইতিহাসের পাতায় বীর হিসেবে স্থান

পেয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁরা যা করেছেন তাতে তাঁদের নাম ইতিহাসের কোন পাদটীকার মত একটু সামান্য স্থান অধিকার করে আছে মাত্র। তোমরা লক্ষ্য করেছ, আমি আগেও বলেছি যে অস্ত্রের শিক্ষা তোমরা ত্যাগ করে আমার ধরনের বীরত্বের পথ অনুসরণ কর—এ আমি তোমাদের বলছি না। আমার ধরনের বীরত্ব বা পথকে আমি এখনও স্পষ্ট করে তুলতে পারি নি, আমার নিজের জন্যও তা নির্ভুল করে উঠতে পারি নি। পূর্ববঙ্গে আমি আমার পথের পরীক্ষা করতে এসেছি। আমি তোমাদের প্রচলিত ও চিরাচরিত বীরত্বের পথ গ্রহণ করতেই বলেছি। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আশা এই যে, তোমরা অন্যদের—নারী ও পুরুষ—সবারই প্রাণে তোমাদের সাহসের সংক্রমণ করাতে পারবে, যাতে তারা নিজেদের সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করার জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায়। তাহলেই হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকতে পারবে, নইলে নয়। কেন না শেষ পর্যন্ত মুসলমানেরা আমাদেরই রক্তের রক্ত। আমাদের হাড়ের হাড়।"

একটা ভুল ধারণা যাতে না হয় তার জন্য এখানেই গোটা কয়েক কথা বলে রাখা ভালো—যদিও বারান্তরে তার বিশদ আলোচনার দরকার হবে। অন্যান্য দেশে যেরকম রক্তাক্ত বিপ্লব হয়েছে এবং যেভাবে সেসব দেশের জনতা নিজেদের রাজ কায়েম করেছে—ভারতবর্ষে সেরকম বিপ্লব হতে পারতো কিনা, এর বিচার একটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। কেন না এখানে আমরা সে জাতীয় আলোচনা উত্থাপন করতে চাইনি—আমরা কেবল আমাদের নজর গান্ধীজীর ভূমিকায় ইতিহাসের সার্থকতা কত দূর এবং কেন হয়েছে, তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো। তাছাড়া এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব হতে পারতো কিনা—এ একটা academic ও hypothetical তর্ক। যদি সত্যি সত্যি একদল বিপ্লবী সর্বভারতে সশস্ত্র বিপ্লব করতে বহু আগে থেকেই লেগে যেতেন, যদি তাঁরা গণআন্দোলনের দায়িত্ব গান্ধীজীর হাতে সঁপে দিয়ে নিজেরা কেবল অস্ত্রের কথাটাই না ভাবতেন, যদি তাঁরা সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতীয়তার দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করতেন, যদি তাঁরা প্রথম থেকেই জনতাকে হাত করার জন্য লেগে যেতেন এবং মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের মধ্যেই বিপ্লব সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস না করতেন, যদি তাঁরা গান্ধীজীর সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরী করার মিছে স্বপ্ন না দেখে শুরু থেকেই কংগ্রেসের বাইরেই নিজেদের গণসংগ্রাম গড়তে চেষ্টা করতেন—তবে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো বৈকি। কিন্তু আজ এসব কথা সম্পূর্ণ কেতাবী বা academic তর্কমাত্র—যার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ ও লড়াইয়ের কায়দা নিশ্চয়ই সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়ে ভিন্ন—অতএব সশস্ত্র সংগ্রামকারীরা, কেন গান্ধীজী তাঁদের মতো সংগ্রাম চালাচ্ছেন না—এই অনুযোগ করতে পারেন না। অথবা তাঁরা যে মনে করতেন গান্ধীজী শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই সশস্ত্র সংগ্রামের আদেশ দেবেন—এই ভুল ধারণা করতে গান্ধীজী কখনো সুযোগ দেন নি। অতএব যা তাঁর কাছ থেকে পাবার নয়—তার আশা করে থাকা নিশ্চয়ই ভুল। অথবা জনসাধারণ একদিন গান্ধীজীর নেতৃত্বকে দূর করে দেবে—যে জনসাধারণ গান্ধীজীর প্রভাবেই

বর্ধিত ও চেতনাপ্রাপ্ত হচ্ছে—এমন সহজ স্বপ্ন দেখাও ভুল হয়েছে। গান্ধীজীর প্রকৃত শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি না করার জন্যই তাঁর কাজটাকে লঘু করে দেখার জন্যই এই জাতীয় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব গান্ধীজী কেন বেপরোয়া রক্তাক্তবিপ্লবের ডাক দিলেন না, এজাতীয় অভিযোগ ও অনুযোগ হাস্যকর। কাজেই গান্ধীজীর সংগ্রাম পদ্ধতি, আপোষ করার নীতি, সংগ্রাম কৌশল ও সংগ্রামের বিরতি, গঠনমূলক ভঙ্গী, শত্রুর সঙ্গে ঠিক শত্রুর মতো ব্যবহার না করা ইত্যাদি যে সমস্ত কৌশল আমরা পছন্দ করি নি বা বুঝতে পারি নি—সেগুলি তাঁর অহিংসা সম্বন্ধে ধারণা থেকেই একমাত্র বোঝা সম্ভব, হিংসার নীতি থেকে বোঝা শক্ত বৈকি। যেমন হরিজন পত্রিকার উপর সরকার ১৯৪০ সালে যখন censor বসাতে চাইলেন, গান্ধীজী তখন হরিজন পত্রিকা সোজা বন্ধ করে দিলেন, সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানলেন না এবং সরকার এই কাগজকে নিয়ন্ত্রিত করতে যতটা আশা করেছিলেন তার চেয়েও বেশী সরকারের ইচ্ছা পূরণ করে দিলেন, অর্থাৎ কাগজটা বন্ধ করেই দিলেন। সরকার হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, অথবা অন্যদিক দিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন লিখলেন, "If my life were regulated by violence in the last resort, I would refuse to give an inch lest an ell might be asked for. But if my life is regulated by non-violence, I should be prepared to and actually give an ell when an inch is asked for. By so doing I produce on the usurper a strange and pleasurable sensation. He would also be confounded and would not know what to do with me." (Harijan 10. 11. 40)

অর্থাৎ "আমার জীবন যদি শেষ পর্যন্ত হিংসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে আমার বিপক্ষ যদি আমার কাছে এক ইঞ্চি পরিমাণ কিছুও চায় আমি তা-ও দিতে রাজী হবো না, পাছে সে শেষ পর্যন্ত পুরো গজ পরিমাণটাই চেয়ে বসে। আবার যদি আমার জীবন অহিংসা-নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে বিপক্ষ যদি এক ইঞ্চি চায়, আমি তাকে নির্বিবাদে এক গজ দিয়ে দেবো। কেন না এক ইঞ্চির বদলে পুরো গজ পেয়ে দখলকারীর মনে এক অদ্ভুত ও সুখকর অনুভূতি আসতে বাধ্য। তাছাড়া সে তখন বিমূঢ় হয়ে পড়তেও পারে এবং আমাকে নিয়ে কি করা যায় সেই ভাবনায় পড়ে যাবে।" অতএব আমরা দেখছি অহিংস-সংগ্রামের কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক ভিত্তি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলে গান্ধীজী বরাবরই বলে আসছেন ও দেখিয়ে আসছেন। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যখন আলোচনা করা যাবে তখন এর আরো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে।

এখন আমরা আমাদের আলোচনার ধারায় ফিরে যাই। সময়ে সময়ে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে গান্ধীজী dogmatic non-violence পছন্দ করেন নি। জীবহত্যা অন্যায়, কিন্তু মানুষ জীবহত্যা না করে পারে না। নির্ভেজাল অহিংস হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মতে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ সত্যি সত্যি অহিংস হতে পারে না। যুদ্ধের সময় অন্নকষ্ট দূর করার উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে

তিনি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনবার ব্যবস্থা করতে সরকারকে বলেছিলেন। একজন ভক্ত তাঁকে বলেন, বাঙালীরা মাছ খায় এবং বাস্তবতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অহিংস হবার কারোরই সাধ্য নেই। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "To allow crops to be eaten up by the animals in the name of ahimsa, while there is famine in the land, is certainly a sin. Evil and good are relative terms. What is good under certain conditions can become an evil…………sin under different set of conditions." (Mahatma Vol. VII, page. 153)

অর্থাৎ "দেশে যখন দুর্ভিক্ষ চলেছে তখন অহিংসার নামে জন্তু জানোয়ারদের শস্য নষ্ট করতে দেওয়া, খাইয়ে দেওয়া, নিশ্চয়ই পাপ। ভালো ও মন্দ উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। কোনও একটি অবস্থায় যা ভালো, ভিন্ন অবস্থায় তা মন্দ হয়ে দাঁড়াতে পারে।" বিপ্লবীদের ও সকল প্রগতিবাদীদেরও ওই একই যুক্তি—এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অতি স্পষ্ট। Absolute Truth মানুষের পক্ষে ধরা অসম্ভব—যদিও তিনি Absolute Truth বা ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করে চলেছেন। তবে তাঁকে Relative Truth নিয়ে চলতে হচ্ছে, সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন—"So long as I have not realised the absolute truth, so long must I hold by my relative truth as I have conceived it." অর্থাৎ "যতদিন পর্যন্ত না আমি পরম সত্যকে দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আপেক্ষিক সত্যকেই ধরে চলতে হবে।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি relative truth বা খন্ড সত্য বা আপেক্ষিক সত্যকেই নিয়ে তাঁর চলতে হয় তবে পরম সত্য বলে একটা কিছু আছে, এই ধারণা রাখার সার্থকতা কি? কেন এই Abstract Truth বা Abstract Ideal-এর পিছনে ছোটা? তিনি উত্তরে বলেছেন, ধ্রুবতারা নাবিকের কাছে যেমন পরমসত্য, আমার কাছে তেমনি। ধ্রুবতারা সুদূর আকাশে মানুষের হাতের নাগালের বহুদূরে চিরকালই থাকবে, কিন্তু নাবিকেরা ধ্রুবতারা দিয়েই তাদের দিগ্‌নির্ণয় করে থাকে—সে দূর বলে কম প্রয়োজনীয় নয়। তেমনি, পরম সত্য, পরম আদর্শ যতই মানুষের অসাধ্য হোক—তবু মানুষের জীবনসমুদ্রে তারা ধ্রুবতারার মতোই কাজ করে যাবে। এই আদর্শ ও পরমসত্যের পিছনে না ছুটলে মানুষের কোন ভবিষ্যতই নেই। এবং কোনকালেও থাকবে না। তিনি বলেছেন, আমি হলেম, Practical Idealist বা বাস্তব আদর্শবাদী। তাই একদিকে তাঁকে আমরা দেখি নিষ্ঠাবান অহিংসার পূজারী রূপে, অপরদিকে অবস্থার সীমাটাও তার লক্ষ্যে স্পষ্ট, তাই মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াকে তিনি অন্যায় বলতেন। এই মাত্রা হলো মানুষের নিজের দুর্বলতা, অবস্থার গন্ডী। যারা কেবল আদর্শের পূজারী, তারা স্বপ্নবিলাসী ও Utopian হয়ে যেতে বাধ্য। আর যারা কেবল বাস্তববাদী practicalism ও pragmatism-কেই সম্বল করে চলে যারা, তারা কখনো দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন হয় না। তারা সুবিধাবাদী হতে বাধ্য হয়, নীতিহীনতা এসে যায়। কাজেই এই দুই ভিন্ন প্রেরণাকে যাঁরা সংযুক্ত করতে পারেন, তাঁরাই বাস্তবেও সার্থক

হন—আবার ক্রমশঃ আদর্শের দিকেই তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন। বিজ্ঞান এবং নীতিধর্ম সম্পর্কেও তাঁর ধারণা এইপ্রকারের। বিজ্ঞানের কোন নীতিবোধ বা moral নেই। বিজ্ঞান বলতে পারে, মানুষের কচি শিশুদের মাংস, মুরগীর মাংসের মতোই উপাদেয় ও উপকারী হওয়া সম্ভব—কিন্তু মানুষের নীতি ও ধর্মবোধ এই কথা শুনে আঁতকে উঠবে। অতএব বিজ্ঞানকে আদর্শ ও নীতির উপদেশ ও পাহারা মেনে চলতে হবে, আবার আদর্শ ও নীতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে, তা বিজ্ঞানবিরোধী হলে চলবে না।

যাই হোক, আমরা অহিংসার কথায় ফিরে যাই। তিনি পরম অহিংস হবার জন্যই সর্বদা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বুঝতেন, যদি একটি দুর্বলচিত্ত লোক একখানা লাঠি হাতে পেলে সবলতা ফিরে পায় এবং অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়, তবে তিনি লাঠি বা অস্ত্রকে অস্বীকার করবেন কি করে? যদি অহিংস উপায়েই বিনা লাঠি, বিনা বন্দুকেই সে রুখে দাঁড়াতে পারে, বাহবা, বেশ—এর মতো চমৎকার আর হয় না। তিনি লোকেদের জন্য এই কথাই, এই শিক্ষাই, এই আদর্শই প্রচার ও প্রয়োগ করে গেছেন। কিন্তু তিনি মেনে নিয়েছেন, বারে বারে যদি কেউ তার পথে সাহস না পায়, যদি অস্ত্র ছেড়ে দিলে তার মনের বল ভেঙে যায়, যদি সে অহিংসার মতো আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারে—তবে তার অস্ত্র তার হাতে থাকুক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াক, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি মনে করতেন ধীরে ধীরে তাঁর আদর্শের বাস্তবশক্তি মানুষ বুঝতে পারবে। একদিনেই সমগ্র জগত তাঁর কথার মর্ম ও সক্রিয়তা বুঝতে পারবে না—কেন না ইতিহাসের হাজার হাজার বছর ধরে লড়াইয়ের যে সংস্কার তার এসেছে তা সহসা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এই ছিল তাঁর Practical Idealism. এই সূত্র থেকেই বুঝতে হবে কেন গান্ধীজী বিপ্লবীদের নোয়াখালিতে অস্ত্রত্যাগ করতে আদেশ দেন নি, কেন চীনের সংগ্রামকে, পোল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি প্রায় অহিংস বলে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং কেন শেষপর্যন্ত পণ্ডিত নেহরুকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীকে পাঠাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সমস্ত অনুমতি দিলেও তিনি কখনও অহিংসার জন্য অভিযানকে ব্যর্থ মনে করেন নি। তিনি বলেন গেছেন, অহিংসার পথে যেতেই হবে। মানুষের অন্য গতি নেই—অবস্থার চাপে পড়েও নেই। পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর সহিংস যুদ্ধবিগ্রহ একপ্রকার অচল হয়ে গিয়েছে। যদি সাধারণ মানুষ, অত্যাচারিত মানুষ পারমাণবিক বোমার জন্য আজ আর লড়াই, চিরাচরিত সশস্ত্র লড়াই করা অসম্ভব মনে করে—তবে তাকে কি করতে হবে? সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের প্রয়োজন তো আজও রয়েছে। তাদের অন্য পথ আবিষ্কার করতেই হবে। সে পথ সত্যাগ্রহের পথ—অহিংসার পথ। এই পথ শক্ত হতে পারে, কঠিন হতে পারে—কিন্তু অন্য পথ, পারমাণবিক বোমার পথ, শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব এবং রুদ্ধই বলা চলে।

আজকাল অনেকেই দাবি করে থাকেন যে ভারত একমাত্র অহিংসার সাহায্যেই

স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী সে দাবি কখনও করেন নি। তিনি বলেছেন, অহিংসার দান রয়েছে, তার প্রভাব হয়তো খুব বেশী ছিল, কিন্তু সত্যিকার অহিংসা বা বীরের অহিংসা খুব বেশী দেখানো হয় নি। ফলে ভারতে এতো অনাচার। এতো দাঙ্গা, এতো বীভৎস কান্ড ঘটেছে স্বাধীনতা পাবার সময়। দুর্বলের অহিংসা বলে কোনো জিনিষ নেই—সবলের অহিংসা কি, ভারত তা আজও ব্যাপক-ভাবে বুঝতে পারে নি। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁকে নানা সন্দেহ ও উদ্বেগে ভুগতে হয়েছে। জীবনের শেষ বছরটি তাঁর গভীর বেদনা ও বিক্ষোভের মধ্যে কেটেছে। তিনি আকুল হয়ে দিনরাত্রি প্রশ্ন করে চলেছেন—তবে কি তিনি কংগ্রেসের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তবে কি দেশবাসী কখনোই অহিংসা বুঝতে পারে নি, তাদের অহিংসা, হিংসার সম্মুখে দাঁড়াতে পারছে না কেন? কেন তাঁর নিকটতম শিষ্যমন্ডলীও অহিংসা ত্যাগ করে অস্ত্র ধরবার জন্য এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কেন তাদের বিশ্বাস অগ্নিপরীক্ষার সামনে এসে গলে যাচ্ছে। দাঙ্গার মধ্য দিয়ে মানুষের যে কুৎসিত কাপুরুষতা, নৃশংসতা, ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার আগুন দেখা দিয়েছিল—এই আগুন কি করে নেভানো যায়? গভীর রাত্রিতে পাগলের মতো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আলো চাই—আর বলেছেন—ম্যায় ক্যা করূঁ, ম্যায় ক্যা করূঁ। (Vide, My Days with Gandhi—by N. K. Bose)

"The world thought that India had won her independence through non-violence, and, if it is so it was a unique thing in history. How he wished it was really so. But he had already declared that it was not. The cowardly or the weak or the lame of the heart could never practice non-violence. The physically disabled could always practice non-violence, if they had the grace of God. He had blindly thought that India's fight was non-violent. But the events that had taken place lately, had opened his eyes to the fact that theirs was the passive resistance of the weak. If the Indians had really been bravely non-violent, they could never nave iudulged in the acts of which they are guilty. (Mahatma Vol. VIII, page—368)

"জগতের লোকের ধারণা ভারতবর্ষ অহিংসার সাহায্যে স্বাধীন হয়েছে এবং যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ইতিহাসের পাতায় একটা নতুন কিছু ঘটলো বটে। গান্ধীজী বলেন, আহা, যদি তাই হতো। কিন্তু তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তা অহিংসার বলেই ঘটে নি। যারা ভীতু, দুর্বল ও ক্ষীণচিত্তের লোক, তারা কখনোই অহিংসার প্রয়োগ করতে পারে না। শরীরে যারা অক্ষম তারাও ভগবানের কৃপা থাকলে অহিংসা দেখাতে পারে। তিনি অন্ধের মতো ভেবেছিলেন যে ভারতের সংগ্রাম বুঝি অহিংসার পথেই চলেছে। কিন্তু ইদানীং যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে তাঁর চোখ খুলে গিয়েছে এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাদের সংগ্রামটা দুর্বলের পরোক্ষ

প্রতিরোধ মাত্র। যদি ভারতীয়েরা সক্রিয় বীরের অহিংসা পালন করতো, তবে কখনোই তারা এসব হীন কাজ করতে পারতো না যাতে আজ্ তারা দোষী।"

আবার শুনুন, "Let me make one thing clear. I have frankly and freely admitted that what we have practised during the past thirty years was not non-violent resistance, but passive resistance, which only the weak offer because they were unable, not willing, to offer an armed resistance. If we know the use of non-violent resistance, which only the hearts of oak can offer, we ean present to the world a different picture of free India, instead of an India cut into twain, one part hightly suspicious of the other and the two too much engaged in internal strife to be able to think cogently of the food and clothing of the hungry and naked millions, who know no religion, that know of one and only God, who appears to them in the guise of necessaries of life. "(Mahatma Vol. VIII, page—57)

"একটা জিনিস আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই। গত ত্রিশবছর ধরে আমরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন করে এসেছি তা সত্যিকারের অহিংস আন্দোলন ছিল না—তা ছিল পরোক্ষ প্রতিরোধ মাত্র—যা দুর্বলেরাই করে থাকে। কেননা সশস্ত্র সংগ্রাম গ্রহণ করবার সাহস, ইচ্ছা ও ঝুঁকি নিতে তারা পারে না। যদি আমরা অহিংস প্রতিরোধ করতে পারতাম—অন্তর যাদের ওক গাছের মতো শক্ত, একমাত্র তারাই সেই অহিংসা দেখাতে পারে—তবে পৃথিবী আজ স্বাধীন ভারতের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখতে পেতো এবং আজকের দ্বিখন্ডিত ভারতের ক্রমবর্ধমান সন্দেহ ও আত্মকলহ-বিড়ম্বিত ছবির বদলে দেখতে পেতো যে আমরা ক্ষুধিত ও নগ্ন লক্ষকোটি জনতার অন্নবস্ত্র সংগ্রহে সত্যি সত্যি ব্যস্ত—যে জনতার কাছে অন্নবস্ত্রাদি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা—যে ভগবান সেটা মেটাতে পারে, সেই ভগবান ছাড়া আজ তাদের অন্য কোন ভগবান নেই, থাকতে পারে না।"

শুধু কি জনসাধারণের অধঃপতনেই গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন? তিনি কংগ্রেসের ভিতরকার গলদ, কংগ্রেস মন্ত্রীমন্ডল ও সভাসদদেরও ত্রুটি, অধঃপতন ও সুবিধাবাদ দেখাতেও কম কঠিন কথা ব্যবহার করেন নি। হরিজন কাগজে দক্ষিণ—ভারতের এক কংগ্রেস নেতার পত্র তিনি নিজের মন্তব্য ও বেদনাসহ প্রকাশ করে দিলেন।

"I intensely hate to point out the shortcomings of the individuals, but to shut one's eyes to the terrible consequences of the rot set in in the individuals an organisation like the Congress of noble in its origin and admirable in its achievements, would be heinous. The rot in the Congress is that of the people's representation in the legislative bodies of the provinces, who are the prototype of the rank and file. They are vociferous about stopping the widespread

corruption, but they themselves resort to worse corruption. They accept money from the people to secure licences of every description, indulge in black-marketing of the worst type, trade on the ignorances of the masses, and corrupt the sources of justice, and force the administrative machinery to get transfers for the administrative personnel. The people are crushed between these sets of people. Two hundred and fifty of these legislators let loose on the people in a province without opposition, are, in my opinion, the worst plague. Is it after all for the replacing rapacity of the White by the Black that so many noble souls, who are no more with us, suffered and sacrificed everything worth living for in their lives? There must be an escape from this morass." (Tendulkar, Mahatma Vol. VIII, page—292)

"লোকের দোষত্রুটি দেখাতে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি কিন্তু কংগ্রেসের মত গৌরবময় প্রতিষ্ঠান, যার জন্ম ও জীবন নানা কীর্তিতে ভরা—সেই কংগ্রেসের মধ্যে ব্যক্তি চরিত্রে যে ভয়াবহ পচন দেখা দিয়েছে, তা দেখতে না চাওয়া আজ ঘোরতর অপরাধ হবে আমার পক্ষে। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে যে সমস্ত সভ্য আজ নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের প্রতিবিম্ব মাত্র। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা খুব মুখর কিন্তু নিজেরা অধিকতর দুর্নীতিতে দুষ্ট। নানারকম লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়ে দিতে এঁরা ঘুষ খান, নানারকমের কালোবাজারের অংশীদার হয়ে পড়েছেন এঁরা, জনসাধারণের অজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ নেন নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য, বিচারালয়গুলিকেও এঁরা দুর্নীতিদুষ্টু করে তুলছেন, কর্মচারীদের বদলির উপর এঁরা অসম্ভব প্রভাব খাটিয়ে থাকেন—নিজেদের স্বার্থে। জনসাধারণ এই দুই দলের লোকের চাপে আজ পিষ্ট। দুইশত পঞ্চাশ জন এই জাতীয় আইন সভাসদেরা, যাদের বাধা দেবার মত কোন বিরোধীদল নেই—আজ তাঁরা জনতাকে লুন্ঠন করতে ব্যস্ত—এই জিনিষটা আমার কাছে প্লেগের চেয়েও ভয়াবহ বলে মনে হয়। সাদাদের শোষণ ও লুন্ঠনের পরিবর্তে কালোদের লুন্ঠন ও শোষণ কায়েম করার জন্যই কি এতো প্রাণ বলিদান করা হয়েছে? যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাঁরা ধন প্রাণ যা কিছুর জন্য মানুষ জীবন উপভোগ করে থাকে, সেসব উৎসর্গ করেছেন কি এরই জন্য? এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ চাইই চাই।"

গান্ধীজী মনে করতেন এই পঙ্কিলতার জন্ম কখনো অহিংসা থেকে হতে পারে না। এ যখন দেখা দিয়েছে তখন বুঝতে হবে আমাদের অহিংসার আড়ালে গোপন হিংসা, গুপ্ত লোভ, নির্লজ্জ সুবিধাবাদ বাসা বেঁধে ছিল। গান্ধীজী তাঁর শেষ জীবনে এসেই এই দুর্বলতার পূর্ণ রূপটা দেখতে পেলেন। কেন আগে দেখতে পান নি বা complacent ছিলেন, এই অভিযোগ নিশ্চয়ই করা যায়। তিনি নিজেও এইজন্য ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন এবং এমন কি তিনি আর ১২৫ বছর বেঁচে থাকতে চান

না, তিনি হয় এই হিংসা ও পচনের পঙ্ক দূর করবেন নইলে প্রাণ বিসর্জন করবেন, এমন ধরণের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও। তবে দুর্বলের ভীরু অহিংসা বলে যে কিছু নেই একথা অবশ্য তিনি বহুপূর্ব থেকেই বলে আসছেন। কিন্তু এসব বলা সত্ত্বেও তিনি কঠিন পরীক্ষা দ্বারা দেখেন নি, যারা কংগ্রেসে ঢুকছে তাদের সত্যিকার নিষ্ঠা কতটুকু। ১৫.১০.২৫ তারিখের Young India-তে তিনি লিখেছেন, "Retreat out of fear was cowardice and cowardice would not hasten a settelment or the advent of non-violence. Cowardice was a species of violence which it was the most difficult to overcome. One would hope to persuade a violently inclined person to shed his violence but since cowardice is the negation of all force, it was impossible to teach a mouse non-violence in respect of a cat. He would simply not understand what non-violence could be, because he had not the capacity for violence against the cat. Would it not be a mockery to ask a blind man not to look at ugly things ? Moulana Shaukat Ali and I were at Bettia in 1921. The people of a village near Bettia told me that they had run away whilst the police were looting their houses and molesting their womenfolk. When they said they had run away because I had told them to be non-violent, I hung my head in shame. I assured them such was not the meaning of my non-violence. I expected them to intercept the mightiest power that might be in the act of harming those who were under their protection, and draw without retaliation, all harm upon their own heads even to the point of death, but never to run from the storm-centre. It was manly enough to defend one's property, honour or religion at the point of sword. It was manlier and nobler to defend them without seeking to injure the wrong-doers. But it was unmanly, unnatural and dishonourable to forsake the post of duty, and in order to save one's own skin to leave property, honour and religion to the mercy of wrong-doer. I could see my way of successfully delivering the message of Ahimsa to those who know how to die, not to those who are afraid of death." (Communal Unity-page—117)

"ভয়ে পালিয়ে আসার নাম কাপুরুষতা। কাপুরুষতার সাহায্যে কোন মীমাংসা বা অহিংসা আনা সম্ভব নয়। কাপুরুষতাও একরকমের হিংসা, যা দূর করা খুব শক্ত। একজন হিংসাপ্রবণ লোককে বরং অহিংস করে তোলা সম্ভব—কিন্তু ভীরুতা যেহেতু সকল শক্তির নেতি, সেইহেতু মূষিককে বিড়াল সম্পর্কে অহিংসা

কোন কালেই শেখানো সম্ভব নয়। মৌখিক অহিংসা কি তা কখনো বুঝতেই পারবে না, যেহেতু বিড়ালের বিরুদ্ধে সহিংস হবার মতো ক্ষমতাও তার কোন কালেই ছিল না। একজন অন্ধকে যদি বলা যায় যে কুৎসিৎ জিনিষ দেখো না, তবে কি তা ঠাট্টার মতো শোনায় না? মৌলানা সৌকত আলি ও আমি ১৯২১ সালে বেটিয়াতে যাই। বেটিয়ার নিকট এক গ্রামের লোকেরা আমাকে জানায় যে যখন পুলিশেরা তাদের ঘরদোর লুট করতে লাগলো ও মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো, তখন পুরুষেরা গ্রাম থেকে পালিয়ে গেলো। যখন তারা বললো যে, তারা আমার শিক্ষানুসারে অর্থাৎ অহিংস থাকার জন্যই পালিয়ে গিয়েছিল, তখন আমার মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়লো। আমি তাদের বোঝাই যে অহিংসার অর্থ তা নয়। আমি তাদের কাছ থেকে এই আশা করি যে যেন তারা জগতের সবচেয়ে শক্তিমান শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়—যখন তারা দেখবে সে শক্তি অন্যায় করতে উদ্যত, এবং কোন প্রতিশোধ না নিয়ে নিজেদের মাথার উপর সেই উদ্ধত শক্তির সমস্ত আঘাত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করবে—কিন্তু কোন অবস্থায়ই রণক্ষেত্র থেকে পালাবে না। নিজেদের সম্পত্তি, মান সম্মান ও ধর্মকে তরবারির সাহায্যে রক্ষা করাতে কোন লজ্জা বা অধর্ম নেই। তা সম্পূর্ণ মানবোচিত ও বীরোচিত ব্যাপার। কিন্তু তারও চেয়ে উন্নততর ও গৌরবময় হবে সেই প্রতিরোধ, যাতে প্রতি-হিংসা নেই, অথবা শত্রুর প্রতি কোন অশুভ কামনা নেই। কিন্তু কর্তব্যের স্থান থেকে পালিয়ে আসা, নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সম্পত্তি, মান-ইজ্জত ও ধর্ম অনিষ্টকারীর হাতে সঁপে দেওয়া অমানবিক, অস্বাভাবিক ও কলঙ্কময়। যারা মরতে পারে তাদেরকেই আমার অহিংসা বোঝানো সহজ—যারা মরতে ভয় পায়, তাদের অহিংসা শেখানো কঠিন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মেটাবার উপায়ও যে সাহস সৃষ্টি করা, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, "The question here, therefore, is not now to teach one of the two communities a lesson or how to humanize it, but how to teach a coward to be brave." (Harijan 11. 10. 1928)

"সুতরাং প্রশ্নটা এই নয় যে দুয়ের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায়কে কেমন করে একটা শিক্ষা দেওয়া যায় বা কেমন করে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগানো যায়, এখানে প্রশ্নটা হলো কেমন করে ভীরুকে সাহসী হতে শিক্ষা দেওয়া যায়।"

তিনি আবার বলেছেন, "I have, therefore, not hesitated to say that it is better to be violent, if there is violence in our breasts, than to to put on the cloak of non-violent to cover impotence. There is hope for a violent man to become non-violent, there is no such hope for the impotent." (Harijan 21. 10. 39)

"তাই আমি দ্বিধাহীনভাবে বলেছি, বারবার বলেছি যে, যদি আমাদের বুকের ভিতর হিংসাই থেকে থাকে তবে বরং সহিংস লড়াই-ই ভাল—কিন্তু কাপুরুষতাকে ঢেকে রাখবার জন্য অহিংসার মুখোশ পরা অন্যায়। হিংসা নপুংসক ভীরুতার

চেয়ে চিরকালই শ্রেয়। হিংসাপরায়ণ লোককে বরং অহিংস করা সম্ভব, কিন্তু ভীরুর কোনই গতি নেই।"

এখন আমরা দেখবো কংগ্রেস শাসন হাতে নিয়ে কিভাবে অহিংসাকে ত্যাগ করেছে এবং গান্ধীজী তাতে কতটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেস, আগেই বলেছি, অহিংসাকে কখনো একটা শাশ্বত নীতি বা principle হিসেবে গ্রহণ করে নি—কৌশল বা tactics হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। ফলে যখন গত যুদ্ধের সময় ইংরেজের সাথে স্বাধীনতার দাবি দাওয়া নিয়ে কংগ্রেস একটা আপোষ করতে যাচ্ছিল, তখন স্বাধীনতা যদি ইংরেজ স্বীকার করে নেয় এবং প্রত্যক্ষভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেসের হাতে তক্ষুণি দেয়, তবে তারা জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিযুক্ত হবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অর্থাৎ অস্ত্র গ্রহণ করতে কংগ্রেস রাজি হলো ও অহিংসা পরিত্যাগ করতে রাজি হলো। এই সময় গান্ধীজী বলছেন, "The tragedy of the situation is that if Congress is to throw in its lot with those who believe in the necessity of armed defence of India, the past twenty years will have been years of gross neglect of the primary duty of the Congressmen to learn the science of armed warfare. And I fear that history will hold me responsable for the tragedy. The future historian will say that I should have perceived that the nation was learning not the non-violence of the strong, but merely the passivity of the weak and that I should have, therefore, provided for the Congressmen's military training." (Mahatma Vol. V, page 218)

"অবস্থার শোচনীয় পরিণাম এই যে, যদি কংগ্রেস আজ অন্যান্য সবার সাথে দেশরক্ষার ব্যাপারে অস্ত্রধারণ করারই দরকার মনে করে, তাহলে গত বিশ বছর ধরে কেন কংগ্রেস-কর্মীদের সশস্ত্র-লড়াইতে শিক্ষিত করা হলো না এবং কেন এই দায়িত্ব অবহেলা করা হলো? আমার মনে হয়, ইতিহাস এই ত্রুটির জন্য আমাকেই দায়ী করবে। ভবিষ্যত ঐতিহাসিক বলবে যে, আমার বোঝা উচিত ছিল যে দেশ বলিষ্ঠের অহিংসায় দিনকে দিন শিক্ষিত হয়ে উঠছে না বরং দুর্বলের পরোক্ষ প্রতিরোধই গড়ে উঠছে এবং আমার কংগ্রেস কর্মীদের জন্য সামরিক শিক্ষারই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।" এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করার দায়িত্ব গান্ধীজী স্বীকার করতেন। দেশ ইংরেজদের কাছে পরাধীন বলে জাপানের আক্রমণ থেকে রক্ষার কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই—এমন ধরনের উদাসীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা তাঁর নীতি বহির্ভূত। জাপান যদি উড়িষ্যার উপকূলে নামে—যার সম্ভাবনা খুব দেখা দিয়েছিল এক সময়ে—সেই আশংকা করে করে গান্ধীজী উড়িষ্যাতে বেসরকারী প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বাছা বাছা কয়েকজন সহকর্মীকে উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই অহিংস প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অতি সামান্য মনে করেন

এবং সশস্ত্র প্রতিরোধই একমাত্র কার্যকরী প্রতিরোধ বলে মনে করেন, কেন না দেশে সেই জাতীয় অহিংসার শক্তি বিদ্যমান ছিল না এবং ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষটা এতো বেশী দেশে ছিল, দেশ পরাধীন বলে, যে জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসী অন্তর দিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগতো না। গান্ধীজীও একথা বুঝতেন এবং বুঝতেন বলেই শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালের আন্দোলন বা আগস্ট বিপ্লবের আয়োজন করেন। কেন না তিনি বুঝেছিলেন, দেশ স্বাধীন না হলে স্বাধীনতার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে দেশবাসী লড়বে না।

এখানো আরো একটা প্রসঙ্গ একটু ছুঁয়ে যাওয়া দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগার সাথে সাথে বা তার পূর্বেই দেশে সংগ্রাম চেতনা খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এবং কংগ্রেসের চরমপন্থী লোকেরা গান্ধীজীর উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ দিতে থাকেন যে যথাসম্ভব শীঘ্র সংগ্রাম ঘোষণা করুন। গান্ধীজী এড়াতে থাকেন। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতি থেকে তাঁর সংগ্রামের আদর্শকে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করে ধরে দেওয়া তাঁর অহিংসা নীতির পক্ষে একটি অত্যন্ত জটিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কেননা তিনি জগত সভায় একথা বুঝাতে চান যে, ইংরেজদের দুর্দিনকে তিনি নিজের সুদিন মনে করলে তাঁর অহিংসা কলঙ্কিত হবে, আর দ্বিতীয়তঃ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লেগে যাওয়াতে একথা যেন প্রচারিত না না হয় যে কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট হিটলারের সহায়ক। কিতু তৃতীয়তঃ, আর একটি বিশেষ কারণে তিনি আরও বেশী দ্বিধা করে চলছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশে এমন অগ্নিময় ও বিশৃঙ্খলার শক্তি ঘনিয়ে উঠেছে যে যদি তিনি অহিংস সংগ্রামের হুকুম দেন তবে অচিরে তা সহিংস সংগ্রাম ও বিশৃঙ্খলায় পরিণত হবে। তাই তিনি বলতেন দেশ তাঁর মতে প্রস্তুত নয়।* অপ্রস্তুত এই অর্থে নয় যে দেশে আগুন জ্বলবে না, অপ্রস্তুত এই অর্থে যে তা অহিংস সত্যাগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। এইজন্যে দেশে যতই সংগ্রামের চাহিদা বেড়ে যেতে লাগলো, তিনি ততই অহিংসার উপর জোর দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্র জনতাকে অহিংসার শিক্ষা দিয়ে তৈরী করো, নচেৎ আমি সংগ্রামের ডাক দেবো না। বামপন্থীরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র অস্থির হয়ে উঠলেন এবং দেশে কিছু হবে না জেনে হতাশ হয়ে বিদেশে ইংরেজবিরোধী শক্তি-সমূহের সহিত সহযোগিতায় দেশ স্বাধীন করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু গান্ধীজী নড়ছেন না। কেন না তাঁর ১৯২২ সালে চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলন বন্ধ করে দেবার কথা মনে আছে। হিংসা ফেটে পড়েছিল বলে তিনি সেদিন সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য কম কৈফিয়ৎ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় নি। এবং আজ যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছেন যে ভারতবর্ষ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে, তখন তো তা হিংসায় ফেটে পড়বেই। অথচ লড়াই করা যে

* এই জটিল পরিস্থিতি অধিকতর পরিষ্কার করার চেষ্টা 'গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র' নামক অধ্যায়ে করা হয়েছে, যেখানে গান্ধীজীর পথ এবং সুভাষচন্দ্রের পথের তুলনামূলক বিচারের প্রচেষ্টা আছে।

প্রয়োজন, লড়াই না করলে যে সেদিনের অসহায় অবস্থা থেকে ভারতকে রক্ষা করার আর উপায় নেই, একথা তিনি যত অনুভব করতে লাগলেন ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি বিনোবা ভাবেকে ও কংগ্রেস নেতাদের শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে নামিয়ে দিলেন। জাতির যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের সাথে সাথে দেশে সুশৃঙ্খল সংগ্রাম গড়ে যাতে তোলা যায়, তারই পটভূমিকা সৃষ্টি করা সেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই সত্যাগ্রহ বিশেষ কার্যকরী জিনিষ হলো না—ইংরেজের পক্ষে আপোষের জন্য একটা চাপ সৃষ্টি হলো মাত্র। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ও ক্রিপস্-মিশন ব্যর্থ হলো। ওদিকে যুদ্ধের জন্য নানারকমের অরাজকতা ও দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে—জাপানী আক্রমণ ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে। তখন গান্ধীজীর একরকম চরম পরীক্ষার দিন। তখন তিনি ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি অন্তর থেকে চীৎকার করে উঠলেন আর নয়, যদি হিংসা আসে আসুক তার ঝুঁকি আমাকে নিতে হবে, আমি অহিংসার সংগ্রামই শুরু করবো—হিংসা আসবে বলে ভয় পেলে চলবে না। Dogmatic Ahimsa তাঁকে ছাড়তে হলো। বলতে হলো, "Leave us to God or anarchy but quit." বলতে হলো, অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠছে, এর চেয়ে যে কেন অবস্থা ঢের ভালো, 'Anarchy is better than this !' তারপরেই আগস্ট আন্দোলনের ডাক, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আহ্বান, Do or die-এর order। সংগ্রামের কৌশল ও দিনক্ষণ ঘোষণা করার আগেই সরকার গান্ধীজী ও কংগ্রেসর উপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন রাত্রির অন্ধকারে। দেশ বিক্ষোভে, বিদ্রোহে, হিংসায়, অহিংসায় মেতে উঠলো —যার নাম 'আগস্ট বিদ্রোহ'। গান্ধীজী জেল থেকে বেরিয়ে বললেন, আমাকে সংগ্রাম করতে দেওয়া হয় নি। আমাকে আমার মতো করে সংগ্রাম বা অহিংস উপায়ে সংগ্রাম চালাবার সুযোগ সরকারই দেয় নি। কাজেই দেশে যে হিংসা দেখা দিয়েছিল কংগ্রেসের দায়িত্ব তাতে কিছু নেই—দায়িত্ব সরকারের, ইত্যাদি। পণ্ডিত নেহরু সেদিন প্রতিবাদ করলেন, বললেন, জনতা যা কিছু করেছে ভালো হোক, মন্দ হোক তার দায়িত্ব কংগ্রেসের নিতে কোন কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করার কারণ নেই। কারণ পণ্ডিত নেহরুর অহিংসা বোধটা অতো নৈতিকতা দুরস্ত নয়। এবং কোন কংগ্রেস কর্মীরই নয়। কেন না তাঁরা অহিংসাকে কৌশল হিসেবেই প্রধানতঃ গ্রহণ করেছিলেন —নীতি বা Creed হিসেবে নয়। যা হোক, ঐতিহাসিক জওহরলাল নীতিবাগিশ গান্ধীর সংকোচ অনুভব করলেন—কংগ্রেস আগস্ট আন্দোলনের সমস্ত গৌরব বুক ফুলিয়ে গ্রহণ করে নিল। গান্ধীজী চুপ করে গেলেন—জওহরলালের দাবি বোধহয় শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। এখানেও আমরা দেখি গান্ধীজী নিজের নীতিকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারতেন। এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহেও শুদ্ধ অহিংসার কোন স্থান হয় নি।

তারপর কংগ্রেস, সরকার দখল করে অহিংসনীতির কোন প্রয়োগ করেন নি। তাঁরা প্রচলিত প্রথা মতো রাষ্ট্রযন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা এখনো ফাঁসী দেবার প্রথাটা পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে পারলেন না। জনতার উপর গুলি, গ্যাস চালানোর প্রথায়

তাঁরা অহিংস আদর্শের প্রতি বিশেষ কোন শ্রদ্ধা দেখান নি। এবং এমনও হয়তো মনে করেন যে সরকারী আসনে বসে কারো অহিংস থাকবার উপায় নেই অথবা প্রয়োজন নেই। দেশের অশান্তি, দাঙ্গা, ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদির প্রতি তাঁদের আচরণ ইংরেজ আমলের মতোই আমলাতান্ত্রিকতা, যান্ত্রিকতা ও Law and order-এর চিরাচরিত প্রথাসম্মত। রাষ্ট্রযন্ত্র চালনায় অহিংসার কোন স্থান আছে বলে তাঁরা স্বীকারই করতে চান না। অথচ গান্ধীজীর মত তা ছিল না। গান্ধীজী অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অহিংসার ক্ষেত্র রাষ্ট্রকেও দেখাতে হবে। সামাজিক অনেক প্রকার বিশৃঙ্খলা, এমন কি জেলের কয়েদী গুন্ডা-বদমায়েসদের সংশোধন করাতেও অহিংসার একটা নিজস্ব নীতি থাকা চাই। দেশ স্বাধীন করার জন্যই অহিংসা দরকার—উপায় হিসেবে মাত্র—কিন্তু স্বাধীন হলে অহিংসার কোন প্রয়োজন নেই—তাহলে অহিংসার কোন সময়ই দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, গান্ধীজীর কাছে অহিংসা মাত্র একটা উপায়ই নয়, লক্ষ্যও বটে—both means and end. পথ ও লক্ষ্য তাঁর কাছে আলাদা জিনিষ নয়। তিনি শুধু সংগ্রামেই অহিংসা চান তা নয়—তিনি এমন সমাজ চান যা অহিংস। ভবিষ্যত সমাজ সমাজতান্ত্রিক হবে, কি সর্বোদয় হবে, এ নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে কিছু লিখেছেন বা বলেছেন বটে—কিন্তু অহিংস সমাজ হবে, একথা তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজের মধ্যে ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, যদি সমাজ অহিংস হয় তবেই সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সর্বোদয় সম্ভব। আদর্শ-সাম্যবাদী সমাজও আসলে অহিংস সমাজ। অতএব যে মুহূর্তে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল তখন আর অহিংসার প্রয়োজন নেই, এই যাঁরা ভাবেন, তাঁরা গান্ধীজীর কিছুই বুঝতে পারেন নি। কাজেই গান্ধীজী যখন দেখতেন কংগ্রেস মন্ত্রীরাও পুরানো আমলাতান্ত্রিক ও জবরদস্তি ঢঙে আইন ও পুলিশের সাহায্যেই রাজ্য চালাতে চাইছেন, তখন তিনি ভীষণ দুঃখ পেতেন। তিনি বলছেন, "I am ashamed that our ministers had to call to their aid the police and the military. I am ashamed that they had to use the language that they did in reply to the opposition speeches *I feel as if the congress had lost and the British had won.* Why does our non-violence fail on such occasions? Is it the non-violence of the weak? Even the goondas should not move us away from our faith and make us say, 'We will send them to gallows or shoot them down.' They too are our countrymen. If they will kill us, we will allow them to do so. You cannot pit against organized violence the non-violence of the weak, but the non-violence which the bravest alone can exercise. We have, you will say, been sufficiently non-violent. We were non-violent during the civil-disobedience campaign, we received lathi blows and worse. My reply is this: We did, but not sufficiently. We could not get

independence at the end of the Dandi March, as ours was not the unadulterated non-violence of the bravest." (Non-violence in Peace and War—page 543)

"আমাদের কংগ্রেস মন্ত্রীরাও যখন শাসনকার্য চালাতে পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্য নেন তখন আমি লজ্জা পাই। আমি শুনে লজ্জা পাই যে মন্ত্রীরা ঠিক সেই জাতীয় ভাষাই ব্যবহার করেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে, যা তাঁরা চিরকাল ইংরেজ আমলাতান্ত্রিকদের কাছে শুনে এনেছেন। **আমি অনুভব করি যেন কংগ্রেস হেরে গিয়েছে—ইংরেজরাই আসলে জিতে গেছে।** কেন এসব অবস্থায় আমাদের অহিংসা ব্যর্থ হচ্ছে? গুন্ডারাও যেন আমাদের বিশ্বাস ও ধর্ম থেকে আমাদের হটাতে না পারে এবং আমাদের মুখ থেকে বলাতে না পারে যে আমরা গুন্ডাদের ফাঁসীতে লটকাবো বা গুলি করে মারবো। ওরা আমাদের স্বদেশবাসী। ওরা যদি আমাদের হত্যাও করে করুক, তবুও আমরা আমাদের নীতি বদলাবো না। আমাদের অহিংসা কি দুর্বলের অহিংসা? সঙ্ঘবদ্ধ হিংসার বিরুদ্ধে দুর্বলের অহিংসা কার্যকরী হতে পারে না—একমাত্র বলিষ্ঠের অহিংসাই দাঁড়াতে পারে। তোমরা বলতে আমরা অতীতে অনেক অহিংসা দেখিয়েছি, আমরা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় অহিংস ছিলাম। আমরা লাঠির আঘাত নীরবে সহ্য করেছি, আরো কতো কি নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার উত্তর এই, আমরা করেছি বটে কিন্তু যথেষ্ট করি নি। ডান্ডি অভিযানের পর আমরা স্বাধীনতা পাই নি, তার কারণ আমাদের অহিংসা বীরশ্রেষ্ঠদের নির্ভেজাল অহিংসা ছিল না।"

তবু যাই হোক, আন্দোলনের সময় অনেকটা অহিংসার প্রভাব ছিল কংগ্রেসের উপর। ক্ষমতা পাবার পর সেই প্রভাব চলে যাচ্ছে কেন? ক্ষমতায় আসীন হলে কি বিরোধীদের প্রতি অহিংস থাকবার কোন উপায় থাকে না? তিনি কংগ্রেসের শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "It should seek to meet the violence of the individuals not with the organised violence called punishment, but with non-violenee in the shape of friendly approach to erring individuals and through the cultivation of sound public opinion against any form of violence. In other words, the Congress will rule not through the police backed by the military but throught its moral authority based upon the greatest goodwill of the people. It will rule not in virtue of authority derived from a superior armed power but in virtue of the service of the people whom it seeks to represent in everyone of its action......the Ministers, who may find violence, hatred or obscenity in their provinces will look to the Congress organisations and ultimately to the Working Committee for active and efficient help before they resort to the process of criminal law and all it means. Indeed the triumph of the Congress will be

measured by the success in achieves in rendering the police and the military idle. (Mahatma Vol.—IV, page 226)

"কংগ্রেস সরকার কখনো ব্যক্তি বিশেষের হিংস্র কাজের বিরুদ্ধে সাজা নামক সংগঠিত দলবদ্ধ রাষ্ট্রীয় হিংসার প্রয়োগ করবে না। বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা ও অহিংস ব্যবহারের দ্বারা সুস্থ জনমত সৃষ্টি করে অন্যায়কারীদের এবং ভ্রান্তবুদ্ধির লোকেদের সংশোধন করবে। অর্থাৎ সৈন্য ও পুলিশের জোরে কংগ্রেস রাজ্য চালাবে না, চালাবে তার নৈতিক সমর্থন দিয়ে—যে সমর্থন আসবে অধিকাংশ লোকের শুভকামনা থেকে। কোন সশস্ত্র শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস ক্ষমতা পায়ও নি এবং তার ক্ষমতা সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে প্রকাশও করবে না—জনগণকে সেবার জন্য প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের প্রতি গণসমর্থন ফুটে বেরোবে।…… মন্ত্রীরা যখন দেখবেন যে তাঁদের প্রদেশে মারামারি, হিংসা, দুর্নীতি বেড়ে চলেছে তখন তাঁরা কংগ্রেস সংগঠন ও কর্মীদের সাহায্য চাইবেন—শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সক্রিয় সাহায্য চাইবেন। তাঁদের সাহায্য পাওয়ার পরেও যদি দরকার হয়, তখন তাঁরা ফৌজদারী আইন ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাদির সহায়তা নিতে পারেন—তার পূর্বে নয়। (অর্থাৎ কংগ্রেস একমাত্র তার সরকারী শক্তি দিয়ে চলবে না, তার বেসরকারী জনসেবার ও গণআন্দোলনের ঐতিহ্যটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তারই সাহায্যে অনেক কাজ করতে হবে কেবল মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা দিয়ে নয়। (লেখক) পুলিশ ও সৈন্যের প্রয়োজন যত কমিয়ে দিতে পারবে, ততই কংগ্রেস সার্থক হলো বলতে হবে।" কিন্তু আমরা আজকাল কি দেখি? পুলিশ ও সৈন্যখাতে ব্যয়টা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। স্বাধীন ভারতে পুলিশের সংখ্যা বোধহয় দশগুণ বেড়ে গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, গান্ধীজীর অহিংসা রাষ্ট্রকার্যে আজ থোড়াই ব্যবহৃত হয়।

আর কংগ্রেসের ভিতরকার হিংসা সম্বন্ধেও গান্ধীজী কম সচেতন ছিলেন না। এখানে দলাদলি, হিংসা, প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতার যে চিত্র তিনি দেখতেন, তাও তাঁকে শংকিত করে তুলতো। তিনি বলেছেন, "Moreover one finds today violence resorted to by rival Congressmen at Congress meetings. The gross indiscipline and fraud practiced at Congress elections are illustrations of Congress violence." (Harijan, 21. 10. 39) "তাছাড়া কংগ্রেসকর্মীদের সভাগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আজকাল হিংসা ও মারামারি করতেও দেখা যায়। কংগ্রেস নির্বাচনের সময় অনেক রকমের দুরাচার ও বিশৃঙ্খলা দেখি, যেগুলি কংগ্রেসের ভিতরকার হিংসার পরিচায়ক।"

যাক, এতক্ষণে আমরা গান্ধীজীর নিজের ভাষ্য থেকেই দেখতে পেলাম যে সত্যিকার শুদ্ধ অহিংসা কোনদিনই তেমনভাবে দেখা দেয় নি, দেশ একমাত্র অহিংসার সাহায্যেই স্বাধীন হয় নি এবং অহিংসাই দেশ স্বাধীনতার প্রধান কারণও হয়তো ছিল না। অন্যান্য শিষ্যরা যে দাবিই করে থাকুন, গান্ধীজী নিজে অহিংসার এতটা দাবি কর্মক্ষেত্রে সমর্থন করতে দিতে নারাজ। দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য এবং সে স্বাধীনতার জন্য একমাত্র অহিংসাই সমস্ত বাহাদুরী নিতে পারে না। যাঁরা সোজা-

সুজি এবং প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদেরও একটা অংশ এর মধ্যে আছে। সুভাষবাবুর মতো যোদ্ধাদের দানও কিছু সামান্য নয়। বামপন্থীদের দান নেই একথাও বলা যায় না। তাছাড়া বিশ্বপরিস্থিতির অনুকূলতাও ভারতের স্বাধীনতা পাওয়াতে সাহায্য করেছে। রুশ বিপ্লব, চীনবিপ্লব, এশিয়ার জাগরণ, ফ্যাসীবাদের ধ্বংস, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা—এগুলিও ভারতকে স্বাধীন হবার পথে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আর সবার উপর রয়েছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, যে সংগ্রামের প্রতীক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। অন্যান্য অনেক শক্তি এই স্বাধীনতার ব্যাপারে নিযুক্ত থাকলেও, একা গান্ধীজীর দান সবার যোগফলের চেয়েও বোধহয় বেশী—নেতৃত্বের দিক থেকে। কিন্তু এটা কি অন্যায় দাবি নয়? একেবারেই নয়। যদিও আমরা দেখেছি গান্ধীজীর শুদ্ধ অহিংসাই সবটা ছিল না, তথাপি একথা বললে মস্ত ভুল হবে যে অহিংসাই হলো গান্ধীজীর একমাত্র দান। গান্ধীজী সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলেন—হিংসা-অহিংসা, গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক, গঠনতান্ত্রিক যতরকমের জাগরণ আমরা দেখেছি তার প্রত্যেকটি শক্তি আলাদা আলাদাভাবে এবং সমগ্রভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বের মধ্যেই কমবেশী সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি সুভাষবাবুর আনুগত্যও গান্ধীজীর প্রতি কম ছিল না। আজাদহিন্দবাহিনীও ভারতের পিতা গান্ধীজীর নাম করেই সংগ্রামী অভিনন্দন করতে দ্বিধা করতো না—এবং গান্ধীজীও বিপ্লবীদের কখনো ত্যাগ করতে পারেন নি।* মডারেটরাও তাঁর কথা না শুনে পারতেন না। ভারতের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, সে জনসেবাই হোক, রাজনীতিই হোক, নারীআন্দোলনই হোক, হরিজন আন্দোলনই হোক, কুটিরশিল্পের রক্ষাই হোক—যা কিছু হোক, সবটার মধ্যে গান্ধীজীর হাত ছিল। জাতীয় জাগরণের প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁর হাত ছিল। সমগ্রভাবে জনতার বৃহৎ ছবিটা, এক প্রাণ এক জাতির বাস্তব মূর্তিটার কাঠামোটা তিনিই তৈরী করে যান। গান্ধীজীই যে ভারতবর্ষ—একথা বিদেশীরাও জানতেন। এ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ধর্মপ্রচারক—কেউ তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন নি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ—সব কাজই শুরু করে দিয়ে গেছেন। কেবল রাজনৈতিক দিকেই নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দান স্পষ্ট। যারা তাঁকে দেখতে পারতো না, তাদেরও স্বার্থ তিনি অবহেলা করতেন না, যারা তাঁকে বিদ্রূপ করতো, তিনি তাদেরও অবহেলা করেন নি। সত্যিকার অর্থেই বলা যায় He was the father of the nation। কেবলমাত্র অহিংসাই তাঁর দান, এই জাতীয় যুক্তি এবং যেহেতু ভারতীয় জীবনে আজ অহিংসা কোথাও কায়েম নেই কাজেই গান্ধীজীর কোন দানই নেই—এই জাতীয় যুক্তি হাস্যকর। গান্ধীজীকে একটা sect বা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা মনে করলে মস্ত ভুল হবে। তিনি ছিলেন ভারত ইতিহাসের এক অপূর্ব সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতীক—যাঁর ভিতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে। গান্ধীজী নিজেও জানতেন অহিংসা তাঁর জীবনের একটা মূল মন্ত্র হলেও ওটাই তাঁর একমাত্র দায়িত্ব

* 'গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নয়। যদি অহিংসাকে সবচেয়ে বড় কথা ও শেষ কথা বলে তিনি ধরে রাখতেন তবে গান্ধীজী তাঁর পরবর্তী নেতার পদে জওহরলালকে নিযুক্ত না করে হয়তো কোন বিশিষ্ট ও গোঁড়া গান্ধীবাদীকেই নিযুক্ত করে যেতেন।* Jawaharlal is my successor বলার মধ্যে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা গুলিই প্রকাশ পেয়েছে। অথচ জওহরলাল কোনকালেই অহিংসবাদী নন—ভগবানভক্ত তো একেবারেই নন। গান্ধীজী রাজাগোপালাচারী বা বিনোবা বা রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পরবর্তী নেতা নিযুক্ত করে যান নি, যদিও অন্যান্য দিক দিয়ে তাঁরা গান্ধীজীর আরও নিকটে ছিলেন। গান্ধীজীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁকে বোঝার মত অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি দিয়েছিল যে এটা ভারতের ইতিহাসকে অগ্রগামী করার বাহন আজ জওহরলালের মধ্যে যতটা আছে, অন্যদের মধ্যে ততটা নেই। অবশ্য জওহরলালকে নেতৃত্বে আসীন করে দিয়ে গান্ধীজীর অহিংসা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এমন মনে করার কারণ নেই। অহিংসা পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়েছে, এধরনের উক্তিও হাস্যকর। Practical idealist হিসেবে গান্ধীজীকে হয়তো কোন কোন বিষয়ে compromise বা আপোষ করে নিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করে দেখি তবে বুঝতে পারবো গান্ধীজীর অহিংসা মুছে যায় নি বা মুছে যাবার কোন লক্ষণ নেই। হিংসার ও প্রতিহিংসার ও কদর্যতার যত ছবিই দেখি না কেন—ভারতের সম্মুখে আজ আদর্শের এমন উজ্জ্বলতা এলো কোথা থেকে? ভারতীয় বৈদেশিক নীতিতে পঞ্চশীলের ও শান্তির আবেদন এলো কোথা থেকে? এর বীজ গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন থেকেই এসেছে—জওহরলাল তার ধারক মাত্র, সৃষ্টিকর্তা নন। আজকাল ভারতীয় রাজনীতিতে জনসাধারণের দাবি সর্বাগ্রগণ্য—এই কথা এলো কোথা থেকে, কার জোরে এটা এতো সহজে স্বীকৃত হলো? নীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র এত সহজে ভারতে কি করে স্বীকৃতি পেয়েছে? এ সমস্তের গোড়ায় গান্ধীজীর যে দান আছে তাকে ভুললে চলবে না। গান্ধীজী আমাদের চরিত্রের ছাপ ও আদর্শ তৈরী করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনের মোড় গণমুখী করে দিয়ে গেছেন। অহিংসার মধ্যকার spirit বা causeটার গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে হবে। কি spirit আজ চলছে? এই spirit of modern India কোথা থেকে এতো ঔজ্জ্বল্য এবং মহিমা অর্জন করেছে? এই spirit-এর বাস্তব realisation অবশ্য

* জওহরলালকে পরবর্তী নেতা বলে বলে দেওয়াতে গান্ধীজীর অহিংসা বর্জন হলো, এমন বলা যায় না। হয়তো গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও সভ্যতা সম্বন্ধে ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, কিন্তু হিংসাবাদের সমর্থন করা হলো না। নেহরু নেতৃত্বে পঞ্চশীল, সহাবস্থান ও শান্তিনীতির প্রচেষ্টা দেখা যায়, যদিও আজ সেই পঞ্চশীল ও সহাবস্থাননীতি বিপন্ন তথাপি অহিংসা ও শান্তি ছাড়া যে মানুষের মুক্তি নেই সেই প্রত্যয়ও অনেক বেশী। কিন্তু যে ধরনের সভ্যতা অর্থাৎ বিকেন্দ্রিত স্বাবলম্বী অর্থনীতি ও সংযত জীবনচর্যা ভিন্ন ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকতে পারে না, সেই বিশ্বব্যাপী প্রশ্ন আজ উপস্থিত আমাদের জন্যও এবং সকলের জন্যও। "গান্ধী—গবেষণা" যখন ৩০ বছর পূর্বে সমাপ্ত করি, জেলখানায়, তখন এসব বৃহত্তর ও গভীরতর সমস্যাগুলি পরিষ্কার হয় নি। ফলে জওহরলাল সম্বন্ধে আমার সেদিনকার সমস্ত চিন্তা চেতনা ও বিচার আজকের কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় নি। এ সম্বন্ধে 'গান্ধী ও ইতিহাস' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

অনেক দূর—কিন্তু We have been possessed by the spirit.

হিংসার সাহায্যে যারা বিপ্লব করতে চায় তাদেরও একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এঙ্গেলসের কথা থেকে বলছি—Engels German Ideology বইখানার ভূমিকায় লিখেছেন……"Let us have no illusion about it ; a real victory over the military in the street fighting, a victory as between two armies, is one of rarest exceptions. But insurgents also counted on it just rarely. For them it was solely a question of making the troops yield to noral influences. Hence the passive defence is the prevailing form of fight. The attack will rise here and there, but only by way of exception. অর্থাৎ আমাদের এ বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নয়ঃ বিপ্লবী জনতার পক্ষে রাস্তার লড়াইতে সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে দেওয়া, যেমন একজন সৈন্য অপরদলকে পরাজিত করে—এমনি ধরনের জয়ে বিপ্লবীরাও খুব বেশী ভরসা করে না। তাদের কাছে সৈন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যে যে নৈতিক আবেদন ও জাগরণ আছে, যাতে সৈন্যরাও মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়, সেইটাই তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য। আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধটাই বিপ্লবে সাধারণ ঘটনা—কদাচিৎ কখনো তা আক্রমণের স্তরে উঠতে পারে এখানে সেখানে—কিন্তু তা কেবল ব্যতিক্রম হিসেবেই ধর্তব্য।

তিনি আরও বলেছেন, "Even in the classic time of street fighting, therefore, barricade produced more of a moral than of a material effect. It was a means of shaking the steadfastness of the military. If it held out until this was attained, then victory was won ; if not, there was defeat. This is the main point, which must be kept in view, likewise, when the chances of contingent future street fights are examined. Engels—"Introduction to Class Struggle in France."

এর সহজ ও সরল অর্থ এই, যখন কোন বিদ্রোহী জনতা সৈন্য ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে যায় বা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে লড়াই করতে চায় তখন তারা যে শক্তি বলে' সৈন্য ও পুলিশকে হারিয়ে দিতে পারে তা নয়। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ একটা অপূর্ব মনোবল সৃষ্টি করে এবং শত্রুর মাথা নত করিয়ে দিতে সাহায্য করে। এর নৈতিক দানটাই বা psychological ferment-টাই বড় কথা, physical strength-টা নয়। দেখা যায় জনতা যখন সংগ্রামে অস্ত্র হাতে নিয়েও এগিয়ে আসে তখনও দক্ষতা ও কৌশলের দিক থেকে তারা কত কাঁচা, কত সহজেই না শিক্ষিত সৈন্যদল তাদের কতলোককে ঘায়েল করে ফেলে। কিন্তু তথাপি এই জাতীয় সংগ্রাম বৈপ্লবিক চেতনা ও আদর্শের ঔজ্জ্বল সৃষ্টি করে, যার ছোঁয়াচ সৈন্য ও পুলিশের উপরে পড়তে বাধ্য হয়। এর অর্থ, এই সশস্ত্র বিপ্লবেও অস্ত্রবলটা বড় কথা নয়—নৈতিক বল ও আদর্শ বা sprit of cause কত শক্তিশালী হলো তারই উপর বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর করে—হাতাহাতি বা গায়ের জোরের হিসেব নিকেশ দিয়ে নয়। এঙ্গেলস এইজন্যই গায়ের

জোরের শক্তি সম্বন্ধে কোন illusion না রাখতে বলেছেন।

গান্ধীজীর অহিংসাও সেই নৈতিক শক্তি জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ ভীরু, দুর্বল, নারী ও শিশু—রাজকর্মচারী, পুলিশ, সৈন্য —সকলের বুকে তাঁর অহিংসা অপূর্ব জাগরণের পরশকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। যারা সহিংস পন্থায় বিশ্বাসী, তাদের বুকেও তিনি সাহস এনে দিয়েছিলেন। ঐ ব্যাপক জাগরণ তাঁর অহিংস আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তার বিকাশ সর্বত্র অহিংস ছিল ন। তাছাড়া ভারতের cause-টাকে তিনি অহিংসার সাহায্যে এমন সুন্দরভাবে পৃথিবীর দরবারে উপস্থিত করে দিয়েছিলেন—ভারতের প্রতি অত্যাচারটাকে সকলের চক্ষে ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা পর্যন্ত দিনকে দিন বিচলিত ও লজ্জিত হয়ে উঠেছিল, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সময় বিলেতে বিশেষ কোনই বাধা ঘটে নি। হিংসার পথে গেলে এত সহজ সমর্থন পাওয়াসব হতো না। অতএব অহিংসার কোন দান ছিল না একথা বলা ভুল। তাছাড়া একথাটাও মনে রাখতে হবে দেশবাসী কার্যতঃ অহিংসা দেখাতে না পারলেও গান্ধীজী নিজেই তা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত জাতীয় জীবনে অনেকদিন পর্যন্ত একটা প্রভাব রেখে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। গান্ধীজীর জীবন ও চরিত্র অহিংসার দ্বারা তৈরী, একথা বলা যেতে পারে এবং তাঁর জীবন, জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে কতটা সাহায্য করেছে তার সত্যিকার হিসেবনিকেশ আজও চলেছে।

এখানে একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে যেতে পারে। সহিংস সংগ্রামের সাহস বড় না অহিংসার সাহস? এ-জাতীয় তর্ক উঠতে পারে, কেন না সাহস দুয়েরই উপাদান। কাদের সাহসটা বেশী effective সেটাই বড় প্রশ্ন—সাহসের বড়াইটা নয়। ফলাফল দিয়েই বিচার হবে এদের গুণাগুণ। গান্ধীজী বলতে চান, অহিংসার সাহস বেশী ফলবান ও দীর্ঘস্থায়ী। কেন না অহিংসার সাহস যে অহিংস, তাকেও যেমন মহান করে, যে বিপক্ষ, অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে অহিংসা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাকেও সংশোধিত হতে, বিবেকবুদ্ধি ফিরিয়ে পেতে ও মহান হতে সাহায্য করে। সহিংস সাহস শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়, অহিংসা শত্রুকে ধ্বংস করতে চায় না, ভয় পাইয়ে দিতে চায় না—অহিংসা সকল মানুষ যে মূলতঃ এক—এই সূত্রটাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। অহিংসা তাই শত্রুকে শত্রু বলে মনে করেনা। সত্য, প্রেম ইত্যাদি overriding qualities of heart বা চিত্তের মহান গুণগুলি দিয়ে অহিংসার সাহস নৈতিক শক্তি অর্জন করে। কিন্তু যারা বিপ্লবী, তাদের চরিত্রেও যে এসব নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন, একথাও কেউ অস্বীকার করবেনা। কিন্তু যেভাবে অহিংসার সংগ্রামকে যোজনা করা হয় তাতে অহিংস সংগ্রামীর উদ্দেশ্যকে শত্রু-মিত্র কারো পক্ষেই সহসা ভুল বুঝবার আশংকা কম। হিংসার সংগ্রামে মানুষের মত্ততা ও তিক্ততা এতো বেড়ে যায় যে বিপ্লবীর উজ্জ্বল আদর্শের মহিমা শত্রুপক্ষের লোক বুঝতে পারে না, বা বুঝতে চায় না। এজন্য বিপ্লবীদের কম বেগ পেতে হয় না। অথচ justness of their cause বা তাদের আদর্শের যুক্তি-যুক্ততা ও ন্যায্যতা যদি

শত্রুপক্ষের উপর না পড়ে, তবে শত্রু পক্ষের বিরোধিতার জোর কমে না। এইজন্য বিপ্লববাদীদেরও fraternisation-এর উপর এত লক্ষ্য রাখতে হয়। সংগ্রামের ন্যায্যতা সংগ্রামকে জয়ী করে থাকে শেষপর্যন্ত—কিন্তু সংগ্রামের শক্তি দুর্বল হতে থাকে যদি তার পিছনে ন্যায্যতার বা নৈতিক বলের সমর্থন কম পড়ে যায়। গান্ধীজী সংগ্রামে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তার মানে তাঁর সংগ্রামের ন্যায্যতা দেখাতে চান, কাজেই তিনি এমন তিক্ততাশূন্য উপায়ে তাঁর দাবি ও বক্তব্য উপস্থাপিত করেন এবং সংগ্রামটাকেও এমনভাবে এবং এমন কায়দায় চালু করতে চান, যাতে সংগ্রামের মধ্যেও তিক্ততা সৃষ্টি না হয়, কাজেই তাঁকে অহিংসার পথ নিতে হয়েছে। শত্রুর গায়ের জোরটা তাঁর লক্ষ্য নয়, শত্রুর অন্তরটাই তাঁর লক্ষ্যস্থল। ফলে তিনি মনে করেন, অহিংস সংগ্রামের যে সাহস তা বেশী ফলপ্রসূ—এবং তা শত্রুর গায়ের জোরকে পরাজিত করার উপর যেহেতু নির্ভর করে না, সেহেতু তা দীর্ঘস্থায়ী। কেন না শত্রুর গায়ের জোরটা আজ হয়তো জব্দ করা গেলো, কিন্তু কাল সে প্রতিশোধ নেবার জন্য তেমনি বর্বরতার সাথে পুনরাক্রমণ করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? যেমন জার্মানীকে বারবার পরাজিত করা হলো, কিন্তু জার্মানী প্রতিশোধ নেবার জন্য বারে বারেই চেষ্টা করে চলেছে—এর শেষ কোথায়? কাজেই গান্ধীজীর যুক্তি হলো, এই অহিংস সংগ্রাম নিজেদের ও শত্রুদের—উভয়েরই মহান পরিবর্তন ঘটিয়ে এক সত্যিকার সমানাধিকারের উপর মিলিত করবে এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে।

কিন্তু এখানে একটা মস্ত কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। বিপ্লবীরা ও গান্ধীবাদীরা উভয়েই সাহসের কারবার করছেন—ভীরুতার কোন দরকার কারোরই নেই। কিন্তু ভীরু লোকেরসংখ্যাই তো বেশী। অতএব ভীরু লোকেদের যদি বাদ দেওয়া যায় তবে কি সহিংস কি অহিংস, কারো দলই তেমন কিছু করতে পারবে না। অতএব কার সাহস কত বড়, এবং কার সাহস কত কার্যকরী এ প্রশ্নের জবাবও নির্ভর করছে কার সাহস কত বেশী ভীরুলোকেদের মনোবল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে তার উপর। অহিংসা যদি ভীরুদেরও একদিন সাহসী করতে না পারে তবে অহিংসা ব্যর্থ হলো আবার অস্ত্রবলে বিশ্বাসী বিপ্লবীর সাহস যদি ভীরুদের সাহসী করতে না পারে তবে তাদের সাহসও ব্যর্থ হলো। কথাতো এই নয় যে সমাজে অনেক সাহসী লোক আছে, তাদের বেছে নিতে হবে। সমস্যা এই যে, সমাজে সাহসী লোক অতি বিরল—অর্থাৎ একটা পরাধীন, পতিত সমাজে সাহসের বড়ই অভাব। কাজে সবাইকে, ভীরুদেরও, সাহসী করে তুলতে হবে—এই হলো সমাধান। বিপ্লবীরা যদি মনে করে যে নিরস্ত্র লোকেদের অস্ত্র যোগাড় করে দিতে পারলেই সাহস হয়, তবে সেটা ভুল। অস্ত্র ধরতে পারে এমন সাহস জনতার আসে তখনই, যখন তারা তাদের উদ্দেশ্য বা দাবির ন্যায্যতা বুঝতে পারে, যখন তারা সত্যি সত্যি সাহসী ও সচেতন (conscious) হতে পারে। অবশ্য এই বুঝবার, এই নৈতিক সমর্থন পাবার সাহায্য হয়তো অস্ত্র হাতে পেলে ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু শুধু অস্ত্রবলই বিপ্লবের বল নয়—বরং সেটা গৌণ, আসল হচ্ছে আদর্শ, সচেতনতা, মনোবল, চেতনা ও নৈতিক শক্তি। তবে তারামনে করে এই চেতনা ও নৈতিকশক্তি শারীরিক শক্তির সাহায্যেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাজেই

তারা অস্ত্রকে সাহস সঞ্চারের কাজে লাগাতেচায় এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে অস্ত্র হাতে পেলে অনেকেই সাহস অনুভব করে, এবং অস্ত্রহীন হয়ে পড়লে অনেকেই দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই পৃথিবীর বিপ্লবীরা অস্ত্রের প্রয়োজন স্বীকার করেছিলেন, সাধারণের সাহস সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু গান্ধীজী মানুষকে অস্ত্র ছাড়াও সাহসী করা যায়, এমন ধরনের বিশ্বাস করতেন। অহিংসারও একটা training বা শিক্ষানবিশী আছে। গঠনমূলক কাজ ও সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে মানুষকে অহিংসার সাহস দেওয়া যায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং সেভাবেই তিনি অহিংসার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং একথাও ঠিক, গান্ধীজী ভারতের আপামর জনসাধারণকে যতটা সাহসী হতে শিখিয়ে গেছেন ততটা অন্যরা পারে নি। কিন্তু গান্ধীজীর এই দান শুধু অহিংসার সাহায্যেই একথা আমরা পূর্বেই দেখেছি, ঠিক নয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় জাগরণের নেতা হিসেবেই তিনি সাহসের সৃষ্টি করেছিলেন—তবে তার মধ্যে একথাটাও স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় সংগ্রাম অহিংসার দ্বারা গঠিত না হলেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

এতক্ষণ এতো ভাবে সাহস কথাটার উপর এতো জোর দেওয়াতে কেউ যেন মনে না করেন, শুধু সাহসই বুঝি অহিংসা, এবং হিংসা ও অহিংসা যেহেতু উভয়েই সাহসের সাধনা করে তবে বুঝি তারা এক। তা কিন্তু নয়। হিংসার সাহস ও অহিংসার সাহসে পার্থক্য আছে—পার্থক্য আছে অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জীবন সম্বন্ধে ধারণা ও ব্যবহারের ভিন্নতা থেকে। অহিংসার মধ্যে সত্য, প্রেম ইত্যাদি যেসব মানসিক গুণ আছে, তাদের মোটেই তুচ্ছ করলে চলবে না। কিন্তু তাই বলে প্রেমই অহিংসার একমাত্র শক্তি, একথা মনে করলেও ভুল হবে। যেমন কেউ কেউ মনে করেন গান্ধীজীর বহু পূর্বে এই বাংলাদেশে অহিংসার ব্যবহার করে গেছেন শ্রীচৈতন্য। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রেমের সাহায্যে জয় করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্য ও গান্ধীর প্রেমে ঢের পার্থক্য। গান্ধীজী পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে লড়াই করেছিলেন—সেটা ঠিক প্রেম বিতরণ নয়। রাজনৈতিক সংঘাত ও প্রতিরোধ এনেছিলেন তিনি দেশে—লক্ষ লক্ষ সাধারণ, ম্রিয়মাণ জনতার বুকে সাহস ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছিলেন। গান্ধীজী ছিলেন একজন সেনাপতি—প্রেমপাগল বৈরাগী নন। যদিও গান্ধীজীর মধ্যে বৈষ্ণবসুলভ প্রেমের প্রভাব খুবই ছিল, যদিও গান্ধীজী একজন ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি শুধু তাই ছিলেন না। তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে ইতিহাসে ঠাঁই পাবেন বা পেয়ে গেছেন। গান্ধীজীর প্রতিদিনকার জীবনের সাথে যাঁরাই সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই জানেন যে তিনি কত মধুর ব্যবহার করতেন, কত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিল তাঁর প্রতি কাজে, শিশুর মতো সরলতা ছিল ও অফুরন্ত উৎসাহ দেবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষ কখনো ভুল করতে পারতো না যে এই মৃদুভাষী, সুন্দর হৃদয়ের লোকটির ভিতর ভিসুভিয়াসের শক্তি পুঞ্জিভূত হয়ে আছে—mighty passions যাকে বলে, তা তাঁর বিশাল হৃদয়ে উত্তাল সমুদ্রের মতো নিঃশব্দ বিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই অনুভূতি নিয়ে সবাইকে ফিরতে

হয়েছে। সকলেই বুঝতো যত হাসাহাসি, তামাসাই তিনি করুন, এই লোকটির মধ্যে অহরহ বিরাট এক শক্তি খেলা করে চলেছে। তাঁর কাছে বসলে মনে হতো যেন এক শান্ত সমুদ্রের কূলে বসা গেছে। অন্য কোন রকম হওয়াই সম্ভব নয়—কেন না সমস্ত ভারতের অপমানিত আত্মা তাঁর ভিতরে প্রকাশিত হয়েছে, অগণিত লোকের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐ বক্ষে আলোড়ন করে চলেছে। গান্ধীজী একজন ব্যক্তি ছিলেন না—তিনি ছিলেন ভারতবর্ষ। বহু বছরের সাধনা ও সেবার দ্বারা তিনি নিজেকে ভারতের আত্মার সাথে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। কাজেই ভারতের নির্যাতিত মানুষের প্রত্যেকটি অপমান, প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি আঘাত তাঁকে বিক্ষুব্ধ, বিচলিত করে তুলতো। এতো সিরিয়াস্ লোক কমই দেখা যায়। কেন না তাঁর দায়িত্বটাও সবার চেয়ে ছিল বেশী। দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে মহাত্মা বলে জয় জয় করছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল—এসব তিনি মজার জিনিষ বলে মনে করতেন না। তিনি বুঝতেন, এর দায়িত্ব কত কঠিন, কত সাংঘাতিক। কাজেই কত রাত্রি তাঁর বিনিদ্র কেটে গেছে, তার হিসেব নেই। উত্তেজনা, উদ্বেগে তাঁকে খুব ভুগতে হয়েছে, যদিও তিনি গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ লোক হবার জন্য প্রতিদিন সাধনা করে এসেছিলেন। লোকের ধারণা হয়তো তাঁর রাগ ছিল না—কিন্তু তিনি ভয়ংকর রাগী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর মনোবিক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইতো, কিন্তু সাধারণ লোকের মতো তা চীৎকার, মুখবিকৃতি বা epileptic fit-এ শেষ হয়ে যেতো না। তিনি মহতী ভাবাবেগগুলিকে (mighty passions) সংযমের বাঁধনে বেঁধে উচ্চতম পথে নিয়ে যেতেন, যাকে শোধন বা sublimation বলা হয়। ক্ষণিকের বিস্ফারণে বা দুর্ব্যবহারের মধ্যে ক্ষোভ ফুটে বেরোতে দিতেন না। যখন কোন কিছু করার নেই, যখন তাঁর মনে হয়েছে কোনও পথ পাচ্ছেন না, সংগ্রামের জন্য—তখন তিনি প্রায়ই অনশনের আশ্রয় নিতেন। তাঁর দুরন্ত বিক্ষোভ অনশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে শান্ত সমাহিত রূপ গ্রহণ করতো। অতএব এই জাতীয় লোককে চৈতন্য, যীশু বা টলস্টয়ের সাথে এক গোত্রের লোক বললে ভুল হবে—যদিও তাঁদের কোনো কোনো গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি একবার বলেছেন – "But in life's battle, there is such a thing as mute submission to many a wrong. If it is deliberate, it generates strength which, if the submission is well-conceived, may well become irresistible." (Mahatma, Vol. V, page—375.) অর্থাৎ "জীবন সংগ্রামে নানা রকমের সমস্যা মুখ বুঁজে অনেক ক্ষেত্রে সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু যদি সে সহ্য করাটা স্বেচ্ছাকৃত ও সুচিন্তিত হয় তবে তা একদিন দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হতে পারে।" একথা বলা যায় যে গান্ধীজীর সংযম তাঁকে অপরিসীম শক্তি যুগিয়েছিল। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "Violence is an exhibition of anger and any such exhibition is dissipation of valuable energy. Subduing one's anger was storing up of national energy, which, when set free in an organised manner would produce astounding results." (Young India—4. 8. 20—

p. 126) ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হলো হিংসা এবং এই জাতীয় বহিঃপ্রকাশ মূল্যবান শক্তির অপচয় মাত্র। ক্রোধকে সংযত করা মানে জাতীয় শক্তি সঞ্চয় করা—একদিন সুশৃঙ্খল উপায়ে তার মুক্তি দিলে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যাবে।" এইভাবেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ও ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্ষীণজীবী, স্বল্পজীবী লোক ছিলেন না। যেদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় এক শ্বেতাঙ্গ তাঁর ঘাড় ধরে রেলের কামরা থেকে বের করে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই তাঁর এই সংযমের শক্তি সঞ্চয় হতে থাকে, যার শেষ পরিণাম দেখি ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রস্থানে। সেই ইংরেজ সেদিন গান্ধীজীকে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করে সাম্রাজ্যবাদের পতনের বীজ পুঁতে দিয়েছিল, একথাও হয়তো ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন। গান্ধীজীর জীবনে আবেগের স্থান যে কতো ছিল, নির্মলবাবুর বইতে (My Days with Gandhi) তার একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। তাঁর নীরবতাও যে কত ভয়ংকর ছিল, তা তাঁর সহকর্মীরা ও সরকার উভয়েই জানতেন। কিন্তু তাঁর এই সাহসিকতা ও বিদ্রোহী মনটাকে আরও একটা শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতো—সে হলো তাঁর overriding love for mankind। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম ভালবাসা—ফলে তাঁর নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য অহরহ সাধনা ছিল, ফলে তাঁর ক্রোধ কুৎসিৎ ও বীভৎস রূপ নিত না, তার শক্তি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতো।

তিনি বলেছেন, জীবনে তিনি অনেক বিষয়ে অনেকবার ভুল করেছেন, ভুল করে করেই তিনি শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর পথে আসতে পেরেছেন, এখনও তিনি জানেন না শুদ্ধতম পথ কী? অহিংসার মতো অদ্ভুত লড়াই—যা সম্পূর্ণ এক নতুন গবেষণা বা experiment—তাতেও ভুল হয়েছে অনেকবার—যেমন রাজকোটের জায়গীরদার ঠাকুরসাহেবের বিরুদ্ধে অনশনের বেলায়। ঠাকুরসাহেবকে প্রজাদের দাবি মানাবার জন্য তিনি বড়লাটের সাহায্য নিয়েছিলেন অনশন করে—একথার দুর্বলতা তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারতেন না। তিনি বুঝলেন, অনশন—যা তাঁর শেষ অস্ত্র, তাকে এক্ষেত্রে তিনি কলুষিত করেছেন, কেন না ঠাকুরসাহেবকে জব্দ করতে তিনি বড়লাটের সাহায্য নিয়েছেন। নিজের ভুল বুঝে তক্ষুনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য বেশ কয়েকদিন আবার আত্মশুদ্ধির অনশন করেছিলেন। নিজের অপরাধকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতেন না। যাই হোক, অহিংসা এভাবে নানা ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, এই ছিল তাঁর ধারণা। ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস অহিংস হয়েছে, মোটামুটিভাবে এই ভ্রান্তিও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ কটি দিন তিনি দিনরাত শুধু এই আক্ষেপই করে গেছেন যে লোকেরা অহিংসার আড়ালে কাপুরুষতা বা নোংরা হিংসা পোষণ করতো। তিনি বুঝে গেছেন যাবার আগে, যে তাঁর আরও বেশী কড়া নজর রাখা উচিত ছিল, আরও কঠিন পরীক্ষা ও ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সুবিধাবাদীদের সম্বন্ধে আরো বেশী হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। মৃত্যুর সময়ে তিনি মোটেই সুখী ছিলেন না—অনেক সময় আত্মবিশ্বাসও সন্দেহযুক্ত হয়ে উঠেছিল যে বুঝি বা অহিংসার কিছুই রইলো না। অতটা নৈরাশ্যবাদী হবার অবশ্য কোন কারণ ছিল না, কেন না অহিংসার শেষ দান তাঁর নিজের জীবন-

দানের ফলে অবস্থার মোড় যে ঘুরে গিয়েছিল—সেকথা তো আর তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

ভুল হিসাবে আরও কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। তবে সেসব ভুল তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন, তার পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। আবার এমন ভুলও আছে যা তাঁর লক্ষ্যে পড়ে নি বা কেউ দেখিয়ে দেয় নি। আমরা একটা লেখার এমনি একটি ভুল দেখাতে চাই। হিটলারের আক্রমণের সামনে ফ্রান্স, পেতাঁর নেতৃত্বে বিনা যুদ্ধেই হার মেনে নিল—পেতাঁর সেই বিশ্বাসঘাতকতাটাকে গান্ধীজী বুঝতে পারেন নি এবং অহিংসার উপর অতিরিক্ত আসক্তি থেকে অথবা হিংসাকে এড়াবার আগ্রহ থেকে তিনি ফ্রান্সকে এই গর্হিত কাজের জন্য প্রশংসা করে বসলেন। তিনি লিখলেন, The fall of France is enough to my argument. I think the French statesman have shown rare courage in bowing to the inevitable and refusing to be a party to senseless mutual slaughter. There can be no sense in France coming out victorious, if the stake in truth is lost. The cause of liberty becomes a mockery, if the price to be paid is wholesale destruction of those who are to enjoy liberty. It then becomes an intolerable situation of ambition. The bravery of the French soldier is world-known. But the world knows also the quieter bravery of the French statesmen in suing for peace. *I have assumed* that the French statesmen have taken the step in a perfectly honourable manner, as behoves a true soldier. Let me hope that Herr Hitler will impose no humiliating terms but show that, though he can't fight with mercy, he can at least conclude peace not without mercy." (Mahatma, Vol. V, page 353)

"আমার যুক্তির সপক্ষে ফ্রান্সের পতন একটি দৃষ্টান্ত। আমার মতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতারা যা অবশ্যম্ভাবী তাকে স্বীকার করে নিয়ে ও বৃথা রক্তক্ষয় হতে না দিয়ে যে পরাজয় স্বীকার করেছেন, তাতে তাঁদের দুর্লভ সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যদি সবই ধ্বংস হয়ে যায় তবে এই যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়ী হয়ে আসার কোন অর্থ হয় না। মুক্তির কোন মানেই হয় না যদি মুক্তির জন্য লড়াইতে যারা মুক্তিকামী তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে সেটা হবে গৌরবহীন দাম্ভিকতা মাত্র। ফরাসী সৈন্যদের বীরত্ব পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু জগত জানুক যে ফরাসী নেতাদের শান্তির জন্য সাহস আরও বীরত্বপূর্ণ। আমি অবশ্য এক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি যে ফরাসী নেতারা সম্পূর্ণ সম্মানজনক সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সন্ধি করেছেন—যা সকল খাঁটি সৈনিকেরাই করে থাকে। আমি আশাকরি হের হিটলার যুদ্ধের সময় করুণা দেখাতে না পারলেও, সন্ধির সময়ে অসম্মানজনক সর্ত আরোপ করবেন না এবং তাঁর সন্ধি-সর্তে করুণার অভাব হবে না।" ১৭ই জুন, ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতন হয়, আর ১৮ই জুন তারিখের 'হরিজনে' তিনি না বুঝে-সুঝে এই জাতীয় একটা বিবৃতি

দিয়ে বসলেন। আমরা জানি, কোনও সম্মানজনক সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পেতাঁ পরাজয় স্বীকার করেন নি। ভিশি সরকার একটি বিশ্বাসঘাতক সরকার ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং কত কলংকময় তার ইতিহাস। দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তো তারা করেই ছিল, সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই জাতীয় পতনকে প্রশংসা করার মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না। এটা গান্ধীজীর একটা বিবেচনারহিত বিবৃতি বলে মানতে হবে। এই জাতীয় কথায় তাঁর অহিংসা ক্ষুণ্ণ হয় এবং অনেক রকমের সুবিধাবাদ এই জাতীয় বিবৃতির মধ্য দিয়ে গান্ধীবাদে প্রবেশ করে। যদি তিনি বলতেন, ফরাসীদেশ অস্ত্র ত্যাগ করেছে করুক, এখন তারা নিরস্ত্র অহিংসার লড়াইয়ের পথে আসুক, তবেই গান্ধীজীর মতো কথা হতো। নাহলে ওটা নেহাৎই impotent pacifism বা ক্লীব শান্তিবাদ হয় যা উনি চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন। গান্ধীজী অবশ্য ইংল্যান্ডকেও হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্রের যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে জার্মান সৈন্যদের ইংল্যান্ডের বুকে ডেকে নিতে বলেছিলেন এবং তিনি নিজে সে সংগ্রামে অংশ নেবার প্রস্তাবনাও করেছিলেন। সেটা যতই অবাস্তব ও Utopian হোক, অন্ততঃ তার ভিতরে লজ্জাজনক নতিস্বীকারের বা সুবিধাবাদের ক্ষেত্র নেই। যে গান্ধীজী মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন বা do or die-এর মন্ত্রদাতা, তিনি ফরাসীদের জীবনের মায়ার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোটেই যুক্তিযুক্ত কাজ করেন নি। কাজেই দেখতে পাই, অহিংসার লড়াই যদি বিন্দুমাত্র ভুল হয় তবে তার ভিতর প্রচুর সুবিধাবাদ ঢুকে যেতে পারে। একমাত্র সহিংস সংগ্রামেই গলদ ঢোকে তা নয়, অহিংস সংগ্রামেও এইভাবেই নানা গলদ ও সুবিধাবাদ, এমন কি কাপুরুষতাও ঢুকে যেতে পারে—যার পরিণত-রূপ গান্ধীজী শেষ জীবনে নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

অহিংসা ও সত্যাগ্রহের নীতি বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়। সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-নীতির প্রয়াস প্রচেষ্টা বলতে ১৯২০-২১ সাল, ১৯৩০-৩১-৩২-সাল ও ১৯৪২ সাল-এই তিনটি কালকেই বোঝায়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গান্ধীজীকে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের অনেক ছোটখাট প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তার মধ্যে কতগুলো আন্দোলনকে মোটামুটিভাবে বড়ই বলাযায়। তাছাড়া ব্যক্তিগত ব্যাপারেও এবং সহকর্মীদের সংশোধনের ক্ষেত্রেও তাঁকে অহরহ ছোটখাট অনশন জাতীয় সত্যাগ্রহ করতে দেখা যায়। এগুলির সামগ্রিক আলোচনা এবং বিশ্লেষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে করা দরকার। এবং সেইসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সত্যাগ্রহ ও অহিংসার নির্ভুল প্রয়োগ সম্পর্কে গান্ধীজীকে অনেক রকম সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং কখনও কখনও তিনি ভুলও করেছেন এবং নিজের ভুলের জন্য আবার অনশন করে প্রায়শ্চিত্তও করেছেন। মোট কথা অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতির প্রয়োগ প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় নি, এবং এই পথ আবিষ্কার করতে গান্ধীজীকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নানা আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে দেশ ভাগ করে ভারত স্বাধীন হবার সময়ে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তাতে কংগ্রেস অথবা অন্যান্য অহিংসা বিশ্বাসী ব্যক্তি ও সংগঠন যেভাবে

সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর শেষপর্যন্ত এই প্রত্যয় হয় যে দেশে যে ধরনের অহিংসার প্রয়োগ হয়েছে এবং যে ধরনের লোক এই অহিংসা নীতি প্রয়োগ করতে গান্ধীজীকে অনুসরণ করেছিলেন, তাতে অনেক দুর্বলতা ছিল। তিনি সবলের অহিংসায় কি হতে পারে তারই অনুসন্ধানে নোয়াখালিতে নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সবলের অহিংসা দিয়ে দেশকে শক্তিমান করতে পারেন নি। এই হতাশা নিয়েই তাঁর একশত পঁচিশ বছর বাঁচবার ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করেন। বলাবাহুল্য নাথুরাম গডসে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।

সত্যাগ্রহ

গত অধ্যায়ে এমন একটা ধারণা হতে পারে যে গান্ধীজী জীবনের শেষে যে আত্মজিজ্ঞাসায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, তাতে হয়তো একটা অনুশোচনার সুর আছে। অর্থাৎ গান্ধীজী শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অহিংসার পিছনে সত্যিকার আন্তরিক সমর্থন, ভারতের জনতার বা কংগ্রেস কর্মীদের কখনো ছিল না, তাঁরা সুবিধার খাতিরেই অহিংসা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভীরু, অনেকে হিংসায় বা অস্ত্রশস্ত্রে বিশ্বাসী। ফলে যখন দুটি গুরুতর পরীক্ষা দেশের সামনে এলো, তখন তাঁরা হেরে গেলেন। প্রথমটি হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের আক্রমণ রুখবার প্রশ্ন নিয়ে, আর দ্বিতীয়টি হলো দেশ বিভক্ত হবার মুখে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখবার সময়ে জনসাধারণের, এমন কি কংগ্রেসকর্মীদেরও অহিংসায় অবিশ্বাস। এই পরীক্ষার সামনে এসে কংগ্রেস নেতাদেরও অহিংসা যখন উবে যেতে লাগলো, তখন গান্ধীজী হতাশ হলেন এবং ভাবতে লাগলেন তবে বুঝি তিনি বীরের অহিংসা দেশকে দেখাতে পারেন নি, তিনি নিজেই হয়তো অন্ধ ছিলেন, সত্য বিচার করতে পারেন নি, ইত্যাদি। এই সুর থেকে হয়তো কারো কারো মনে হতে পারে যে গান্ধীজীর যেটা মুখ্য কথা অর্থাৎ অহিংসা যখন ব্যর্থ হলো, তখন গান্ধীজীর সার্থকতা কোথায় রইলো ? এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধীজীকে জাতির জনক কি করে বলা যায় ?

কিন্তু আমাদের বক্তব্য তা নয়। গান্ধীজীকে বুঝতে হলে দুটি ধারাকে একসঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা, দ্বিতীয় তাঁর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটা বিশেষ মতবাদ। গান্ধীজী শুধুই অহিংসার প্রতিভূ নন, গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিভূ। একটা বিশেষ যুগে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, আবার গান্ধীজীর একটা অহিংসা সম্পর্কিত বিশেষ দায়িত্বও আছে। ইতিহাসের ভূমিকায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন গান্ধীজী, আবার ইতিহাসকে একটা বিশেষ দিকে নিয়ে যাবার জন্যও তাঁর একটা প্রচেষ্টা—এই দুই শক্তিকে আলাদা আলাদা করে বুঝতে হবে, যদিও এই দুই শক্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়।

একশত পঞ্চাশ বছরের পরাধীন ভারত, নির্যাতিত ভারত—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতোই দাঁড়াতো—তা গান্ধীজী ভারতে জন্মাতেন আর নাই-বা জন্মাতেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইতিহাসের গর্ভে আপন নিয়মেই নিয়তির মতো অনিবার্য ছিল। কিন্তু নিরস্ত্র, দুর্বল শতবিভক্ত ভারত গান্ধীজীর মধ্যে আপন বিদ্রোহের বাহন খুঁজে নেয়। গান্ধীজীর কথা, কাজ, গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম, স্বভাবতই ভারতের আপামর জনসাধারণের সকল শ্রদ্ধা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রীভূত রূপ দিতে সমর্থ হলো। অসহযোগ নীতি, পরোক্ষ প্রতিরোধ

নীতি, সক্রিয় প্রতিরোধ নীতি, স্বদেশী ইত্যাদি সহজসাধ্য প্রোগ্রাম জনচিত্তে একটা সাড়া জাগানো আবেদন বা সাধারণ সর্ববাদীসম্মত যুক্ত প্ল্যাটফর্ম বা কর্মপন্থা রূপে গৃহীত হলো। ১৯২১ সালের সাত দফা প্রোগ্রাম বৃহত্তর জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজ, সকলেরই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হলো। এখানে গান্ধীজী এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু শুধু ইতিহাসের তৈরী অস্ত্র নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি ইতিহাসের হাতে একটা নতুন অস্ত্র দিতে চাইলেন—যার অস্পষ্ট নাম হলো অহিংসা। অহিংসার প্রকৃত কোন নিশ্চিত সংজ্ঞা তিনি দিলেন না, মোটামুটি একটা চেহারা এঁকে দেখালেন মাত্র—কেন না নিজেরই কাছে তা তখনো স্পষ্ট নয়। বহুদিনের, বহু সংগ্রামের শেষে তাঁর শেষ জীবনে এসেও তার স্পষ্ট সংজ্ঞা তিনি দিয়ে যান নি। এই অস্পষ্টতার একটা সুবিধাও ছিল—কেন না তার মধ্যে flexibility রয়ে গেল, অবস্থার উপর ব্যবস্থা ও অদলবদল করার স্বাধীনতা রইলো। এবং জনসাধারণ নিজেদের মনোমত অর্থ করেও কতকটা চলবার স্বাধীনতা রইলো বলে মনে করলো। প্রথমদিককার দিনগুলিতে, অর্থাৎ ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত একটা ব্যাপক সাধারণ নিরস্ত্র বিদ্রোহের অস্পষ্ট অথচ রঙিন ছবি জনতার চোখে ফুটে উঠলো। ফলে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়-ঐক্য, হিন্দু-মুসলমানের মিলন, স্বদেশীশিল্পের রক্ষা, কুটির-শিল্পের পুনর্জাগরণ, আত্মসম্মানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অথচ অস্ত্রহীনতার জন্য দুর্বলতা-বোধের অভাব, ইত্যাদি যাবতীয় যে সব প্রেরণা সমগ্র জাতিকে মাতিয়ে তুললো, তার তুলনা হয় না। গান্ধীজী জাতির সুপ্তশক্তিকে এক ডাকে জাগিয়েছিলেন। ভারত ইতিহাসের ডাক শুনতে পেলো, উঠে বসলো।

গান্ধীজী জানতেন অহিংসাকে জনতা মূল নীতি বা creed হিসেবে গ্রহণ করে নি, তবে কৌশল হিসেবে বা কার্যক্রম হিসেবেই যদি গ্রহণ করে, তাহলেই তাঁর কাজ চলবে। সেদিনের সেই বিদ্রোহের মধ্যে অহিংসার শাসন এতটুকু থাকলো যে, কেউ খুনোখুনি করতে বা অস্ত্র ধরতে যেন না যায়। অহিংসা সেখানে একটা positive কথা না হয়ে বরং বারণের বা নেগেটিভ শক্তি হিসেবেই কাজ করলো। তাছাড়া জনসাধারণ সেদিন সত্যিই খুব সাহসী ছিল না, বা সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য কোন বড় দলও প্রস্তুত ছিল না, যদিও কিছু কিছু বিপ্লবীদল এখানে সেখানে কিছু কিছু কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল। সাধারণভাবে জনতার সাহস, একতা, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি খুব কমই ছিল।

গান্ধীজী বলেছেন, "I admit at once that there is a doubtful proposition of full believers in my 'Theory of Non-violence'. But it should not be forgotten that I have also said that for my movement I do not at all need believers in the theory of non-violence, full or imperfect. It is enough if the people carry out the rules of non-violent action." (Gandhiji's Correspondence with Govt. quoted by N. K. B., page 125) অর্থাৎ "আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করছি যে আমার অহিংস

নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী কজনা আছেন তা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক। কিন্তু একথা জেনে রাখা দরকার, বিশ্বাসী হিসেবে অহিংস কর্মীর উপর আমার আন্দোলন একেবারেই নির্ভর করে না। যদি কার্যক্রম হিসেবে বা কাজের ক্ষেত্রে তারা অহিংসার নিয়মগুলি মেনে চলে, তাতেই যথেষ্ট।" তিনি আরো বলেছেন, কংগ্রেসের ভিতর অহিংসা একটা কার্যকরী কৌশল (expedient) হিসেবে প্রবর্তন করাতে তাঁর কোন অন্যায় হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন না। তিনি জানতেন অহিংসা গ্রহণ করার দাবি করতে গেলে তাঁকে হয়তো নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দিয়েই তা গ্রহণ করানো সম্ভব হতো না। ফল যাই হোক, বারেবারেই কার্যক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ও ভুল দেখে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বটে, কিন্তু মোটামুটিভাবে এই বিরাট ভারতবর্ষের অসংঘবদ্ধ জনতা তাঁর শাসন যতটা মেনেছে তাতে তাঁর অহিংসায় অবিশ্বাসী হবার কোন কারণ ঘটে নি। "If I had started with non-violence as a creed, I might have ended with myself. Imperfect as I am, I started with imperfect men and sailed on an uncharted ocean." (Harijan, 12. 4. 42) অর্থাৎ *"অহিংসাকে মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করে আমি যদি শুরু করতাম, তাহলে হয়তো নিজেকে নিয়েই আমাকে থাকতে হতো। আমি যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি অসম্পূর্ণ লোকেদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম এবং অজানা অকূল সমুদ্র পাড়ি দিতে উদ্যত হলাম।"*

এখানে এই অনুপযুক্ত লোকেদের বাদ দেবার কথা যদি উঠতো তবে ভারতের কোন ভবিষ্যতই ছিল না। ভীরু, দুর্বল, আত্মকলহে নিমগ্ন ভারতবাসীদের যদি কার্যতঃ সাহসী শক্তিমান ও একতাবদ্ধ না করতে পারা যেতো তবে অহিংসার বাণীটি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই হতো না। কাজেই শেষ জীবনে যখন তিনি আপশোস করেছেন, বীরের অহিংসা ও সত্যিকার অহিংসার অভাব দেখে,—তাতে এটা মনে করার কারণ নেই যে অতীতে যে জাগরণ হয়েছে দেশে, সেটা ধোঁকা মাত্র বা তার প্রয়োজন ছিল না, বা গান্ধীজীর তাতে সমর্থন ছিল না। আদর্শ-হিংসা বা আদর্শ-অহিংসা—বীরের জিনিষ ঠিক, কিন্তু এই সব আদর্শ যারা দুর্বল তাদের বুকে যদি সাহস না জাগাতে পারে, তবে তা অলীক স্বপ্ন মাত্র। এমন নীতি চাই যা দুর্বলকে সবল করতে পারে। সবল লোকদের বাছাই করাটা ভারতের সমস্যা ছিল না, কেন না সবল লোক তৈরী হয়ে বসে ছিল না—কি গান্ধীজীর জন্য, কি ভগৎ সিং-এর জন্য। কাজেই দুর্বলের প্রতিরোধের কোন দাম নেই, এ জাতীয় আক্রমণ অন্যায্য ও ভুল। কত ভীরু লোকও হয়তো গোপনে স্বাধীনতাকামীদের কিছু সাহায্য করেছেন, কত দুর্বলচিত্ত লোকও হয়তো বিদেশীবস্ত্র বর্জন করে দেশের কাজে সাহায্য করেছেন, কত অসহায় নারী হয়তো কোন না কোনো ভাবে সাহায্য করেছেন, কত হিংসাপ্রবণ লোক হয়তো পুলিশের সঙ্গে পেটাপেটি করেছেন, কত লোক অতশত না বুঝেও জেল জরিমানা ভোগ করেছেন, কত কবি, কত গায়ক, কত লেখক কতভাবে প্রেরণা দিয়ে গেছেন, কত নরম-পন্থী লোক হয়তো আইনসভাতে দেশের স্বার্থকে রক্ষার জন্য কিছু না কিছু চেষ্টা করে গেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা সহস্র রকমের জাগরণের কাজ এই দেশে কত রকম চরিত্র ও চিত্তের

লোকেরা করেছেন। এই সমষ্টিগত রূপটাকে যদি এক কথায় বলি যে, এসব দুর্বলের প্রতিরোধ, এসব কিছুই নয়, তবে কোন মানেই হয় না। ধর্মঘট, হরতাল, ও সভা-সমিতিতে পুলিশের গুলি ও লাঠিতে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা অনেকেই গান্ধীজীর অহিংসা বা বিপ্লবীদের হিংসা—কোনও তুলাদণ্ডেই স্থান পাবেন না। কিন্তু সমষ্টিগত বহমান চিত্রটাই হলো ভারতের ইতিহাস বা জাগরণ। এই বিচিত্র বহমান ধারার মধ্যে অবশ্য দুটি স্পষ্ট শক্তি কার্যকরী নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেছে। একটি হলো গান্ধীজীর অহিংসা, অপরটি বিপ্লববাদীদের হিংসা। দ্বিতীয়টি জোরদার হয় নি, হতে পারে নি। প্রথমটি অর্থাৎ গান্ধীজীর অহিংস নেতৃত্বটাই greatest common platform হিসেবে দেশে ক্রমশঃ সবার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অতএব গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি হলো, জাতির সামগ্রিক জাগরণের নেতৃত্ব, আর অহিংসা হলো তাঁর বিশেষ কৌশল বা tactics, যা মোটামুটিভাবে এই জাতীয় জাগরণের উপর একটা বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসের ধারার উপর অহিংসার ছাপ ও চাপ প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা গান্ধীজী করে গেছেন। সমগ্র দেশটাকে তিনি এই সংগ্রামে টেনে আনতে চেয়েছিলেন, কেবল সমর্থকদেরই নয় বা কেবল অহিংসদেরই নয়। "I want Swaraj in the winning of which even women and children would contribute an equal share with the physically strongest."

অর্থাৎ "আমি এমন স্বরাজ চাই যেখানে মেয়েদের, এমন কি শিশুদের পর্যন্ত সংগ্রামে সমান দান থাকবে, যেমন থাকবে বলীয়ানদের দান।" কার্যতও তিনি তা অনেকটা করতে পেরেছিলেন, ফলে কোনও একটি বিশেষ আদর্শের—এক্ষেত্রে অহিংসার আদর্শের—প্রতিষ্ঠাই তাঁর মুখ্য কাজ ছিল না। অহিংসার সার্থকতা বরং এখানে যে সর্বজাতীয় লোকের একটা সাধারণ কর্মক্ষেত্র ও লড়াইয়ের ক্ষেত্র তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন—যেখানে ভীরুরা ও দুর্বলেরাও কিছু করার সুযোগ পেয়েছিল—আবার অনেক বিপ্লবীও তাতে নিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই হিসেবে গান্ধীজী হলেন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা, জাতীয় জাগরণের মূর্ত প্রতীক। অহিংসার একটা বিশেষ মতবাদ দিয়েই গান্ধীজীকে বোঝা যাবে না—এটি হলো গান্ধীজীর নিজস্ব একটি দান। তবে ভারতের এই জাগরণের সমষ্টিগত সাধারণ ক্ষেত্র রচনায় অহিংসা যে একটা বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে অনেক কাজ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশ যদি অহিংসাকে বর্জনও করে তথাপি গান্ধীজীর দান অস্বীকার করার উপায় নেই। এই ঐতিহাসিক দিক থেকে যদি দেখি তবেই বুঝতে পারবো কেন 'গান্ধীবাদ' পরাজিত বা 'ফেল' করা সত্ত্বেও—যদি তা ফেল করেছে বলে মনে করা হয়—গান্ধীজী ভারতের জনক বা জাতির পিতা বলে পরিচিত বা স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। আজ যাঁরা গান্ধীজীকে কেবলমাত্র গান্ধীবাদ বা অহিংসাবাদের মধ্যেই আটকে রাখতে চান, তাঁরা তার ঐতিহাসিক ভূমিকা ভুলে গেছেন। তাঁরা একটা sectarianism বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছেন মাত্র। তিনি অহিংসাকেও অবশ্য ইতিহাসের ক্রমবিকাশে একটা অনিবার্য স্থান করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন এবং অহিংসাকেও একটা ঐতিহাসিক শক্তি হিসেবে হয়তো

দেখিয়ে গেছেন। সেকথা পরে আলোচনা করবো এবং দেখাবো অহিংসার স্থানও আছে এবং ক্রমশঃ তা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হোল ভিন্ন কথা। প্রথম কথাটা হচ্ছে এই যে, গান্ধীজী শুধু একটি ব্যক্তি নন, তিনি ভারত ইতিহাসের এক মহান বাহন। এইজন্যই যখনই প্রয়োজন তখনই তিনি চোখ বুঁজে ঈশ্বর ভরসা করে সম্মুখ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভয়ে কাতর হন নি, পাছে সংগ্রাম হিংসায় পরিণত হয়ে যায়। বরং যত জোরের সঙ্গে তিনি অহিংসাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন ততই তিনি সরকারের হিংসা ও বিপ্লবীদের প্রতিহিংসার চক্র থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারবেন, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। হিংসা হবে বলে বসে থাকলে ভারতে রক্তারক্তি ও প্রতিক্রিয়ার জয় হবে, এই ছিল তাঁর ভাবনা। তাই তিনি দুর্জয় সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এই ঝাঁপিয়ে পড়াতে হিংসা কতটুকু কেটেছে, আর অহিংসা কতটুকু সার্থক হয়েছে তা অবশ্য তর্কের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন তা হলো এই যে, ইতিহাস এগিয়েছে, ইতিহাসে গতিবেগ যুক্ত হয়েছে। এতো গেল ১৯২১-১৯২২ সালের কথা।

পরবর্তীকালে, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩০ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' তিনি লিখেছেন, অর্থাৎ সেই ভারতব্যাপী বিরাট আন্দোলনের প্রাক্‌কালে ঘনায়মান বিদ্রোহ ও ইতিহাসের চাপকে মুক্ত করার পূর্বক্ষণে লিখেছেন, "There is undoubtedly a party of violence in the country. It is growing in strength. It is as patriotic as the best among us. What is more, it has much sacrifice to its credit. In daring it is not to be surpassed by any of us. It is easy enough to fling unkind adjectives at its members, but it will not carry any conviction with them. I am not now referring to the frothy eloquence that passes muster for patriotism. I have in my mind that secret, silent persevering band of young men and even women who want to see their country free at any cost. But whilst I admire and adore their patriotism, I have no faith whatsoever in their method. India's salvation does not lie through violence......But they will listen to no argument however reasonable it may be, unless they are convinced that there is a programme before the country which requires at least as much sacrifice as the tallest among them is prepared to make. They will not be allured by our speeches, resolutions, or even conferences. Action alone has any appeal for them. This appeal can only come from non-violent action which no other than civil disobedience can expect to do.

We must cease to dread violence, if we will to have the country free. Can we not see that we are tightly pressed in the coil of violence? The peace we seem to prize is mere makeshift, and it is bought with the blood of the starving millions. If the critics could

not realise the torture of slow and lingering death brought about by forced starvation, they would risk anarchy and worse in order to end that agony. The agony will not end till the existing rule of spoliation has ended. I would have waited if I could have been convinced that the condition of the masses has undergone progressive amelioration under the British rule. Alas, he who runs, may see that it has progressively deteriorated under the rule. It is a sin, with that knowledge, to sit supine, and for fear of imaginary anarchy, or worse, to stop action that may prevent anarchy, and is bound, if successful, to end the heartless spoliation of a people who deserved a better fate (N. K. B. P. 249)

"ভারতে হিংসাধর্মী বিপ্লবীরাও আছেন। তাঁরা একটি বর্ধমান শক্তি। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের মতো তাঁরাও স্বদেশভক্ত। তাছাড়া অনেক আত্মবলিদানের গৌরব আছে তাঁদের। সাহসে তাঁদের সমতুল্য নেই। তাঁদের সম্বন্ধে নিন্দাবাক্য যতই ব্যবহার করা হোক, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। বাগ্মিতাবিলাস যা স্বদেশপ্রেম বলে আজকাল চালু আছে, তার কথা বলছি না আমি। আমি সেই সব গোপন, নীরব ও অধ্যাবসায়ী যুবক ও এমন কি যুবতীদের কথা বলছি, যারা যে কোন মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা পেতে চায়। কিন্তু তাদের সাহসকে ও চরিত্রকে আমি যতই না কেন শ্রদ্ধা করি, তাদের পথে আমার বিশ্বাস নেই। ভারতের মুক্তি হিংসার পথে নেই।···কিন্তু যুক্তি যত ভালোই হোক, তাঁরা সেকথায় কর্ণপাতও করবে না, যদি না তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান যে ভারতের সামনে এমন এক আত্মত্যাগের কর্মপন্থা রাখা হয়েছে, যা তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরদেরও প্রাণে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। আমাদের বক্তৃতা, প্রস্তাব ও সম্মেলন তাঁদের মোটেই আকৃষ্ট করবে না। সেই আবেদন আসতে পারে একমাত্র অহিংস সংগ্রামের ডাকেই, যা আইন অমান্য সংগ্রামের কর্মপন্থা। এই সংঘাতের ডাকই তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে······

"যদি আমরা দেশকে মুক্ত করতে চাই, তবে হিংসাকে ভয় করা বন্ধ করতে হবে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ক্রমেই আমরা হিংসা ও প্রতিহিংসার আবর্তে পড়ে যাচ্ছি? এমতাবস্থায় শান্তির স্বপ্ন একটা ধোঁকা মাত্র। এই ধোঁকা বুভুক্ষু জনতার রক্তের বিনিময়েই ক্রয় করা সম্ভব। যদি সমালোচকেরা কখনও বুঝতে পারেন, কি অপরিসীম যাতনা এই ধীর অথচ নিশ্চিত মৃত্যু, এই বুভুক্ষু জনগণকে ঘিরে ধরেছে, তাহলে তাঁরাও যে কোনো অরাজকতা, এমন কি আরো কিছুকে বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই ধ্বংসের রাজত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিভীষিকার শেষ নেই। যদি আমি বুঝতাম যে ইংরেজ রাজত্বে জনগণের এই দুর্দশা ধীরে ধীরে কমে আসছে, তবে আমি অপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় চুপ করে বসে থাকা পাপ। এবং কল্পিত অরাজকতা বা হিংসা হবে, এই আশংকায় বসে থাকা ভুল, বরং সক্রিয় সংঘাতেই অরাজকতা বন্ধ করা যেতে পারে। যদি সংগ্রাম

সার্থক হয়, তাহলে জনজীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।......"

এই বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানের মধ্যে ইতিহাসেরই অমোঘ আদেশ ঘোষিত হচ্ছে। এই আদেশ যাঁর মুখ থেকে ঘোষিত হবে তাঁর পক্ষে হিসেবনিকেশ তুচ্ছ হতে বাধ্য। হিংসা হবে এই ভয় তাঁর থাকতে পারে না, অথবা হিংসার ভয়ে আঘাত হানতে তিনি দ্বিধা করবেন না। বারে বারেই, প্রত্যেক সংকটময় সময়েই, গান্ধীজীর মধ্যে এই বেপরোয়া শক্তির বিকাশ হয়েছে। প্রতিক্রিয়ার সময়ে অহিংসার শুদ্ধতা নিয়ে তাঁর হিসেবনিকেশের অন্ত ছিল না। অহিংসায় দেশবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য গঠনমূলক কাজের চাপে কর্মীরা অস্থির হয়ে উঠতো। কিন্তু যখনই অবস্থা সংকটাপন্ন হয়েছে, ভারতের আকাশ-বাতাস ইতিহাসের চাপে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—তখুনি গান্ধীজীর গম্ভীর আদেশ ধ্বনিত হয়েছে। হিংসা হয়েছে বারে বারে, তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য অনশন করেছেন, কিন্তু যখনই আবার সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তখন হিংসা হবে এই ভয়ে ভীত হন নি। ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তাই, Luis Fisher তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, যদি গান্ধীজী এখন অহিংসা সংগ্রাম ঘোষণা করেন, তবে কি তা বিষম অরাজকতা ও রক্তপাতে পরিণত হবে না ? গান্ধীজী উত্তর দিচ্ছেন, "That is a very proper question. That is the consideration that has weighed with me these 22 years. I waited and waited until the country should develop the non-violent strength necessary to throw off foreign yoke. But my attitude has undergone a change. I feel that I cannot afford to wait. If I continue to wait I might have to wait till doomsday. For the preparation that I have prayed for and worked for, may never come, and in the meanwhile I may be enveloped and overwhelmed by the flames that threaten all of us. That is why I have decided that even at certain risks which are obviously involved, I must ask the people to resist the slavery......After all, those who are unarmed cannot produce a frightful amount of violence or anarchy, and I have a faith that out of that anarchy may arise pure non-violence. But to be a passive witness of the terrible violence that is going on, of the terrible anarchy that is going on in the name of resisting a possible foreign aggression, is a thing I cannot stand. It is a thing that would make me ashamed of my ahimsa. It is made of sterner stuff. (Harijan 7. 6. 42 quoted by N. K. B. P. 294)*

"হ্যাঁ, এটা একটা উপযুক্ত প্রশ্ন বটে। গত বাইশ বছর ধরে আমি এই প্রশ্নই করে এসেছি নিজেকে বারে বারে। বিদেশী শাসন অহিংস উপায়ে দূর করে দেবার মতো শক্তি অর্জন করতে আমি অনেক অপেক্ষা করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমার মতামত

* "গান্ধীজী ও সুভাষ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বদলে গেছে। আমি বুঝেছি আর অপেক্ষা করা চলে না। আর অপেক্ষা করা হয়তো শেষ কেয়ামতের দিনের জন্য অপেক্ষা করার সামিল হবে। যে অহিংস প্রস্তুতির জন্য আমি জীবনভর প্রার্থনা ও কাজ করে এসেছি তা হয়তো কখনো কাজে আসবে না এবং ইতিমধ্যে চারদিকে যে-আগুন জ্বলে উঠছে তাতে আমি আটকে যেতে পারি ও ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। অতএব মস্ত ঝুঁকি নিয়েও দাসত্বের শৃংখল মুক্ত করার জন্য জনতাকে ডাক দিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।...শেষপর্যন্ত নিরস্ত্র জনতা কতটুকুই বা হিংসা ও অরাজকতার সৃষ্টি করতে পারে? আমার বিশ্বাস হয়তো সেই অরাজকতার মধ্য দিয়েই সত্যিকার অহিংসা বের হয়ে আসবে। কিন্তু আজকের ভয়াবহ সরকারী হিংসার নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকা, সম্ভাব্য বিদেশী কোনো শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার নামে ভয়াবহ হিংসা বসে বসে দেখা, আমার পক্ষে আজ অসম্ভব। এ আমার অহিংসাকে লজ্জা দেয়। আমার অহিংসা এর চেয়ে ঢের বেশী শক্ত ধাতু দিয়ে গড়া।"

নাম্বুদ্রিপাদের বই থেকেও এর সমর্থনে কিছু বক্তব্য তুলে দিই। লুই ফিসারের সঙ্গে কথোপকথনটা নাম্বুদ্রিপাদও তুলেছেন: His attitude in 1942 was entirely different for the first time in his life. He did not denounce the masees of the people for having resorted to violence. Departing from his traditional outlook on militant mass actions (as at the time of Chouri-Choura) he now took the stand that whatever 'mob violence' took place was the natural reaction to the 'leonine violence' resorted to by the Govt. "১৯৪২ সালে গান্ধীজীর চিন্তা-চেতনা এমন বদলে যায় যা অতীতে কখনো ছিল না। জনসাধারণ যদি কিছু হিংসা করেও ফেলে তা তিনি তখন ভ্রূক্ষেপ করতে প্রস্তুত নন (যেমন একদিন চৌরিচৌরাতে হিংসা দেখে আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন)। তিনি এখন মনে করেন (১৯৪২ সালে) যে, জনগণ যদি কিছু হিংসাত্মক ব্যবহার করে তবে তা সরকারের মারাত্মক হিংসারই প্রতিক্রিয়া মাত্র।"

নাম্বুদ্রিপাদ লিখছেন: There are indications that, in the days before 8th August 1942, Gandhiji had visualised that a spontaneous rising of the people would take place when the "Quit India" struggle was launched. For once in his life, he talked of the mass struggle in which the millions of peasants would rise in revolt not only against the British Government but also against landlords. For example, he told the American journalist Mr. Louis Fischer, that the peasants would begin with non-payment of taxes, but that "refusal to pay it will give the peasants courage to think that they are capable of independent action. Their next step will be to seize the land."

"With violence?" Mr. Fischer asked.

"There may be violence," Gandhi replied, "but then again the landlords may cooperate."

"You are an optimist," remarked Mr. Fischer.

"They might cooperate by fleeing," Gandhi said.

"Or," Mr. Fischer said, "they might organise violent resistance".

"There may be fifteen days of chaos," Gandhi said, "but I think we would soon bring that under control."

(Mahatma & the Ism by Namboodiripad)

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্টের প্রাক্কালে গান্ধীজী বোধহয় প্রথম অনুভব করতে পারলেন যে, এবারে তাঁর 'ভারত-ছাড়' সংগ্রামের ডাক হয়তো বিশাল জনসমুদ্রে বিরাট বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃষক জমিদারদের বিরুদ্ধেও অভ্যুত্থান করে বসতে পারে। এই ধরণের বিস্ফোরাত্মক সময়ে অকুতোভয়ে সংগ্রামের ডাক দেওয়ার নজীর গান্ধীজীর জীবনে এ-ই বোধহয় প্রথম। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায়, এই সময়ে আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্য। গান্ধীজী বলেন, লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ হয়তো ট্যাক্স বন্ধ করার আদেশকে জমি দখলের আন্দোলনেও কাজে লাগিয়ে দিতে পারে।

লুই ফিশার তাঁকে প্রশ্ন করেন, "হিংসার সঙ্গেও ?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "হয়তো হিংসাও হতে পারে, তবে জমিদারেরাও সহযোগিতা করতে পারেন।"

লুই ফিশার, "আপনি খুব আশাবাদী দেখছি।"

গান্ধী, "তাঁরা পালিয়ে গিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।"

লুই ফিশার, "অথবা তাঁরা সহিংস প্রতিরোধ সংগঠিত করতে পারেন।"

গান্ধীজী, "সেসব হিংসাত্মক কান্ড দিন পনেরো চলতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি তা সহজেই নিয়ন্ত্রিত করা যাবে।"

(মহাত্মা এন্ড দি ইজম্—নাম্বুদ্রিপাদ)

যাই হোক এইভাবে গান্ধীজী ইতিহাসের ডাকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে সাড়া দিতেন। হিংসা-অহিংসার কূট তার্কিকতা থেকে তিনি উপরে উঠতে পারতেন কখনো-কখনো। তিনি জানতেন, তাঁর জীবনের একটি বিশিষ্ট সাধনা হলো অহিংসা। কিন্তু পূর্ণ অহিংসার জন্য দেশ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত, তিনি অপেক্ষা করতে পারেন না। তাই দেশ যখনই এমন বিপদাপন্ন হয়েছে যে তাঁর অহিংসা দ্বারা দেশরক্ষা সম্ভব নয়—অর্থাৎ দেশে তেমন অহিংস শক্তি নেই—তখন তিনি অন্যান্য নেতাদের অস্ত্রের পথ ধরতেও নিষেধ করতে পারেন নি, বরং অনুমতি দিয়েছেন। কাশ্মীর রক্ষার জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে পাঠাতে অনুমতি দান তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাপানী আক্রমণ রুখতে অহিংসা যথেষ্ট নয়—অর্থাৎ দেশ অহিংসার সাহায্যে রুখবার মতো শক্তি অর্জন করতে পারে নি, এইকথা যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, বিশেষ করে মৌলানা আজাদ ও নেহরু, বুঝতে পারলেন এবং গান্ধীজীকে বললেন, গান্ধীজী

তখন নিজে সরে দাঁড়ালেন—এবং কংগ্রেসকে নিজের পথে যেতে অনুমতি দিয়ে, নিজে নিজের পথে চলবার জন্য শক্তি যোজনা করতে লাগলেন। কিন্তু ইংরেজ যখন কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আপোষ করলো না, গান্ধীজীকে বাদ দিয়েও কংগ্রেস যখন ইংরেজের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হলো না, সেই দুর্দিনে আবার যখন গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে ওয়ার্কিং কমিটি অনুরোধ করলেন, তখন গান্ধীজী রাজী হতে দ্বিধা করলেন না—কেন না জাতীয় দায়িত্ব এড়াবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি জানতেন, কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা পাবে, বা দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন শাসনকর্তারা দেশরক্ষার জন্য অহিংসা গ্রহণ করবেন না এবং তাঁর অহিংসা হয়তো তাঁকেই আশ্রয় করে থাকবে। তবু তিনি কংগ্রেসের এই অক্ষমতা বা দেশের এই অক্ষমতাকে কপটাচার বলে মনে করেন নি। তিনি মনে করেছেন হিংসার পথ ছাড়বার মতো সাহস আজও পৃথিবীর হয় নি বটে, তবে ধীরে ধীরে অহিংসার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়বে বই কমবে না। চিরাচরিত অভ্যাস ও গতানুগতিক চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে দেরী হবে এবং সে-পথ পরিষ্কার করার জন্য তিনি আপ্রাণ খেটে যাবেন, দৃষ্টান্ত দ্বারা সাহস দিয়ে যাবেন, তাই বলে দেশ যতটুকু এগোতে পারে ততটুকুর জন্যই তিনি প্রস্তুত এবং দেশকে সর্বদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত। ইতিহাসের ডাকে সাড়া দিতে তাঁর কোনো কুণ্ঠাই দেখা যায় নি।

আজ দেশ স্বাধীন কিন্তু দেশের সরকার অহিংসার উপর নির্ভর করে সৈন্য ও পুলিশ কমিয়ে দিতে পারছেন না বলেই অহিংসা-নীতি পরাস্ত হলো—এমন কোনো সোজা হিসেব নেই। এই অহিংসা নীতিই আজ ভারতের বৈদেশিক নীতিতে শান্তির বাণীতে প্রকাশ পেতে চায়। সেকথা পরে আলোচ্য। এখানে শুধু এইটুকু আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ইতিহাস যেমন গান্ধীজীকে তৈরী করেছে তার বাহন করার জন্য, তেমনি গান্ধীজী আবার ইতিহাসের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন কম নয়। History acts upon man and man upon history। এই দ্বৈত আঘাত ও প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে ইতিহাস অগ্রসর হয়। গান্ধীজী ইতিহাসের কেবল একটি হাতিয়ারই নন। গান্ধীজী ইতিহাসের উপরও একটা ছাপ রেখে গেছেন, তাঁর অহিংসার সাধনা দিয়ে। অমোঘ কোন অস্ত্র, নির্ভুল কোন অস্ত্র হয়তো অহিংসা নয়, অহিংসার অস্ত্র ব্যবহার করায় গান্ধীজীর মতো কুশলী ও শক্তিমান সৈনিকের অভাব বড্ডো বেশী, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তির বাণী ও হিংসার অবসানের যে দাবি উঠেছে এবং তার দাবি আজ এতো প্রবল হয়ে উঠেছে যে তাতে বোঝা যায় যে অহিংসা আজ আর অবাস্তব কোন কথা নয়। যে বাস্তব পরিস্থিতি আজ পৃথিবীতে যুদ্ধ ও হিংসাকে অসম্ভব করে তুলেছে তার পিছনে অনেক রকম শক্তি কাজ করছে—কিন্তু মনোজগতের দিক থেকে যে চেতনার প্রয়োজন, তার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অহিংসার দান বিশ্বের এই শান্তি-সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। আমরা দেখি, এই ভারতক্ষেত্রে গান্ধীজী যেমন ইতিহাসের দ্বারা শক্তিমান ও দুর্জয় হয়ে উঠেছিলেন, আবার বাস্তব পরিস্থিতির চাপে গান্ধীজীর অহিংসা বারে বারে ব্যর্থও হয়েছে। যেন ইতিহাস গান্ধীজীকে কখনো কখনো সাহায্য করছে, আবার পরক্ষণে পথে বসিয়ে

দিচ্ছে। ইতিহাসের ভিতরকার প্রগতিশীল শক্তিগুলি যতটা পুষ্ট হয়েছিল, গান্ধীজী তার দ্বারা লাভবান হয়েছেন, কিন্তু যেসব শক্তি তখনও পুষ্ট হয় নি, সেগুলির শক্তি গান্ধীজী দীর্ঘকাল ভোগ করতে পারেন নি। কোন্ কোন্ শক্তি আজও ইতিহাসে পুষ্ট হয় নি? অহিংসা, ভালোবাসা, যুক্তি, এসবের শক্তি আজও ইতিহাসে তেমন প্রধান নয়। অথচ এগুলিকেই গান্ধীজী আশ্রয় করে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বারে বারে ফেলও করেছেন—হেরে গেছেন। কিন্তু বারে বারে পরাস্ত হলেও—অহিংসার দাবি জগতসমক্ষে তিনি উপস্থিত করতে পেরেছিলেন। এর আশু সার্থকতা দিয়ে জয়পরাজয় নির্ভর করবে না—করবে তার স্থায়ী প্রভাবটা দিয়ে। অথচ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র থেকে, পৃথিবীর যাবতীয় পরিস্থিতি থেকে আজ শান্তি, সভ্যতা ও অহিংসার জন্য আবেদন ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজীর মধ্যে তাই বর্তমান ইতিহাসের ধারা ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের আবেগ এই দুই শক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান ধারাটি ইতিহাসেরই ধারা বলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে তাঁর মধ্যে বিভিন্ন শক্তিগুলি একই সময়ে প্রকাশ পেতে চেয়েছে। তাই তিনি এডগার স্নো-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—"I am trying to represent the spirit of India. It is and will be a mixture." জাতীয় নেতা হিসেবে তিনি ভারতের প্রতিনিধি, সে হিসেবে তাঁর মধ্যে বহু শক্তির সমাবেশ দেখা যাবেই। কিন্তু সে মিশ্র সমাবেশের মধ্যে অহিংসার যে-কথাটি, যে-সুরটি উঠেছে, সেটি তাঁর নিজস্ব একটি প্রচেষ্টা, সে-প্রচেষ্টার মধ্যেও ইতিহাসেরই একটা ধারা বিদ্যমান, কিন্তু সে ধারা ছিল ক্ষীণ, তাকে প্রশস্ত বেগবান শক্তি হিসেবে গান্ধীজী দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ভবিষ্যতের ইতিহাসেই বিকশিত হবে। এ যুগের শান্তির, সহঅস্তিত্বের, সাম্যের, সহযোগিতার, স্বাধীনতার ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের যে সব মহান বাণী আজ শুনি তারই মধ্যে অহিংসার বিকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

ওয়ালটার লিপম্যান একসময়ে লিখেছেন, "The institution of war is not merely an expression of military spirit. It is not a mere release of certain subjective impulses clamouring for expression. It is also—and I think primarily—one of the ways by which great human decisions are made. If that be true, then the abolition of war depends primarily upon inventing and organising other ways, deciding those issues which have been hitherto decided by war."

(Quoted by R. R. Diwakar in his Satyagraha. page—61)

"মানুষের সামরিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ কেবলমাত্র জিগীষা ও আবেগ প্রকাশ করার সুযোগ হিসেবেই সৃষ্টি হয় না। মানবজাতির নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য অন্যতম উপায় হিসেবে প্রধানতঃ যুদ্ধের দরকার হয়েছে। যদি একথা সত্য হয়, তবে তখনই যুদ্ধের অবসান হবে চিরকালের জন্য, যখন মানুষ তাদের এই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—যার দ্বারা

তাদের ভাগ্য তৈরী হয়—কার্যকরী করার জন্য যুদ্ধের বদলে অন্য কোন পথ আবিষ্কার করতে পারবে।" অর্থাৎ যুদ্ধের একটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, যুদ্ধের সাহায্যে দেশের ভাগ্য তৈরী হতো, দেশ বৃদ্ধি হতো, দেশ স্বাধীন হতো, শ্রেণীযুদ্ধের সাহায্যে বিপ্লব ঘটাতো, ইত্যাদি। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বা অপর দেশ দখল করার যুদ্ধই একমাত্র যুদ্ধ নয়—ন্যায় যুদ্ধও অনেক আছে। তবে আজ সব যুদ্ধই অচল হয়ে ওঠে যদি যুদ্ধের সঙ্গে মানুষের সর্বনাশ হওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখা না যায়। এই পারমাণবিক বোমার যুগে যুদ্ধ যেভাবে অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছে, তখন মানুষ যুদ্ধ চাইবে না, যুদ্ধ এড়াতে চাইবে। কিন্তু যুদ্ধ এড়াতে চাইলেও তো এড়ানো সম্ভব নয়, কেন না ইতিহাসের গতিকে তো অব্যাহত রাখতে হবে, মানুষের ভাগ্য তো এখানে এসেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া অনেক দেশই এখনো স্বাধীনতা পেতে বাকি আছে, অনেক অত্যাচারিত মানুষের মুক্তি এখনো হয় নি, শোষিত শ্রেণী সমূহ এখনো শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপন করতে পারে নি। শ্রেণীযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ করতে গেলেও আজ বিশ্বযুদ্ধ গড়িয়ে আসতে বাধ্য। অতএব যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখতে পেলেও মানুষের মুক্তির অভিযান যতক্ষণ সম্পূর্ণ জয়যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম ও যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ কি করবে?* আফ্রিকাকে স্বাধীন হতে হবে, গোয়াকে স্বাধীন হতে হবে, মালয়ের সংগ্রাম স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত কি করে ক্ষান্ত হবে, ইত্যাদি প্রশ্ন কেবল শান্তির নাম করে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কাজেই যদি যুদ্ধকে এড়াতে হয় তবে যুদ্ধের বদলে এমন কোন সক্রিয় ও কার্যকরী উপায় বের করতে হবে যাতে যুদ্ধের মতোই কাজ হয়, অর্থাৎ মানুষের হাতে মুক্তির জন্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি মেলে। সে কি উপায়? গান্ধীজী বলেন যে তিনি শান্তিবাদী বা pacifist নন। pacifist-দের দলে তিনি কখনো নাম লেখাতে রাজি হন নি—যদিও বহু শান্তিবাদী তাঁকে এজন্য ধরেছেন। তিনি জানতেন মানুষের মুক্তি চাই—স্বাধীনতা চাই—এবং এই দাবি শান্তিকামীরা বা শান্তিবাদীরা মেটাতে পারে না। তাই তিনিও যুদ্ধ চান—অথচ যুদ্ধের হিংসা ও ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতা তাতে থাকবে না। তাঁর সেই যুদ্ধের নাম 'সত্যাগ্রহ'। তাই নির্মলবাবু লিখেছেন, "It is just here that the method of satyagraha steps in as a possible and effective substitute for war. It does not propose to do away with conflicts; but it raises the qualities of those very conflicts by bringing into operation a spirit of love and a sense of human brotherhood. Satyagraha is not a substitute for war, it is war itself, without of course many of its ugly features and guided by a purpose nobler than we associate with destruction. It is an intensely heroic and

* উদ্ধৃত এই অংশটি আফ্রিকার স্বাধীনতা বা গোয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই লিখিত।

chivalrous form of war" (Studies in Gandhism—page 120) "এখানেই সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, যা যুদ্ধের মত কার্যকরী অথচ যুদ্ধের বদলে অন্যরকম কিছু। সত্যাগ্রহ দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে না, বরং সেই সব দ্বন্দ্ব বা বিরোধগুলিকে ভালোবাসার শক্তি ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্যে উচ্চতর মার্গে সমাধানের চেষ্টা করে। এমন কি সত্যাগ্রহ যুদ্ধের বদলে অন্য কিছু নয়—সত্যাগ্রহ যুদ্ধই, তবে তাতে যুদ্ধের নানাবিধ বিশ্রী দিকগুলি নেই। এই সত্যাগ্রহের যুদ্ধে ধ্বংসের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যাগ্রহ একপ্রকার অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ও মহত্বপূর্ণ যুদ্ধ।"

গান্ধীজীর নিজের কথাই তোলা যাক : "I shall take up the Abyssinian question first. I can answer it only in terms of active, resistant non-violence. Now non-violence is the activest force on earth. But it is my conviction that it never fails. But if the Abyssinians had adopted the attitude of non-violence of the strong, i.e., the non-violence which breaks to pieces but never bends, Mussolini would have no interest in Abyssinia. Thus if they simply said ; "You are welcome to reduce us to dust or ashes but you will find no Abyssinian ready to cooperate with you", what could Mussolini have done ? He did not want a desert, Mussolini wanted submission not defiance, and if he had met with the quiet, dignified and non-violent defiance that I have described, he would certainly have been obliged to retire. Of course it is open to any one to say that human nature has not been known to rise to such height. *But if we have made unexpected progress in physical science, why may we do less in the science of the soul* ?

Now about the English pacifists. I know there are some great and sincere men amongst them, but they are thinking in terms of pacifism as distinguished from unadulterated non-violence. I am essentially a non-violent man, and I believe in war bereft of every trace of violence. An essentially non-violent man does not calculate the consequences." (Harijan, 14. 8. 38)

"আবিসিনিয়ার কথাটাই ধরা যাক। আমি সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধকে একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা মনে করি। অহিংসা সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি এবং আমার মতে অহিংসা কখনো ব্যর্থ হয় না। যদি আবিসিনিয়ানরা এই বীরের অহিংসা—যে অহিংসা ভাঙে, তবু মাথা নোয়ায় না—গ্রহণ করতে পারত, তাহলে মুসোলিনীর আবিসিনিয়াতে আর কোনো লোভ থাকতো না। যদি তারা বলতে পারতো, এসো, তুমি আমাদের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারো, ছাই করে দিতে চাও, দাও, কিন্তু তুমি একজন আবিসিনিয়ানকেও তোমার সহকারী হিসেবে পাবে না, কেউ তোমার

সঙ্গে সহযোগিতা করবে না, তাহলে মুসোলিনীর কি করার থাকতো? মুসোলিনী তো মরুভূমি চায় নি? সে চেয়েছিল বশ্যতা—প্রতিরোধ নয়। এবং যদি তাকে এই জাতীয় নীরব, স্বপ্রতিষ্ঠ অহিংস প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হতো, তবে তাকে সেখান থেকে পালাতে হতো। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, মানুষের স্বভাব কখনো অত উঁচুতে উঠতে পারে না। কিন্তু জাগতিক বিজ্ঞানসমূহ যদি আজ এতো অভাবনীয় উন্নতি করতে পেরে থাকে, তবে মানুষের আত্মার শক্তি বিজ্ঞানেই বা কম উন্নতি হতে পারবে কেন?

"এখন ইংরেজ শান্তিবাদীদের সম্পর্কে বলা যাক। আমি জানি তাঁদের মধ্যে কিছু মহৎ ও খাঁটি লোক আছেন, কিন্তু তাঁরা তথাকথিত শান্তিবাদ নিয়ে চিন্তামগ্ন, যা নির্ভেজাল অহিংসা থেকে ভিন্ন। আমি মূলতঃ একজন অহিংস ব্যক্তি, কণামাত্র হিংসা-শূন্য যুদ্ধে বিশ্বাসী। একজন খাঁটি অহিংস ব্যক্তি পরিণামের হিসেব করে এগোয় না।"

অনেক সময় গান্ধীজী বলেছেন যে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করছেন বটে, তাই বলে তিনি ইংরেজ জাতির অমঙ্গল চান নি। ইংরেজদের তিনি সমানই ভালোবাসতেন। তাঁর অভিধানে শত্রু বলে কোন শব্দ নেই। ইংরেজকে তিনি শত্রু মনে করতেন না। অনেকে গান্ধীজীর এই উক্তিকে তাই প্রতারণা মনে করতেন অথবা অত্যন্ত ভালো-মানুষী বলতেন। যার সঙ্গে লড়াই করছি তাকে শত্রু মনে না করলে লড়াই চলতে পারে না এবং যেহেতু গান্ধীজী ইংরেজদের ভালোবাসতেন, সেহেতু গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন না এবং সত্যাগ্রহ কোন বিপ্লবী অস্ত্র নয়, আপোষের হাতিয়ার মাত্র, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা জানি গান্ধীজীর অসহযোগ, স্বদেশী, আইনঅমান্য আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ—বাণিজ্য ও শিল্পের—কিরূপ ক্ষতি সাধন করেছিল। ফলে ইংরেজরাও গান্ধীজীর ভালোবাসার কথাটাকে ফাঁকিরী প্রতারণা বলে আখ্যা দিত। ফলস্বরূপ দাঁড়াতো এই, ইংরেজরাও গান্ধীকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতো না, আর ভারতীয় চরমপন্থীরাও গান্ধীকে ইংরেজের সত্যিকার শত্রু বলে মনে করতো না। গান্ধীজী বারবার বলেছেন, ইংরেজ তাঁর বন্ধু—কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তিনি অবসান না করে ক্ষান্ত হবেন না। তিনি বলতেন যে ইংরেজদের যদি সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করতে হয় তবে তাদের ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। সাম্রাজ্যবাদের জন্যই ইংরেজ আজ এতো ছোট হয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত হতে পারলে—স্বেচ্ছায় মুক্ত হতে পারলে—ইংরেজ পৃথিবীতে এক মহান জাতি হিসেবে সম্মান পাবে এবং নিজেরাও সত্যি সত্যি মহান প্রতিপন্ন হবে। এই জাতীয় কথাবার্তা আমাদের ভালো লাগতো না। কিন্তু যারা প্রকৃত মার্কসবাদী, তারা কিন্তু গান্ধীজীর এই জাতীয় উক্তিতে আইনতঃ আপত্তি করতে পারে না—তাদের মধ্যে কোন Chauvinism বা Jingoism প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়, অন্ততঃ মার্কসের শিক্ষা তা নয়। মার্কস্ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন লড়াই করতে বলেছেন বটে, কিন্তু কখনো জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ বা উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রচার করেন নি—আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বপ্রেম

শিখিয়েছেন। কিন্তু তাঁরই ভ্রান্ত শিষ্যরা কখনো কখনো উগ্রজাতীয়তাবাদের মোহে জাতি বিদ্বেষ প্রচার করেছে। মার্কসবাদীদের কাছে গান্ধীজীর উদারতা ও বিশ্ব-মানবতা অপ্রিয় জিনিষ হওয়া উচিত নয়। মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষা এ নয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা অবশ্য স্টালিনের মুখে অন্য কথা শুনেছি। তখন ক্রুদ্ধ রাশিয়া প্রবল ঘৃণার আশ্রয় নিয়েছিল। Internationalism ও Fraternisation-এর কথা বন্ধ রেখে স্টালিন ঘোষণা করলেন যে শত্রুকে ঘৃণা করতে না পারলে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা চলে না। শুধু হিটলারকেই নিন্দে করলে চলবে না, গোটা জার্মান জাতটাকে ঘৃণা করতে হবে, কেন না তাদের বর্বরতা সীমার বাইরে চলে গেছে, তারা সম্মিলিতভাবে তার জন্য দায়ী। তিনি লেখক, শিল্পী সবাইকে আদেশ করলেন যে ঘৃণা করতে শেখাও। সেই তীব্র ঘৃণার আগুনে শত্রুকে পুড়িয়ে ছাই করো ইত্যাদি। সেদিন স্টালিনের কথাগুলো নিশ্চয়ই অনেকের কানে নতুন ঠেকেছিল। গুরুতর বিপদের দিনে হয়তো সেই জাতীয় ঘৃণার সাহায্য নিতে হয়েছে কিন্তু সেদিনকার সেই আপৎকালীন নীতিকে চিরকালীন মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে এবং আজ কেউ সেই কথার পুনরাবৃত্তি করবে না। ইতিহাসের তেমন দুর্দিন হয়তো আর আসবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকতাই প্রাধান্য লাভ করবে। ঘৃণার বদলে ঘৃণা—এই জাতীয় ফাঁদে পা দিলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই পরাজয় হবে। অন্ততঃ বর্তমান যুগে ও আগামী যুগে এধরণের ঘৃণার আর স্থান নেই একথা জোর করে বলা যায়। অন্যায়কে ঘৃণা করতে হবে চিরকালই—কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করা চলবে না। 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে ঘৃণা করো না'—এমন কথা অবাস্তব নয়; যেমন অবাস্তব নয় একথা যে 'রোগকে ঘৃণা করো, রোগীকে নয়'। অর্থাৎ মনকে শিক্ষিত করতেই হবে, সহজ ভাবালুতা দিয়ে চললে হবে না। শিক্ষিত মন না হলে আজকার বিশ্বসভ্যতার অধিকারী আমরা হতে পারবো না, তবে ট্রাইবেল সভ্যতাই আমাদের চাওয়া উচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান যন্ত্র-শিল্পে গড়া বিশ্বসভ্যতার যেখানে এসে আমরা পৌঁছেছি তাকে যদি আমরা রাখতে চাই, ভোগ করতে চাই, আরো সুন্দর ও মহৎ করতে চাই, তবে আমাদের রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি মানসিক রিপুগুলির উপর অধিকার স্থাপন করা চাই। অর্থাৎ এই সভ্যতাকে বহন করার মতো মহান মনের, শিক্ষিত মনের ও পটু মানসিকতারও প্রয়োজন আছে।

যাই হোক, পূর্বের কথায় আবার ফিরে যাই। ইংরেজকে ভালোবাসি—একথা যখন গান্ধীজী বলেছেন, তখন একথাও বলেন যে, ভালোবাসি বলে তার দোষ-গুলিকেও ভালোবাসি না, তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না, তার ভালোর জন্যই তাকে অহংকারমুক্ত, সাম্রাজ্যমুক্ত ও রোগমুক্ত করতে চাই। এতে যদি কষ্ট হয় তাদের, তাতেও কোন ঘাবড়াবার কারণ নেই—রোগীকে ভালো করতে গিয়ে যদি তার উপর অস্ত্রোপচার করতে হয় তা-ও করতে হবে, তার মানে রোগীকে শত্রু করা হচ্ছে না। তাঁর নিজেরই ভাষায়, "I accept the interpretation of Ahimsa, namely, that it is not merely a state of harmlessness, but it is a positive

state of love, of doing good even to the evil-doer. But it does not mean helping the evil-doer to continue the wrong or tolerating it by passive acquiescence. On the contrary, love, the active state of Ahimsa, requires you to resist the wrong-doer by dissociating yourself from him even though it may offend him or injure him physically. Thus if my son lives a life of shame, I may not help him to do so by continuing to support him, my love for him requires me to withdraw all support from him, although it may mean even his death. And the same love imposes on me the obligation of welcoming him to my bosom when he repents.

"Non-co-operation is not a passive state but it is an intensely active state—more active than physical resistance. Passive resistance is a misnomer. Non-cooperation in the sense used by me must be non-violent and therefore neither punitive nor vindictive nor based on malice, ill-will or hatred. It follows therefore that it would be a sin for me to serve General Dyer and cooperate with him to shoot innocent men. But it will be an exercise of forgiveness or love for me to nurse him back to life, if he was suffering from a physical malady." (Young India, 25. 8. 20, quoted by N. K. B.—page 168)

"আমি অহিংসার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছি যে "অহিংসা কখনো কারও ক্ষতি করবে না", এমনি ধরণের নেতিবাচক নিষ্ক্রিয়তাবাদ নয়, বরং এটি একটি ইতিবাচক ভালোবাসার শক্তি, যে ভালোবাসা দুষ্কৃতকারীরও মঙ্গল চায়। কিন্তু দুষ্কৃতকারীকে তার দুষ্কর্মে সহায়তা করা অথবা তার কৃত অন্যায়কে বরদাস্ত করে যাওয়া অথবা নীরবে সহ্য করে যাওয়া অহিংসা নয়। বরং এই ভালোবাসা বা অহিংসার সক্রিয় শক্তি দুষ্কৃতকারীকে বাধা দিতে বাধ্য করবে। নিজেকে সর্বপ্রকারে দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে এমন অসহযোগিতা করতে হবে যাতে হয়তো তাকে আহত করা হতে পারে, এমন কি শারীরিক ক্ষতিসাধনও হওয়া সম্ভব। আমার ছেলে যদি লজ্জার জীবন যাপন করে, আমি নিশ্চয়ই তার সেই ঘৃণিত জীবন যাপনে সাহায্য করবো না, আমার ভালোবাসা আমাকে বরং তাকে আমার সকলপ্রকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য করবে, তাতে যদি তার মৃত্যুও ঘটে, তাতে বিচলিত হলে চলবে না। যদি সে অনুতপ্ত হয় ও সে-পথ বর্জন করে তবে আমার ভালোবাসা তাকে তক্ষুনি আমার নিজের বুকে টেনে আনতে দ্বিধা করবে না।

"অসহযোগ কখনো নিষ্ক্রিয়তা নয়, এ একটি তীব্র ও সক্রিয় শক্তি—শারীরিক প্রতিরোধের চেয়ে অনেক বেশী তার সক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শব্দের কোন অর্থ হয় না। অসহযোগ আমার কাছে অহিংস অর্থাৎ তাতে কোন প্রতিশোধের ইচ্ছা,

জিঘাংসা প্রবৃত্তি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ঈর্ষা বা ঘৃণা নেই। এর থেকেই বোঝা উচিত যে আমার পক্ষে জেনারেল ডায়ারের কাজে সহায়তা করা অথবা তার মানুষ মারায় সহযোগিতা করা অত্যন্ত পাপ। কিন্তু সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে তবে তাকে সেবার সাহায্যে ভালো করে তোলা আমার কাছে ক্ষমা ও প্রেমধর্মের অন্তর্গত কর্তব্য বিশেষ।"

অতএব আমরা বুঝতে পারছি গান্ধীর অহিংসা বা সত্যাগ্রহের সাথে তথাকথিত শান্তিবাদ বা pacifism বা নিষ্ক্রিয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই। মহাত্মাজী সংগ্রামকে মস্ত বড় স্থান দিয়েছেন। যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহের সাহায্যে এই সংগ্রাম করতে চেয়েছেন। এখানে লেনিনের একটা কথার আলোচনা করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। লেনিন বলেছেন: An oppressed class which does not use arms, deserves to be treated like slaves. We cannot forget, unless we have become bourgeois pacifists or opportunists, that we are living in a class society, that there is no way out and there can be none, except by means of class struggle and overthrow power of the ruling class." (The Disarmament Slogan. Collected works, Vol. XIX p. 355)

"যে নির্যাতিত শ্রেণী নিজেদের মুক্তির জন্য অস্ত্রশিক্ষায় বিরত হয় তার পক্ষে দাস থাকাই উচিত। যদি আমরা বুর্জোয়া শান্তিবাদী ও সুবিধাবাদী না হই, তাহলে আমাদের কখনো একথা ভুললে চলবে না যে আমরা যে, সমাজে বাস করি তা শ্রেণী-বিভক্ত এবং শ্রেণীযুদ্ধ ছাড়া, শাসকশ্রেণীকে গদিচ্যুত করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই; মুক্তির আর কোন উপায় থাকতে পারে না।"

এতো পরিষ্কার ভাবে এবং এতো খোলাখুলিভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা লেনিন বলেছেন—এরচেয়ে সোজা করে আর বলার দরকার পড়ে না। কিন্তু, এজাতীয় কথা লেনিন সর্বদাই বলেছেন তা নয়। শ্রেণীযুদ্ধের সাহায্যেই শ্রেণীহীন সমাজের গঠনের কথা হাজারোবার বলেছেন **কিন্তু অস্ত্র ধরতেই হবে, এমন ধরণের কথা সর্বদা বলেন নি।** যে দৃষ্টান্ত দিলাম তা চরম উদাহরণ। কিন্তু এখানে অস্ত্রের কথাটা চিরকালের সত্য নয়। চিরকালের সত্যটা হলো শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনের কথাটা। **শ্রেণী সংগ্রাম শেষপর্যন্ত সব দেশে সব কালে অস্ত্রধারণ করেই করতে হবে এমন কথা মার্কসবাদের-লেনিনবাদের নিত্য-সত্য নয়।** বাস্তব অবস্থার উপরেই তা নির্ভর করে। একথাও লেনিন বলেছেন। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতম কংগ্রেসেও একথা স্বীকার করা হয়েছে যে বিনাঅস্ত্রে ও বিনা গৃহযুদ্ধেও অনেক দেশে সমাজতন্ত্র বর্তমানে আনা সম্ভব ও সেদিকেই সর্ব চেষ্টা নিবদ্ধ রাখতে হবে। আসল কথাটা এই, **সংগ্রামটা চাই—কিন্তু অস্ত্র দিয়েই সংগ্রাম হবে এমন কোন কথা নেই।** অতএব গান্ধীজী যদি এমন কোন সংগ্রামের কৌশল আমাদের দিতে পারেন যাতে সংগ্রামটি বেশ চলবে অথচ অস্ত্রের দরকার হবে না—তবে তা এখন লেনিন-বিরোধী হবে কেন? বিপ্লবটি চাই, সংগ্রাম করার ক্ষমতা চাই—ঠিক কথা,

কিন্তু অস্ত্র চাই-ই চাই—অস্ত্রই বিপ্লবের রূপ, এমন ধরণের বক্তব্য আজ আর গ্রাহ্য নয়। কাজেই লেনিনের উপরে উধৃত কথার সার বস্তুর সাথে গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের কোন মৌলিক বিরোধ নেই।*

দেশ স্বাধীনতার কাজেই ও ইংরেজের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করার প্রয়োজন, **দেশের ভিতরকার দুষ্কৃতকারীদের ও কায়েমী স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে নয়, এমন ধরনের কথাও গান্ধীজী কখনো বলেন নি।** দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাছাড়া তিনি বলেছেন, "My non-violence would not prevent me figting my countrymen on the many questions that must arise when India has become free......I konw, however, that if I survive the struggle for freedom, I might have to give non-violent battle to my own countrymen which may be as stubborn as that in which I am now engaged. My collaboration with my countrymen to-day is confined to the breaking of our shackles. How we would feel and what we shall do after breaking them is more than I know." (Young India—30.1.30)

"দেশ স্বাধীন হবার পর যে সমস্ত জটিল অন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা উঠবে, **সেসব বিষয়েও আমার দেশবাসীদের সঙ্গে একদিন অহিংস সংগ্রাম আমাকে করতে হবে।...... আমি জানি যদি স্বাধীনতার সংগ্রামের পরও আমি বেঁচে থাকি তবে আমার দেশবাসীদের সঙ্গেও একদিন আমাকে অহিংসার লড়াই করতে হবে এবং সে সংগ্রাম আজকের চেয়ে কম কঠিন হবে না।** পরাধীনতার শৃংখল মোচন করার সাধারণ কর্মক্ষেত্রেই আজ আমার সকলের সাথে চলেছে সহযোগিতা, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর পরাধীনতার শৃংখল টুটে যাবার পর, আমাদের মনোভাব কি হবে এবং কি আমরা করবো, সেকথা তারা কিংবা আমি এখনও জানি না।"

এ থেকেই বুঝতে পারি **দেশীয় শোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল সংগ্রামের** সম্ভাবনার কথা। মার্কস্‌বাদীরা শ্রেণীসংগ্রামের সাহায্যে শ্রেণীহীন সাম্যসমাজ বলতে যা বোঝাতে চান, মহাত্মা গান্ধী অহিংসার সাহায্যে অহিংস শ্রেণীহীন সর্বোদয় সমাজ বলতে সেজাতীয় সাধনার কথাই বলেছেন। তিনি বারবার বলেছেন exploitation

* মাও-সে তুঙের উক্তি, বন্দুকের নলের মধ্য দিয়েই বিপ্লব আসে। বিপ্লবের এই অগ্নিনালিকার সূত্রটা সর্বকালে, সর্ব অবস্থায় সত্য নয়, ভবিষ্যতে হয়তো আরও হবে না। এজাতীয় কথাতে বিপ্লব ও বন্দুক যেন পরস্পর নির্ভর, একে অন্যের সহায়ক বলে মনে হতে পারে। এজাতীয় ঢালাও কথাবার্তা সমাজবিরোধী মতবাদের নামান্তরে পরিণত হতে পারে, গুন্ডাদেরই মনোবল বৃদ্ধি করতে পারে। সংগ্রামটা অবশ্যই চাই, কিন্তু বন্দুক ভিন্ন সংগ্রাম হতে পারে না, এজাতীয় কথার নিয়ন্ত্রণ চাই। বন্দুক-কামানের লড়াইকে কনভেনশন্যাল-ওয়ার বলা চলে, এই কনভেনশনাল-ওয়ার বন্ধ রাখার যুক্তিতেই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার সাফাই গাওয়া হয়। ধরা যাক্ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ে কেউ বন্দুক কামানের কনভেনশনাল লড়াই বন্ধ রাখলো, কিন্তু তখনকার ন্যায়ের জন্য সংগ্রামটা তো বন্ধ রাখা চলবে না? তখন সে লড়াই করার একটিই হাতিয়ার আজ দেখা যায় —যেটা গান্ধীজীর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের লড়াই।

is the root of Himsa—শোষণই হিংসার জড়। কৌশলগত পার্থক্য যতই থাকুক, মূল প্রেরণাগত আদর্শ ও সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ একই। যে ট্রাস্টিশিপবাদ নিয়ে গান্ধীকে আক্রমণ করা হয়, তার বিশদ আলোচনা আমরা যথাস্থানে করবো। কিন্তু সেই উপলক্ষেও গান্ধীজী ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা বলে গেছেন। যথা, "If, however, in spite of the utmost effort, the rich do not become guardians of the poor in the true sense of the term and the latter are more and more crushed and die of hunger, what is to be done? In trying to find out the solution of this riddle I have lighted on non-violent non-cooperation and civil-disobedience as the right and infallible means. The rich cannot accumulate wealth without the co-operation of the poor in society. If this knowledge were to penetrate to and spread amongst the poor, they would become strong and would learn how to free themselves by means of non-violence from the crushing inequalities which have brought them to the verge of starvation." (Harijan, 25.8.40, quoted by N.K.B. in Studies in Gandhism, page 98)

"যদি সর্ব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধনীরা গরীবদের সম্পত্তির ট্রাস্টি হিসেবে নিজেদের মনে না করে এবং যদি গরীবরা দিন কে দিন তাদের দ্বারা পিষ্ট হতে থাকে এবং ক্ষুধার জ্বালায় এমনিভাবে মরতে থাকে, তাহলে কি করা যাবে? এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই আমি অহিংস অসহযোগ ও আইনঅমান্যের আলো জ্বেলেছি। গরীবদের সহযোগিতা ভিন্ন ধনী কখনো ধনসঞ্চয় করতে পারে না। এই জ্ঞান যদি গরীবেরা পায়, এবং এই সত্য যদি তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তারা শক্তিমান হবেই এবং অহিংস অসহযোগের ও সত্যাগ্রহের বলে নিজেদের অচিরে মুক্ত করে নিতে পারবে এবং আজকের এই অনাহার ও বিধ্বংসী অসাম্য থেকে মুক্তি পাবে।"

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি **দেশী-বিদেশী সকল প্রকার জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার হাতিয়ার হিসাবেই গান্ধীজী গরীবের হাতে সত্যাগ্রহ নামক অস্ত্রটি রেখে গেছেন**। মার্কসবাদীরা এ অস্ত্র ব্যবহার করবেন না, যেহেতু গান্ধীজী মার্কসবাদী ছিলেন না—একথা হাস্যকর। মার্কস ধর্মঘট বা রাস্তার লড়াই (ব্যারিকেড ফাইট) আবিষ্কার করেন নি, তিনি প্রচলিত অভিজ্ঞতা ও চালু সংগ্রামকৌশলগুলিকে মার্কসবাদের অস্ত্রাগারে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বন্দুক, কামান, বারুদ-ও কমিউনিস্টদের আবিষ্কার নয়, তথাপি সেগুলি কি করে কমিউনিস্টরা ব্যবহার করেছে এতকাল? যদি মহাত্মা গান্ধী জনগণের হাতে তাদের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য সত্যাগ্রহ নামক হাতিয়ারটি দিয়ে থাকেন তবে মার্কসবাদীরা তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হলে বলবো জনতার স্বার্থের চেয়ে তাঁদের গোড়ামীর স্বার্থই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* * *

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে হিংসা ও অহিংসা ছাড়া সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন,

ও রক্ষা করার আর কি কোন ব্যবস্থা নেই? violence আর non-violence ছাড়া জগতে আর কি কোন শক্তি নেই? প্রশ্নের উত্তর কতকটা নির্ভর করছে আমরা এই দুই শক্তিকে কিভাবে বুঝি, তার উপর। সংকীর্ণ অর্থে ধরলে অবশ্য এই দুই শক্তিই মানুষের সব শক্তি নয়—কিন্তু ব্যাপক অর্থে ধরলে অনেক কথা এসে যায়। কায়িকশক্তি বা physical force বা অস্ত্রশক্তি ইত্যাদি হলো একপ্রকার শক্তি। গান্ধীজী দেখালেন ভালোবাসার শক্তি, আত্মত্যাগের শক্তি, অহিংসার শক্তি ইত্যাদি বলেও এক জাতীয় শক্তি মানুষের হাতে আছে। তাছাড়াও আরো শক্তির খবর আমাদের জানা আছে। যেমন, যুক্তির শক্তি বা force of reason, যাকে কথায় বলে force of logic. আমরা জানি ব্যবহারিক জগতে যুক্তির একটা বিরাট স্থান আছে। কেবলমাত্র যুক্তির সাহায্যেই আমরা আমাদের অনেক কাজ করে থাকি এবং সভ্যজগত অনেক সময় যুক্তির বিচার মানে, যুক্তি না থাকলে হার স্বীকার করে, যুক্তির জোর থাকলে জেতে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে। যুক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের মতবাদ প্রচার করি, নিজেদের দল বাড়াই, গণসমর্থন সংগ্রহ করি। যুক্তির সাহায্যে মামলা জিতি, ইত্যাদি। একদল দার্শনিক আছেন যাঁরা মনে করেন, মানুষ যুক্তিবাদী জীব এবং মানুষের জীবনে যুক্তিকে প্রধান স্থান দিতে হবে। যা যুক্তিসঙ্গত নয়, এমন কাজ মানুষ করবে না বা করতে পারে না, ইত্যাদি। তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কাজে, সমাজতন্ত্র আনয়নের কাজে যুক্তির সাহায্যই যথেষ্ট মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন আদর্শটিকে যদি যুক্তি দিয়ে জনতাকে ও সবাইকে বোঝানো যায় তবেই কাজ হবে, হিংসা অহিংসার লড়াই বা বিপ্লব করার দরকার হবে না। এদেরকে বলে Rationalist। লোকেদের শিক্ষিত করে তোলার উপরই সব নির্ভর করে এমন তাঁদের বিশ্বাস। Fabian Socialist-রা এজাতীয় লোক। কিন্তু এসব কথায় অনেক যুক্তিযুক্ততা থাকলেও আমরা দেখেছি যে মানুষের সব প্রেরণা, সব আবেগ, যুক্তি থেকেই আসে না। আমরা জানি, যারা সুবিধা দখল করে আছে তারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিতে চায় না। আমরা দেখেছি, তারা বলে, জোর যার ন্যায় তার—Might is right. যুক্তি দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত এমন সব কঠিন বাধার সম্মুখে এসে উপস্থিত হতে হয় যেখানে হয় সশস্ত্র, নয় নিরস্ত্র, যা হোক একটা সংগ্রাম ছাড়া এগোতে পারা যায় না। ছোট-খাট সাধারণ দাবি তাও প্রাণান্তকর ধর্মঘট ছাড়া পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া যুক্তির সাহায্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে বেশীর ভাগ ভোট পেয়েও প্রগতিবাদীরা যখন সরকার দখল করেছেন, অপরপক্ষের প্রতিবিপ্লব ও অস্ত্রাঘাত তা পণ্ড করে দিয়েছে, যেমন স্পেন দেশের ইতিহাসে। নানাদেশের ফ্যাসিবাদের উত্থানের ও পতনের কথাও মনে রাখতে হবে।

কিন্তু তাই বলে যুক্তির কোন বল বা ক্ষমতা নেই একথা প্রমাণ হয় না। এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে যুক্তির স্থান ও কার্যকারিতা সমান থাকে না। যুক্তিরও ইতিহাস আছে, অর্থাৎ যুক্তির রাজ্যও ধীরে ধীরে কিন্তু নানা সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে একথা বলা যায়। অর্থাৎ যুক্তির অধিকার অবস্থার উপর নির্ভর

করে। কোন অবস্থায় যুক্তি খুব কাজ করে, আবার কোনো কোনো সময় আসে, যখন যুক্তি অচল। এখানে ব্যক্তিগত জীবনে যুক্তির কথা বা স্থান সম্বন্ধে বলা হচ্ছে না। দেশের বড় বড় ব্যাপারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্তির স্থান নির্ণয় করার কথা ভাবা যাচ্ছে। Atmosphere বা পরিস্থিতিটা যদি কটু, অসহনীয় ও তিক্ত হয়ে ওঠে, তখন যুক্তির স্থান খুব কমে যায়। আর যদি পরিস্থিতিটা অহিংস বা গণতান্ত্রিক থাকে তবে যুক্তির কাজ বেশ চলে। কথা হচ্ছে, এই যুক্তির ক্ষেত্র আজ দেশে দেশে বেড়ে চলেছে না হ্রাস পাচ্ছে? বলতে পারা যায় যে যুক্তির ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। তার একটি লক্ষণ হলো সকল দেশে সাধারণের ভোটাধিকার দিন দিন বেড়ে যাওয়া। আজ অনেক দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই এবং মেয়েদেরও ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, ফলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ক্ষেত্র বেড়েছে। এই গণতান্ত্রিক অধিকার কার্যকরী করার প্রধান উপায় হলো যুক্তির সাহায্যে রাজনীতি চালানো।* যে দল যুক্তি দেখাতে পারবে না সে দল হেরে যাবে। ফলে কে কত যুক্তিপূর্ণ তার একটা প্রতিযোগিতা হতে বাধ্য। অবশ্য দলগুলি যে ভোটারদের যুক্তি শক্তির উপরই আবেদন করে থাকে তা নয়—প্রায় ক্ষেত্রেই নানা sentiment, prejudice ও হুজুগ ইত্যাদি emotional appeal-ই করে থাকে। তাহলেও সেসব ভাবাবেগগুলিকেও যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে উপস্থিত করতে তারা বাধ্য হয়, এবং শুদ্ধ যুক্তিও কাজ করে থাকে। অর্থাৎ যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণের স্থানও প্রশস্ত হচ্ছে, একথা বলা যায়।

এই যুক্তির লড়াই শেষপর্যন্ত গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের রূপ গ্রহণ করছে। গণতান্ত্রিকতা মানে কেবল ভোট সংগ্রহ করাই নয়, যুক্তির সাহায্যে অপরের যুক্তিকে খন্ডন করা, যুক্তির প্রয়োজনে সহনশীলতায় অভ্যস্ত হওয়া, অপরের যুক্তিতে বিরক্ত বা হিংস্র প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে যুক্তিসম্মত উপায়ে তাকে পরাজিত করা ইত্যাদির সমবেত রূপ হলো গণতান্ত্রিক শক্তি। Universal franchise হলো এই গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটা বিশেষ শক্তি। অতএব আমরা হিংসা, অহিংসার শক্তি ছাড়াও আরও একটা শক্তি দেখছি, তাহলো গণতান্ত্রিক শক্তি—যার পিছনে আছে যুক্তির শক্তি। যাঁরা সাংবিধানিক বা constitutionalist বা গণতান্ত্রিক বা Democrat তাঁরা এই জাতীয় শক্তির উপরই চলে থাকেন। এটা কম শক্তিশালী হাতিয়ার নয় এবং এই হাতিয়ারকে সমাজে কায়েম করতে কম হিংসা ও অহিংসার লড়াই ও বিপ্লব করতে হয়নি মানুষকে। চিরকালই মানুষ হিংসা ও অহিংসার বিপ্লব করে বেড়াবে, না হিংসা ও অহিংসার বিপ্লব শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতে এমন আরও একটা স্থায়ী উপায় ধরিয়ে দেবে যার সাহায্যে যাবতীয় রাজকার্য সম্পন্ন করা যাবে—তারই

* এই উক্তি আজকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চোখ বুজে মেনে নেওয়া চলে না। সাধারণের ভোট কীভাবে কেনা হচ্ছে, নির্বাচনে কী ধরনের দুর্নীতি ঢুকেছে, নির্বাচনব্যবস্থা কীভাবে ক্রমশই অর্থবলের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যেখানে জনসাধারণ তাদের ভোটের মূল্যও বুঝতে পারছে না, এসব বাস্তব হতাশাজনক অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে বোঝা দরকার যে যুক্তিকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আবার অহিংস সত্যাগ্রহী সংগ্রামের দরকার আছে।

রূপ হলো গণতান্ত্রিক সরকার, সাধারণের সমর্থিত ভোটে প্রতিষ্ঠিত সরকার। অনেক লড়াই, অনেক সাধ্যসাধনা করে এই গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এই নিয়মকে মেনে যে নিয়মতান্ত্রিকতা তারই সাহায্যে আমাদের যাবতীয় সামাজিক আর্থিক পরিবর্তনের যা যা দরকার তা করা যাবে, এ হলো একটা ইতিহাসের ধাপ। অর্থাৎ ইতিহাস এক স্তরে এসে এই নিয়মকে মেনে নিচ্ছে।

এখানে শিক্ষার শক্তিকেও একটু আলাদা করে বিচার করা দরকার। যুক্তির শক্তি মানেই শিক্ষার শক্তি নয়। মূর্খেরও যুক্তি আছে, আবার শিক্ষিত লোকেরও যুক্তি আছে। শিক্ষিত লোকের যুক্তি নিশ্চয়ই মূর্খের যুক্তির চেয়ে উচ্চস্তরের। অতএব যে পরিমাণে দেশে শিক্ষার বিস্তার বেড়ে চলেছে সেই পরিমাণে যুক্তির মানও বেড়ে চলবে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা আজ আরও অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চলছে। শুধু নিরক্ষরতাই দূর হচ্ছে না, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কৃষ্টির শিক্ষা দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়ে প্রত্যেক দেশের সর্বসাধারণের উন্নতির কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এসবের প্রভাব আমাদের মূল যুক্তিশক্তিকে উন্নত করতে বাধ্য।

এমনি করে দেখতে গেলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে সংস্কৃতি বা কালচারেরও একটা শক্তি আছে। দেশে দেশে নানা কৃষ্টির সংযোগ ঘটতে শুরু করেছে, এতে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষের ক্ষেত্র কমে আসছে এবং সকল মানুষই যে এক এবং ভাই ভাই এ সত্যও ক্রমশঃ সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করে তুলছে, এবং সংস্কার বা prejudice-এর ক্ষেত্র কমে আসছে।* এতে সহনশীলতা, সহঅস্তিত্বের প্রেরণাগুলি বেশী সমর্থিত হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার ক্ষেত্র প্রশস্ত হচ্ছে। এই কৃষ্টিরও একটা শক্তি আছে। কৃষ্টির শক্তি অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ও গায়ের জোরের শক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী। অতীতে ভারতের কৃষ্টি বিনা যুদ্ধে চীন-জাপান, কম্বোডিয়া, সুমাত্রা, বালি ইত্যাদি কত দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক ধর্মের সংস্কৃতির ও নৈতিক আকর্ষণই দেশে দেশে বিস্তার লাভ করেছে—তরবারির সাহায্যে যে ধর্ম ও কৃষ্টি বেড়েছে, সেব বিস্তার কৃষ্টিও নয় এবং ধর্মও নয়—জাগতিক স্বার্থের বিস্তার মাত্র। বর্তমান যুগেও দেখি এক একটা আদর্শ বা Ideology, যেমন কমিউনিজম্, সমাজতান্ত্রিকতা, নৈরাজ্যবাদ, গান্ধীবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি ভাবধারার শক্তিগুলি গায়ের জোরে বাড়ে নি—তাদের নিজস্ব কৃষ্টির, যুক্তির ও নৈতিক আবেদনেই দেশে দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্যই এইসব ভাবধারা অনেক অনেক সংগ্রাম, বিরোধ, বিপ্লব ঘটিয়েছে—কিন্তু তাদের যে একটা নিজস্ব প্রসার-প্রবণতা আছে তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।

তাছাড়া ন্যায় ও নীতিধর্মের বা ethics-এর একটা শক্তি আছে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে কম নীতিধর্মের মহড়া দেয় নি। প্রত্যেক যুগে মহৎ লোকেরা,

* শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার মানুষের বিচার ও চেতনাতে উন্নতি ঘটিয়ে যুক্তিবাদের ক্ষেত্র প্রসার করছেই—এটা আর বাস্তব ক্ষেত্রে চোখ বুজে মানা চলে না। আজ সব দেশগুলি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার জন্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষটাও যেন বাড়ছে। কাজেই তথাকথিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার চিত্তের ও চিন্তার প্রসারতা বাড়াচ্ছেই বা বাড়াবেই এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

সাধুজনেরা, ধর্মনেতারা যেসব নীতির কথা, মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি, দেখিয়ে গেছেন, তার পুঞ্জীভূত শক্তি মানুষের ইতিহাসের ভান্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। আমরা জানি খৃষ্টানেরা খৃষ্টকে ভুলে গেছে, আমরা জানি ভারতীয়রা বুদ্ধকে ভুলে গেছে। ধর্মাবতার, ন্যায়াবতারদের আমরা ইতিহাসের অন্ধকক্ষে পরিত্যাগ করে রেখেছি, প্রাত্যহিক জীবনে তাদের উপদেশ আমাদের জীবনকে বিশেষ নিয়ন্ত্রিত করে না। কিন্তু একেবারেই করে না, এমন ধরনের কথা বলা একপেশে চিন্তা মাত্র। আজও আমাদের শিশুদের মন রাম লক্ষ্মণ সীতার আদর্শ দিয়ে তৈরী হয়, আজও বহু দেশের শিশুদের চরিত্র খৃষ্টের কথা দিয়ে শুরু হয়। বীরত্ব, সত্যবাদিতা, প্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি যেসব গুণ আমাদের কিছু না কিছু আছে, সেই সব মূল্যবোধগুলির গোড়ায় প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ও নৈতিক সঞ্চয়সমূহ অলক্ষ্যে খাদ্য জুগিয়ে চলেছে। আজ আমরা শুধু একটি দেশেই বাস করি না—পৃথিবীর নানা জাতির নানা দান, নানা কৃষ্টি, নানা নীতিধর্মের সাথে আমাদের সহযোগ ঘটেছে, ফলে আন্তর্জাতিক নীতিবোধ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। আজ আমাদের নীতিগত সম্পদের, আদর্শগত সম্পদের সঞ্চয়টাও বৃহৎ বিশ্বভান্ডার থেকে আমরা গ্রহণ করছি এবং নিজেরা বিশ্বভান্ডারে কিছু না কিছু দান করছি। আজ পৃথিবীর কোন কোণে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি কোথাও নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ঘটে, চারদিক থেকে সাহায্যের তাড়া পড়ে যায়, এথেকেই বোঝা যায় আজ মানবতাবোধ কত ব্যাপক হতে চলেছে। আজ বিশ্বসভায় নিজেদের মান-ইজ্জত ও ভদ্রতা রাখার একটা দায় এসে জুটেছে। আজ নিজেদের ঘরের কোণে নিজেরা নিজেদের কূপমন্ডুকতা নিয়ে সন্তুষ্ট নই। আজ আমাদের লজ্জাবোধও বেড়ে গেছে। কোনও ব্যাপারে, তা নারী স্বাধীনতাই হোক, জনমুক্তিই হোক, পশুপালনই হোক, বৃক্ষ-সম্পদই হোক, বন্যপশুসম্পদ সম্পর্কেই হোক, কারো কাছে আমরা হেয় বা হীন প্রতিপন্ন হতে চাই না কোন বিষয়েই। আজ positive forces of goodness বা মহত্ত্বের সততার শক্তিগুলিও কাজ করে চলেছে।

Humanism বা মানবিকতার দাবিও আজ ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে চলেছে। মানবিকতা কথাটা ব্যাপক, তাহলেও আমরা জানি মানবিকতাবোধ আজ সকল মানুষকে আকৃষ্ট করে তুলেছে—দলের পার্থক্য, মতের পার্থক্য, দেশের পার্থক্য, রুচির পার্থক্য, আর্থিক ব্যবস্থার পার্থক্য—এতসব কিছু বাধাকে অতিক্রম করেও "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—এই দাবি ক্রমশঃ সর্বজনস্বীকৃত হতে চলেছে। এবং এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই মানুষের রূপান্তর, ভাবান্তর ঘটে চলেছে। আর এসব ঘটছে কমবেশী শান্তির মধ্য দিয়েই।

গান্ধীজী বলেন, উপরোক্ত যে সব শক্তির বর্ণনা করা হলো—যেমন যুক্তির শক্তি, গণতান্ত্রিকতার শক্তি, শিক্ষার শক্তি, কৃষ্টির শক্তি, ন্যায়ের শক্তি, শান্তির শক্তি, মানবিকতার বা বিশ্বপ্রেমের শক্তি, ইত্যাদি সবই অহিংসার অন্তর্গত জিনিষ। **অর্থাৎ অহিংস অবস্থায় এ সবের বিকাশ দ্রুততর হয়।** অহিংসা ছাড়া আর কোন শক্তি নেই, একথা যদি ব্যাপক অর্থে হিসেবে ধরি, তবেই অহিংসার প্রকৃত অর্থ হয়। নাহলে

অহিংসাকে যদি কেবল সত্যাগ্রহ আন্দোলনই বলি, তবে তা বিকৃত হতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে গান্ধীজীর ভগবান হলো সত্য, অহিংসা নয়। সত্যের মধ্যে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে—এবং অহিংসা তাঁর সত্যকে পাবার উপায় মাত্র। অতএব সত্যই হলো সব, অহিংসা সব নয়। সত্য ও অহিংসার মধ্যে সত্যই যে বড় একথা গান্ধীজী নিজেও ইঙ্গিতে স্বীকার করেছেন, যখন তিনি বলেছেন, By instinct I was truthful but not non-violent. As a Jain *muni* once rightly said, I was not as much a votary of Ahimsa as I was of truth, and I put the latter in the first place and the former in the second. *For, as he put it, I was capable of sacrificing non-violence for the sake of truth.* In fact it was in search of truth that I discovered non-violence. (The Mind of Mahatma Gandhi—Prabhu & Rao, page. 51) সত্যের বিকাশ আজ অহিংসার মাধ্যমেই সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন হবে, এই হলো তাঁর কথা। অন্য কোনো উপায়ে সত্যের অনুসন্ধান করলে তা হবে স্বার্থদুষ্ট, একপেশে ও ভ্রমপ্রবণ।

আরো একটা বিশেষ ও ব্যাপক শক্তির কথা যদি আমরা আলোচনা না করি তবে মস্ত ভুল হবে। সেই শক্তি হলো অবস্থার চাপ বা force of circumstances। অবস্থা, পরিস্থিতি বা circumstance বা environment বলতে মস্ত একটা কথা বোঝায়। বাস্তব জাগতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া উপরোক্ত শক্তিগুলিরও সম্যক বিচার সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিকতা, যুক্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম, শিক্ষা, কৃষ্টি, অহিংসা ইত্যাদি শক্তিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বশক্তিতে সম্পূর্ণ নয়। বাস্তব পরিস্থিতি পিছন থেকে তাদের যোগ্যতা, কার্যকারিতা, সার্থকতার ক্ষেত্র ও সাহায্য জুগিয়ে থাকে। এক যুগে, এক দেশে যে যুক্তি অচল, ভিন্ন যুগে, ভিন্ন অবস্থায় সে যুক্তি বিশেষ কার্যকরী হতে পারে। এক যুগে হিংসাই একমাত্র শক্তি, আবার অন্য যুগে, অন্য অবস্থায় অহিংসাই একমাত্র শক্তি—এমন ধরনের তথ্য ইতিহাস থেকে দেখিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব। অতীতে মানুষ বহু রক্তপাত করেছে, তারা খুব হিংস্র ও বদমায়েস ছিল বলেই যে করেছে তা নয়—সেদিনকার অবস্থায় তাই ছিল বাস্তব-রীতি সম্মত। আজ হিংসা বা যুদ্ধ অসম্ভব। অহিংসার বাণী এসেছে বলেই নয় —হিংসার চরম বিকাশের জন্য। অহিংসা আগেও লোকে জানতো এবং ঘরে ঘরে সমাজে ছোটখাট কাজে লাগাতো—কিন্তু ব্যাপক রাজনীতির ক্ষেত্রে লাগাবার মত বাস্তব পরিস্থিতি তখনো হয় নি। কিন্তু আজ অবস্থার চাপে হিংসা রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশই অচল হয়ে উঠছে অথচ গান্ধীজী দেখিয়েছেন অহিংসাকে ব্যাপক রাজনীতির ক্ষেত্রে লাগানো সম্ভব। হিংসার তীব্রতা দেখেই অহিংসার আবিষ্কার করেছেন গান্ধীজী, এমন নয়। কিন্তু তাঁর অহিংসার বাণী এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারতো না, যদি না হিংসার অসহায়তা ধরা পড়তো, যদি না সাধারণ মানুষ এই হিংসার যুগে অহিংস লড়াইয়ের কৌশল ও কার্যকারিতা বুঝতে পারতো।

অবস্থার চাপ বলতে শুধুই যুদ্ধের ভয়াবহতার কথাই বোঝায় না। তার একটা

positive দিকও আছে। সে হলো মানুষের Econc-Technological achievement বা অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি-শক্তির বিকাশের দিক। যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে এক নতুন জগতে, নতুন সম্ভাবনার মধ্যে এনে পেঁছে দিয়েছে। যন্ত্রসভ্যতার অর্থনৈতিক অবদান ভিতর থেকে মানুষের পায়ের তলায় ভিত স্থাপন করে দিয়েছে। বিজ্ঞানচালিত শিল্পশক্তি এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে যে কারোরই নিরন্ন থাকার দরকার করে না। সকল মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে, সমান অধিকারে থাকতে পারে। এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করে বেঁচে থাকার দরকার নেই। উৎপাদিকা শক্তি এমন ক্ষমতা আমাদের হাতে এনে দিয়েছে যে একজনকে অপরের শোষণের উপর বেঁচে থাকার আর কোন যুক্তিযুক্ততা নেই। মানুষের মানুষ-শোষণ করার প্রয়োজন মিটে গিয়েছে, প্রকৃতিকে শোষণ ও বিজ্ঞানকে দোহন করে সবাই আমরা রাজার মতো থাকতে পারি। সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন নেই, ধনতন্ত্রের প্রয়োজন নেই উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে —কাজেই এসব শক্তি আজ সেকেলে ও গতায়ু হয়ে উঠেছে। সাদা ও কালোর মধ্যে যে ঘৃণা তার পিছনে রঙের অসহনীয়তা কাজ করছে না, করছে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন আজ আর নেই, তাই সাদা ও কালোরা ভাই ভাই—এ সত্য আজ আর লুকিয়ে রাখবার দরকার হচ্ছে না। মানুষকে সুন্দর ও সহজ জীবন যাপন করতে হলে একদল দাস ও হরিজনের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই—তাইতেই মানুষের সমান অধিকারের দাবি আজ এতোই সহজগ্রাহ্য হয়ে ওঠেছে। ভয়ংকর লড়াই ছাড়াও বিশেষ অধিকার (special rights) ও সুবিধা (privilege) ত্যাগ করতে মানুষ রাজি হচ্ছে। ফলে পরিবর্তনটা এতো সহজে হয়ে গেছে, অপরপক্ষকে ধ্বংস, ধনীদের নির্বংশ বা ধ্বংস না করেও ধনতন্ত্রের অবসান করা সম্ভব হয়ে উঠছে—শান্তিপূর্ণ উপায়ে, সত্যাগ্রহের পথে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে, গণতান্ত্রিক উপায়েও বিপ্লব সম্পূর্ণ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।*

* এই প্যারাগ্রাফের বক্তব্যটা আজ মূল লেখার ত্রিশবছর পরে আমি আর বিশ্বাস করি না। কিন্তু যেহেতু এজাতীয় বিশ্বাস অনেক প্রগতিবাদীর আজও আছে যে পৃথিবী অনন্তসম্ভবা এবং সকলকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রাচুর্যের উচ্চতম জীবনমান দেওয়া সম্ভব সেই হেতু সেদিন আমি যা লিখেছিলাম, জেলে বসে, তার সবটাই রেখে দিয়ে পাদটিকা দিয়ে আমার ভুল ধারণাটাকে সংশোধন করছি। Limits of growth (লিমিট্স্ অফ্ গ্রোথ) আজ ধরা পড়েছে। পৃথিবীর non-renewable resources অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। বায়ুমন্ডল, জল বা পরিবেশ দ্রুত বিষাক্ত হয়ে উঠছে। পৃথিবীর প্রাণশক্তি অদূর ভবিষ্যতে ত্রাহি ত্রাহি রব করবে, সন্দেহ নেই। ভোগবাদের সন্ধানেই আজ মানুষের এই সংকট উপস্থিত।

প্রাচুর্য বা affluence for all সম্ভব হবার কথা নয়। বরং গোষ্ঠী বিশেষের প্রাচুর্য রক্ষা করতে হলে বহুলোকদের রিক্ত করতে হবে, তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে থাকবে। গরীবী বা দারিদ্র্য হটবে না, বরং দারিদ্র্যকে একটা স্থায়ী প্রথা বা সিস্টেম হিসেবে বজায় রাখতেই হবে, যেমন আজকের দিনে হরিজন না রাখতে পারলে ভাঙ্গি→

এই অবস্থার বর্ণনা করার সময় এসব কথাও ভুললে চলবে না যে আজ অনেক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অনেক উপনিবেশ স্বাধীন হয়েছে, তারাও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে।* তাদের মিলিত শক্তিটা আজ এতোই প্রবল হয়ে উঠেছে যে অপর পক্ষের সহজে যুদ্ধে নেমে আসা আর সহজ নয়, বরং দিন কে দিন সে

←বা মেথরের কাজ করবে কে? এজাতীয় যুক্তিতেই মুষ্টিমেয়কে প্রাচুর্যের সম্ভোগ দিতে হলে, বিশাল জনসমুদ্রকে দরিদ্র করে রাখতেই হবে। তৃতীয়বিশ্বের পিছিয়ে পড়া লোকদেরই কেবল দরিদ্র রাখলে চলবে না। তথাকথিত সমৃদ্ধ দেশগুলিতেও ক্রমবর্ধমান ডোল-নীতি, ভরতুকীজীবী দরিদ্রের অনেক পকেট সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রাচুর্য দিয়ে সামাজিক বিরোধ দূর করা যাবে, শ্রেণীগত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে, চোখের জল না ফেলে painless equal distribution of wealth নিরুপদ্রবে সম্পদের সমবন্টন হবে, এই সুখ স্বপ্ন আজ ভূলুণ্ঠিত।

ভাগ করে নেবার, সমান ভাগ করে নেবার সংগ্রাম চলছে, আরও অনেককাল পর্যন্ত তা চলবে। কিন্তু সুখ দুঃখ সমানভাবে, সকলে ভাগ করে সত্যিকার সাম্য-সমাজ তৈরী করতে হলে কেবল সকলকে সমান করার সংগ্রামই সবটা নয়, আবার সবাইকে এক করার বৃহত্তর সংগ্রামও চালু করতে হবে, এই ধরনের মূল্যবোধ ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া সব দেশের, সব মানুষ, সবাই মিলে এক, এ বোধটা না থাকলে সকলের সমান অধিকারই বা আমরা স্বীকার করতে যাবো কেন?

মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট চিন্তাধারায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক সম্বন্ধে ধনতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার যত পার্থক্যই থাকুক, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট চিন্তাধারা প্রায় একরকমই। অর্থাৎ প্রকৃতিকে দোহন করো, শোষণ করো, এবং মানুষের অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ চরিতার্থ করো। ফলে উভয় দৃষ্টিভঙ্গীই দস্যুর মতো। কিন্তু আজ এই কথাটা সবাইকে মেনে নিতে হবে, প্রকৃতির উপরে বলাৎকার করা চলবে না। ধরিত্রীমাতাকে মাতা বলেই স্বীকার করে নিতে হবে, তার উপরে বলাৎকার করা চলবে না। And in these days of scarcity, the most basic need is to be human, which means a living style of life which is biological and psychological harmony with the rest of the creation. পৃথিবীকে বাঁচাও এবং নিজেরা বাঁচো। Harmony of human interest সম্ভবই নয়, যদি unity of all mankind স্বীকার না করি। অথচ এই unity equality-র কোন বিরুদ্ধ শক্তি নয়।

আমার বর্তমান পরিবর্তিত মতামত—সভ্যতার সংকট ও তা থেকে মুক্তি সম্বন্ধে—আমার আজকালকার লেখা বহু লেখাতে আছে, বিশেষ করে "বিতর্ক" নামক বইতে।

* সদ্য স্বাধীন দেশগুলির ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিকাশ ও উন্নয়নের যে সুবর্ণময় স্বপ্ন দেখা গিয়েছিল, তাতেও অনেক কীটদুষ্টতার লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। ভোগবাদ এসব সদ্যস্বাধীন ও নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেও বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে তুলেছে। তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দেউলে অবস্থা বিশেষ→

সম্ভাবনা কমে আসছে। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণও আজ অনেক বেশী সজাগ ও অগ্রগামী। তারাও কোন না কোন প্রকারের সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে। রাজনীতির এই বিশ্ব-পরিস্থিতিটাও একটা অবস্থার চাপ বা শক্তি। এই শক্তিগুলি ক্রমশই গণতান্ত্রিকতা ও অহিংসার শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলছে।

এরকম অবস্থায় অবশ্য কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে আর হিংসার লড়াইয়েরও প্রয়োজন নেই, অহিংসার আত্মত্যাগের লড়াইয়েরও প্রয়োজন নেই, লেনিনেরও দরকার নেই, গান্ধীরও প্রয়োজন নেই। তাঁরা মনে করেন, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এসব মতবাদ দিয়েই সম্ভব হবে, নিয়মতান্ত্রিকতাই যথেষ্ট। কিন্তু এমন ধরনের চিন্তায় যুক্তি থাকলেও সুবিধাবাদ বেড়ে যাবে। বিশ্বের প্রধান প্রধান সংগ্রাম-ক্ষেত্র হয়তো কমে গেছে, বড় যুদ্ধ ও রক্তবিপ্লবের পটভূমিকা হয়তো আর নেই—**কিন্তু ছোট ছোট লড়াই সর্বত্র রয়েছে এবং তাদের মিলিত ছবিটা কম ভয়াবহ নয়।** ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, **গোপন হিংসা বা কুৎসা ইত্যাদি তো আছেই,** তাছাড়া প্রায় সব দেশেই এখনো শ্রেণীসংগ্রাম তেমনি তীব্র রয়েছে, অতএব সংগ্রামের ক্ষেত্র রয়েছে। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ এখনো ধ্বংস হয় নি, তার অনেক পকেট পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। গোটা আফ্রিকাই তো রয়েছে। আজও নিগ্রোদের উপর অত্যাচার কম নেই। আজও হরিজনদের আমরা সম্মান করতে শিখি নি। আজও সমাজতন্ত্র আমরা শুরু করতে পারি নি—ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব চোখ বুজে শান্তির স্বপ্ন যদি **দেখি তবে তা স্বপ্নবিলাসিতা ও সুবিধাবাদ। আজও অনেক ত্যাগ, অনেক শহীদের প্রয়োজন আছে—মুক্তির রাজ কায়েম হয় নি।** অবশ্য সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা বিরাট গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছে সব দিক থেকে। তাহলেও সেই গতিবেগকে আরও বেশী দ্রুততর ও কার্যকরী করবার দায়িত্ব রয়েছে। **প্রতিবিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা** আজও শেষ হয়ে যায় নি, **যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় নি।** অতএব মানুষের সংগ্রামচেতনা, মানসিক শক্তি, নৈতিকবল, আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, আজ যে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়েই বিশ্ব রূপান্তরের বাকি কাজটা করে ফেলার মত অপূর্ব সুযোগ এসেছে, তার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে এবং তা করতে হলে complacency বা অতিনিশ্চয়তার কোন স্থান নেই, বরং দুরন্ত বেগে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে হিংসা ও যুদ্ধের শক্তিগুলি আর মাথা তুলতে না পারে। যাতে তাদের বর্তমান পরাজয়ের অবস্থাকে আর তারা কাটিয়ে উঠতে না পারে।

←চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। ভোগবাদ, অথবা ইন্দ্রিয়বিলাস ও প্রাচুর্যের স্বপ্নই তাদেরকে এই স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটিয়ে মারছে, নানা ধরনের হীনমন্যতায় ভুগছে। এসম্বন্ধেও আমার চিন্তাচেতনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসবের উত্তর খুঁজতেও গান্ধীজীর চিন্তাভাবনাকে আরও বেশী প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে, আমার কাছে। সবটার বিচার করতে গেলে কেবলমাত্র কিছু পাদটিকা দিয়ে সম্ভব নয়। হয়তো আরও একটা বইয়ের দরকার আছে।

এমতাবস্থায় যদি সত্যাগ্রহের কোন প্রয়োজন থেকে থাকে তবে তার ব্যবহার করতে হবে এবং করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ—আজ আর প্রয়োজন নেই, এমন ধরনের কথা ভাবা ভুল।* বরং আমরা লক্ষ্য করেছি অহিংসা ও সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সাহায্যে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনটাও শক্তিমান হয় এবং গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে যে সব সুবিধাবাদ ও দুষ্টনীতি এবং দুর্নীতি প্রবেশ করে তা দূর হয় অহিংসার নৈতিক স্পর্শ দিয়ে, আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতার সহযোগিতায়। একথা ভুললে চলবে না যে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে **ক্ষমতার লড়াই, দুর্নীতি, সুবিধাবাদ, কেরিয়ারিজম্ ইত্যাদি দোষ চট্ করে এসে যায়**—কিন্তু অহিংস গণআন্দোলনের সাক্ষাৎ ও জীবন্ত স্পর্শ যদি রাজনীতিতে থাকে তবে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। গান্ধীজীর অহিংসা কেবল একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার বা উপায় বিশেষই নয়। অহিংসা লক্ষ্যস্থলও বটে—পথও বটে, পাথেয়ও বটে। অহিংসা ব্যক্তিজীবনকে একটা সম্পূর্ণতা দিয়ে থাকে, গোটা মানুষ সৃষ্টি করাই তার লক্ষ্য, man is not merely an instrument but an end in himself. সেই অহিংসা রাজনীতিরই যন্ত্র নয়, মানুষের তা ধর্ম, মান ষের জীবন-নীতি—অতএব মানুষের চরিত্র গঠনের দিকে তার একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে। ফলে অহিংস মানুষের গণতান্ত্রিক রাজনীতি আর সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী মানুষের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

* প্রত্যক্ষত, সাম্রাজ্যবাদ অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ মাল্টিন্যাশন্যাল সংস্থার মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জাতিগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। এ এক নতুন পরিস্থিতি, যেখানে শত্রুকে আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করা শক্ত। ইন্দ্রজিৎ যেমন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতো, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ এখন বহুজাতিক শিল্পবাণিজ্য সংস্থার আড়ালে তাদের শোষণ চালিয়েই চলেছে। এই বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে আমাদের দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরাই কেবল নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা ও 'নিয়োরিচ্' বা নতুন ধনী লোকেরাও যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আচার বিচার, শিক্ষাদীক্ষাকে তারাই নিয়ন্ত্রিত করছে। এই বহুজাতিক সংস্থার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি সংস্থার মারফৎও আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে অস্ত্রশস্ত্রের কোন কার্যকারিতাই দেখা যায় না। একমাত্র এদের সঙ্গে অসহযোগিতা করা ও সত্যাগ্রহী আন্দোলন করা ছাড়া জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামানোই হয়তো অসম্ভব। ভোগবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও সংযত ও সরল জীবনের মানই সর্বজনের জীবনমান বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার জন্য প্রথমেই চাই একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যে বিপ্লবের নৈতিক সম্পদ ও বাস্তব ব্যবহারিক সত্যাগ্রহী হাতিয়ার গান্ধীজীর কাছ থেকে আমরা অনেক পেতে পারি।

সত্যাগ্রহ বনাম দুরাগ্রহ

সত্যাগ্রহ একটা সংগ্রামের কৌশল হলেও যে কোন কাজে বা উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ হয় না। উদ্দেশ্য যদি সৎ ও মহৎ না হয় তবে সত্যাগ্রহ অচল। অসৎ বা স্বার্থপর উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ করলে তা হবে দুরাগ্রহ। ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ হাসিল করার জন্য, যেমন নিজের কোন সুবিধা আদায় করার জন্য, খাতকের কাছ থেকে ঋণ আদায় করার জন্য, বাড়ীভাড়া আদায় করার জন্য যদি কেউ সত্যাগ্রহ করে বা অনশন করে তবে তা সত্যাগ্রহ হবে না এবং তা থেকে কোন ভালো ফলও হবে না। অহিংসা কখনো স্বার্থপরতা থেকে জন্ম নিতে পারে না। ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার জন্য যদি ইংরেজরা গান্ধীজী ও ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে পালটা সত্যাগ্রহ করতে যেতো তবে সেটা হতো প্রহসন মাত্র। **অতএব ইংরেজীতে যাকে বলে cause—সেটা থাকা চাই।** Rightness of the cause-ই সত্যাগ্রহ বা অহিংস সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার শক্তি যোগায়। এই cause জিনিষটা নৈতিক সমর্থন, ন্যায্যতা, যুক্তিযুক্ততা ও ইতিহাসের প্রগতি দিয়ে নির্দিষ্ট। যে জিনিষটার কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজন নেই অথবা যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তার কোন cause নেই। কাজেই cause কথাটার উৎপত্তি ইতিহাসের গর্ভ থেকেই হয়। স্বাধীনতার cause, জনস্বার্থের cause, সমাজতন্ত্রের cause আছে, কিন্তু আজকের যুগে সামন্ততন্ত্রের, সাম্রাজ্যবাদের বা ধনতন্ত্রের কোন cause নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার একটা cause ছিল, কিন্তু অপরপক্ষে হিটলারের কোন cause ছিল না। হিটলারের cause টা কেন cause বলে গ্রাহ্য হয় নি? কেননা পৃথিবীর জনতার ন্যায়নীতি, দায়দাবি সম্বন্ধে এমন একটা চেতনার মান আজ তৈরী হয়েছে যে পরদেশ লুণ্ঠন করাকে আর কেউ শ্রদ্ধা করে না। হিটলারের নিজের বাহিনীর সৈন্যরাও রাশিয়ায় বর্বর আক্রমণ চালাবার সময় তাদের নৈতিক বল হারিয়ে ফেলেছিল, লুণ্ঠন ছাড়া সংগ্রামের কোন সমর্থন পাচ্ছিল না—কেন না তারা কোন cause খুঁজে পাচ্ছিল না। এইজন্যই স্টালিন বারবার বলেছেন রাশিয়া শেষপর্যন্ত জিতবেই, কেননা রাশিয়ার cause ন্যায্য। নাজি জার্মানীর কোন cause নেই—ন্যায্যতা তো দূরের কথা। পৃথিবীর যত যুদ্ধ-বিশারদ সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন যে শেষ পর্যন্ত সেই পক্ষই লড়াইতে জেতে, যার উজ্জ্বল ও ন্যায়সঙ্গত cause আছে। নেপোলিয়ান, স্টালিন, মাও-সে-তুঙ ইত্যাদি সবাই এই কথা বলেছেন এবং প্রমাণ করে গিয়েছেন এই কথা।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের বেলায় যদি এই নৈতিক সমর্থন বা cause-এর প্রয়োজন হয়, তবে অহিংসার সংগ্রাম যেখানে, **সেখানে এই নৈতিক সমর্থনটাই একমাত্র শক্তি।** অস্ত্রবলে দুর্নীতিপরায়ণ শক্তি হয়তো সাময়িকভাবে জিততে পারে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া, নৈতিক সমর্থন ছাড়া অহিংস সংগ্রাম এক পাও এগোতে পারে না। কেননা

নৈতিক বল, হৃদয়ের উদারতা, এসবই হলো অহিংস সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র। এবং ন্যায্য উদ্দেশ্য বা right cause বা মহান লক্ষ্যই নৈতিক সংগ্রামের জন্মদাতা। কাজে কাজেই আমরা দেখি গান্ধীজী সংগ্রামে নীতির উপর, লক্ষ্যের উপর, আদর্শের উপর এত জোর দিতেন। নীতিকে দুর্বল করলে, সুবিধার খাতিরে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলে তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবেই যাবে। কাজেই নিজের দাবিটা বিন্দুমাত্র কলুষিত হতে তিনি দিতেন না। রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের বিরুদ্ধে গান্ধীজী খেয়ালের অভাবে সামান্য একটা সুবিধার আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে লজ্জায় ও অনুতাপে দীর্ঘদিন নিজেরই বিরুদ্ধে অনশন করলেন। কাজেই গান্ধীজী কেন ন্যায়নীতি নিয়ে এতো খুঁতখুঁতে ছিলেন তা এখন হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে। কোন প্রকার নৈতিক ছুঁৎমার্গ রোগ বা শুচিবায়ুতা তাঁর ছিল না, গোঁড়ামির খাতিরে তিনি সততার উপর এতো জোর দিতেন না, দিতেন নৈতিক লড়াইয়ের মূল শক্তিটাকেই অক্ষুণ্ণ ও ক্রমবর্ধমান রাখার জন্য। নীতির সঙ্গে কোন লুকোচুরি খেলা যায় না—লোকের চোখকে বা নিজের চোখকে বা বিবেকের চোখকে যখনই ধোঁকা দেবার চেষ্টা হবে, তক্ষুনি নিজের দুর্বলতা শুরু হতে থাকবে। নিজের ভিতরকার দুর্বলতা, যা হয়তো অন্য কেউ দেখতে পায়নি, সেটাও তিনি তৎক্ষণাৎ জনসমক্ষে ধরে দিয়ে নিজের শাসন নিজেই করে নিতেন। কাজেই কোন প্রকার শঠতা, চালাকি, কূটনীতি, গোপনীয়তা, অতিরঞ্জন ইত্যাদি কৌশলকে তিনি এতো ঘৃণা করতেন। দেশের ভিতর থেকে এইজন্য তিনি দুর্নীতিপূর্ণ রাজনীতি বা কূটনীতি দূর করতে চেয়েছিলেন—সোজা সরল সৎপথ ছাড়া নৈতিক সংগ্রামের শক্তি জাগানো সম্ভব নয় বলেই তিনি নৈতিক সমর্থন কথাটার উপর এতো সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

এযুগে যেটা cause বা নৈতিক সমর্থন, ভিন্ন যুগে সেটা আর তা নয়। ইতিহাসই এই নৈতিক সমর্থনকে নির্ধারণ করে। অতএব ইতিহাসের গতির উপর গান্ধীজীর বিশেষ নজর ছিল। কোন অনৈতিহাসিক কথা নিয়ে তিনি লড়তেন না। গান্ধীজীর অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি খুব পন্ডিত লোক বা scholar ছিলেন না, তিনি অনেক নেতার চেয়েই কম পড়াশোনা করা লোক। তথাপি তাঁর জ্ঞান অনন্যসাধারণ। বহু জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও আসল শক্তিটিকে তিনি ধরে ফেলতে পারতেন—এই সহজ জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারশক্তি তাঁর এমনিতেই জন্মে নি। তিনি অনেক বই-টই পড়েন নি বটে—খুব কম বইই পড়েছেন—কিন্তু জীবনগ্রন্থটিকে তিনি এতো ভাল করে জেনেছেন যে তা বলার নয়। এতো দীর্ঘদিন ধরে যে কঠিন সংগ্রাম তিনি করেছেন তা থেকেই তাঁর এই অসাধারণ জ্ঞান জন্মেছিল এবং অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছিলেন। অনেক বই তিনি পড়েন নি, অন্যের কাছ থেকে সাহায্য তিনি কমই পেয়েছেন, ফলে তাঁর কথাগুলো হয়তো শিক্ষিত ঐতিহাসিকদের মতো নয়, কিন্তু প্রত্যেক জিনিষকে সংগ্রাম ও গবেষণা দ্বারা পরীক্ষা করে নেবার এই অদ্ভুত সাহস তাঁর এগিয়ে যাবার ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্তও তাঁর বিকাশ অব্যাহত ছিল, কোনো ছেদ বা ক্লান্তি বা সমাপ্তির লক্ষণ দেখা দেয় নি। তিনি বলতেন তাঁর শিষ্যদের, 'See, I am

growing, you grow with me. I have grown from truth to truth."

যদি কেউ মনে করেন গান্ধীজী কেবল হৃদয়ের কথাই বলে গেছেন, শুধু তাঁর বিশাল হৃদয় দিয়েই তিনি জয়ের পর জয় করে চলেছিলেন, তবে ভুল হবে। তিনি বলেছেন, 'Goodness must be joined with knowledge. Mere goodness is not of much use as I have found in life." "কেবল মহত্ব বা সততাই সব নয়—জ্ঞানবুদ্ধিও চাই।" মহাত্মাজীর বুদ্ধি ছিল না, তিনি মাথা ঘামাতেন না, একমাত্র হৃদয়ের জোরে আর বিশ্বাসের জোরে চলতেন—এমন কথা কেউ বলতে সাহস করবেন না। তাঁর কতো শিষ্য, কত দেশবিদেশের অনেক শিক্ষিত মনীষীরাই তাঁর ভক্ত ছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর সঙ্গে বুদ্ধির জোরেও এঁটে উঠতে পারতো না, তিনি প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম তৈরী করে দেশবাসীকে দিতে পারতেন, তিনি কখনো দেউলে বোধ করেন নি, দেশের নানাদিকে হাজারো কাজ সৃষ্টি করে হাজার রকমের লোককে নিযুক্ত রাখতে পারতেন, সরকার কখনো তাঁকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি—এটা কি চারটিখানি বুদ্ধি বা প্রতিভার কথা? কাজেই গান্ধীকে অনুসরণ করতে হলে গোটা কয়েক মামুলি বুলি আর গোঁড়ামী দিয়ে চলা সম্ভব নয়। অসম্ভব সৃষ্টিশীল প্রতিভা তাঁকে সর্বদাই জ্ঞানের সন্ধানে, আলোর সন্ধানে ছুটিয়ে মারতো। চিন্তার জগতে তাঁর বিশ্রাম ছিল না মনোজগতে ও কর্মজগতে কোথাও তাঁর আলস্য ছিল না। এসব কথা ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য বা তাঁর চরিত্র চিত্রণ করার জন্য উল্লেখ করা হলো না, হলো এইজন্য যে তাঁর নৈতিক সমর্থনটাকে দীপ্তিমান রাখার জন্য তাঁকে সর্বদাই জ্ঞান, বিচার ও বুদ্ধিকে সজাগ রাখতে হতো, তিনি কেবল হৃদয় দিয়েই সবকিছু করতেন না—এই কথাটা বলে রাখার জন্য। এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাকে অনেকে চট করে ধরতে পারতেন না, কিন্তু একটু পরিচয় হলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাও তাঁর কাছে মাথা নত করে চলে আসতেন। ইংরেজ প্রভুরাও তাঁকে ভয় করেই চলতো, পাছে তাদের বশ করে ফেলেন। গান্ধীজী অনেককে বশ করেও ছিলেন। তাঁর সরলতাকে কেউ বোকামি বলে মনে করতে পারতো না, তাঁর বিনয়কে কেউ দাস্য বলে ভুল করতো না, তাঁর চোখে সূক্ষ্মতম জিনিষটিও চট করে ধরা পড়তো।

যে মানুষ গায়ের জোরের সাহায্য নেবেন না, অর্থবল যাঁর বল নয়, অস্ত্রশস্ত্র যাঁর কাম্য নয়, তাঁর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদকে জয় করতে হলে তাঁর বিচার, বুদ্ধি ও জ্ঞানই আসল শক্তি। এ হেন মানুষকে, তাঁর বুদ্ধি ও জ্ঞানকে ধারালো না করে উপায় নেই। ফলে তাঁর মাথা ও মগজের গুণ অসম্ভব রকম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। যদি আমরাও গায়ের জোরটাকে রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ত্যাগ করি তবে আমাদেরও মাথার গুণটাকে অনেক বাড়াতে হবে, বুদ্ধি ও বিদ্যার অভাবটা গায়ের জোরে যখন সেরে নেবার উপায় থাকবে না, তখন আমাদের intelligence-ও সেই অনুপাতে উৎকর্ষ লাভ করতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে হৃদয়ের সততা যদি থাকে তবে সে বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি হবে না, সে বিদ্যা অবিদ্যা হবে না—সত্যিকার জ্ঞান বা wisdom-এ পরিণত হবে।

সত্যাগ্রহে জনমতটা একটা মস্তবড় কথা। গান্ধীজী জনমত সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। বস্তুতঃ জনমত গঠন করাই, জনমতের সমর্থন লাভ করাই তাঁর জয়ের কৌশল। এই হিসেবে তিনি একজন সার্থক মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। গণমনের বিজ্ঞানে তাঁর দোসর মেলা কঠিন। কি করে জনমত তৈরী করতে হয় তার ম্যাজিক তিনি জানতেন। শুধু দেশেরই জনমত নয়, বিশ্বের জনমত তিনি খুবই দরকারী জিনিষ বলে মনে করতেন। তিনি জানতেন, আজকের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে পরাজিত করতে হলে গোটা বিশ্বের জনমতকে তাঁর সঙ্গে পেতে হবে। তাঁর মতো কৌশলী প্রচারক বা expert propagandist খুব কম দেখা যায়। রাজনৈতিক অন্দোলনে নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি দিনের পর দিন গঠনমূলক নীরব কর্মের তালিকাটাকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, তেমনি ঠিক সময়ে ঘনায়মান পরিস্থিতিতে এমন এক একটা কাজ করতেন বা কথা বলতেন, যার ফল হতো নাটকের পঞ্চম অংকের মতো আলোড়নকারী। আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন শিল্পী বা আর্টিস্ট। আর বিপক্ষকে এমন বোকাও বানাতে পারতেন! সমস্ত অন্যায়ের দায়িত্ব বিপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তাঁর মতো কৌশলী কম ছিল। বিপক্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায়গুলির কুৎসিত চেহারা, নিষ্ঠুর কদর্যতা এমন জ্বাজ্বল্যমান করে তুলে ধরতেন জগতবাসীর সম্মুখে যে, শত্রুপক্ষকে লজ্জা পেতে হতো, তাতে তাদের মুশকিল হতো মুখ রক্ষা করতে। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাবার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে ইংরেজকে বহু প্রচারক নিযুক্ত করতে হতো, কিন্তু নেংটা ফকিরের সঙ্গে পেরে উঠতো না। 'To put the other side always in the wrong box—এই ছিল তাঁর সত্যাগ্রহের একটা প্রধান লক্ষ্য। অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের হস্তও প্রসারিত হয়ে থাকতো। অপরপক্ষকে হেয় করে রাখাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না—তাদের মহান হবার জন্য সৎকাজ করার জন্য সুযোগ ও সুবিধা করে দিতেন, ফলে সংগ্রামের অবসানে তিক্ততা সৃষ্টি করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। অপর পক্ষও যাতে fair play-র যাবতীয় নিয়ম পালন করে, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। খেলায় যেমন আমরা একটা সাধারণ নিয়মকানুন রাখি, যাতে কেউ অন্যায়ভাবে খেলতে না পারে—তেমনি কেউ অন্যায় যুদ্ধ করবে না—এই ছিল তাঁর চেষ্টা। সশস্ত্র যুদ্ধেরও কানুন আছে—সর্বসম্মত নিয়ম আছে, সেগুলি লঙ্ঘন করলে কোনও দেশের সম্মান থাকে না, ফলে প্রত্যেক দেশই সে-সব নিয়ম মেনে চলবার চেষ্টা করে। যেমন যুদ্ধে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করতে হবে, বন্দীদের সুখসুবিধা দেখতে হবে, বন্দীদের হত্যা করা চলবে না, আত্মসমর্পণ করার পর কাউকে গুলি করে মারা চলবে না, বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা চলবে না, রেডক্রসের গাড়ীর উপর গুলিগোলা মারা চলবে না, দূতকে বধ করা চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধে এসব নীতি বড় একটা কেউ মানে না। বিশেষ করে আজকাল যুদ্ধের সেসব মারাত্মক নীতিহীনতা দেখা দিয়েছে। অহিংস লড়াইয়ের এমন একটা কৌশল গান্ধীজী চালাতে চেয়েছিলেন শত্রুপক্ষের লজ্জাবোধ ও নীতিজ্ঞানটাই যাতে জাগরিত হয়। তাদের মধ্যেও ধর্ম

আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তাদেরও একটা ইতিহাস আছে, তাদেরও গৌরববোধ আছে, প্রাণ আছে—একথাটাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইতেন। যত তাদের সে-জ্ঞান আসবে তত তারা অন্যায় খেলা করবে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ইংরেজের হৃদয় জয় করবো, তাদের সুপ্ত হৃদয়কে জাগিয়ে দিয়ে, তার শক্তির মোহকে ভেঙ্গে দিয়ে, এই ছিল তাঁর সাধনা। সে কেমন করে সম্ভব? আত্মনিপীড়ন দিয়ে, নিজেরা দুঃখ বরণ করে। শত্রুর বিনাশ নয়, শত্রুতাকে বিনাশ করা যাঁর লক্ষ্য, তাঁর ব্যবস্থাটাও কিছু ভিন্ন ধরণের হতে হবে। এগুলি কি কথার কথা? এই যে গান্ধীজী দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংসার লড়াই করলেন—তাতে কি সত্যি ইংরেজের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হয়েছিল? সত্যিই কি ইংরেজ হৃদয় পরিবর্তন করেই আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছে? এতটা দাবি স্বীকার করা যায় না। ইংরেজ আমাদের উপর সদয় হয়ে দেশ ছেড়ে গেছে বললে অতিরিক্ত বলা হবে। তবে গান্ধীজীর সার্থকতা কোথায়? ইংরেজ যদি বাধ্য হয়েই সরে গিয়ে থাকে, ইংরেজ যদি চাপে পড়েই, বিপদে পড়েই 'অর্ধং ত্যজতি' করে বুদ্ধিমানের কাজ করে চলে গিয়ে থাকে, তবে গান্ধীজীর হৃদয় পরিবর্তনের দাবি কোথায় কার্যকরী হলো? ভারতের সঙ্গে ইংরেজদের এই অহিংস সংগ্রামের স্পর্শ ইংরেজ হৃদয়ে ও চরিত্রে পরিবর্তন আনে নি—একেবারেই আনে নি—এমনও হয়তো বলা যায় না। অন্তত ইতিহাসের আরো কিছুদিন না গেলে এই কথার শেষ বিচার করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর অহিংসার বদলে আমরা দেখেছি ইংরেজরা কম হিংস্র হয় নি, তাদের বর্বরতার অনেক পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাহলেও ইংরেজের বর্বরতার ধার হয়তো কমে আসছিল। ইংরেজের দেশে ভারতের বন্ধু দিন কে দিন বেড়ে যাচ্ছিল। বেশ একদল সাধারণ ইংরেজ গান্ধীজীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো—গান্ধীজীর মৃত্যুতে অনেক ইংরেজ নরনারীকে কাঁদতেও দেখা যায়। ইংরেজ যে শেষপর্যন্ত তাদের শেষ কামান, বন্দুক, বোমারু, বিমানগুলি ভারতবাসীর উপর পরীক্ষা না করেই চলে গেছে তার পিছনে সাধারণ স্বার্থবাদী হিসেবী বুদ্ধি থাকলেও একটা নৈতিক লজ্জাও প্রায় এসে যাচ্ছিল, অন্তত তাদের কায়েমী স্বার্থ ও রাজত্ব রক্ষার নৈতিক সমর্থন একেবারেই হারিয়ে ফেলছিল। মোটকথা ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন হয়েছিল একথা ঠিক নয়, তবে ইংরেজরা বিবেক-দংশন-বোধ অনেকটা ভোগ করছিল—মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী গোঁড়ারা ছাড়া। আজ পর্তুগালের সাম্রাজ্যবাদ গোয়াতে নির্মম গুলি বর্ষণ করে যে চেহারা ও ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে, অথবা একদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর ইংরেজ ডায়ার গুলিবর্ষণ করে যে ঔদ্ধত্য ও বাহবা নির্লজ্জের মতো উপভোগ করেছে, গান্ধী আন্দোলনের শেষের দিকে তাদের সেই ঔদ্ধত্য বোধ কমে এসেছিল। ১৯৩১ সালে গান্ধীজী যখন বিলেতে গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে, তখন তিনি বৈঠকের আলোচনাটাকেই সব কাজ মনে করেন নি। প্রতিদিন ইংল্যাণ্ডের জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার কাজটি ছিল তাঁর একটা প্রধান কাজ। তিনি লণ্ডনের ইস্টএণ্ড-এ গরীব মজুর এলাকায় অবস্থান করতেন এবং প্রতিদিন সকাল বেলায় মজুর নরনারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও ভারতের দাবি ও তার মর্ম কি,

তা বোঝাতে চেষ্টা করতেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, গান্ধী যে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জনের আন্দোলন করছেন, তাতে ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের বেকার হতে হবে, তাদের ভাত মারা যাবে। তাছাড়া তখন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনৈতিক সংকট চলেছে—কলকারখানা এমনিতেই বসে পড়ছে, সেই অবস্থায় ব্রিটিশ জনসাধারণের গান্ধীর উপর রাগ ও বিদ্বেষ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিরুদ্ধ প্রচারকে পন্ড করে দেবার জন্য গান্ধীজী জোর করে মজুর অঞ্চলে তাঁর আড্ডা গাড়লেন এবং অবাধে মজুরদের মধ্যে মিলবার সুযোগ করে নিলেন। দেখা গেল ইংরেজ মজুরেরা গান্ধীজীকে ঘৃণা করা দূরের কথা, খুব ভালোবেসে ফেললো তাঁকে, চাচা গান্ধীকে দেখবার জন্য, তাঁর বাণী শোনবার জন্য সমবেত জনতার ভীড় সামলানো পুলিশের একটা দায় হয়ে উঠলো। সাম্রাজ্যবাদী তিক্ততা যতই ঘটে থাকুক, ইংরেজের দেশে ভারতের বন্ধু আজ অনেক আছে—গোটা কয়েক সাম্রাজ্যবাদী জোট ছাড়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ থেকে বেরিয়ে আসা না-আসা এই সব যুক্তির অন্তর্গত নয়, অর্থাৎ একথা থেকে এ বলা হচ্ছে না যে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে না। মূল প্রশ্নটা হচ্ছে ইংরেজের চরিত্র কিছু বদলাতে পেরেছেন কি না গান্ধীজী। হয়তো সামান্য কিছু পেরেছেন এবং গান্ধীজী বলবেন, সেটাও কম নয়। কেন না অনন্তকালের তুলনায়, ত্রিশ-চল্লিশটা বছর কিছুই নয়—ইতিহাসের হিসেবে এই সময়টা দীর্ঘ নয়, এবং চমকপ্রদ ফল পাওয়া না গেলেও গান্ধীজী মানবতার যে বাস্তব আদর্শ রেখে গেছেন তার ফল এখনও নিঃশেষ হয় নি—ইংরেজের উপর তাঁর প্রভাব আরও অনেক কাল চলবে।

দাবি বা demand স্থাপনের ব্যাপারেও সত্যাগ্রহী আন্দোলনের একটা স্বকীয়তা আছে, একটা সাধারণ দাবি গান্ধীজী ওঠাতেন না। অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য পরিষ্কার দাবি রাখতেন, যা সাধারণ মানুষেরা সকলেই বুঝতে পারতো এবং সেগুলি হতো এমন অত্যাবশ্যকীয় মূল-দাবি, যার উপর কোন ছাঁটকাট চলে না এবং যে-দাবি বিপক্ষের স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব নয়। স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা সমাজতন্ত্র এমন ধরণের কোন একটা ব্যাপক অথচ অস্পষ্ট দাবি, যা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে। স্বরাজের জন্য সত্যাগ্রহ করছি জানলেও সে লড়াইয়ের একটা বাস্তব চেহারা তো দরকার। ইংরেজের সঙ্গে ব্যাপক লড়াই করলেও কেমনভাবে ঠিক ঠিক সেই লড়াই করছি, তা তো দেখা দরকার। সেইজন্যই তিনি এমন এক একটা কাজ বেছে নিতেন, যা সেই সংগ্রামের অস্পষ্ট রূপকে একটা স্পষ্ট চেহারা এনে দিত। যেমন 'লবণ আইন' ভঙ্গ করা। স্বাধীনতার জন্য লড়াই ঘোষণা করছি, তবে এই লবণ-টুকু নিয়ে এতো মারামারি করা কেন? ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করার আদর্শটা তাই অনেকের কাছে ঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল সমগ্র ভারতের জনতা এই লবণ আইন ভঙ্গ করার ভিতর দিয়েই সমস্ত দেশে একটা বিদ্রোহের আবহাওয়া সৃষ্টি করে বসলো। তাছাড়া লবণ এমন একটা সাধারণ জিনিস যা প্রত্যেকের প্রতিদিনকার জীবনে অপরিহার্য, তার ফলে লবণ আইন ভঙ্গ করাটা এমন একটা বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো যা প্রত্যেকের চিন্তা ও কর্মজগতে আঘাত

করতে বাধ্য। বড় বড় কংগ্রেসী ও বিপ্লবী নেতারা, এমন কি স্বয়ং বড়লাট পর্যন্ত, এই লবণের মহিমা প্রথমে অনুধাবন করতে পারেন নি। কিন্তু ক্রমশঃ সে লবণ বিরাট বিস্ফোরণের মতো কাজ করলো। আসলে বিদ্রোহ-প্রবণ জনতার প্রতিরোধ শক্তিটাকে এমন কতকগুলো স্পষ্ট ও সহজসাধ্য কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা চাই—গান্ধীজীর ছিল এই ধারণা। সাধারণ বা অস্পষ্ট স্লোগানের মধ্য দিয়ে নয়, সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তব রূপ দেবার ভিতরই সেই জনশক্তি সংহত করা সম্ভব। জনতাকে কি করতে হবে তা ঠিক ঠিক স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। এমনভাবে আদেশপত্রটি তৈরী করতে হবে যা জনতা যেন বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারে।

অন্যদিকে আবার জনতার শক্তি বুঝে প্রোগ্রামটি দিতে হবে। জনতার শক্তি কতটা হয়েছে অর্থাৎ তার দুঃখবরণের ক্ষমতা কতটা হয়েছে, সেটাই হলো গান্ধীজীর কাছে শক্তি পরীক্ষার মানদন্ড। জনতা কতটা আঘাত করতে পারবে, জনতার রাগ বা ক্রোধ কতটা হয়েছে তাই দিয়েই গান্ধীজী জনশক্তির ওজন করতেন না। যারা সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী, তারা বরং এই হিসেব করে যে জনতার ক্রোধ কতটা সৃষ্টি হয়েছে এবং জনতা কতটা আঘাত হানতে পারবে। এই শক্তির উপরই লড়াই নির্ভর করে। কিন্তু অহিংসার হিসাব অন্যরকম, সেখানে জনতা কতটা তৈরী, সে-পরীক্ষা হবে জনতা কতটা সহ্য করতে পারবে, তা দিয়ে। কেন না জনতাকে দিয়ে পালটা আঘাত সৃষ্টি করা অহিংসার সার কথা নয়। অবশ্য এখানে কোন অন্ধ-ধারণা বা dogmatic idea রাখা সম্ভব নয়। যারা সহিংস সংগ্রাম করে তাদেরও দেখতে হয় এবং জানতে হয় যে শেষ পর্যন্ত জনতার সহ্য শক্তিটাও থাকা চাইই চাই—কেবল আঘাতের পর আঘাত, জয়ের পর জয় সৃষ্টি করে যাওয়া সহিংস সংগ্রামেও সম্ভব নয়। রুশবিপ্লবের কৌশল থেকে অবশ্য লেনিন একথা বলেছেন যে জয়ের পর জয়ের সম্ভাবনা থাকা চাই, আঘাতের পর আঘাত হেনে যাওয়া চাই, বিপ্লবে বিপ্লবীদের হাতেই initative থাকা চাই এবং সেই অবস্থাতেই বিপ্লব সার্থক হতে পারে। কিন্তু সে হলো স্বল্পকালীন বিপ্লবী সংগ্রামের নীতি। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ বা গেরিলা বা partisan war-এর বেলায় আমরা দেখেছি এই জাতীয় আঘাতের পর আঘাত হেনে যাওয়া শুধু সম্ভব তো নয়ই, বরং ক্ষতিকারক। মাও সে তুঙের এই বিপ্লব-নীতি থেকেই সেই তথ্য আমরা জানি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আক্রমণের পর আক্রমণ নীতি গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সেখানে প্রতিরোধাত্মক-আক্রমণাত্মক নীতি (defensive-offensive) নীতি বা শত্রুর সাক্ষাৎ আক্রমণকে এড়িয়ে যাওয়ার নীতিটাই ছিল প্রধান। সেখানে কত দুঃখবরণ করতে হয়েছে, সেখানে সহ্য করার ক্ষমতাটাই প্রধান কথা হয়ে উঠেছে। যাক্ সে কথা, এখানে কেবল একথাটা মনে রাখা দরকার যে গান্ধীজী দুঃখবরণের কথাটা বলতে গিয়ে জনতার শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখার ভুল অভ্যাস ত্যাগ করাতে বাধ্য করেছেন। অনেকে মনে করেছেন যে, লবণের মতো একটা অতি সাধারণ জিনিষের আইন নিয়ে লড়াই করার মধ্যে গান্ধীজীর নরমপন্থী পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। যদি তিনি সত্যি সত্যি বিপ্লবী হতেন তবে তিনি সোজা খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ

করার জন্য আদেশ দিলে বিপ্লব ফেটে পড়তো। কেননা, তাহলে দেশীয় জমিদার, জায়গীরদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে সোজা চ্যালেঞ্জ করা হতো। কথাটা শুনতে সহজ হলেও কাজে সহজ নয়। হিসেব করে দেখতে হবে জমি জায়গা, বাড়ীঘর নিলামে নিয়ে নিতে, তাদের উপর ঘরে ঘরে অকথ্য অত্যাচার ডেকে আনতে জনতা প্রস্তুত ছিল কি না। এটা কেতাবি তর্ক নয়, বাস্তব সমস্যা। বাস্তব শক্তি জনতার সেদিন, সেই ১৯৩০ সালে, এতোটা ছিল না, এবং খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ করতে বললে জনসাধারণের ঐক্যটাও ভেঙে যেতো এবং অনেক শ্রেণী, যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পেলেও অন্তত পক্ষে তাদের নিরপেক্ষ সমর্থনটাও পাওয়া দরকার, তার অসদ্ব্যবহার করা হতো। সম্মিলিত সংগ্রাম থাকতো না, যার প্রয়োজন রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে। তাছাড়া আমরা এ-ও জানি, যেখানে খাজনা বন্ধ করার মতো শক্তি অর্জন করা গিয়েছিল, সেখানে খাজনা বন্ধ আন্দোলনও ঘটেছে। যেমন, বারদৌলির বিখ্যাত আন্দোলন। যেমন, যুক্তপ্রদেশের প্রজাদের আন্দোলন। বারদৌলিতে নিলাম করেও সরকার প্রজাদের মনোবল ভাঙতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারত সরকার। খাজনা-বন্ধ, ট্যাক্স্ বন্ধ আন্দোলন তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রের অত্যাচার ঘরের মধ্যে ডেকে আনে। তা রুখবার মতো সাহস সৃষ্টি হয়েছে কিনা, পুলিশ নারী, শিশু ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদির উপর যে অত্যাচার শুরু করে, তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব হবে কি না, অথবা সেই নগ্ন অত্যাচারের দৃশ্য দেখে হিংসা বা রক্তারক্তির সৃষ্টি হবে কিনা, অথবা একটা কোন রক্তারক্তির অছিলা দেখিয়ে ব্যাপক হত্যাকান্ড সৃষ্টি করে জনতার বুকে ত্রাসের সঞ্চার করবে কিনা, একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামকে সহসা একটা আচমকা প্রত্যাঘাতের সামনে বিলীন করে দেওয়া ঠিক হবে কি না—এসব বিচার না-করে যা তা বলে যাওয়া কি অহিংস, কি সহিংস কোন সংগ্রামেরই কৌশল নয়, তা কেবল হঠকারিতা মাত্র। যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা আমরা বলে থাকি তাও একটা বিজ্ঞানসম্মত সংগ্রাম। সেখানে জনতার উত্থান নামক একটা অস্পষ্ট কথার ঠাঁই নেই। ফরাসী বিপ্লবের মতো হঠাৎ জাগরণ ও রক্তারক্তির স্বপ্ন আজ আর কোন বিপ্লবীর প্রোগ্রাম নয়। লেনিন যে বিপ্লবের কথা বলেছেন তাও বিজ্ঞানসম্মত violence-এর কথা—যাতে সবচেয়ে কম রক্তারক্তি হয়। তার বিজ্ঞান আয়ত্ত করার কথা, এমন কি রক্তারক্তি করার দায়িত্বটা থাকছে বিপক্ষের উপর, জনতার উপর নয়। সেজন্য বিপ্লবটাকে তিনি একটা least bloody art অথবা almost bloodless action-এ পরিণত করতে চেয়েছেন। তারপরে মাও-সে-তুং যে সংগ্রাম করলেন সেখানে বিপ্লবে গৃহযুদ্ধের ব্যাপারটাকে একটা হাটুরে লড়াই বা দাঙ্গা বা মারামারির ব্যাপার করেন নি। সেখানে একটা বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধশাস্ত্রের কথা রয়েছে। গোটা কয়েক মর্মস্পর্শী দাবির পিছনে জনতাকে উত্তেজিত করে ছেড়ে দিলে বিপ্লব হয় না বরং প্রতিবিপ্লবই জয়ী হয়ে যায়।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহটাও তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যদি ব্যবহার না করা যায় তবে তাতেও বিঘ্ন ও অনর্থ ঘটে যেতে পারে। যে কোন লোক না-বুঝেসুঝে হঠাৎ

সত্যাগ্রহ করতে নেমে গেলো—তাতেই সত্যাগ্রহ হবে ও জয় হবে, এ স্বপ্ন দেখাও ভুল। জনশক্তির হিসেব চাই, জনতার চেতনার পরিমাপ করা চাই, জনতার সহ্য শক্তির ও আদর্শবোধের একটা ধারণা থাকা চাই। আর চাই ধাপের পর ধাপ তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নীতি। ছোট থেকে বড়তে যেতে হবে—বড় একটা দাবি তুলে শেষ-পর্যন্ত পিছু হটতে গান্ধীজী রাজি ছিলেন না। তাই শ্রমিক আন্দোলনই হোক, দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলনই হোক, চাষীদের আন্দোলনই হোক, হরিজনদের আন্দোলনই হোক, অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সংগ্রামই হোক—তিনি কখনো বহরটাকে বাড়িয়ে বলতে রাজি ছিলেন না—যেটুকু নেহাৎই মিনিমাম, যা না হলেই নয়, সেটাকে তিনি বলতেন মৌলিক দাবি। সেই নিম্নতম দাবিটাতেই তিনি আসল জিনিষটাকেই রাখতেন, ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে দাবিটাকে স্থাপন করতেন না। যেটার কম হতে পারে না, সেটা সোজা করে স্থাপন করতেন এবং সেই নিম্নতম দাবির উপর সর্বোচ্চ সংগ্রাম ওঠাতে বলতেন। একটা সর্বোচ্চ দাবি রেখে সর্বনিম্ন মাপে সংগ্রাম করাটাকে তিনি হাস্যকর দুর্বলতা বলে মনে করতেন। সর্বোচ্চ দাবি করলেই সর্বোচ্চ সংগ্রাম হয় না—এই সহজ কথাটা অনুধাবন করা চাই। সর্বোচ্চ দাবির জন্য লড়াই অনেক কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এমন অনেক বাতুল আছেন, যাঁরা মনে করেন, গান্ধীজী যদি ১৯৩০ সালেই সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই ঘোষণা করে দিতেন তবে বুঝি মজুর-চাষী তাই করে ফেলতো! অথচ যেহেতু তিনি তা করেন নি, সেহেতু তাঁকে এখনকার দিনের মার্কসবাদীরা মডারেট, সাম্রাজ্যবাদীর চর ও কায়েমীস্বার্থের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছেন।

এ একটা নরমপন্থা বা চরমপন্থার কথা নয়—এ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির কথা। দাবিটাকে সর্বনিম্ন করার ভিতর সংগ্রাম শক্তিকে নরম করা হয় না, যা সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রাহ্য, যা সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোককে সংহত করে, সেটাই কৌশলের দিক থেকে গ্রাহ্য। মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের শক্তিকে লক্ষ্য রেখেই দাবির বহরটা তৈরী করতে নেই, সাধারণভাবে জনতা তার কতটা গ্রহণ করতে পারবে বা বহন করতে পারবে সেইটাই হলো বিচার্য বিষয়। দাবিটাকে কমিয়ে এমন করা চাই যার কম আর করা যায় না এবং যার থেকে একচুল পিছু হটতে গান্ধীজী রাজি নন এবং যার জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং সেই প্রাণদান তখন জনতার পক্ষে সহজবোধ্য বিষয় ও তার ন্যায্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না জনতার। অনেক সময় অনেক নেতা ও বিপ্লবীরা দেখে অবাক হয়েছেন কেন গান্ধীজী এমন সামান্য দাবির জন্য তাঁর সর্বস্ব, এমন কি জীবন পণ করে ফেললেন! একটা তুচ্ছ মন্দিরের জন্য মরণপণ অনশন কেন? এতো এতো বৃহৎ কাজ থাকতে সামান্য একটা তুচ্ছ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসকে উপলক্ষ্য করে নিজের ও অনেকের প্রাণ দান করতে প্রস্তুত হন কেন? তিনি বলেছেন, "Let it also be remembered that Satyagrahi's minimum is also his maximum". (Harijan, 9. 7. 38) সামান্য জিনিষ মনে করে, নিম্নতম দাবি মনে করে, নিম্নতম শক্তি প্রয়োগের কথা তিনি ভাবতেন না। সর্বশক্তি দিয়ে সেই নিম্নতম দাবিটা যখন আদায় করা যায়, তখন জনতার আত্মশক্তি যায়

বেড়ে, এবং সেই আত্মশক্তি দিয়ে উচ্চতর দাবির জন্য সংগ্রাম করা সম্ভব হয় এবং ক্রমে উচ্চতম দাবিও জয় করা সম্ভব হয়।

১৯৩৯ সালে জয়পুর ও রাজকোট সত্যাগ্রহের সময় প্রজাদের দাবিগুলিকে নিম্নতম দাবির কোঠায় এনে গান্ধীজী বলেছিলেন, "What I have done by correcting myself in Rajkot is to show the true way of Satyagrahis. In following it, they may find it necessary to lower their immediate demands but only so as to really hasten their progress to their goal. Therefore there can be no lowering out of weakening. Every lowering must be out of a due appreciation of the local situation and the capacity of the workers to cope with it. Here there is no room for demoralisation and rout. In cases like Jaipur of course there can be no question of lowering. The demand itself is in the lowest pitch, there is no room in it for lowering anything. In essence it is one of civil liberty. Civil liberty consistent with observance of non-violence is the first step towards Swaraj. It is the breath of political and social life. It is the foundation of freedom. There is no room there for dilution or compromise. It is the water of life. I have never heard of water being diluted." (Harijan, 24-6-39,) "রাজকোটের আন্দোলন উপলক্ষে আমি নিজের যেটুকু সংশোধন করে নিয়েছি তাতেও সত্যাগ্রহীর জন্য প্রকৃত পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। তার অনুসরণ করতে গিয়ে সত্যাগ্রহীদের আশু দাবিগুলিকে কিঞ্চিৎ নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু দাবিটাকে নিম্নতম করাতে তাদের সংগ্রাম ও তার জয় ত্বরান্বিত হবে মাত্র। কাজেই সেক্ষেত্রে এই নামিয়ে আনার মধ্যে ভবিষ্যৎ দুর্বলতার প্রতিরোধ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পরিস্থিতির বাস্তব হিসেব ও কর্মীদের অবস্থাকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতার দিকে খেয়াল রেখে এই নিম্নতম দাবির মানদন্ড তৈরী হয়। এখানে নৈতিক অধঃপতন ও পলায়নের কোন অবকাশ নেই। জয়পুরের বেলায় অবশ্য দাবি আরও নীচু করার কথাই ওঠে না, কেন না সেখানকার দাবিটা একেবারেই নিম্নতম। এখানে নামবার কোন ক্ষেত্রই নেই। মূলতঃ এ হলো ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি। অহিংসা সমর্থিত ব্যক্তিস্বাধীনতাই হলো স্বরাজের প্রথম ধাপ। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসই হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ভিত্তিও তাই দিয়ে। অতএব এখানে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ বা নমনীয়তার স্থান নেই। জলকে আরও জলীয় করতে আমি কখনো শুনি নি।"

এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম কি করে ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করে—তার অগ্রগমনের নিয়ম কি এবং কেন তা ক্রমশঃ বিস্তৃত ও গভীরতর হতে বাধ্য তা নিয়ে লিখতে গিয়ে মহাত্মাজী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন ঃ

"My experience has taught me that a law of progression applies

to every righteous struggle. But in case of Satyagraha the law amounts to an axiom. As the Ganges advances, other streams flow into it, and hence at the mouth it grows so wide that neither bank is to be seen and a person sailing upon the river cannot make out where the river ends and the sea begins. So also as a Satyagraha struggle progresses onward, many other elements help to swell its current, and there is a constant growth in the results to which it leads. This is really inevitable, and is bound up with the first principles of Satyagraha. *For in the Satyagraha the minimum is also the maximum and there is no question of retreat, and the only movement possible is an advance.* In other struggles, even when they are righteous, the demand is first pitched a little higher so as to admit of future reduction, and hence the law of progression does not apply to all of them without exception. But I must explain how the law of progression comes into play when the minimum is also the maximum as in Satyagraha. The Ganges does not leave its course in search of tributaries. Even so does the Satyagrahi not leave his path which is sharp as the sword's edge. But the tributaries spontaneously join the Ganges as it advances, so it is with the river that is Satyagraha. Seeing that this Immigration Act (in South Africa) was included in Satyagraha, some Indians, ignorant of the principles of Satyagraha, insisted upon the whole of the mass of the Anti-Indian legislation in the Transvaal being similarly treated. Both the suggestions involved a breach of principles. I distinctly said that it would be dishonest now, having seen the opportunity, to take up a position which was not in view when Satyagraha was started. No matter how strong we were, the present struggle must close when the demands for which it was commenced were accepted. I am confident that if we had not adhered to this principle, instead of winning, we would not only have lost all along the line, but also forfeited the sympathy which had been enlisted in our favour. On the other hand if the adversary himself creates new difficulties for us while the struggle is in progress, they become automatically included in it. A Satyagrahi, without being false to his faith, cannot disregard new difficulties which confront him while pursuing

his own course. The adversary is not a Satyagrahi—Satyagraha against Satyagraha is impossible, and is not bound by any maximum or minimum. He can therefore try if he wishes to frighten the Satyagrahi by raising novel issues. But the Satyagrahi has renounced fear, tackles by Satyagraha the later difficulties as well as the former and trusts that it will help him to hold his own against all odds. Therefore, as Satyagraha struggle is prolonged, that is to say by the adversary, it is the adversary who stands to lose from his own standpoint, and it is the Satyagrahi who stands to gain." (Satyagraha in South Africa, page 319)

অর্থাৎ "অভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা জানি যে প্রত্যেক ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামেরই একটা ক্রমবর্ধমান গতি আছে। কিন্তু সত্যাগ্রহের বেলায় এটি একটি অবধারিত নিয়ম। গঙ্গা যতো অগ্রসর হতে থাকে, অন্যান্য স্রোতস্বিনীগুলি তাতে এসে পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার মোহনায় এমন বিস্তৃত রূপ গ্রহণ করে যে দু-পার আর দেখাই যায় না এবং যারা সেই স্থানে নৌকায় যেতে থাকে তারা বুঝতে পারে না নদী কোথায় শেষ হলো আর সাগর কোথায় শুরু হলো। তেমনি সত্যাগ্রহ যতই চলতে থাকে অন্যান্য অনেক শক্তি এসে তাতে জুটে যায় এবং তার সম্মিলিত ফল ক্রমশই বর্ধমান শক্তিতে বিপুলতর হতে থাকে। এটা অবশ্যম্ভাবী, এবং সত্যাগ্রহের মূলনীতির মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে। কেন না সত্যাগ্রহে যা নিম্নতম, তাই আবার একই সাথে ঊর্ধতম; এবং যেহেতু সেই নিম্নতমের কোন নিম্ন নেই, ফলে পশ্চাদপসরণেরও কোন অবকাশ নেই এবং সম্মুখে যাওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। অন্যান্য সংগ্রামে, এমন কি যে-সকল সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ দাবিটা প্রথমতঃ অনেকটা বড় করেই রাখা হয় যাতে ভবিষ্যতে অবস্থা বুঝে কিঞ্চিৎ সরে আসা সম্ভব ও পিছিয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে—ফলে ক্রমবর্ধমানতার নিয়ম সেখানে সর্বদাই কার্যকরী হয় না। কিন্তু সত্যাগ্রহে, যেখানে নিম্নতমটাই ঊর্ধতম বলে ধার্য করা হয়, সেখানে এই স্বয়ং-ক্রমবর্ধমানতার নিয়ম কি করে কার্যকরী হয় সে কথা আমাকে বোঝাতে হবে। গঙ্গা কখনো শাখা প্রশাখার খোঁজে নির্গত হয় না। সত্যাগ্রহী তেমনি তার ক্ষুরধার পথকে কখনো ত্যাগ করে না। কিন্তু শাখাপ্রশাখাগুলি যেমন আপনা থেকেই এসে গঙ্গাতে পতিত হয়, তেমনি সত্যাগ্রহের ধারাতেও অন্যান্য স্রোত আপনা থেকেই এসে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে 'ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট' ভঙ্গ করা যখন প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করা হলো তখন সত্যাগ্রহ অজ্ঞ অনেক ভারতীয়, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ট্রান্সভালে যত আইন আছে তা সবই ভঙ্গ করা সত্যাগ্রহের অন্তর্গত প্রোগ্রাম হিসেবে দাবি করতে লাগলো। আবার অনেকে এই সংগ্রামে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় যত ভারতীয়—যথা নাটাল, কেপ-কলোনি, অরেঞ্জ ফ্রি-স্টেট ইত্যাদি সব জায়গায় ভারতীয়দের, যাবতীয় ভারত-বিরোধী আইনভঙ্গ করার জন্য আহ্বান জানাবার দাবি করেছিল। আমার মতে এই দুটি দাবিই মূলনীতি বিরোধী। আমি

পরিষ্কার বলেছিলাম যে-সংগ্রাম আমরা যে-দাবির উপর শুরু করেছি আজ অবস্থার সুবিধা বুঝে যদি আমাদের সেই দাবিকে আমরা বাড়াই তবে তা আমাদের পক্ষে অসাধু কাজ হবে। এখন আমরা যত শক্তিমানই হই না কেন, বর্তমান সংগ্রাম সেখা'নই শেষ হবে, যখনই আমাদের যে দাবি নিয়ে আমরা লড়াই শুরু করেছি, সেই দাবি স্বীকৃত হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমরা এই নীতি না-নিয়ে চলতাম, তবে আমাদের কোন জয় তো হতোই না, বরং সর্বত্রই আমরা হেরে যেতাম এবং যাদের সহানুভূতি আমরা অর্জন করেছিলাম তাও হারিয়ে ফেলতাম। কিন্তু বিপক্ষ দল যদি আমাদের চলার পথে কোন নতুন বাধা বা বিপদ সৃষ্টি করে তবে তা অবশ্যই আমাদের সত্যাগ্রহ গ্রহণ করে নেবে, অর্থাৎ সে সব নতুন বাধার বিরুদ্ধেও নয়া দাবি তৈরি করে নিতে হবে। সত্যাগ্রহীকে যদি সৎ থাকতে হয় তবে একথা মনে রাখতেই হবে যে চলার পথে বিপক্ষ নতুন অন্তরায় সৃষ্টি করবেই এবং সেগুলি চোখ বুঁজে এড়ানো সম্ভব নয়। কেন না বিপক্ষ তো সত্যাগ্রহী নয়—বস্তুতঃ সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে কোন সত্যাগ্রহ হয় না। এবং বিপক্ষের সংগ্রামনীতিতে কোন নিম্নতা বা ঊর্ধতম নির্যাতনের সীমার বালাই নেই। কাজেই তাদের পক্ষে ইচ্ছামতো নয়া বিপত্তি ও বাধা সৃষ্টি করে সত্যাগ্রহীকে ভয় পাইয়ে দিতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যাগ্রহী সকল ভয়কে জয় করেছে, সত্যাগ্রহের সাহায্যেই নয়া ও পুরাতন সকল বাধাকে অতিক্রম তাকে করতে হবে, এবং তার বিশ্বাস আছে এই সত্যাগ্রহ তাকে সকল প্রকার বিপর্যয় থেকে পার করে দেবে। কাজে কাজেই সত্যাগ্রহ যত দীর্ঘায়িত হতে থাকবে—দীর্ঘায়িত হবে বিপক্ষেরই ব্যবহারে—ততো বিপক্ষকে তার নীতিতেই হার মানতে হবে এবং সত্যাগ্রহীরই জয় হবে।"

এখানে একটা জটিল প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবিক। গান্ধীজী কেন ট্রান্সভালের আন্দোলনকে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর আন্দোলনে তক্ষুনি ব্যাপ্ত করে ফেললেন না। তার যে যুক্তি তিনি দিয়েছেন তা হয়তো সত্যাগ্রহ নীতিসম্মত নয়, কিন্তু বিপ্লববাদী অন্যান্য আন্দোলনকারীরা কখনোই এই সুযোগ পরিত্যাগ করতেন না। **এখানে বিপ্লববাদীদের সাথে গান্ধীজীর বিভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট।** শুধু যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যেই ব্যাপক অভিযান একই সাথে ঘোষণা করতে বিরত হলেন তা নয়। এক সময় তাঁর সত্যাগ্রহ যখন খুব জোর চলছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরাও তাদের ধর্মঘট আন্দোলনকে ওদের সাথে যুক্ত করার জন্য গান্ধীজীকে আহ্বান জানায়। গান্ধীজী রাজি হন নি। রেল শ্রমিকদের আন্দোলন যদি সেদিন ভারতীয়দের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতো তবে তার শক্তি কতো ব্যাপক হতো এবং অনেক কিছু হতে পারতো। খনিশ্রমিক, রেলশ্রমিক ও শ্বেতাঙ্গশ্রমিকদের লড়াইটা ভারতীয়দের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকা চমৎকার করা সম্ভব ছিল। এবং তা করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম বিপ্লবী স্তরে যায় নি—এই অভিযোগ বিপ্লবীরা করতে পারেন। **সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর** 'Satyagraha or the Service of Capitalism' নামক পুস্তিকায় এই অভিযোগই তীব্রভাবে করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে গান্ধী একজন সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী নন, ফলে ধনতন্ত্র ও

সাম্রাজ্যবাদের গোড়াতে আঘাত পড়লে তিনি সরে আসতেন, ফলে তাঁর সত্যাগ্রহ ধনতন্ত্রকেই সাহায্য করে মাত্র। এই অভিযোগের সমর্থনে একথাও বলা চলে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সংগ্রাম করলেও, আজও ভারতীয়দের অধিকার সেখানে কতটুকু কায়েম হয়েছে ? তিনি যতটা সার্থক হয়ে দেশে ফিরে এলেন, সেই চুক্তি আজও প্রায় অচল। এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নানারকমের বর্ণবিদ্বেষী আইন, apartheid আইন, বলবৎ হয়েছে এবং ফ্যাসিস্ট ধরণে শ্বেতাঙ্গরাজ হয়েছে। একথা হয়তো ভাবা যেতে পারে যদি গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্পর্কে সচেতন থাকতেন তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম অন্য রূপ গ্রহণ করতো এবং বিপ্লবে পরিণত হতো। সামাজিক বিজ্ঞানে অজ্ঞ থাকার জন্যই তাঁর সংগ্রামকে তিনি ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত করতে ভয় পেয়েছিলেন এবং আজও আফ্রিকা তাই সেই আফ্রিকাই থেকে গেছে, ইত্যাদি। কিন্তু এতো সহজ হিসেবও ইতিহাস সমর্থিত নয়। মনে রাখতে হবে, গান্ধীজী কোন যুগে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করেছিলেন। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তখন রুশবিপ্লবের শিক্ষা ও তাৎপর্য বর্তমান ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তখন উঠতি অবস্থা—পড়তি অবস্থার কোন লক্ষণই দেখা দেয় নি। ভারতীয় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কিছু বিপ্লবী ছিলেন না। Indentured কুলিদের স্বাভাবিক ভয় তখন কত বেশী ছিল। শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কতটুকু ক্ষমতা রাখতো, অতবড় দেশে ভারতীয়রা কিভাবে ছড়িয়ে ছিল ? সে দেশের আদিম অধিবাসী বা খাস আফ্রিকাবাসীদের স্বার্থে ভারতীয়দের ও অন্যান্য এশিয়াবাসীদের বৈপ্লবিক-সংগ্রামিক যোগাযোগ কতটুকু করা সম্ভব ছিল ? মোট কথা আফ্রিকার জঙ্গলে পিছিয়ে-পড়া এই জনতা ও পরাধীন ভারতের ভীরু অধিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষার মানদন্ড তো ইউরোপীয় বা রুশ-শ্রমিকের তুল্য নয়! কতখানি বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞানকান্ড, শিক্ষাদীক্ষা, সংগঠন থাকলে একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব ঘটানো যায়, সে কথা মনে রাখা দরকার। অনেকেই আফ্রিকার সেদিনকার অবস্থাকে ইংলন্ডের মজুর, ফ্রান্সের জনতা, রাশিয়ার মজুর, চীন জাপানের জনতার সমকক্ষ মনে করে এই অভিযোগ করতে পারেন যে গান্ধীজী বুঝি আফ্রিকায় একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করে পন্ড করে দিয়েছিলেন। এই জাতীয় তুলনা একটা মাত্রাজ্ঞানের অভাব থেকেই সম্ভব। তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কেউই চ্যালেঞ্জ করে পার পায় নি, এমন কি প্রবল প্রতাপান্বিত জার্মান কাইজারও চূর্ণ হয়ে যায়। খাস ভারতবর্ষ তখন পরাধীনতার ঘুমে নিমগ্ন। যেক্ষেত্রে খাস ভারতবর্ষের লোক ভয়ে জুজু হয়ে আছে, সেই ভারতবর্ষেরই কয়েক হাজার প্রবাসী দুর্বল ভারতীয় কুলি ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকায় বিপ্লব করবে, এমন ভাবাটাও হাস্যকর। গোখলে গান্ধীজীকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজীর প্রকৃত রণক্ষেত্র এখন ভারতবর্ষেই। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন না হয়, শক্তিমান না হয়, তবে তাঁর প্রবাসী ভারতীয়দের ইজ্জত রক্ষা করার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। স্বাধীন ভারতই আফ্রিকায় ও অন্যত্র ভারতীয়দের সম্মান রক্ষা করতে পারবে। গান্ধীজী নিজেও একথা বুঝেছিলেন অনেকদিন পূর্বেই, কিন্তু সেখানে

কাজের চাপ একটার পর একটা চেপে থাকাতে ভারতে আসতে পারছিলেন না। কাজেই শেষ পর্যন্ত জেনারেল স্মাটস্-এর সঙ্গে একটা সম্মানজক আপোষ সর্ত করেই ভারতে ফিরে এলেন এবং বৃহত্তর সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম আজও সার্থক হয় নি, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সমগ্র আফ্রিকাতে আজ স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে। সমগ্রভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেখানকার জনতা নির্বিশেষে আজ অগ্রসর হয়ে চলেছে। আফ্রিকার ঘুম আজ ভেঙেছে, আজ সেখানে সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের শেষ পর্যায়ই হয়তো আফ্রিকাতে সমাপ্ত হবে। সেই দীর্ঘ সংগ্রামের পথে মহাত্মা গান্ধী একজন পূর্বগামী বা Pioneer হিসাবে আফ্রিকার সর্বত্র সম্মান পাবেন। এবং ভারতীয়দের আত্মসম্মান ও অধিকার জ্ঞানের ভিত্তিটাও তিনি যা তৈরী করে দিয়ে এসেছেন, তা থেকে তাদের হটানো কোন কালেই সম্ভব হবে না এবং আজ স্বাধীন ভারতও সে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারবে না। তাই দেখি আফ্রিকাকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ সচেষ্ট।* সে দায়িত্ববোধের শক্তি ভারতবর্ষকে গান্ধীজী দিয়ে গেছেন। আরও একটা কথা জানা দরকার, সেখানে সেদিন ভারতীয়দের সংগ্রাম কোন রক্তারক্তি বা চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেলে যে বেশী সার্থক হতো এমন মনে করার কোন কারণ নেই। যদি তাই হতো তবে 'বুয়োর ওয়ার' বা 'জুলু ওয়ারের' মতো শোচনীয় পরিণামই হতো। জুলুদের বিদ্রোহ যতো সহজে ইংরেজরা দমন করতে পেরেছিল, গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের সংগ্রাম ততো সহজে কাবু করা তো দূরের কথা, তারা গান্ধীজীর সাথে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং সেই অবস্থায় তিনি আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে সম্মত হন।

এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে গান্ধীজী যতটা কাজ করেছিলেন, তার চেয়ে এক চুলও এগোতে পারা যেতো না—এমন কথা বলা যায় না। গান্ধীজীর সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে ধারণা তখন অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। মনে রাখতে হবে গান্ধীজী প্রথম থেকেই সচেতন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে develop করেছেন। অতি মডারেট ও নরমপন্থী ছিলেন—তিনি রাজনীতিকই ছিলেন না। প্রথম জীবনে

---

* আজকে আফ্রিকার অনেক দেশেই ভারতীয়দের সেই সম্মান ও মর্যাদা নেই। কালো নিগ্রোদের সঙ্গে একাত্মতা স্বীকার করতে পারেন নি সেখানকার সুবিধাভোগী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। খাস আফ্রিকানদের চেয়ে তাঁরা বড় জাত—এ ধরণের মহামন্যতা বা অভিমান ভারতীয়দের ও পাকিস্তানীদের আছে বলেই আজ সাদাদের সঙ্গে ভারতীয়দের সকলকেই কালো আফ্রিকানরা বর্জন করেছে। আফ্রিকার নানা দেশ থেকে ভারতীয়রা আজ বিতাড়িত হচ্ছে। কবে, কোন কালে একদা গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাতে অত্যাচারিতদের পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন, সেকথা আজ তথাকার আফ্রিকান এমনকি আজকের আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দেরও হয়তো স্মরণে নেই, কিংবা পুরোনো সেই ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য বরাবরকার কোন সংগ্রামও তাঁরা রচনা করেন নি। ফলে আফ্রিকা থেকেও দলে দলে ভারতীয় শরণার্থী বিলেতে ও ভারতে ফিরে আসছে। রাজনৈতিক মর্যাদা, এমনকি স্বাধীনতা, একবার পেয়ে গেলেই চিরকালের জন্য তা স্থায়ী থাকে না। তারজন্য eternal vigilance বা নিরলস প্রচেষ্টা যেমন চাই, তেমনি চাই সক্রিয় সংগ্রাম।

তিনি রাজনীতিক ছিলেন না এবং কোনো রাজনৈতিক আকাঙ্খাই তাঁর ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তিনি ওকালতি বা আইনের ব্যবসায় করতে, কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার ও অপমান তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না—ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। তখনকার দিনে তিনি বরং ইংরেজ ভক্তই ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ইংলন্ডে ইংরেজদের ভাবসাব, চলাফেরা, উদারতা ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা দোষত্রুটি থাকলেও তিনি ব্রিটিশ-শাসনতন্ত্র ও ব্রিটিশ-জনগণের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। মনে রাখতে হবে যে গান্ধী ছাত্রাবস্থায়, ১৮৮৮ সালে বিলেতে যান। তখন ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা কত সামান্য ছিল। এই ধর্মভীরু শান্ত বালক বিলেতে থাকাকালীন কোন বিপ্লবী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন নি। তখনকার দিনে উদারনীতি বা লিবারেলিজমই (liberalism) যথেষ্ট বিপ্লবী মতবাদ বলে ভারতীয়রা মনে করতেন। মার্কস্, এঙ্গেলস্-এর কর্মক্ষেত্র যদিও ইংল্যান্ডে, তবু বালক গান্ধীর সেসব দিকে যাওয়া সম্ভবই হয় নি, কেননা রাজনীতি করার তাঁর কোনই বাসনা দেখা দেয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় এবং সেখানে আফ্রিকাকে স্বাধীন করা বা ইংরেজকে তাড়ানো—এমন কোন প্রোগ্রাম তাঁর ছিল না। কিন্তু ভারতীয়দের দাবি ও সম্মান কায়েম করা ও সে দেশের জনসাধারণের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করানো—এরচেয়ে বড় রাজনীতি তাঁর ছিল না এবং সেই সব ন্যায়সঙ্গত দাবি কায়েম করতে হলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই চূর্ণ করা দরকার, এতটা রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁর হয় নি এবং হলেও কিছু ইতর বিশেষ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তিনি সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাটা ও জ্ঞানটা ভারতের সংগ্রামক্ষেত্রেই অর্জন করেন। প্রথম জীবনেই যদি তিনি রাজনীতির এই মূলকথাগুলি বুঝতে পারতেন, অর্থাৎ শেষ বয়সে যা বুঝেছিলেন, তা যদি বাল্যাবস্থায়ই বুঝতে পারতেন, তবে হয়তো তাঁর ব্যবহারে কিছুটা ভিন্ন ধরণ দেখা যেতো। তাহলেও একথা ভুল করা উচিত নয় যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি জ্ঞানতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম না করলেও, সচেতনে না করলেও, কার্যতঃ তিনি যা করেছেন তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরই সূচনা। কার্যক্ষেত্রে তাঁর আঘাতগুলি সাম্রাজ্যবাদকেই আঘাত করেছে এবং জনচেতনায় আত্ম-সম্মান ও আত্ম রক্ষার জন্য যা তিনি করেছেন, তাতেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকেই জাগিয়েছিলেন।

আরও একটা কথা এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম সেই স্থানের স্থানীয় সংগ্রামেই নিষ্পত্তি হয় না। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি পৃথিবীব্যাপী, সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যেকটি উপনিবেশ বা বসতিকে পৃথিবীর ভাগ্যের সঙ্গে একত্রিত করে দিয়েছে—কোনো স্থানের গুরুত্বকে সেই স্থানীয় গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে নি, তাকে বিশ্বগন্ডীর আবহমন্ডলে এনে ফেলে। তখন সেই পরাধীন বসতিটুকু বা উপনিবেশটিকে ও তার সংগ্রামটাকে বিশ্ব সংগ্রামের গন্ডীতে টেনে এনেই সার্থক করতে পারে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্বব্যাপী শক্তি, তেমনি ধরণের পাল্টা বিশ্ববিপ্লবী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করেই সেই সব উপনিবেশ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনও

হতে পারে—অর্থাৎ স্থানীয় সংগ্রামে তার চরম সার্থকতা হয় না। আজ যেমন গোয়ার স্বাধীনতা গোয়াতেই বা ভারতেই সীমাবদ্ধ নেই। গোয়াকে স্বাধীন করতে হলে কেবল পর্তুগীজদের সাথে লড়াই করার কথা উঠছে না, ন্যাটোশক্তি সমূহের সাথেও মোকাবিলার প্রয়োজন হতে পারে, এবং তাও সম্ভব যদি ন্যাটো বিরোধী শক্তি সমূহের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা সম্ভব হয়। প্রত্যেকটি স্থানীয়-সমস্যা যখন বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত হয়ে পড়েছে, তখন বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহারের মধ্যে মুক্তির অনেক প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সে সমস্ত শক্তি পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক স্থানীয় সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। কতগুলি ঐতিহাসিক শক্তি পূর্ণতায় না পৌঁছন পর্যন্ত অতি পশ্চাদপদ অন্ধকার আফ্রিকা মুক্ত হতে পারে না-আজ সেসব শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে আসছে এবং আজকের সংগ্রাম অচিরেই সার্থক হতে বাধ্য। কিন্তু এই মুক্তি সংগ্রাম তাই এতো দীর্ঘায়িত হতে বাধ্য হয়েছে এবং অকারণ যদি স্বপ্ন দেখা হয় যে গান্ধীজী সেদিনই আফ্রিকাতে বিপ্লব ঘটাতে পারতেন তাহলে ভুল হবে। সেদিন বিপ্লবের কোনো পটভূমিকা তৈরী হয় নি। এবং গান্ধীজীও তখন বিপ্লবী তো দূরের কথা, একজন চরমপন্থী রাজনীতিকও ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গান্ধীজী শত্রুপক্ষকে বিব্রত করার নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। অর্থাৎ বিপক্ষ যখন অন্য কারণে বিপদগ্রস্ত তখন তার সুবিধা গ্রহণ করাকে তিনি অহিংসা মনে করতেন না, বরং বিপদে পড়লে তাকে আঘাত করাকে তিনি হিংসা মনে করতেন। ফলে হিটলার-জার্মানী যখন ইংলন্ডকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলতে লাগলো, গান্ধীজী তখন ভারতে ইংরেজদের আঘাত করাটাকে অন্যায় মনে করতেন। সুভাষবাবু বরং সেটাকেই সুযোগ মনে করলেন। শত্রুর বিপদই আমাদের সুযোগ, এই নীতিই হলো চিরকালের নীতি, তা কেবল সুভাষবাবুরই এই রাজনীতি নয়—প্রত্যেক জাতি স্বাধীনই হোক আর পরাধীনই হোক, চিরকালই শত্রুর বিপদের দিনের অপেক্ষায় থাকে এবং তার সুযোগ নেয়। কিন্তু গান্ধীজী তো পুরাতন রাজনীতির লোক নন। তিনি জগতে অন্য নীতি, সততার নীতি, অহিংসার নীতি আনতে চান। কাজেই ইংরেজের সেই বিপদের দিনে পিছনের থেকে তাকে আঘাত করাটা তাঁর অহিংসার নীতিতে বেধেছে। তিনি যদি তাই করতেন তবে হয়তো তিনি স্বাধীনতার সৈনিকই থাকতেন, কিন্তু অহিংসার কোন বাণী তাঁর চলতো না। এই অর্থেই তিনি বিব্রত করার নীতি মানতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য বিপক্ষকে ধ্বংস করা নয়, তাদের বিবেককে পরিবর্তন করা বা কনভার্ট (convert) করা। ধ্বংস করার জন্য পিছন থেকে তার বিপদের দিনে আঘাত হানলে হৃদয় পরিবর্তিত করার কোন দাবি করাই চলে না। তিনি বলেছেন, "A genuine Satyagrahi proceeds by setting the opponent at his ease. His action never creates panic in the breast of the 'enemy'." (Harijan, 20. 5. 39) অর্থাৎ "একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী তার বিপক্ষকে নিশ্চিন্ত হতে সাহায্য করে কিন্তু ত্রাসগ্রস্ত করে না।

শত্রুর মনে ভয় বা ত্রাস সৃষ্টি করা তার কাজ নয়।"* এইজন্যই উচিত পথে চলা, যে কথা বলা তা রক্ষা করা, শত্রুপক্ষের বিপদের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করা—এগুলি তাঁর ধর্ম বা নীতি। কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনা করে তিনি হয়তো তাঁর মূল সর্ত বা original position-টাকে হেয় করতে চান নি। এই জাতীয় নীতি জ্ঞান তাঁর বরাবরই ছিল। এবং এটা না থাকলে তাঁর অহিংসাই দাঁড়াতে পারতো না। গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি কথার উপর শ্রদ্ধা শুধু এজন্যই এতো বেশী ছিল শুধু তাইই নয়, শত্রুপক্ষ অর্থাৎ ইংরেজদেরও তাঁর উপর ও তাঁর কথার উপর আস্থা ছিল। এবং এই বিশ্বাস ছিল বলেই এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে গান্ধীজীকে তারা ডাকতে পারতো, আলোচনা করতে পারতো এবং এদেশের রণক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ মারাত্মক ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। পূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ লড়াইয়ের নিয়মকানুন মেনে চলার দরুন অন্যায় বা অসাধু-খেলা (foul game) ও নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রটা অনেক কম হয়েছিল—একথা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনামূলক বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে। ভারতের মতো এত বড় একটা মহাদেশ যত কম মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, ততো কম মূল্যে অপর কোন দেশ তা পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। তবে এর পিছনে অবশ্য অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক সাহায্যও আছে।

সত্যাগ্রহী আন্দোলনে আপোষের স্থান সর্বদাই আছে। যেহেতু শত্রুর ধ্বংস নয়—পরিবর্তন বা conversion এখানে লক্ষ্য, সেহেতু প্রত্যেকটি আপোষের সুযোগকে গান্ধীজী গ্রহণ করতেন। আপোষটাকে অবহেলা করা কখনো ন্যায়-সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতেন না। কিন্তু মূল ন্যূনতম দাবির ব্যাপারে কোন আপোষ চলতো না—সেখানে তিনি একেবারে অনড়, অটল। তিনি বলেছেন, "Indeed life is made of such compromises. Ahimsa, simply because it is the unselfish love, often demands such compromises." (Harijan, 17. 10. 36) কেবল রাজনীতির ব্যাপারেই নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাঁর আপোষ ও ক্ষমার মনোভাব সর্বদাই ছিল। **কেবল নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধেই তিনি আপোষ-হীন ছিলেন। নিজের দোষটাকে বেশী করে দেখা, অন্যের দোষটাকে কম করে দেখা—তাঁর একটা স্বভাব ছিল।** রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যরকমের যুক্তি থেকেই তিনি আপোষকে স্বীকার করতেন, কেন না আপোষের দ্বারা কোন একটা সুবিধা আদায় করে নিয়ে পরবর্তী সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরী করতে তিনি বেশী সুবিধা পেতেন। তিনি বলেছেন, "My life is made up of compromises but they have been compromises that have brought me nearer the goal-" বিপ্লবীরাও একথা জানেন যে আপোষটাকে অস্বীকার করা যায় না—reform গুলিকে revolution-এর কাজে লাগাতে হয়। যাঁরা লেনিনপন্থী তাঁরা জানেন যে reform ও compromise জনজীবন ও ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া

---

* "গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যায় না বরং অনেকক্ষেত্রে সেগুলি প্রস্তুতি ও পরবর্তী সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায় ও তা লাগানো উচিত। গান্ধীজী লিখেছেন, "The method of Satyagraha requires that the Satyagrahi should never lose hope so long as there is the slightest ground left for it. For he never despairs of being able to evoke the best in his opponent, his mission being to convert the opponent, not humiliate or defeat him. He therefore even knocks at his opponent's door if it becomes necessary, as I did often with General Smuts. It so happened that the last opening, when I had the least hope, proved the prelude to success.

There ought to be no demoralisation among the ranks. It is up to the lieutenants to be in constant touch with them and explain to them the reason for, and the bearing on the struggle of, each step. For whether there is actual battle or merely preparation, the education of the masses continues without interruption. It is a great mistake to suppose that the revolutionary instinct will die, if the garnered energies of the people have no outlet. This may be true of violent revolution, but it is utterly wrong of the non-violent revolution. I am quite convinced we would put ourselves in the wrong if in our impatience we precipitate the battle or, which is the same thing, bang the door on negotiations. The battle will come at the right time when it is clear beyond doubt that there is no escape from it." (Harijan, 17. 2. 40.)

"যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ আশাটুকু আছে তার পূর্ব পর্যন্ত সত্যাগ্রহীর নিরাশ হওয়া সম্ভব নয় ও উচিত নয়। কেন না তার পক্ষে বিরুদ্ধবাদীর হৃদয়ে যা কিছু মহৎ, তাকে জাগাবার শক্তিতে অবিশ্বাস রাখা ঠিক নয়—তার সাধনাই হচ্ছে তাকে পরিবর্তন করা—অপমানিত বা ধ্বংস করা নয়। আমি যেমন জেনারেল স্মাট্‌স্‌-এর কাছে যেতাম, তেমনি তাঁকেও বিপক্ষের দুয়ারে প্রয়োজন হলে নিজ থেকে হানা দিতে হতো। এমনও হয়েছে যে যখন আমার নিজেরও আশা ছিল না, সেই অবস্থায়, সেই শেষ আবেদনটি কার্যকরী হয়েছে।

"তাই বলে নিজেদের দলে কোন নৈরাশ্যের কথাই ওঠে না। কর্মীদের সংগ্রামী জনতার সাথে সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে হবে এবং সংগ্রামের প্রয়োজনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ জনতাকে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের থাকা চাই। সংগ্রামের সময়েই হোক আর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির সময়েই হোক, জনতার রাজনৈতিক শিক্ষার কাজ অব্যাহত থাকা চাই। জনতার জাগ্রত চেতনাকে যদি কোন স্ফুরণের পথ না করে দেওয়া হয় তবে জনতার বিপ্লবীশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, এমন ধারণা ভুল।

একথা হয়তো সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অহিংস বিপ্লবে এমন ধরণের আশংকার অবকাশ নেই। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, যদি অধৈর্য বশতঃ সংগ্রামটাকে সহসা ঘটিয়ে দিই অথবা আপোষ আলোচনার রাস্তা আগে থেকে আমরাই বন্ধ করে দিই, তবে আমাদের পক্ষেই তা ক্ষতিকর ও দূষণীয় হবে। যখন জনতা এমনিতেই বুঝতে পারবে যে সংগ্রাম ছাড়া আর পথ নেই তখনই সংগ্রাম আসবে এবং সেইটাই হবে ঠিক সময়।"

মোটামুটিভাবে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করবার জন্য কতগুলি সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। গান্ধীজী এই অস্ত্রটাকে একটা বিজ্ঞানসম্মত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন, যাতে তিনি ছাড়া অন্য লোক অন্য দেশেও এর ব্যবহার করতে পারে। এবং তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন যে এই অস্ত্র ব্যবহারে তিনি শেষ কথা আবিষ্কার করে যান নি। তিনি একজন পথিকৃৎ মাত্র এবং এই পথের ব্যবহারে তিনি বারেবারেই নানা ভুলভ্রান্তি করেছেন এবং তিনি আশা করেন, **তাঁর চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতে এই অস্ত্র অব্যর্থ হবে।** আমরা সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করেছি তাতেই যে তার পূর্ণ চেহারাটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি তা নয়, কেননা আলোচনাগুলি খুব সংক্ষিপ্তভাবে হয়েছে। যাঁরা সত্যাগ্রহ ভালো করে বুঝতে চান তাঁদের উচিত হবে প্রত্যেকটি সংগ্রামকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করা। যেমন কোন দুটি লড়াইই একরকম হয় না, তেমনি কোনো দুটি সত্যাগ্রহই একরকম নয়—অবস্থা, প্রস্তুতি, নেতৃত্ব ইত্যাদির ইতরবিশেষে সত্যাগ্রহের রূপ ও ফলাফল বিভিন্ন হতে বাধ্য। যুদ্ধশাস্ত্রেও তাই এমন কোন অপরিবর্তনীয় নিয়ম কেউ তৈরী করে দেয় না যে তার হুবহু ফলন হবেই। বস্তুতঃ ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে কোনো যুদ্ধের নিয়মকানুনই অপর কোনো যুদ্ধের সময় হুবহু মিলে চলে না, অবস্থার বৈচিত্র্য, সেনাবলের স্বরূপ, নেতৃত্বের কায়দা, ব্যক্তিত্ব, অস্ত্রশস্ত্রের বৈচিত্র্য ইত্যাদি নানা কারণে যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম তৈরী করা কঠিন হয়। তা হলেও সাধারণ নিয়ম যে তৈরী হয় নি বা খুঁজে পাওয়া যায় নি, তা নয়। নাহলে যুদ্ধশাস্ত্র বলে কোন শাস্ত্র থাকতো না। সে হিসেবে প্রত্যেকটি সত্যাগ্রহ সংগ্রামের রূপ আলাদা হয়ে ফুটে উঠলেও তাদের ভিতরকার কতগুলি নিয়মের যে সাধারণত্ব আছে, তা থেকেই আমরা উপরোক্ত একটা সত্যাগ্রহ-শাস্ত্র তৈরী করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিষয়টা ভালো করে আয়ত্ত করতে হলে প্রত্যেকটি সংগ্রামের ঐতিহাসিক পরিবেশ ভালো করে জানা দরকার। ইতিহাস থেকে ছিন্ন করে, প্রত্যেকটি ঘটনার পরিবেশটি না ধরে কেবল আদর্শগত বা তত্ত্বগত সত্যাগ্রহ আলোচনা ব্যর্থ হবেই। তাছাড়া গান্ধীজী যেখানেই, যে উপলক্ষেই সত্যাগ্রহ করে থাকুন, তারমধ্যে কেবলমাত্র সত্যাগ্রহী শক্তিটাই কার্যকরী ছিল, এমন তো নয়। তাঁর অহিংসার সাথে অনুগামীদের ও পার্শ্বচরদের হিংসাও নানা কারণে জড়িয়ে যেতো। কাজেই নেহাৎ শুদ্ধ ও অবিমিশ্র সত্যাগ্রহ কমই ঘটেছে। কাজে কাজেই প্রত্যেকটি আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার সময় বিশেষ তৎপরতার সাথে বেছে নিতে হবে কতটুকু সত্যাগ্রহ আর কতটুকু অন্যান্য আগ্রহ কাজ করেছে, কেন না পরিষ্কার শুদ্ধ আবহাওয়া সমাজে পাওয়া অসম্ভব। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর

সত্যাগ্রহের গঙ্গাস্রোতে অনেক স্রোতস্বিনী এসে পড়তো এবং সমুদ্র মোহনার প্রান্তে এসে তার আকার বিপুল হয়ে উঠতো। কিন্তু সবটাই সত্যাগ্রহ নয়। নেহেরু যাকে বলেছেন, the fact of conflict, সেটাই একটা বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করতো জনমানসে, কিন্তু সেই উত্তেজিত জনমানসে সত্যাগ্রহের কাজ ও পরিণাম কতটুকু, তার বিশেষ ও বিচক্ষণ বিচার দরকার। আইন অমান্য, পিকেটিং, বয়কট, বর্জন, অসহযোগ, অনশন, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি যে সমস্ত সত্যাগ্রহের রূপ আমরা দেখেছি, সেগুলির প্রত্যেকটির বিচার আলাদা আলাদা করে করতে পারলেই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটা জ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব। ভারতব্যাপী বড় বড় আন্দোলন ছাড়াও যে সমস্ত স্থানীয় সত্যাগ্রহ হয়েছে—যেমন মেদিনীপুর, মুলসিপেট, ভাইকম, চম্পারণ, তারকেশ্বর, গুরুদ্বারা, চিরলাপেরালা, পটুয়াখালি, নাগপুর, নেইল, কয়রা (Kaira), বারদৌলি প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত স্থানীয় সত্যাগ্রহ হয়েছে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। কেবল সত্যাগ্রহের খাতিরে নয়, গণআন্দোলন কি করে করতে হয় তা প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর জানা দরকার। সেদিক দিয়ে এই সব খণ্ড ও বৃহৎ আন্দোলনগুলিতে সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য শক্তি কীভাবে কাজ করেছে, তার বিশ্লেষণ করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হতে পারে না এবং একটা বিরাট অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়, যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সুগম হতে পারে। বিজ্ঞান হিসেবে সত্যাগ্রহকে দাঁড় করাতে হলে এই অতীতের, যে অতীত মোটেই দরিদ্র নয়, তার বিশ্লেষণ করা দরকার।* তাছাড়া আরও ভাবা ও গবেষণা করা দরকার। কেন না সত্যাগ্রহ গান্ধীজী যতটা দেখিয়েছেন তার চেয়েও অগ্রসর হতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিতে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায় কিনা, সেই প্রশ্ন মোটেই অবান্তর হবে না। এখনো যে সব দেশ, যে সব জাতি, যে সব শ্রেণী নির্যাতিত হয়ে রয়েছে, তাদের মুক্তি অভিযানে সত্যাগ্রহ যদি কোন কাজ না দেয় তবে সত্যাগ্রহের কোন দামই থাকবে না। গোয়াকে স্বাধীন করা, নিগ্রোজাতির আমেরিকাতে মুক্তি, আফ্রিকার মুক্তি, এসব কত কি কাজ রয়েছে। তাছাড়া সমাজতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের পথেও অন্তরায় রয়েছে অথচ যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ যখন পৃথিবীতে একরকম অচল হয়ে উঠলো, তখন সত্যাগ্রহের একটা স্থান থাকা স্বাভাবিক। আজ যদি গান্ধীজী জীবিত থাকতেন তবে বিশ্বের ব্যাপারে তিনি কী নীতি গ্রহণ করতেন? যদিও তিনি দেশের মধ্যেই সত্যাগ্রহকে নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, কিন্তু তখন তার একটা কারণ ছিল। তিনি বলেছেন, সত্যাগ্রহ সবদেশেই প্রযোজ্য, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে তার কার্যকারিতা না দেখানো পর্যন্ত অন্য কোন দেশের সত্যাগ্রহ পরিচালনায় কোনো উপদেশ বা আদেশ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আজ যখন ভারত স্বাধীন, তখন নিশ্চয়ই তাঁকে বাইরের ব্যাপারেও হাত দিতে হতো যদি তিনি বেঁচে থাকতেন। অবশ্য ভারতবর্ষকে অহিংসার পথ, সত্যাগ্রহের পথ অন্যকে দেখাতে

* ইদানীংকালে ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইংরাজীতে Satyagraha নামে যে বইখানা লিখেছেন সেটিও দ্রষ্টব্য। আমেরিকার, মার্টিন লুথারের সত্যাগ্রহ ও তাঁর আততায়ীর হাতে অকাল মৃত্যু আধুনিক কালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝাবার একটি বড় আলোচ্য বিষয় হতে পারে।

হলে ভারতবর্ষের সেই যোগ্যতা হয়েছে কিনা তা নিশ্চয়ই তিনি দেখে নিতেন, না হলে গায়ে-পড়াভাবে উপদেশ দিয়ে তিনি নিজেকে ঠাট্টার পাত্র করতেন না নিশ্চয়ই। এই যোগ্যতার অর্থ কী? পূর্বেই বলেছি যে স্বেচ্ছায় কষ্ট বহন করার ক্ষমতা বা ability to suffer—এইটাই হচ্ছে যোগ্যতার মাপকাঠি। ভারতবর্ষ জগতে শান্তি ও স্বাধীনতা স্থাপনের কাজে যদি অগ্রসর হতে চায় সত্যাগ্রহের পথ ধরে, তবে ভারতের যোগ্যতার মানদণ্ড উঁচু করতে হতো গান্ধীজীকে। ভারতবর্ষের লোকের নৈতিকমান যেভাবে দিনকে দিন নীচের দিকে নেমে যেতে চাইছে তাতে তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই হঠকারিতা করা সম্ভব হতো না। **তাঁকে প্রথমেই ভারতবাসীদের তৈরী করে নেবার জন্য লাগতে হতো** এবং ধীরে ধীরে বিশ্বের জনমত গঠনের কাজে লেগে যেতে হতো এবং বিশ্বসত্যাগ্রহীর দল তৈরী করতে হতো হয়তো। হয়তো বা তিনি নিজেই সর্বপ্রথমে সেই যোগ্যতা ও আত্মত্যাগের নমুনা দেখাতে এগিয়ে আসতেন। যাক্, এসব কেবল জল্পনাকল্পনা মাত্র। অর্থাৎ তিনি বেঁচে থাকলে কি করতে পারতেন! তবে সাহস করে বলা যায় যে তিনি নীরব থাকতেন না এবং নিষ্ক্রিয় দর্শকও হতেন না এবং একথাও ঠিক, ভারতে অহিংসা স্থাপনের জন্য যে ব্যক্তি জীবন পণ করে লেগেছিলেন; বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠায়, অহিংসার প্রচেষ্টায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে আনন্দই বোধ করতেন। আরও একটা কথা এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে যখনই মৃত্যু বরণের কথা বা তার প্রয়োজন এসেছে গান্ধীজী নিজেই সবার আগে একাই অনেকবার অগ্রসর হয়েছেন, সত্যাগ্রহের এ-ও এক নীতি। রাম-শ্যাম-যদু-মধু বা চেলা-চামুণ্ডাদের আগে দিয়ে পরে নেতাদের অগ্রসর হবার নীতি, সত্যাগ্রহ নয়। যে খ্যাতি, যে ব্যক্তিত্ব, যে শ্রদ্ধা তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের সংগ্রাম ও সাধন এবং সেবার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, সেই খ্যাতির মোহ বা শ্রদ্ধার সঞ্চয় তাঁকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার লোভ দেখাতে পারতো না, যেমন পারেও নি। আজ যারা নিজেদের বাঁচিয়ে সত্যাগ্রহের কল্পনা করেন তাঁদের এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো বৃহৎ কাজের জন্য যদি বৃহত্তম মূল্য ও শ্রেষ্ঠতম প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত না থাকা যায় তবে বিশ্বে সত্যাগ্রহ চালু করার কথা হাস্যকর।

এখন আমরা আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনায় অগসর হবো। সে হলো প্রস্তুতি ও শিক্ষা সম্পর্কে। যুদ্ধের জন্য যেমন প্রস্তুতি ও শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি সত্যাগ্রহের জন্যও প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির দরকার। বিনা শিক্ষা ও প্রস্তুতিতে যেমন সশস্ত্র যুদ্ধ চালানো যায় না, তেমনি শিক্ষা ও প্রস্তুতি ভিন্ন সত্যাগ্রহ করাও সম্ভব নয়। ভীরুকে সাহসী করা, বিশৃঙ্খলতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, কর্মীদের তৈরী করা, অচ্ছেদ্য গণ-সংযোগ সৃষ্টি করা, দেশকে ভালোবাসতে শেখানো, মানুষের সেবা করতে আগ্রহ সৃষ্টি করানো ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ সত্যাগ্রহীর থাকা দরকার—**সেগুলি কেবল বক্তৃতা দিয়ে তৈরী হয় না বা উত্তেজিত ঘটনাতে আপনা থেকে সেসব গুণ এসে যায় না। তারজন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি চাই। সেই প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ আসবে গঠনমূলক প্রোগ্রাম থেকে।** সৈনিকের জন্য প্রতিদিন ড্রিল ও কুচকাওয়াজ যেমন

দরকার, গঠনমূলক কাজ তেমনি সত্যাগ্রহীদের জন্য অপরিহার্য। এই গঠনমূলক কাজ সম্পর্কেই আমরা এখন আলোচনা করবো। গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক সন্দেহ ও তর্কাতর্কি হয়েছে গান্ধীযুগে, তারও কিছুটা আলোচনা করতে হবে। গান্ধীজীর অহিংসা সত্যাগ্রহ প্রভৃতি কাজ যেমন সবারই জানা আছে, কিন্তু তাঁর গঠনমূলক কাজটা তেমন সুনজর বা পরিচিতি পায় নি, অথচ গঠনমূলক কাজের কর্মতালিকাটা গান্ধীজীর একটা শ্রেষ্ঠ দান ও কল্পনা। আমরা দেখাবো গান্ধীজী এই গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি ছাড়াও সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা ছবি এঁকে গেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও কূপমণ্ডূকতার জন্য তাঁর গঠনমূলক কথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মোটেই গ্রাহ্যের বিষয় হয় নি।

গঠনমূলক কাজ বা Constructive Programme

সবচেয়ে সহজ যেটা দৃষ্টিগোচর না হয়ে পারে না, তা হলো এই যে, গঠনমূলক কাজের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে গণসংযোগ করা। শিক্ষিত লোকেদের বক্তৃতার আসন থেকে কংগ্রেসকে একটা বিরাট জনসংগঠনে পরিণত করার প্রয়োজনে গান্ধীজী গঠনমূলক কর্মপন্থা প্রয়োগ করেন। জনসংযোগ বামপন্থী কমিউনিস্ট-সোশিয়েলিস্টদেরও করতে হয়, কিন্তু সেখানে তাঁরা এ যাবৎ মজুর ও কৃষক আন্দোলন ছাড়া জনসাধারণকে স্পর্শ করবার মতো অন্য কোন রাস্তা বড় একটা গ্রহণ করেননি। যদিও মজুর ও কৃষকই দেশের প্রায় সব, তথাপি যে কয়েকটি ইউনিয়ন বা কৃষকসমিতি তাঁরা গড়তে পেরেছিলেন তাতে সমগ্র দেশের জনসাধারণকে সামান্যই স্পর্শ করেছে। তাছাড়া সংগ্রামের পথ ছাড়া জনতাকে সংগঠিত করা বা স্পর্শ করা যায় না, এমন একটা চিন্তা থাকার দরুণ তাঁরা মজুর ও কৃষকশ্রেণীকেও ভালোভাবে সংযোগ করতে পারেননি। কিন্তু গান্ধীজীর জনসংযোগের পরিকল্পনা কত বিরাট তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যে জনসংযোগ, সে তো আছেই, তাছাড়া এই আন্দোলন সর্বদা চালু না থাকার জন্য গণআন্দোলনে যে ছেদ পড়ে সেই ছেদ গান্ধীজী নানা গঠনমূলক কাজ দিয়ে ভরে রেখেছিলেন। পনেরো দফা গঠনমূলক কাজের হেডিংগুলি দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে গান্ধীজী জনজীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে জনতাকে কত নিবিড় করে সংযোগ করতে চেয়েছিলেন। যেমন, (১) হিন্দু-মুসলমান একতা, (২) হরিজন উন্নয়ন ও ছুৎমার্গ পরিহার, (৩) আদিবাসী উন্নয়ন, (৪) নারী-সমাজের উন্নয়ন, (৫) মদ্যবর্জন, (৬) খাদি ও কুটিরশিল্প, (৭) বুনিয়াদি শিক্ষা, (৮) গো-সেবা সঙ্ঘ, (৯) জনস্বাস্থ্য, (১০) হিন্দি ও রাষ্ট্রভাষা, (১১) বিভিন্ন ভাষার উন্নয়ন, (১২) মজুর সংগঠন, (১৩) বয়স্ক শিক্ষা, (১৪) ছাত্র সংগঠন, (১৫) স্বদেশী প্রচার ইত্যাদি। কংগ্রেস সংগঠনের কাজ, রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রচার ছাড়াও তিনি এতো এতো কাজের সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ যত রকম প্রকারে সম্ভব জনতার সঙ্গে হাজারো বন্ধনে রাজনৈতিক কর্মীদের বাঁধতে হবে—এই ছিল তাঁর নির্দেশ। জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের মৃত্যু হবে, একথা গান্ধীজী মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। এক একটা আন্দোলনের সময় ও তারপরে সরকার কংগ্রেসকে চূর্ণ করে দিতে চাইতো, গান্ধীজীর সমস্ত শক্তি ও সংযোগ নষ্ট করে দিতে চাইতো। কিন্তু এইসব গঠনমূলক কাজের মারফৎ গান্ধীজী জনসংযোগ আরো ব্যাপক ও আরও নিবিড় করে ফেলতেন। সরকার গান্ধীজীকে কখনোই জনতার কাছ থেকে ছিন্ন করতে পারতো না।

কেবল সংগ্রামের পথ ছাড়া জনতাকে একত্র বা সংগঠিত করা যায় না, এই ভ্রান্তি

দূর করা দরকার। জনতা সংগ্রামশীল সব সময়েই থাকে না, সংগ্রামের পর অনেক সময় ভেঙে পড়ে, আবার জনতাকে সংগ্রামশীল করতে হলে বেশ কিছুটা কাটখড় পোড়াতে হয়। দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক একটা জোয়ার দেশকে ভাসিয়ে নিত সত্য, কিন্তু সেই জোয়ারকে যদি বিভিন্ন কর্মোদ্যমের মধ্যে না ধরে রাখা যায়, তবে সত্যিকার জনশক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। সেবার মাধ্যমে, জনসেবার মাধ্যমে জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, একথা গান্ধীজী খুব জোরের সঙ্গে দেখিয়ে গেছেন। জনতার সেবা করা, এইটাই একটা প্রধান কাজ রাজনৈতিক কর্মীর। বামপন্থীরা জনতার নেতৃত্ব বা to lead the people-এ কথাটুকুই ধরে রেখেছিলেন। নেতৃত্ব তো দিতেই হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে কার এবং সে নেতৃত্ব মানবার লোক আছে বা হবে কী ভাবে, এ দুটি প্রশ্ন তলিয়ে দেখতে হবে তো? রাম-শ্যাম সবাই কোন না কোন দলে এসে মনে করলো, আর কি, এবারে জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু জনতাকে সে চিনেছে কিনা, জনতা তাকে জানে কিনা, বুঝেছে কিনা সে হিসেব করার সময় নেই তাদের। ফলে, প্রায় ক্ষেত্রেই তারা গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়লের দল হয়ে পড়ে। গান্ধীজী গঠনমূলক কাজের মারফত জনতার সেবা করা, তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য করা, তাদের শিল্প ও কর্মোদ্যমে নতুন প্রাণ এনে দেওয়া, সামাজিক জীবনে ঐক্য, সমতা ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা জুগিয়ে দেওয়া, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভার যথাসম্ভব লাঘব করে দিতে সাহায্য করা ইত্যাদি নানা উপায়ে জনতাকে কর্মঠ, উদ্যমশীল, জাগরণশীল ও একতাবদ্ধ করার চেস্টা করেছেন। কাজে কাজেই তিনি একমাত্র ধর্মঘট আর ডেমোনেস্ট্রেশনের উপর নির্ভর করেই থাকতেন না। যাঁরা বামপন্থী, তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক বুলি আর কালেভদ্রে সংগ্রাম, এছাড়া আর কোন উপায়ে জনতাকে কাছে পাবার রাস্তা নেই বলে মনে করতেন। এবং গান্ধীজী যেসব চেষ্টা করতেন সেগুলিকে রিফরমিস্ট-আন্দোলন বলে মনে করে নিজেরা আত্মপ্রসাদের নামে আত্মবঞ্চিত হতেন মাত্র।

অথচ যখনই জাতীয় সংগ্রামের সময় এসেছে, তখনই দেখা গেছে গান্ধীজী ছাড়া কোন আন্দোলন শুরু হয় না। কেন? যাঁরা বিপ্লবী, যাঁরা সংগ্রাম ছাড়া জনতাকে সংযোগ করার আর কোন প্রকার বিপ্লবী গণসংযোগে বিশ্বাস করেন না, যাঁরা সেবা-ধর্মকে ছি-ছি করেন, তাঁরা নিজেদের জোরে কেন আন্দোলন শুরু করতে পারতেন না? কেন তাঁরা সেই বুড়ো নরমপন্থী গান্ধীকেই সংগ্রামের ডাক দেবার জন্য এতো অনুরোধ, উপরোধ ও চাপ দিয়ে বেড়াতেন? গান্ধী ছাড়া বামপন্থীরা তো দূরের কথা স্বয়ং কংগ্রেস কমিটিও এক পা তুলতে পারতো না, জনতাকে এগিয়ে আনার কাজে। কেন? কেউ সেকথা কী ভেবে দেখেছেন ভালো করে? স্বয়ং সুভাষবাবু* পর্যন্ত নিজের জোরে কোন আন্দোলন করে যেতে পারেন নি। কংগ্রেস ও গান্ধীজীর সঙ্গে বিরোধের ফলে যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, তখন তাঁর নিজের নাম, খ্যাতি ও বামপন্থী সমর্থনের কোন অভাব ছিল না, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশে তিনি

* "গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিছু করতে পারেন নি, একথা মনে রাখা দরকার। হলওয়েল মনুমেণ্টের আন্দোলন অতি সামান্য রকমের স্থানীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল মাত্র। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত দেখা গেল গণসংগঠন বলতে তাঁর ও বামপন্থীদের এমন কিছু ছিল না যার সাহায্যে কোন দেশব্যাপী সংগ্রাম, গান্ধীজীকে বাদ দিয়েও গড়ে তুলতে পারেন। তিনি বিফল মনোরথ হয়েই শেষপর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে যান এবং বিদেশে গিয়ে বিদেশীশক্তির সাহায্যে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করেন ও সংগ্রাম করেন। মোটকথা নরমপন্থী গান্ধীর গণসংযোগের কাজটাই কংগ্রেসের ও দেশের প্রধান শক্তি ছিল এবং এই গণসংযোগের কাজ তিনি প্রধানতঃ তাঁর গঠনমূলক কাজের মারফতেই করেছেন। অবশ্য একথা বলার এই উদ্দেশ্য নয় যে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থেকে গান্ধীজী বা অন্যান্য নেতারা জনতাকে স্পর্শ করতেন না। তাতো করতেনই, কিন্তু সেই চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী হতো গঠনমূলক কাজের সংগঠনের মধ্য দিয়ে।

গান্ধীজী কার্যক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদীদের চেয়েও বস্তুবাদী ও বাস্তবপন্থী ছিলেন। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের প্রাধান্যটা তিনি কাজে কম দেখান নি। অন্যান্য বামপন্থী মার্কস্‌বাদী দলগুলি জনতাকে স্রেফ রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনীতিতে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতে একটা আদর্শবাদের ঢং আছে, কিন্তু abstract political slogan-এর আকর্ষণ ভাসা ভাসা কাজ ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু গান্ধীজী নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের মারফৎ জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও দলবদ্ধ করতেন। সেখানে বরং তাঁর আন্দোলনের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। বস্তুতঃ গান্ধীজী বহুবার বলেছেন যে, God today can appear before the *hungry people* only in the form of bread.

ভগবানকে যদি আজ দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসীর কাছে উপস্থিত হতে হয় তবে তাঁকে খাদ্যের রূপে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মাধ্যমে আসতে হবে। আজ ভগবানের অন্য কোন রূপ নিরন্ন জনতা ভ্রূক্ষেপও করবে না। তিনি আরো বলেছেন: "A semistarved nation can have neither religion, nor art, nor organisation, whatever can be useful to the starving millions is beautiful to my mind. Let us give to day first the vital things of life and all other graces and ornaments of life will follow. My ambition is to wipe every tear from every eye." এখানেই লক্ষ্য করুন গান্ধীজীর অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর ছিল, বাস্তববুদ্ধি ও ইতিহাস জ্ঞান কত তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর সমস্ত গঠনমূলক কাজ একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি দিতে চেয়েছিল গণআন্দোলনকে, জনতার নিত্যকার বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনে যে কোন উপায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাহায্য পৌঁছুতে চেয়েছিলেন তিনি। অনেক বামপন্থী তখন এই সব ধারণাকে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ, বা ইকনমিজম মনে করে ঠাট্টা করে এসেছেন। যেহেতু রাশিয়ায় একদিন লেনিনকে ইকনমিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল, সেই হেতু এদেশের অন্ধ অনুরাগীদের ধরে নিতে হলো যে গান্ধীজী রাজনীতিতে ইকনমিজম্ এনে ফেলেছেন। তাঁর রিফরমিজম্, ইকনমিজম্-এর নামান্তর মাত্র। জনতাকে সেবা করা, সে তো রামকৃষ্ণ

মিশনের কাজ। রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ও দেশের অর্থনীতিতে বিপ্লব না আসা পর্যন্ত কোন প্রকার গঠনমূলক কাজই চলতে পারে না, সে কেবল প্রচলিত অর্থনৈতিক ঘূণে ধরা কাঠামোটাকেই চাপাচুপি দিয়ে ও সংস্কার করার চেষ্টা মাত্র, এসব চেষ্টা বিপ্লব বিরোধিতা মাত্র ইত্যাদি-ইত্যাদি। অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের ভয়ে বামপন্থীরা জনসাধারণের সকল প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ (সারভিস্) থেকে নিজেদের এড়িয়ে রাখতেন এবং একমাত্র বুলির সাহায্যেই জনতার চেতনা সংগ্রামশীল করার তালে ছিলেন। অথচ মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ ও রাশিয়ার ইতিহাস যদি তলিয়ে তাঁরা পড়ে দেখতেন, তবে বামপন্থীদের এজাতীয় ভ্রম হতো না, সেখানেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানাপ্রকার কাজের চেষ্টা ছিল। তবে অবশ্য এতটা ছিল না, যতটা গান্ধীজী প্রবর্তন করেছিলেন। চীনবিপ্লবে মাও-সেতুং জনতার সেবাটাকে একটা প্রধান স্থান দিয়ে গেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সংগ্রামী বুলি ও কাজই জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে না, গঠনমূলক সেবা থাকলেই বরং সংগ্রামী শক্তি সত্যিকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (See—Attend to peoples Needs—by Mao-Tse-Tung) অতিবিপ্লবী কথাবার্তা এভাবে বামপন্থীদের জনতার প্রতিদিনকার জীবন ও প্রয়োজন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। গান্ধীজী মার্কস্‌বাদীদের চেয়ে কার্যক্ষেত্রে জনতার জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নটা বেশী করে বুঝেছিলেন। জনতার কাছে তিনি শুধু কথার বেসাতি নিয়ে উপস্থিত হতেন না—খাওয়াপরা, ঘরবাড়ী, গরু-বাছুর, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, সমান-অধিকার প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তথ্য ও সম্ভার নিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন এবং তারই মাধ্যমে তিনি তাঁর নীতি, নৈতিক জাগরণ, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বাণী ছড়াতেন ও সংগঠন তৈরী করতেন।

এই সমস্ত গঠনমূলক কাজ আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতিহীন বা অরাজনৈতিক। এই অরাজনৈতিক প্রোগ্রামের প্রতি অতি-রাজনৈতিক দলগুলি কোনো শ্রদ্ধা রাখতে পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন, রাজনৈতিক কর্মীরা এই প্রোগ্রামের পাল্লায় পড়ে অরাজনৈতিক হয়ে যাবে, তারা সংস্কারপন্থী ও সমাজকর্মী হয়ে পড়বেন। স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু পর্যন্ত এই সন্দেহ থেকে সর্বদা মুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজেই লিখেছেন। "To some extent I resented Gandhiji's preoccupation with non-political issues, and I could never understand the background of his thoughts." (Autobiography, page 192)

অথচ গান্ধীজী এই সব গঠনমূলক কাজ রাজনীতির বাইরেই রাখতেন। কংগ্রেসের কাজ ও গঠনমূলক কাজ জড়িয়ে ফেলতে দিতেন না। একে তো এই কারণে দিতেন না, যাতে সরকার সেসব কাজে প্রকাশ্যভাবে বাধা দিতে না পারে—সেখানে রাজনীতির ঘাঁটি করা হচ্ছে বলে ধরে নিয়ে গিয়ে কাজটাকে পণ্ড করার কোনো সুযোগ তিনি করে দিতেন না। দ্বিতীয়তঃ এই কাজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল জনতার মাঝে,

জনতার কাজ করে তৈরী হবার সুযোগেরও প্রয়োজন ছিল; তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক লোক ছাড়াও অনেক অরাজনৈতিক অথচ জনসেবক ভালো লোকেদের এই কাজের মাধ্যমে টেনে আনবার প্রয়োজন ছিল; চতুর্থতঃ এই সমস্ত গঠনমূলক কাজের উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক বিক্ষোভই নয়—এদের নিজস্ব একটা প্রয়োজন আছে—জনসেবার প্রয়োজনে, জনসেবার খাতিরেই করার দরকার আছে। অর্থাৎ যেমন, নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানো কেবল রাজনীতির প্রয়োজনেই দরকার নয়—শিক্ষার প্রয়োজন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এমনিতেই আছে। পাছে রাজনৈতিক কর্মীরা এই প্রয়োজনের দিকটা অবহেলা করে এবং সস্তায় কিস্তিমাত করার লোভে না পড়ে, তারই জন্য তিনি গঠনমূলক কাজ স্বতন্ত্র ভাবে করে যেতে বলেছেন। অথচ তিনি জানেন শেষ পর্যন্ত অরাজনৈতিক গঠনমূলক কাজই কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তির reserve বা আধার হতে বাধ্য। তিনি বলেছেন, "If we are to analyse the activities of the Congress for the last twelve years, we would discover that the capacity of the Congress to take Political power has increased in exact proportion to its ability to achieve success in the constructive effort-that is to me the substance of political power Actual taking over of the Government machinery is but a shadow, an emblem. And it would easily be a burden if it come as a gift from without, the people having no effort to deserve it.

অর্থাৎ "আমরা যদি কংগ্রেসের গত বারো বছরের কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করার ক্ষমতা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যে পরিমাণে গঠনমূলক কাজ অগ্রসর হয়েছে। আমার মতে সেইটাই হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার সারবস্তু। রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকার গ্রহণ করাটা একটা বাইরের দেখবার মতো ঘটনা বটে। কিন্তু এই ক্ষমতা গ্রহণ করা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে মাত্র, যদি সে ক্ষমতা বাইরে থেকে দান হিসেবে পাওয়া যায় এবং জনসাধারণ সে ক্ষমতা লাভ করার জন্য কোনো কিছু যোগ্যতা অর্জন না করে থাকে।"

এখানে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের সাধারণ ধ্যান-ধারণার একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার। গান্ধীজী প্রায়ই বলতেন, দেশের স্বরাজ গঠন করে তুলতে হবে। দখল করতে হবে এমন ধরণের ভাষা তিনি বড় একটা ব্যবহার করতেন না। 'স্বরাজ গঠন করো', এটা অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরা বলে না, তাঁরা বলবেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা, দেশের স্বাধীনতা, এসব দখল করার জিনিষ। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে সে দখল গায়ের জোরেই হোক অথবা কারও পরিত্যক্ত গদিই হোক বা দানই হোক, তা সত্যিকার বিপজ্জনক পাওনা। এ জাতীয় পাওয়া স্বরাজ কাজে লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে। স্বরাজের ভিত্তি পরাধীন ভারতের মধ্যেই জনতা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলবে—নানা প্রকার গঠনমূলক কাজ দিয়ে জাতিকে প্রথম থেকেই গড়ে তুলতে হবে। জাতি গঠনের কাজ স্বরাজ পাবার পরে শুরু করতে হবে এমন ধরণের কথায় বিশ্বাস করতেন না। সেই জাতি গঠনের

মধ্য দিয়েই বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে আসার পর সেই গঠনমূলক ধারাটাকে দ্রুততর সার্থকতা ও চরমে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যে কাজ আমরা পরাধীন অবস্থায় শুরু করবো সেই কাজের ধারাই বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সংঘর্ষ সৃষ্টি করাবে এবং সেই কাজের জয়ের মধ্য দিয়েই স্বরাজ প্রাপ্তি হবে এবং সেই কাজই স্বাধীন ভারতে শতগুণ শক্তিতে চারদিক দিয়ে দেশগঠনের কাজে যুক্ত হবে। তিনি একদা বলেছেন, In non-violence, destractaction of the old order is through construction—এই প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠনমূলক কাজ যদি অগ্রসর হতে থাকে তবে ক্ষমতা পাওয়া মাত্র কোনো মুশকিলে পড়তে হয় না, কি কাজ করতে হবে, কে করবে, কর্মী কোথায়, পরিকল্পনা কি, লোকজন, মালমশলা কোথায়, এ নিয়ে সময় নষ্ট করার কোন দরকার হয় না অথবা কোন গোলযোগ হয় না। কেন না কাজ কি, কর্মী কারা, দেশের লোকের উৎসাহ কোথায়, এসব আগেকার কর্মধারা থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আসছে। ফলে সরকারী কর্মচারী বা অফিসারদের উপরও নির্ভরশীল থাকার দরকার করে না। আজ স্বাধীন ভারতের দেশ গঠনের কাজ এতো কঠিন হতো না, যদি সত্যি সত্যি দেশে গঠনমূলক কাজ যথেষ্ট থাকতো। কংগ্রেস কর্মীরা সে কাজ অনেককাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে আজ দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের প্রয়োজন একমাত্র রাজনৈতিক দলাদলি ছাড়া আর কিছুতে নেই। দেশগঠনের কাজ পুরোনো ঝানু অফিসারদের উপর ও ঠিকাদারদের হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।*

তাছাড়া স্বাধীন ভারতের শোষণহীন অর্থনীতির বুনিয়াদও তিনি গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই গড়তে চেয়েছিলেন। অবশ্য তাতে তিনি সার্থক হন নি। সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। তবে এটুকু মনে রাখতে হবে যে, কুটিরশিল্প, তাঁত, চরকা, পশুপালন, হরিজন উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তাতে ধনতান্ত্রিক ও অন্যান্য শোষণ যাতে প্রবেশ না করতে পারে, প্রথম থেকেই শোষণহীন সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তার কথা ভেবেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ ভারতে যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কায়েম হবে তাতে শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী হতে পারে। কিন্তু তাঁর এসব চিন্তা ও আদর্শ কার্যত কোন স্পষ্ট রূপ নিতে পারে নি। কেন পারে নি তারও আলোচনা আমরা পরে করবো।

গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী সমগ্র ভারতকে স্পর্শ করেছেন, জনজীবনের সকল ব্যাপারে হাত দিয়েছিলেন—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। বস্তুতঃ এইভাবেই তিনি সমস্ত ভারতের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন। শুধু কোনো বিশেষ গান্ধীবাদের ধারায় তিনি 'জাতির পিতা' হননি। জনজীবনের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক বিকাশের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগটাই তাঁকে এই পদ বা কেন্দ্রীয় স্থানটি দিয়েছিল। কোন একটি কাজ, একটি বিষয় নিয়ে যদি তিনি মেতে থাকতেন তবে তিনি জাতির জনক হতে পারতেন না। সমস্ত জাতিকে তিনি গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে আগলে ধরেছিলেন, তার উপর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালু করে সেই

* রবীন্দ্রনাথের ধারণাও অনেকটা এ জাতীয় ছিল, তাঁর "স্বদেশী সমাজ" দ্রষ্টব্য।

মহান রূপকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত গঠনমূলক কাজই শেষপর্যন্ত স্বাধীনতার কাজের পাথেয় ও শক্তি সংগ্রহ করেছে এবং এই প্রকার হাজার হাজার রকম কর্মের কেন্দ্রগুলির কেন্দ্রস্থলে তিনি বিরাজিত ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে দেশের কোন কাজ, কোন সংগঠন চলতে পারতো না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, নারী, হরিজন, আদিবাসী, চাষী, মজুর, ছাত্র, উকিল, ব্যারিস্টার, শিল্পপতি, কারও তাঁর কথা গ্রাহ্য না করে চলার উপায় ছিল না। অথচ সে অধিকার তিনি একমাত্র সেবার মাধ্যমেই অর্জন করতে পেরেছিলেন, কোন প্রকার ক্ষমতা দখল করার প্রচেষ্টা তাতে ছিল না। তিনি মনে করতেন জাতীয় জাগরণে সকল দিকে জাগরণ চাই। কেবল রাজনৈতিক জাগরণই যথেষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, "The fact is that political emancipation means the rise of mass consciousness. It cannot come without effecting all branches of national activity. Every reform means an awakening. Once truely awakened the nation will not be satisfied with reform only with one department of life. All movement must therefore proceed, everyone proceeding simultaneously."

(Young India—5.8.26)

অর্থাৎ "রাজনৈতিক মুক্তির অর্থ হলো জনসাধারণের চেতনা। এই চেতনা জনজীবনের সকল ব্যাপারে আন্দোলিত না করে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক সংস্কারের মূলে আছে জাগরণ। সত্যিকার জাগরণ যখন আসে তখন জনতা তাদের জীবনের কোন একটি ব্যাপারে জাগরিত হয়েই ক্ষান্ত হয় না। কাজেই সকল প্রকার আন্দোলন সৃষ্টি করা চাই এবং সব আন্দোলন একই সাথে চালানো চাই।"

উপরোক্ত উধৃতি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি কেন গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী এতো ব্যাপক ও সামগ্রিক ছিল। খণ্ড চিন্তা, খণ্ড দৃষ্টি তাঁকে আকর্ষণ করতে পারতো না। জাতির সমগ্র মধ্যে চিত্রটা তাঁর সামনে সর্বদা জাগরূক থাকতো। ফলে তাঁর মধ্যে ধর্মপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব হয় নি অথবা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীও প্রাধান্য পায় নি। গঠনমূলক কাজ কতগুলো আলাদা আলাদা কাজ নয়। ওতে সমস্ত জাতির সমগ্র ছবিটাই প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র জাতিকে নিয়ে চলবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। এরই ফলে তিনি জাতির জনক বলে খ্যাতি পেয়েছেন।

অবশ্য গঠনমূলক কাজ যে সমাজ সংস্কারের কাজেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে না এমন নয়। অনেক সময় যারা সুবিধাবাদী ও সংগ্রামভীরু, তারা গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সরে যেতে চায়। কিন্তু এই পলায়নপরতা বা সুবিধাবাদ গঠনমূলক কাজের ধর্ম নয়, মানুষের দুর্বলতা মাত্র। সুবিধাবাদ ও পলায়নপরতা অন্য ধরণের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতেও ঢুকতে পারে, এমন কি সশস্ত্র সংগ্রামের ধুয়োটাও অন্যান্য সাধারণ সংগ্রামকে এড়াবার অছিলা হিসেবে কেউ যে ব্যবহার করেন নি, তা নয়। যেমন নেহেরু এক ক্ষেত্রে বলেছেন, "But I have found there, as I have found elsewhere in India, some people who wanted to make high *socialistic doctrine a refuse* for inaction"

অর্থাৎ "আমি লক্ষ্য করেছি এখানেও এবং ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন একদল লোক আছেন যাঁরা অতি উচ্চ সমাজতন্ত্রের নামের আড়ালে নিজেদের সংগ্রাম বিমুখতাকে ঢাকা দিতে চান"। এই ইতিহাস ভারতের সেদিনকার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই বলতে পারবেন—উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের মোহ নিশ্চয়ই আছে। এখানে গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজ ও রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক চিন্তা ও কাজের মধ্যে পার্থক্যটা দেখিয়ে দেওয়াও অনুচিত হবে না। রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাঁর ধাতে সহ্য হয় নি বলেই ক্রমশঃ তিনি কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই মনোবিবেশ করেন। যদিও শ্রীনিকেতনে গঠনমূলক কাজের স্বপ্নটা তিনি ফলবতী করতে কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু শ্রীনিকেতনের ও পল্লী-মঙ্গলের কাজটা তাঁর ক্রমশঃ অরাজনৈতিক ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট ও সরকার-ঘেঁষা হতে থাকে। তাঁর সেই কাজ থেকে সংগ্রামের সৈনিক তৈরী হয় নি অথবা তাঁর সেই সেবা থেকে গণবিদ্রোহের কোনো ধূমাগ্নি সৃষ্টি হতে পারে নি। "স্বদেশী-সমাজ" তাঁর কর্মপন্থা, কিন্তু সে কর্মপন্থায় সরকারকে বর্জন করার কোনো উৎসাহ ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজের পিছনে অসহযোগের একটা বিরাট পটভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজে দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যাপারেই যদি আমরা সরকারী সাহায্য, সরকারী হস্তক্ষেপ দাবি করি তবে জনতার আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরতার অভাবেই তা দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের ইতিহাসে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতের সমাজ, রাষ্ট্রের মুখ চেয়ে কখনো বসে থাকতো না বলেই রাষ্ট্রের উত্থানপতনে সমাজ কাঠামো ও তার অর্থনৈতিক ভিত ভেঙ্গে পড়তো না, ইংরেজ বা বণিকসভ্যতা আসার পূর্বে। কিন্তু বণিক ইংরেজ এসে গ্রামের সভ্যতাকে, সমাজকে, শিল্পোন্নয়নকে করেছে বিরাট আঘাত, কিন্তু আজ যদি আবার সেই ইংরেজ বা সরকারের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপাতে চাই তবে ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের স্বাতন্ত্র্য যাবে ভেঙ্গে। অতএব তাঁর মতে সরকার স্কুল-কলেজ করে দিক, সরকার রাস্তাঘাট করে দিক, সরকার জলের ব্যবস্থা করুক, এ রকম দাবি সরকারের উপরই নির্ভরশীল হতে শেখাবে। এবং তাতে জনতার আত্মশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তখনকার দিনের হল্লাকারী রাজনৈতিক ও চরমপন্থীদের সাথে বিরোধ বাধে এবং তিনি ক্রমশঃ রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে এবং যদিও গান্ধীজীর বিশ্লেষণের সাথে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের কতকটা মিল আছে কিন্তু কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে, সমাধান নির্ণয়ের ব্যাপারে দুজনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলো। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে গেলেন, আবার ঠিক ঐরকম একটা ধারা থেকেই গান্ধীজী দিন কে দিন রাজনীতির গভীরে ও কেন্দ্রস্থলে অনুপ্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের গঠনকর্ম সরকারী সাহায্য ও আশীর্বাদ পেতে লাগলো। গান্ধীজীর গঠনকর্ম সরকারের প্রাণ শুকিয়ে দিতে লাগলো। এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন নিন্দাবাদের জন্য এটা দেখানো হলো না। কেন না একথা মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও

সাহিত্য, শিল্প, কলা, দর্শন ও ইতিহাসের সাহায্যে ভারতের চরিত্রবল ও মনোসম্পদ প্রচুর দিয়ে গেছেন, যা ছাড়া আজ ভারতবর্ষ এতটা আত্মপ্রত্যয় ও সম্মান পেতে পারতো না। সকল প্রকার রাজনীতির গোড়াকার খাদ্যপ্রাণ তাঁর লেখনী থেকে, গান থেকে দেশ সংগ্রহ করেছে এবং তাতে দেশ বড় হয়েছে। মনে রাখতে হবে গান্ধীজীও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন, অনেক বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও। যাই হোক গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে পার্থক্য নিয়ে যখন আলোচনা করা যাবে তখন আবার একথার বিশদ আলোচনা করবো।

যারা রাজনীতি নিয়ে চলেন, তারাও গঠনমূলক কাজের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক কোথায় না বুঝতে পেরে অনেক কথা বলেছেন। গান্ধীজীর ভাষাই তোলা যাক—
"I know many have refused to see any connection between the constructive programme and civil disobedience. But for one who believes in non-violence, it does not need hard thinking to realise connection between the construetive programme and civil disobedience *for Swaraj.* I want the reader to mark the qualification. Constructive programme is not essential for civil disobedience for specific relief as in the case of Bardoli. Tangible common grivance restricted to a particuler locality is enough. But for such an indefinable thing as Swaraj, people must have previous training in doing things of all India interest. Such work must throw together the people and their leaders whom they would trust implicity. Trust begotten in the persuit of continuous constructive work becomes a tremendous asset at the critical moment. Constructive work therefore is for a non-violent army what drilling etc, is for an army designed for a bloody warfare. Individual civil disobedience among an unprepared people and by leaders not known to or trusted by them is of no avail, and mass civil disobedience is an impossibility. The more therefore the progress of constructive programme, the greater is there the chance for civil disobedience."

(Young India—9.3.30.—N.K.B.—184)

অর্থাৎ "আমি জানি অনেকেই গঠনমূলক কাজ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে, একথা স্বীকার করেন না। কিন্তু যাঁরা অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী তাঁদের একটুও বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে **স্বরাজের** জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে গঠনমূলক কাজের মৌলিক ও অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে। আমি পাঠককে আমার বক্তব্যের সর্তটার উপর (স্বরাজের জন্য) নজর দিতে বলেছি। কোন স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে সত্যাগ্রহ যেমন বারদোলির বেলায়, গঠনমূলক কাজটা একান্ত আবশ্যকীয় নয়। স্থানীয় লোকেদের সম্মিলিত নালিশের

ঘনীভূত রূপটা থাকলেই তা ঘটতে পারে। কিন্তু স্বরাজের মতো কোন একটা অস্পষ্ট অথচ ব্যাপক সংগ্রামের জন্য সর্বভারতীয় স্বার্থসমন্বিত গঠনমূলক কাজ একেবারে অপরিহার্য। এই জাতীয় গঠনমূলক কাজই নেতাদের ও জনতার মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেয় এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘস্থায়ী গঠনমূলক কাজ ও সেবার মধ্য দিয়ে যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয় সংকটকালে তা একটা সঞ্চয় হিসেবে কাজ করে। সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য ড্রিলিং ইত্যাদি সৈনিকের (প্রস্তুতির জন্য) যেমন দরকারি; অহিংস সংগ্রামের কর্মীদের জন্য গঠনমূলক কাজ তেমনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। অপ্রস্তুত জনতার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের আইনঅমান্য এবং এমন সকল নেতার আইনভঙ্গ—যাদের জনসাধারণ চেনে না, জানে না বা বিশ্বাস করার মতো কোন কারণ দেখে নি–এসব কোন কাজে আসে না এবং এই জাতীয় অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে গণআইন অমান্য আন্দোলন অসম্ভব। কাজেই গঠনমূলক কাজ যত এগোবে, গণআইন অমান্য আন্দোলন তত শীঘ্র তৈরী হয়ে আসবে।" তিনি আবার বলেছেন, "A living continuous mass contact is impossible with some constructive programme requising almost daily contact of the workers with masses." (Harijan—23.3.40 N.K.B, page 185)

অর্থাৎ "জনতার সঙ্গে জীবন্ত গণসংযোগ প্রতিদিন কোন না কোন গঠনমূলক কাজ ছাড়া তৈরী করা যায় না।" মজার বিষয় এই, তিনি এই গঠননূলক কাজ অহিংস বিপ্লবের প্রয়োজনে বাতলে দিলেও সহিংস সংগ্রামেও যে গঠনমূলক কাজের প্রয়োজন, সেকথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। অর্থাৎ তিনি যেমন অহিংস সংগ্রামের কথা ভেবেছেন, সহিংস সংগ্রামের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তাঁর অনবহিত থাকা সম্ভব হয় নি।" প্রকৃত লড়নেওয়ালা সেনাপতি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন না। সকল প্রকারের লড়াইয়ের নিয়মকানুন সমন্ধেই তাঁদের ভাবতে হয়। তিনি একবার বলেছেন, "If crores of people donot take living interest in this nation building work, freedom must remain a dream, unattainable by either non-violence or violence." (Gandhiji's Correspondence with Government, 1942—45, page 354 N. K. B, 178)

অর্থাৎ "যদি লক্ষ লক্ষ লোক এই দেশগঠনের কাজে অংশ না নেয়, স্বাধীনতা একটা স্বপ্নই থেকে যাবে এবং অহিংস কি সহিংস—সকল প্রকার পথই ব্যর্থ হবে।" তার মানে এই যে সহিংস সংগ্রামী যাঁরা তাঁদেরও কোন না কোন প্রকার গঠনমূলক কাজ করতে হবে, একথা গান্ধীজীও বুঝেছিলেন। কিন্তু যাঁরা হিংসাপন্থী তাঁরা নিজেরা তা বুঝতে পারেন নি। অথচ মাও-সে-তুঙের মতো সশস্ত্র বিপ্লবী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। কেবল অহিংস সত্যাগ্রহেই গঠনমূলক কাজ দরকার, এই জাতীয় ধারণা অত্যন্ত বিপদজনক। এক একটা সংগ্রামের পরে যে প্রতিক্রিয়া আসে ও নির্যাতন চলতে থাকে, তখন গঠনমূলক কাজ ছাড়া আর অন্য কোন কাজই করা সম্ভব হয় না। সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাত্মা বলেছেন, "There are circumstances where anything but constructive work is impossible. We have

then to hitch our wagon to that single star, forgetting for the moment the fight for responsible Government or Swaraj."

Vol—v. Tendulkar.

দীর্ঘ লড়াই করার শক্তি ও সহ্য শক্তি সৃষ্টি করার কাজেও গঠনমূলক কাজ একটা প্রকাণ্ড হাতিয়ার বা শক্তি। বলাবাহুল্য গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের কল্পনা একটি মাত্র আঘাত বা ক্ষণকালীন বিপ্লবের কল্পনা নয়, সেটি দীর্ঘায়িত বিপ্লবের কর্মসূচীর অন্তর্গত। এই দীর্ঘায়িত বিপ্লবের সশস্ত্র নমুনা মাও-সে তুঙ ও হো-চি-মিন দেখিয়েছেন। সেখানে আমরা দেখেছি সংগ্রামী জনতার সহনশক্তি, রসদ সংগ্রহ বা যোগান ইত্যাদি দীর্ঘকালীন সংগ্রামের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট হয়েছিল। দু দশমাসের প্রোগ্রাম সেসব নয়। দশ-বিশ বছরের অবিরাম লড়াইয়ের দীর্ঘায়িত ছবি সেসব। কাজেই লড়াইয়ের রসদ, লড়াইয়ের কায়দা, লড়াইয়ের সহনশীলতা সেখানে খুব দরকারী কথা। যদি কোন অঞ্চলে তারা ঘাঁটি তৈরী করে নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রেখেছেন—সেখানে খাবার-দাবার, অস্ত্রপাতি, ঔষধপথ্য, জামাকাপড় সেই মুক্ত ঘাঁটি বা অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে চাষবাস, শিল্প, ও অপরাপর কর্মও তাদের করতে হয়েছে এবং সর্ব বিষয়ে যথাসম্ভব স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে নজর দিতে হয়েছে। সৈন্যদের প্রতিদিনকার প্রয়োজন, খাদ্যের, ঔষধপথ্যের, গোলাগুলি ইত্যাদি কেবল লুটের উপরই নির্ভরশীল হতে পারে না। এবং এগুলি যদি না থাকে তবে সেই বিপ্লবী সৈন্যদলের লড়াই করার শক্তি ক্ষণভঙ্গুর হতে বাধ্য—তার লড়াইয়ের সহনশীলতা টিকবে না, একথা বলতে হবে।

অহিংসার সংগ্রামেও গান্ধীজী সংগ্রামী জনতার সহনশীলতা বাড়াবার জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। খাওয়া পরার ব্যাপারে যাতে প্রত্যেকটি গ্রাম অনেকটা স্বাবলম্বী হতে পারে, শহরের উপর তাদের চাষবাস ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবন যাতে নির্ভরশীল না থাকে—এবং শহর শত্রুপক্ষ দখল করলে অথবা বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করলে অথবা ঘেরাও (ব্লকেড) সৃষ্টি করে, গ্রামের জনতাকে যাতে অসহায় করে না ফেলতে পারে তারই একটি দিক গান্ধীজীর চাষ-বাস-কুটিরশিল্প ও বিকেন্দ্রীকরণ কর্মপন্থার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কুটিরশিল্প ও বিকেন্দ্রীকরণে সামাজিক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর বিবেচনা করা ছাড়াও সংগ্রামী জনতার প্রয়োজনে তাদের লড়বার সহনশীলতা বাড়াবার জন্য গঠনমূলক কাজ একটা পরোক্ষ রণনীতি। যখন আমরা কুটিরশিল্প ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বিকেন্দ্রীকরণের কথা আলাদা আলাদা করে আলোচনা করবো তখন সে সবের সংগ্রামী প্রয়োজনীয়তার কথাও ভালো করে দেখা যাবে। দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পথে গ্রামবাসীরা খাওয়া-পরার ব্যাপারে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী হবে, লড়াইয়ের এই রসদটা একটা মস্ত কথা। যারাই লড়াই করেছেন তারাই জানেন লড়াইতে রসদের স্থানটা গোলাগুলীর চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া কোন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা সম্ভবপরই নয় যদি জনতার মধ্যে ঐক্য গড়ে না ওঠে, যদি হিন্দু-মুসলমান মিলন না থাকে, যদি বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে ঐক্য না থাকে, যদি নারীরা সেখানে অগ্রগামী না হয়,

যদি রাজনৈতিক চেতনা সেখানে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়—যদি গ্রামবাসীদের ও সংগ্রামী-জনতার খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি ব্যাপারের যথেষ্ট যোগাড় না থাকে এবং জনতা তাদের প্রয়োজন যথাসম্ভব নিজেরাই তৈরী করে নিতে না অগ্রসর হয়। এসবই গঠনমূলক কাজের লক্ষ্য। অতএব গঠনমূলক কাজ ছাড়া আইন অমান্য আন্দোলন বা অহিংস বিপ্লব সম্ভব নয়, একথা যখন গান্ধীজী বলেছেন, তখন অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ করেন নি। রাজনীতিকে, রাজনৈতিক সংগ্রামকে সুদৃঢ় ও সুদূর প্রসারী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। গান্ধীজীর শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কে যখন আলোচনা করবো তখনও দেখাবো গান্ধীজী মজুরদের সংগ্রামশক্তি ও সহনশক্তি কি করে বাড়াতে পারা যায় সে সম্বন্ধে কত ভেবেছেন এবং অভিনব পন্থা নির্দেশ করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক শ্রমিককে তার নিজের কাজের দক্ষতা ছাড়াও অন্যান্য কাজে দক্ষ হতে হবে, যাতে ধর্মঘট কালে তারা অন্য কাজ করে যেতে পারে, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে না হয়, মনোবল ভেঙ্গে না পড়ে বা দুষ্টবুদ্ধি নেতাদের হাতের পুতুল না হয়ে পড়তে হয়। এমনি ধরণের প্রচেষ্টা তিনি আমেদাবাদ মিল মজুরদের নিয়ে করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। এখানে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে সংগ্রামের সহনশক্তির দিকে নজর না রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন মূল্যই থাকে না। বিশেষকরে বর্তমান যুগে শাসকশ্রেণী বিজ্ঞানের কল্যাণে যেরূপ মারাত্মক অস্ত্রপাতি নিয়ে সুসজ্জিত, সেখানে হঠাৎ দু-চারদিনের গণবিদ্রোহ কখনো বিপ্লব সম্ভব করাতে পারে না। সেখানে কোন না কোন প্রকার দীর্ঘায়িত সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

শেষপর্যন্ত কর্মী তৈরী করা, প্রকৃত সৈনিক ও নেতা তৈরী করাও গঠনমূলক কাজের একটা প্রধান লক্ষ্য। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা তৈরী করা সহজ কাজ নয়। সাধারণতঃ আমরা দেখে থাকি দেশে বামপন্থী নেতা ও কর্মীর অভাব নেই। কিন্তু এই সব কর্মীরা প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর এবং নেতারা নেতৃত্বশূন্য। কত কর্মীর, কত নবাগত যুবকের আদর্শ, স্বপ্ন ও জীবন যে তথাকথিত বিপ্লবীদলগুলিতে অপচয় হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাংলাদেশে তার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে মর্মান্তিক। এখানে সর্বস্ব ত্যাগ করে লড়াই করবার জন্য দলে দলে মহাপ্রাণ যুবকের দল রাজনীতিতে এসেছে কিন্তু তারা কয়েক বছর পর বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, নিজেদের কোন বিকাশ বা সার্থকতা দেখাতে পারে নি। যাঁরা শহীদ হয়ে গেছেন, তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু হাজার হাজার প্রাণ যে নষ্ট হয়েছে, কত চেষ্টা যে বিফল হয়েছে, একথা যারা হিসেব করতে চাইবেন, তারাই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করবেন এবং হতাশ না হয়ে পারবেন না। এতো ত্যাগ ও এতো ত্যাগের বাসনা থাকা সত্ত্বেও আজ বাংলার এই দুর্দশা কেন? আজ ভারতীয় রাজনীতির প্রথম সারিতে দাঁড়াতে পারেন এমন ক'টি বাঙালী আছেন? বাংলা আজ সবার পিছনে পিছনে চলছে কেন? বাংলার ছেলেমেয়েদের নৈরাশ্য ও বিফলতার অভাব নেই। বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত, বাংলার জনতার আজ বাংলাদেশেও ঠাঁই হয়না, বাংলা আজ সারা ভারতের কৃপার ও সাহায্যের পাত্র। এই শোচনীয় পরিণামের পিছনে বাংলার অতি

বামপন্থী মূলহীন, গণসংযোগবিহীন, গঠনকর্মহীন রাজনীতিই দায়ী। মেকী বিপ্লবীপনা কর্মীদের কর্ম দিতে পারে নি। খাদ্য ছাড়া যেমন জীবনধারণ সম্ভব নয়, জল ছাড়া যেমন মাছের জীবন সংশয় হয়, কর্ম ছাড়া তেমনি কর্মী তৈরী করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কর্ম মানে কেবল গরম গরম কথাই নয়, শুধু বুলি কপচানো নয় এবং কালেভদ্রে বিস্ফোরণ করবার চেষ্টাও নয়। কেন না এ কাজ বেশীক্ষণের কাজ নয়, একাজ সর্বদা জনতার সাথে সংযোগ করাতে সাহায্য করে না, একাজ জনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দেয় না, বরং জনতাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তারা জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জনতাকে বাদ দিয়েই বিপ্লব সাধনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আবার গঠনমূলক কর্মী মাত্রেই যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময়ে সার্থক যোদ্ধা হতে পারে এমন নিশ্চয়তা নেই। নেহাৎ সংস্কারমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে যাঁরা গঠনমূলক কাজ করেন তাঁরা সংকটকালে কাজে ইতঃস্তত করতে পারেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবে কারা কত সংগ্রাম করেছিল সে হিসেব নিতে গিয়ে গান্ধীজীর কাছে রিপোর্ট হয়েছিল যে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলে যারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অর্থাৎ সেই বিদ্রোহীদের তুলনায় অনেক গঠনমূলক কর্মে নিযুক্ত কর্মী সন্তোষজনক ব্যবহার করে নি। অথচ বামপন্থী, কংগ্রেসকর্মী ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা ও জনতা ঢের বেশী সাহসিকতা ও সংগ্রাম এবং ত্যাগ দেখিয়েছিল। প্যারেলালজী বলেছেন যে এই সংবাদে গান্ধীজী মর্মাহত ও চিন্তিত হয়েছিলেন এবং তার সংশোধনের উপায় কি তা ভেবেছিলেন। গঠনমূলক কাজ অনিবার্যরূপে সংগ্রামের পথে নিয়ে যায় না, সেটা নির্ভর করে কর্মীর মনোভাবের উপরে। নির্মলবাবু তাঁর 'গান্ধী চরিতের' ১৮৭ পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর একটি উক্তি উল্লেখ করেন: "আমার শরীরে দয়ামায়া নেই (ম্যায় নির্দয় হুঁ)। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লোকক্ষয়, আমি নীরবে সহ্য করবো। আর্তত্রাণের বুদ্ধিতে জনসেবা করলে চলবে না। যে সমস্যার মূলে রাজনীতি রয়েছে, তার আবরণ খুলে না ফেললে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না।"

গণসংগঠন করা, গণচেতনা আনা, জনতার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে সাহায্য করা, জনতার ভিতরকার অনৈক্য দূর করা, একতা সৃষ্টি করা, হিন্দু-মুসলমানের মিলন সৃষ্টি করা ইত্যাদি নানা কাজই কর্মীকে কর্ম দিতে পারে এবং তারই মধ্য দিয়ে কর্মীর যোগ্যতা, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, সংগঠন করার ক্ষমতা ও গণসংযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কর্মী ও নেতা এইভাবেই দিনের পর দিন নিজেদের যোগ্যতা ও জনসমর্থন অর্জন করতে পারেন। গঠনমূলক কাজ এইসব সুবিধা করে দেয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, সেসব কারণ আমরা পরে আলোচনা করবো, বাংলার যুবকেরা গান্ধীজীর এই প্রোগ্রামকে সংস্কারবাদের ফাঁদ মনে করলো এবং একটা অবিবেচক বিদ্বেষের বশে গান্ধী-বিরোধী হয়ে পড়লো। তার ফল যে কত বিষময় হয়েছে তা হয়তো আজ স্বীকার করা সম্ভব। অথচ এই বিরোধিতা করেছেন ও বিদ্বেষে ভুগেছেন বিজ্ঞান, প্রগতি ও বিপ্লবের নামে—এটাই ভাগ্যের চরম পরিহাস!

রাজনীতির আরো কতো বিকৃতি ঘটেছে ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ে। যেহেতু সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই শেষপর্যন্ত ক্ষমতার জন্য লড়াই, সেহেতু ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন জিনিস তাদের জীবনকে লড়াই দেয় না। জনতার শক্তি শেষপর্যন্ত জনতার নাম করে যে দলসমূহ গঠিত হয়েছে তা দল বিশেষের ক্ষমতাতে পর্যবসিত হয়েছে। ক্ষমতার প্রলোভন এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে অবশেষে সেই দলের ক্ষমতার কথাটাও কর্মী-বিশেষ বা নেতাবিশেষের ক্ষমতায়পর্যবসিত হতে চায়। ক্ষমতার এই লোভ সাংঘাতিক লোভ। ধনের লোভ, সম্পত্তির লোভ মানুষ পরিত্যাগ করতে পারে যদি তাকে এর বদলে ক্ষমতার প্রলোভন দেখানো যায়। এই দুর্নীতি কেবল নেতাদেরই পেয়ে বসে তা নয়; এ ব্যাধি সংক্রামক, সকলেরই এ রোগের প্রবণতা আছে। এ থেকে অভিমান, অহংকার, আভিজাত্য, ব্যুরোক্রেসী বা আমলাতন্ত্র ইত্যাদি নানা দুর্লক্ষণ দেখা দেয় এবং রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। বিশেষকরে যেখানে সম্মুখ সংগ্রাম নেই, যে রাজনীতিতে মৃত্যু অবধারিত জেনে অগ্রসর হতে হয় না, যেখানে রাজনীতিতে বিপ্লব নেই, সেখানে বিপ্লবীদলগুলিও প্রচলিত কূটনীতি ও দলাদলি এবং উপদলীয় সংগ্রাম থেকে, নেতৃত্বের লড়াই থেকে মুক্ত হয় না, একটা নোংরা গোলক-ধাঁধায় (ভিসিয়াস সারকেল) পড়ে যায়। প্রত্যেকটি ছোটখাট কর্মীর এই ক্ষমতার মোহ কম নয়। তার ক্ষুদ্র ক্ষমতার চৌহদ্দিটাকে কোনো নেতা বিশেষের অন্ধ অনু-গমনের দ্বারা রক্ষিত হয়। পিরামিডের গঠনের মতো নীচে থেকে মাথা অবধি এই ক্ষমতার সৌধটি সৃষ্ট। বিচিত্র এর প্রেরণা, অদ্ভুত এর খেলা এবং কদর্য অন্তর্নিহিত সংগ্রাম। এর সঙ্গে জনশক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

গান্ধীজী ক্ষমতার উদ্দেশ্য নিয়ে (পাওয়ার-মোটিভ) নয়, সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা তৈরী করতে চেষ্টা করে গেছেন। তিনি নিজের চলাফেরা ও জীবনাদর্শ দিয়ে, কেমন করে সেবার মধ্য দিয়ে জনশক্তি গঠন করতে হয়, তার বিরাট উদাহরণ দেখিয়ে গেছেন। কংগ্রেসের তিনি সভ্যও ছিলেন না শেষপর্যন্ত। অর কার্যকরী কমিটিরও তিনি কেউ ছিলেন না; কিন্তু তিনি ছিলেন কংগ্রেসের মহা-সভাপতি, মন্ত্রদাতা ও পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রভাব কংগ্রেসের উপর অপরিসীম। অথচ কোনো প্রকারের ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টা থেকে তাঁর এই ক্ষমতা আসেনি। তাঁর যে অধিকার ছিল কংগ্রেসের উপর. সেই অধিকার একমাত্র সেবা (সার্ভিস্) থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল। গান্ধীজীর যা করেই এই প্রভাব এসে থাকুক না কেন সেই প্রভাব বা সেই ক্ষমতা তিনি আগলে বসে থাকতেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে স্বাধীন-ভাবে চলবার ক্ষমতা তিনি অর্জন করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে চলুক, এই চাইতেন, এমন কি ১৯৪০ সালে তিনি অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমস্ত দায়িত্ব পরিত্যাগও করেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তা মেনেও নিয়েছিল। তিনি নিজে নেতৃত্ব নিয়ে মশগুল ছিলেন না। তিনি অনবরত কর্মী ও নেতা তৈরী করার দিকে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু তারা যাতে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ক্ষমতাবান হয়, ক্ষমতার মোহে নয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতেন। তাই বলে কংগ্রেস নেতারা ও কর্মীরা যে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন,

তা নয় ; এবং আজকে ক্ষমতা দখলের দলাদলি কংগ্রেসে যথেষ্টই আছে, ফলে কংগ্রেসকে খুব নীচে নামিয়ে আনছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ও দৃষ্টান্ত কংগ্রেস নেতাদের ও কর্মীদের আজো অনেকটা সংযত রেখেছে, অন্ততপক্ষে আজও ক্ষমতা দখলের জন্য হত্যা বা গুম করার ষড়যন্ত্রে বা জঘন্য সত্যাপলাপের চেষ্টায় নেমে আসেনি, যা অপরাপর দেশের রাজনীতিতে অহরহ দেখতে পাই। সে সব দেশের রাজনীতিতে একটা ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া লেগেই আছে, কিন্তু গান্ধীজীর কল্যাণে ভারতবর্ষে আজও তেমন ভয়ংকর রূপ ও বিষাক্ত রূপ দেখা দেয়নি, কি কংগ্রেস কি অন্যান্য দল, সবাই গান্ধীজীর এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। ফলে, অনেকটা সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিকতার আবহাওয়া এখনে এখনো কিছুটা আছে। এ দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা এখনো সম্ভব।

সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে রাজনীতি করলেই কর্মীদের বিনয়, যোগ্যতা, সংগঠনক্ষমতা ইত্যাদি গুণ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। যে পরিমাণে আজকাল দলীয় কর্মীরা অহংকারী, অল্পবিদ্যায় ভয়ংকরী ও কলহপ্রিয় হয় তা দেখে শংকিত না হয়ে উপায় নেই। দলে দলে তো ঝগড়া আছেই, তাছাড়া দলের মাতব্বরি নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরাম নেই, সেখানে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য না থাকলেও দলাদলির প্রয়োজনে পার্থক্য সৃষ্টি করতেই হয়। ঐক্যের উপর জোর না দিয়ে যেখানে মিলিত হবার মত ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে জোর না দিয়ে যেটুকুতে পার্থক্য আছে তার উপরে যত জোর, যার ফলে একদেশদর্শিতা আসতে বাধ্য। এই একদেশদর্শিতা ও দলের ভিতর উপদলের উপদ্রব বা খণ্ড খণ্ড দলের আবির্ভাব-এর পিছনে যে শক্তি নিত্য যোগান দিয়ে চলেছে তা সত্যিকার রাজনৈতিক বিজ্ঞানসম্মত জিজ্ঞাসার প্রেরণা থেকে নয়। সত্যিকারের ইন্ধন, এতো তিক্ততার ইন্ধন সত্যসন্ধিৎসা থেকে কখনোই আসতে পারে না, সত্যিকার ইন্ধন আসছে ক্ষমতার জন্য গুপ্ত লড়াই থেকে। অথচ একদেশদর্শিতার মূল কারণ মার্কসের মতে difference বা ব্যবধানের উপর জোর দেওয়া থেকে এবং ঐক্যের ক্ষেত্রটাকে অবজ্ঞা করা থেকে। যেখানে শতকরা নব্বুই ভাগের বেশী ঐক্যমত আছে সেটার উপর নজর না দেওয়া—অথচ শতকরা দশ ভাগে যেখানে অনৈক্য আছে তারই উপর জোর দেওয়াতে একদেশদর্শিতার জন্ম হয়। অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মগুলির নব্বুই ভাগ ঐক্যবস্তুকে নিয়ে তৈরী নয়, কাজেই জনগণের একতা আসবে কোথা থেকে? সঙ্ঘবদ্ধতার নামে অসঙ্ঘবদ্ধতা, ঐক্যের নামে অনৈক্য, সংহতির বদলে নিজেদের ভিতর ষড়যন্ত্র ইত্যাদির চেষ্টা চলেছে। বোটলের (Botle) নিকট লেখা চিঠিতে মার্কস্ লিখছেন, "The development of the system of socialist sects and that of real worker's movement always stand in inverse ratio to each other. So long as sects are (historically) justified, the working class is not yet ripe for an independent historic movement. As soon as it has attained this maturity, all sects are essentialy reactionary." (3.11.1871)

অর্থাৎ, "প্রকৃত গণশ্রমিক আন্দোলন যত বাড়বে সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলি ততই বিলীন হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়গুলির দরকার আছে, বুঝতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকেরা কোন স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলন করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। যখনই শ্রমিকশ্রেণীর এই যোগ্যতা হবে, তখন এই সকল সংকীর্ণতাবদ্ধ গোষ্ঠীগুলি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।" আমরা পূর্বেই বলেছি সংকীর্ণ সম্প্রদায়গুলির (সেক্ট) স্বরূপ কি ? একদেশদর্শিতা (সেক্টেরিয়া-নিজম্), কূপমণ্ডূকতাপূর্ণ, বিভেদ খুঁজে বেড়ায়, বড়কে বড় দেখতে পারে না, সমুদ্রকে কূপে পরিণত করতে চায়। এবং সত্যিকার গণআন্দোলনের সাথে এসব বা দলীয়তার বা সাম্প্রদায়িকতার (সেক্টের) কোন সম্পর্ক নেই। কোন একটা নতুন মতবাদ প্রথমটা হয়তো জনাকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তখন তার একটা গোষ্ঠী-গত সাম্প্রদায়িক রূপ পাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু যখনই সে মতবাদের বাল্যাবস্থা কেটে গিয়ে বয়োপ্রাপ্ত হয় তখনও যদি সে সাম্প্রদায়িক থেকে যায়, তবে বুঝতে হবে যে ঐতিহাসিক কোন গণআন্দোলনের তাৎপর্য তাতে নেই। এবং বুঝতে হবে দেশে তখনো গণআন্দোলন দেখা দেয়নি। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে গণশক্তি জার্গোন বা গণআন্দোলন হয়নি বা জনসাধারণের রাজনৈতিক মান বাড়েনি, একথা তো বলা যায় না ? তবে এখনো ভারতবর্ষে এতো এতো দলের প্রয়োজন কেন ? কেন এতো গণ্ডায় গণ্ডায় দল ও প্রত্যেকটায় ততোধিক উপদল ? এই উপদলগুলি কি তবে কোন নতুন মতবাদ সৃষ্টি করার কাজে ব্যস্ত ? এগুলি কি কোনো সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ? মোটেই নয়। প্রায় একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা, কখনো এটার উপর জোর দেওয়া, কখনো বা ওটার প্রতি জোর এবং পার্থক্য দেখিয়ে বেড়ানো, এই হলো এদের মতবাদ। তথাপি এই সম্প্রদায় বা দলগত ভাবটা মরছে না কেন ? সেই ক্ষমতার পিছনে ছোটার মোহ থেকে। ক্ষমতার লোভ এদের এমন মজিয়ে রেখেছে যে দল ও উপদলের প্রেরণা তাই থেকেই আসছে। ফলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এরা বাধ্য। তাই যদি আবার জনতার সাথে এসব দলগুলিকে সত্যিকারের সংযুক্ত করতে হয় তবে ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ের পরিবর্তে সেবামূলক মনোভাব দিয়ে দল গড়তে হবে। সেবামূলক কাজ করতে কোন সংঘর্ষ হয় না কিন্তু ক্ষমতা অধিকারের রাজনীতিতে পদে পদে সংঘর্ষ আসতে বাধ্য। সেবামূলক কাজ করবার প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হলে আমাদের স্বভাব ভদ্র, বিনয়ী ও সুন্দর হতে বাধ্য এবং অহংকার ও ডেপোমী দূর হতে বাধ্য।

কংগ্রেসের সমালোচনা করার সময় গান্ধীজী একসময় বলেছিলেন, "We had ambition and we had fought each other for positions of power and responsibility, and stayed away from ahimsa. Let us, therefore, forget politics until our service is needed and people can not represent the millions, until we have reduced ourselves to a cipher, effaced the self in us completely."

(Tendulkar's Mahatma—Vol, V, page 300)

অর্থাৎ, "আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তার জন্য আমরা ক্ষমতা ও দায়িত্বের লোভে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছি এবং অহিংসার পথ থেকে সরে গিয়েছি। অতএব রাজনীতি আমাদের ভুলতে হবে, যতক্ষণ না আমাদের সেবার দরকার হয় এবং জনসাধারণ আমাদের সেবা গ্রহণ না করে পারে না। লক্ষ-কোটি লোকেদের আমরা প্রতিনিধি হতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের অহং-শূন্য করতে পারবো। অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবো।"

সত্যাগ্রহী ও অহিংসকর্মীদের জনসেবার মধ্য দিয়ে মহান কর্মী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাদের বিনয়ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, Its grandeur lies in its majestic lowliness. But one hears of non-cooperationists being insolent and intolerable in their behaviour towards those who differ from them. I know they will lose their majesty and glory, if they betray any inflation ...Non-cooperation is not a movement of brass, bluster and bluff. It is a test of sincerity. It requires solid and silent self-sacrifice for national work. It is a movement that aims at translating ideas into action. And more we do the more we find that much more must be done than we had expected. And this thought of our imperfection must make us humble." (Young India 12.1.21,).

"মহিমান্বিত নম্রতাই এই দৃশ্যের কেন্দ্রীয় বস্তু। কিন্তু কোন কোন সত্যাগ্রহী নাকি অহমিকাগ্রস্ত ও যাঁরা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তাঁদের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত জানি, যদি তাঁরা এভাবে ফেঁপে উঠতে থাকেন তবে শীঘ্রই তাঁদের মহিমা ও গৌরব সবই নষ্ট হবে।...অসহযোগ তাদের জন্য নয়,যারা বাক্যবাগীশ, হামবড়া ও ধাপ্পাবাজ। এ আমাদের এক আন্তরিকতার পরীক্ষা। এ কাজে আমাদের খাঁটি ও নীরব আত্মত্যাগের প্রয়োজন হবে। এই সংগ্রামে আমাদের সততার অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে, আর পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের দেশের কাজ করার ক্ষমতার। মানুষের আদর্শকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আন্দোলন এইটি। এবং যতই আমরা তা করতে যাই, ততই দেখি আরো ঢের কিছু করার বাকি রয়ে গেছে এবং যা কিছু করেছি তা যথেষ্ট হয়নি। আমাদের এই অক্ষমতা ও অযোগ্যতার বোধ আমাদের সর্বদা বিনীত করতে বাধ্য।"

দুঃখ বরণের মানদণ্ড কি, তা বলতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, But it would be wrong to brood over the sufferings, exaggerate them or to be puffed up with pride. True suffering does not know itself and never calculates. It brings its own joy which surpases all joys." (Young India—19.3.31)

অর্থাৎ "কতটা দুঃখ বরণ করেছি বা দুঃখ ভোগ করেছি তাই নিয়ে বসে বসে ভাবা অথবা তার অতিরঞ্জন করা অথবা তা নিয়ে গর্ব বোধ করা অন্যায় কাজ হবে।

সত্যিকার দুঃখ বরণ যারা করতে পারে তাদের দুঃখের কথা মনেই থাকে না এবং তারা কখনো হিসেবনিকেশ করেনা। দুঃখবরণের মধ্যে এমন একটা আনন্দ আছে যা অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় না।" গান্ধী দুঃখবরণের এই মাপকাঠি রেখেছেন এবং আমরা জানি যাঁরাই অনুপ্রাণিত কর্মী ও উৎসর্গিত প্রাণ, তাঁরা দুঃখকে কখনো স্বীকার করেন না এবং তাঁরা মহা আনন্দের মধ্যেই থাকেন। জনসেবা করতে গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে কত যে অসীম কষ্ট দিনের পর দিন বহন করতে হয় দুঃখ সহন ও বহন করবার ক্ষমতা দীর্ঘকাল গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই যাচাই হতে পারে ও শক্ত হতে পারে। যাকে de-classed কর্মী বলে, অর্থাৎ নিজেদের শিক্ষা ও পদমর্যাদা বর্জন করে সত্যিকার জনজীবন গ্রহণ করে বলে এই দীর্ঘ জনসেবার কাজের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা জানি সাধারণত রাজনৈতিক কর্মীরা শিক্ষিত শ্রেণী থেকেই প্রথমে এসে থাকে কিন্তু তাদের শ্রেণীগত সংস্কার, অহমিকা, আলস্যপরায়ণতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার যে সব সামাজিক দুর্গুণ আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের হুঁসিয়ার থাকা উচিত। তারা যেমন সবার আগে এগিয়ে আসে, কিন্তু তারা অসুবিধা এবং বাধাও কম দেয় না। দলাদলি,উপদলীয়, চক্রান্ত এইসব লোকের মধ্যে সহজেই দেখা দেয়। তাই একস্থানে গান্ধীজী বলেছেন, "It is educated India which spilt up into parties I confess my incompetence to bring these parties together. Their method is not my method. I am trying to work from bottom upward. To an onlooker—it is cxasperately slow work, they are working from top downward—a process more difficult and complicated than the former. I he millions for whom the signatories have claimed to write are uninterested in party complications which are above their heads." (Young India, 9.9.26)

অর্থাৎ "শিক্ষিত শ্রেণীগুলি এতো দলে দলে বিভক্ত হতে চায়! এই সমস্ত দলগুলিকে একত্র করতে আমি পারছি না, তা আমি স্বীকার করি। তাদের কর্মপন্থা আমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি নীচে থেকে শুরু করে উপরের দিকে অগ্রসর হই। অনেকের কাছে তা অতি মন্থর গতি বলে মনে হয়। কিন্তু তারা কাজ করে উপর থেকে নীচের দিকে যা আমার মতে, অনেক বেশী শক্ত ও জটিল। যে লক্ষকোটি জনতার নাম করে তারা দাবি জানায়, সে জনতা এসব দলাদলি সম্বন্ধে মোটেই উৎসাহী নয়, এবং এসব কথা তাদের মাথার উপর দিয়ে ভেসে বায় অর্থাৎ মোটেই তাদের আকর্ষণ করে না।"

গঠনমূলক কাজ নীচে থেকে, জনতা থেকে রাজনীতি গড়ার কাজ, উপর থেকে হাওয়ায় ওড়ানো কথামালা তা নয়। গঠনমূলক কাজের শৃঙ্খলা, ধৈর্য, মেহনত, কষ্টসহিষ্ণুতা, বাস্তবজ্ঞান ও বুদ্ধি শিক্ষিত শ্রেণীর কর্মীর চারিত্রিক দুর্বলতা ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে নতুন মানুষ করে দিতে বাধ্য। এই পথেই জনতাকে সে চিনতে পারবে এবং জনতা তাকে আপন করে নেবে। গান্ধীজী প্রায়ই একটা উপমা দিতেন—

দুধের মধ্যে চিনি যেমন, জনতার মধ্যে কর্মী তেমনি মিশে যাবে এবং জনতার রূপ যাবে বদলে, অথচ কর্মীকে স্বতন্ত্র করে বুঝাবার দরকার হবে না। দুধের মধ্যে চিনির মতো সহজেই মিশে যাওয়া অথচ গুণগত রূপান্তর ঘটিয়ে দেওয়া, এই সম্পর্কটাই হলো কর্মী ও জনতার আসল সম্পর্ক। গান্ধীজী বলেছেন, Satyagrahis should not function as a party seperate from the masses, either in constructive work or in civil-disobedience. Their relation to the common people should be like that of sugar in milk which enriches its tastes but has no separate existence. The common man's belief in non-violence may not be intelligent ; but that of the satyagrahi should be of different kind. The latter should try to live up to all the implications of such belief intelligently." (Harijan 14. 5. 38) N. K. B—131

অর্থাৎ "কি গঠনমূলক কাজে, কি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সত্যাগ্রহীদের কোন অবস্থায়ই জনতার থেকে আলাদা হয়ে কাজ করা উচিত নয়। সর্বসাধারণের সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের সম্পর্ক হচ্ছে দুধের সঙ্গে চিনির মতো—যাতে দুধের মিষ্টত্ব বাড়ে অথচ চিনির কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। সাধারণ লোকের অহিংসা সম্পর্কে বিশ্বাস প্রায়ই বুদ্ধি ও বিচারসম্মত নয়। সত্যাগ্রহীর কাজ হবে সেই বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে সাধারণের শক্তিকে বলবান করা।"

এখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো যে কি কি কারণে গঠনমূলক কাজ সর্বভারতে রাজনৈতিক কর্মীদের তেমন উদ্বুদ্ধ বা আকর্ষিত করতে পারেনি। এবং কেন গান্ধীজীর এই দিকটা বা এই দানটা লোকে তেমন মূল্য দেয়নি। বলাবাহুল্য গান্ধীজীর অপরাপর কাজ ও মতবাদ সম্বন্ধে লোকে যতটা জানে, গঠনমূলক কর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর ধারণার শতাংশের একাংশও জানে না।

প্রথমে কথা হলো, এই গঠনমূলক কাজটা চমকপ্রদ কিছু নয় ও উত্তেজনার অবসরও তাতে সামান্য। দিনের পর দিন জনতার মধ্যে পড়ে থাকা, আর একঘেয়ে জীবনের মন্থর ও অচল গতির মধ্যে আটকে পড়া, এসব আজকালকার রুচির বাইরে। যাতে উত্তেজনা নেই, যাতে রোমান্স নেই, নেই লম্ফঝম্প, যে কাজ এতো ধীরপ্রসু, যে কাজে হিমালয়ের মতো ধৈর্য চাই, সে কাজ নবযুবকদের মন যোগায় না। তারা হুজুকের বলে দু-পাঁচদিন সেসব কাজ ধরলেও তাতে শেষপর্যন্ত টিকে থাকে না! ফলে গুটি কয়েক বৃদ্ধদের মধ্যেই গঠনমূলক কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ যদি জাতির যুবশক্তিকে দেশগঠনের কাজে মাতিয়ে তোলা না যায়—তবে একমাত্র জনকয়েক বিজ্ঞ ও বৃদ্ধদের চেষ্টায় কোন কাজ হতে পারে না। আর প্রাণহীন রুটিনের পর্যায়ে যদি গঠনমূলক কাজ নেমে আসে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। জনতাকে ও যুবশক্তিকে প্রাণভোলা উৎসাহে উৎসাহিত করতে পারা এবং সেই উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী করার উপর তার সার্থকতা নির্ভর করে। এক-আধটি লোক নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে উৎসাহের

সূচনা করতে পারেন কিন্তু সার্থকতা নির্ভর করছে জনসাধারণ সে উৎসাহ পেলো কিনা এবং উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী হলো কিনা, তার উপর।

জনসাধারণের ও যুবকদের রুচি জিনিষটাও এখানে বিচার্য। জীবন সম্বন্ধে ধারণা, কি করে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম ব্যবহার করা যায়, কীভাবে জীবনের সবচেয়ে বেশী সার্থকতা ও সুখ আসতে পারে এ সম্বন্ধে আজকের লোকের ধারণা অত্যন্ত গোলমেলে। গান্ধীজীর এ সম্পর্কে কী ধারণা ছিল তা আমরা পরে যখন আলোচনা করবো তখন জনসাধারণের ভালোমন্দ জ্ঞান সম্বন্ধেও আলোচনা করবো। এখানে শুধু এইটুকুই লক্ষ্য করতে হবে যে, যদি আমরা বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, একপেশে দৃষ্টিভ্রম থেকে মুক্ত না হই, যদি পাগলের মতো, অন্ধের মতো ব্যক্তি সর্বস্বতার আদর্শে বিভ্রান্ত থাকি, যদি উত্তেজনা খুঁজে বেড়ানোটাই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করি, যদি শহুরে জীবন সম্বন্ধে অন্ধভক্তি না ঘোচে, যদি সৌন্দর্য বোধের জ্ঞান সুস্থ না হয়, তবে গ্রামে গ্রামে পড়ে থেকে গঠনমূলক কাজ নিয়ে মেতে থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বসভ্যতার এই দ্রুত বিলীয়মান সময়ে (ট্রেনসিটারী পিরিয়ড) যারা পিছিয়ে পড়া পরাধীন সাম্রাজ্যবাদপিষ্ট দেশে জন্মেছে, তাদের জীবনাদর্শে নানা সংকট উপস্থিত হতে বাধ্য। তারা নবীনতার সঙ্গে নূতনত্বের পার্থক্য বুঝতে পারে না, তারা সংস্কৃতির সঙ্গে ফ্যাসনের তফাৎ বুঝতে অক্ষম, তারা শান্তির সঙ্গে প্রগতির সম্পর্ক বুঝতে পারে না, তারা প্রগতির সঙ্গে উত্তেজনার পার্থক্য বুঝে না, তারা গতিকে বুঝে, কিন্তু উন্নতি বুঝতে পারে না, তারা বিজ্ঞানভক্ত হয় অথচ স্বাধীন চিন্তায় আলস্যপরায়ণ হয়, তারা অনুকরণকেই সহজতম ও শ্রেষ্ঠতম পথ বলে মনে করে। এজাতীয় বিকৃতি, জীবনাদর্শেই বিকৃতি ঘটায়, ফলে তারা না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে পড়ে। শহরের একটা অতিনোংরা বস্তির চিরঅন্ধকার কুঠুরীও তাদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হয়। কিন্তু গ্রামের বিশাল প্রান্তর ভরা রৌদ্র হাওয়া ও জলের ছবিটাতে তার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। প্রভাতের সূর্য, উদার আকাশ ভরা সূর্য-চন্দ্র-তারা-পশু-পাখী-গাছ-পালা-এসব তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উধাও হয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়টা, আত্মীয়তাটাও তাদের ঘুচে গেছে। শহরে এতো মানুষের ভীড় অথচ মানুষে মানুষে আত্মীয়তা করার দায়িত্ব সেখানে নেই। সেখানে নির্লজ্জের মতো নিজের স্বার্থকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বেড়ানো যায়। কোন লজ্জা বা কৈফিয়তের দরকার হয় না। এতো লোকের ভীড়ের মধ্যে এতোটা অসামাজিকভাবে জীবনযাপন করার কৌশল বর্তমান ধনতন্ত্রচালিত শহরগুলি ছাড়া কোথাও সম্ভব নয়। মার্কসবাদীদের কাছে পাছে এই বর্ণনা বড্ড অপছন্দ হয়, এই জন্য আমরা এখানে স্বয়ং এঙ্গেলসের লণ্ডনের বর্ণনা সম্পর্কে কিছুটা তুলে দিচ্ছি: "It occurs to no man to honour another with so much as a glance. The brutal indifference, the unfeeling isolation of each in his private interest becomes more repellent and offensive, the more these individuals are crowded together, neither a limited space. And however much one may be aware that this isolation of the individual, this narrow

self-seeking is the fundamental principle of our society everywhere, it is nowhere shamelessly barefaced, so self-conscious as just here in the crowding of the great city. The dissolution of mankind into nomad, of which each one has a separate principle, the world of atoms, is here carried out to its utmost extreme." On London, 1884– Conditions of working class in England Page, 24.

কথাটা এই নয় যে গ্রামের মানুষেরা শহরের সৌন্দর্য দেখে বা প্রেমে পড়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে ভীড় করেছে। গ্রামে অর্থসংকট ও জীবন সংকট ও দারিদ্রের চাপেই নিঃসম্বল হয়ে শহরের দিকে ছুটছে, একথাটা ঠিক। কিন্তু এই গতিটাকে, এই গ্রাম থেকে পলায়নের ভীষণ ও নির্মম চিত্রটাকে সাম্রাজ্যবাদী দালাল কৃষ্টিবাহকেরা, দেশীয় ধনীবুর্জোয়া ও পাঁতি বুর্জোয়া কৃষ্টিবানেরা ও তথাকথিত প্রগতিবাদীরা একটা সাংস্কৃতিক রূপ দিয়েছেন। গ্রামকে ঘৃণা করতে, মানুষকে অবজ্ঞা করতে তারা একটা সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টির মদত দিয়েছিলেন এবং নবযুবকেরা এই অপপ্রচারে ও এইসব অর্ধ-সত্য মেকী বিজ্ঞানবাদের ভাঁওতায় বেশ মেতে উঠেছিল এবং নিজেদের অধঃপতনের একটা আত্মপ্রতারণাকারী সাহায্য পেয়েছিল এবং গ্রামকে ঘৃণা করতে একটা প্রগতির যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই এসে প্রচণ্ড এক আঘাত করলেন এই মূর্খতার, অজ্ঞতার গড্ডলিকাকে। তিনিই প্রথম দেখালেন নবীনের সঙ্গে নতুনের পার্থক্য কি। কুৎসিত বলড্যান্স থেকে তিনি দেশকে বাঁচালেন, সত্যিকারের গান, নাচ, কৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ কি, সুন্দর কাকে বলে, শিল্পবোধ কোথায় রয়েছে, প্রকৃতি থেকে আলাদা জীবনের বিড়ম্বনা কত, এসব কত জিনিষ তিনি ভারতকে দেখালেন এবং মোহ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি জানতেন গ্রামকেও গ্রাম্যতা দোষ থেকে মুক্ত করতে হবে। গ্রামে বিজ্ঞানের প্রবর্তন করতে হবে কিন্তু তিনি শহরের বিকৃত রুচিতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। শহর নিয়ে একটাও কবিতা রচনা করা তাঁর অসম্ভব মনে হতো, তাই তিনি শহর থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে গ্রামের মধ্যে, মাঠে-প্রান্তরে, আকাশের তলে তাঁর কর্মজীবন ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। রবীন্দ্রনাথ কিছু কম বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, এই তথাকথিত সংস্কৃতির ও বিজ্ঞানের বাঁদরগুলি (বাহকগুলি') থেকে। পরাধীন ভারতের বিকৃত রুচিকে তিনি অনেকটা শুদ্ধ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে চেষ্টাও এখনও সার্থক হয় নি। বরং রবীন্দ্রনাথের দানগুলিকেও আজ শহরের কুক্ষিতে ও কক্ষতে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখার অভিনব চেষ্টা শহরবাসী অভিজাতরা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান, কথা, সাহিত্য আজ ক-টা গ্রামে জীবন্ত আছে? শহরবাসীদের আড্ডায় রেস্টুরেন্টে ও ড্রয়িং রুমের হাল্কা গল্প ও চিত্তবিনোদনের কাজেই তা ব্যবহার হচ্ছে। তারই প্রভাবে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীরাও গ্রামকে ও গ্রামবাসীদের ভালোবাসতে পারছে না। তাদের রুচিবোধও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের গ্রামের কাজে নিমগ্ন থাকা সম্ভব হয় না। সামান্যতম বাধা পেলেই তারা পালিয়ে আসে এবং নিজেদের বিকৃতি ও অযোগ্যতাগুলিকে গ্রামের লোকেদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ঢেকে নেয়। অতএব সত্যিকার একটা বিপ্লব

দরকার জীবন দৃষ্টিভঙ্গীতেও। আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগার জ্ঞানটার যে বিকার ঘটেছে তাকে যদি শুদ্ধ না করা যায় তবে কোন শিক্ষিত কর্মীকে গ্রামে ধরে রাখাই সম্ভব হবে না। মানুষকে ও এই পৃথিবীকে ভালোবাসা ও তার সেবা করার মধ্য দিয়েই জীবনের চরম সার্থকতা রয়েছে, এই কথা গ্রহণ না-করা পর্যন্ত আমাদের দেশ সেবার কাজ উপর উপর বা উপর চালাকির স্তর থেকে গভীর হবে না। এবং কোন প্রকার দেশগঠন বা গঠন কর্মেই মনোনিবেশ করা সম্ভব হবে না। গান্ধীজী তাই এতো রবীন্দ্রভক্তও ছিলেন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজকে মহিমান্বিত সুর দিতে পারতেন মহাকবি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই দুই প্রতিভার অনেক পার্থক্য ছিল, কিন্তু রুচি জ্ঞান ও জীবন সৌন্দর্য সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী একজাতীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ ও পৃথিবীকে পেতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী কর্ম ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ ও পৃথিবীকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গান্ধীজী ছিলেন অনেক কঠোর, বাস্তবধর্মী ও কঠিন। কেন না তাঁর আদর্শ যাতে সৌখিনতায় উবে না যায়, তাঁর আদর্শ যাতে কর্মে ও সংগ্রামে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে ও দেশে জাগরণ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে তিনি শান্তিনিকেতনের হালকা গতিটার দিকে গুরুদেবের নজর আকৃষ্ট করতে ছাড়তেন না। তিনি অভিযোগও করেছেন, যেন বেশী গান হচ্ছে, অথচ কর্মে ও দেশগঠনের কাজে, রোগ-ব্যাধি-দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে. জীবনে প্রতিদিনকার সংগ্রামে গানেরই মতো আনন্দ ও উৎসাহ সৃষ্টি হচ্ছে কোথায়? এটা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা নয়—প্রয়োজন অনুযায়ী জোর কখন কোথায় দিতে হবে, তার প্রতি নজর করিয়ে দেওয়া মাত্র। আজ যে রবীন্দ্রনাথকে একটা ফ্যাশানের ও ড্রয়িং রুমের সামগ্রী করা সম্ভব হয়েছে তারও কারণ গান্ধীজীর হুঁসিয়ারিটাকে খেয়াল না করা থেকে। রবীন্দ্রনাথকে পলায়নী মনোবৃত্তির লোকেরা যতটা ব্যবহার করে নিয়েছে চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্তরা তাদের জীবন সংগ্রামকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করার কাজে ততটা লাগাতে পারে নি। সমাজের শোষক ও দুর্বৃত্ত পরস্বাপহরণকারীদের কৌশলশক্তি অতি অদ্ভুত। তারা শুধু সাধারণের শ্রমজাত জিনিষগুলি হাত করে নিজেদের ভোগে লাগাতে অভিজ্ঞ; শুধু তাইই নয়, তারা জনতার শিল্পসম্পদকেও জনতার কাছ থেকে বঞ্চিত করে বেমালুম ভোগ করতে পারে। তাই লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত আজ সাধারণ লোকেদের ভোগের বস্তু নয়, তাও দিল্লীর দরবারে ও বড় বড় শহরের প্রমোদালয়ের একচেটিয়া ভোগের জিনিস। রবীন্দ্রনাথকে তারাই একচেটিয়া করেছেন। গ্রামবাসী জনতা "ছোটলোকদের" হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করতে পেরেছেন বলে পরম তৃপ্তি তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা এমনকি এই সত্য ও কঠোরতার নেংটিপরা গান্ধী-মূর্তিটাকেও ড্রয়িংরুমের প্রতিমা বা রক্ষাকর্তা রূপে বা আত্মার শান্তির কাজে লাগাচ্ছেন। নিজেদের অলস, অসৎ ও কুৎসিত ভোগবিলাসের উপরে শুভ্র খদ্দরের আচ্ছাদন দিয়ে, যে খদ্দর তারা কাটতেও জানেন না, গান্ধীজীকে তারা এই ছোট-লোকদের হাত থেকে, অজ্ঞলোকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীকে

অত সহজে হজম ও আত্মসাৎ করা সম্ভব হয় নি, হবেও না কোনো কালে। কারণ গান্ধীজী গোড়ায় আঘাত করে গেছেন। অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে তিনি আঘাত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের মূলে আঘাত করে গেছেন, জনতার চৈতন্য এনে দিয়েছেন, সেই আঘাতের বেগ ও ধাক্কা ভারতকে বহুদূরে ঠেলে নিয়ে যেতে বাধ্য। পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীলশক্তির মহামোহনায় ভারতকে নিয়ে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু সংস্কৃতি দিয়ে বড় বড় শক্তির যোজনা করতে পারেন নি, কেউ তা কোন কালে পারে না। সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও রাজনৈতিক কাঠামোকে নাড়া দেওয়া চাই, শুধু সাংস্কৃতিক বিপ্লব বেশী দূরে অগ্রসর হয় না। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে অতি সহজেই ধনীরা তাদের কুক্ষিগত করতে অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন। এমন কি ইংরেজরাও হাত করবার তালে ছিল। যাক্‌ এসব তুলনামূলক কথা পরে বিশ্লেষণ করা যাবে। এখন কেবল এইটুকু স্মরণ রাখা দরকার শ্রমিকচাষী আন্দোলন, দেশের ভালো করার চেষ্টা ইত্যাদির পিছনে জীবন দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক কথাগুলি রয়েছে। সেগুলি পরিষ্কার না হলে গঠনমূলক অথবা যে কোন কঠিন কাজ দীর্ঘ দিন বসে করা বা তাতে জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব নয়।

সহিংস বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজেও বড় বেশী রোমাঞ্চ থাকে না। প্রস্তুতির কাজটা সব সময়ই প্রায় নিরস। যাঁরা বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত আছেন এবং যাঁরা দেশে বিদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ভিতরকার ইতিহাস জানেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে এ্যাডভেঞ্চার ও রোমান্সের মধ্য দিয়েই বিপ্লব তৈরী হয় না। সেখানেও অসীম ধৈর্য, কঠোর নিরস নিরলস পরিশ্রম, হাড়ভাঙা খাটুনি, ক্লান্তিহীন কর্ম রয়েছে। সংঘাতকালীন অবস্থায় যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে অবশ্য প্রচুর জনশক্তির উৎপাদন ঘটে, সে মুক্ত শক্তির সাহায্যে পর্বত প্রমাণ বাধাকেও অতিক্রম করা যায়। কিন্তু সেই বিপ্লবী জনশক্তি মুক্ত হলেও তার ধারাবাহিক ব্যবহার দীর্ঘায়িত করতেই হয় এবং সেখানে আবার ধৈর্য, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা কোন কিছুরই ঘাটতি থাকলে চলে না। বিপ্লব যখন আক্রমণের রূপ নেয়, তখন অবশ্য এই জনশক্তির উৎপাদন চারদিক থেকে ফেটে পড়তে থাকে এবং ছোট-বড় সামাজিক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জনতার সৃজনী শক্তি যেমন বেগবান, তেমনি ধৈর্যশীল রূপে দেখা দেয়। কিন্তু এটা একটা চিরন্তন নিয়ম নয় এবং সব দেশেই এমন ধরণের বিপ্লব ঘটে নি বা ঘটবে না। বরং আজকালকার ইতিহাসে যে ক'-রকমের বিপ্লবের নমুনা আমরা দেখেছি তাতে গোড়া থেকে আক্রমণকারী বিপ্লবের কোন ব্যাপার নেই। আজকাল বিপ্লববাদীরা আত্মরক্ষণাত্মক (defensive) লড়াইয়ের সাহায্যে বা রক্ষণাত্মক-আক্রমণাত্মক (defensive-offensive) রণনীতির সাহায্যে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে এবং দীর্ঘায়িত এইসব বিপ্লবের (প্রোট্রেকটেড রেভোলিউশন) প্রস্তুতির কাজটাই সংগ্রামের সবচেয়ে প্রধান কথা। এই প্রস্তুতি ব্যাপারটা হচ্ছে, সেখানে সংগ্রাম আরম্ভ করার পূর্বেকার কাজটা অবাধ নয়, দীর্ঘ সংগ্রাম চালু রাখার জন্য দীর্ঘকালের প্রস্তুতি। অর্থাৎ যদি বিশ বছরের গৃহযুদ্ধে নামতে হয় তবে বিশ বছরের প্রস্তুতিই থাকতে হবে,

লড়াইয়ের সাথে সাথে। সে কি ভীষণ ধৈর্য, কি ভীষণ কষ্টসহিষ্ণুতা, কি গভীর করে জনতার সঙ্গে মিশে একান্তভাবে দিনের পর দিন কাজ করে যাওয়া। তার মধ্যে তথাকথিত রোমাঞ্চ আছে কতটুকু? অবশ্য তাঁরা যে তখন তিক্ত বা বিরক্ত মনে কাজ করেন, তা নয়। তিক্ততা বা বিরক্তি বোধ করলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই কঠোর ও ধৈর্য সাপেক্ষ কাজগুলিকে তাঁরা এ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখেন। চটকদারী ও চমকপ্রদ কাজেই যে কেবল আনন্দ থাকে তা নয়, তাঁদের আদর্শবোধ এমনভাবে তাঁদের জীবনকে রাঙিয়ে ভরিয়ে তোলে যে কদর্যতম মেহনতটাও একটা পরম আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এইটাই হলো সত্যিকার বৈপ্লবিক চেতনা। কাজেই গান্ধীজীর পথে রোমাঞ্চ নেই বলে যাঁরা সেই পথে চলেন না, তাঁরা বিপ্লবীদের পথও মাড়ান না, কেন না সেখানেও ঐজাতীয় চটকদারী ব্যাপার নেই। ডিটেকটিভ উপন্যাসের থ্রিল বা শিহরণ কিংবা রোমাঞ্চ কোন প্রকার বিপ্লবেই নেই। বস্তুতঃ ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখকরা বিপ্লবের বিষয় নিয়ে তাঁদের উপন্যাস রচনা করার কখনও কোন উপাদান (খাদ্য) পেয়েছেন বলে শুনিনি। এগুলি নোংরা খুন-জখম-হত্যার পুলিশী কাহিনীর পরিবেশন মাত্র।

সেই সঙ্গে আবার কেবল অন্তরের গোঁয়ার্তুমি এবং আন্তরিকতার জোরেই গঠনকর্ম করা সম্ভব নয়। সেখানে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারবোধ থাকা চাই, একথা গান্ধীজী বার বার বলেছেন। যাঁরা গঠনকর্মকে কেবলমাত্র রুটিনকর্ম হিসেবে প্রাণহীন কর্ম করে ফেলেন, তাঁরা নিজেদের চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন এবং জনতার হৃদয়ে উৎসাহও জাগাতে পারেন না। সেই জ্ঞান বা বিজ্ঞান বুদ্ধি কী? এখানে নানা জটিল প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। সমাজবিজ্ঞান ও মানুষের মনোবিজ্ঞান, এই দুটি বিষয়ে জ্ঞান অন্ততঃ থাকা চাইই চাই। সমাজ ও দেশ কোন্ পথে চলেছে, কোন্ পথে মুক্তি, কোন্ পথে সংগ্রাম সম্ভব ইত্যাদি জ্ঞান যদি না থাকে তবে চলবে না। দেশ গঠন মানে দেশের ছেঁড়া কাঁথায় তালি দেওয়া নয়। পুরোনো কুটিরশিল্প ও হাতের কাজগুলিকে জিইয়ে তোলা মানে পিছনে ফিরে যাবার উদ্দেশ্য থেকে নয়—সেই শিল্পগুলিকে নতুন কায়দায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যবহার। নতুন দেশ তৈরী করতে হবে, তারই সূচনা করতে হবে জনতার নিজস্ব যা কিছু শক্তি, বুদ্ধি ও যোগ্যতা আজও আছে তা দিয়ে। যাঁরা নতুন দেশ তৈরী করতে চান তাঁরা যদি মনে করেন অতীতের সব কিছু ধুয়ে মুছে (ক্লিন শ্লেট) নতুন করে একমাত্র আমদানি করা বিদ্যা ও আমদানী করা যন্ত্রপাতির সাহায্যেই দেশগঠন শুরু করবেন, তাঁদের কখনো শুরু করাই হবে না। অতএব জনতার অর্থনৈতিক সংকটে তাকে যতটুকু পারা যায় সাহায্য করা যাক, শুধু এইটুকুতেই গঠনমূলক কর্মপন্থা সীমাবদ্ধ নয়। সেই সাহায্যগুলি এমনভাবে করতে হবে যাতে নতুন জীবনের অভিযানও শুরু হয়, শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজের গোড়াপত্তনের কাজের দিকে নজর রেখে অগ্রসর হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি না থাকে তবে গঠনমূলক কাজ কোনও গতিবেগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারবে না।

এতো গেলো শিল্পোদ্যমের দিক থেকে, তাছাড়া অন্যদিকে আছে হরিজন

উন্নয়ন, নারীজাতির সমান অধিকার, হিন্দু-মুসলমানের মিলন, গণশিক্ষা ইত্যাদি যে সব কাজ রয়েছে তার ভিতরেও দু-টি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য থাকা চাই। এক, রাজনৈতিক সংগ্রামে যে একতা দরকার ও জন জাগৃতি দরকার, সেই সংগ্রামিক প্রয়োজনের কথা। দ্বিতীয়ত, শ্রেণীহীন সমাজের জন্য যে সাম্য ও গণতন্ত্রের (equality ও democracy) প্রয়োজন বা সমান অধিকারের প্রয়োজনের কথা। এইসব ভবিষ্যতের পটভূমিকায় বর্তমান কাজগুলি করবার জন্য যদি শক্তি প্রয়োগ না করা হয়, তবে তা হবে অচল এবং সমাজের বর্তমান অচলায়তনকে তা ভাঙতে পারবে না। অবশ্য গান্ধীজীও এই বিপ্লবী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সব সময়ে পরিষ্কার করে বলতে পারেন নি, কিন্তু মাঝে মাঝে তার প্রকাশ রয়েছে। মনে রাখতে হবে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জ্ঞান সর্বদাই একটা ক্রমবিকাশমান পর্যায়ে ছিল। অবস্থার চাপে ও বিভিন্ন মতামত বা বাধার মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর ছোটবেলাকার ধারণার অনেক কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। সে কথা অন্যত্র আলোচনা করবো। কিন্তু এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে গান্ধীজী একজন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি কাজের সূচনা ও বিস্তারের দিকে গভীর নজর রাখতেন এবং গঠনমূলক কাজ যে রুটিন কাজের প্রাণহীনতায় ডুবে যেতে পারে তার দিকে খেয়াল রেখেছিলেন এবং এইজন্যই বলেছেন যে শুধুই আন্তরিকতা যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি বিবেচনা যদি সেই আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্ত না হয় তবে তাতে বদ্ধমূল ধারণা ও দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি কাজকে তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন দিয়ে যাচাই করতে হবে, সেই কাল ও সেই পরিস্থিতির মধ্যেই সেই পরিকল্পনার চরিতার্থতা ও বিচার চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দু-একটা কথা তোলা যাক্‌ঃ "In the past charka was not linked with the idea of freedom. Nor did it then symbolize the power of non-violenee. In the older days it symbolized our slavery." (Mahatma, Volume VII, page 39)

"অতীতে চরকা স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। অহিংসার শক্তি প্রকাশের উপায় হিসেবেও চরকা ব্যবহার হয়নি অতীতে। বরং অতীতে চরকা জনতার দাসত্বের প্রতীক ছিল।" অর্থাৎ চরকার-কালাতীত, স্থানাতীত কোন মূল্য নেই। কোন কালে, কোন উদ্দেশ্যে, কার হাতে তার ব্যবহার হচ্ছে, তাই দিয়ে চরকার মূল্যামূল্য নিরূপণ করা হবে। এরই ভিতরে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চমৎকার অভিজ্ঞান প্রকাশ পায়। তিনি আবার বলেছেন, "Soulless labour symbolizes serfdom. Labour illuminated with knowledge symbolizes will of freedom"

"প্রাণহীন শ্রম দাস-প্রথারই লক্ষণ। সচেতন ও সজ্ঞান শ্রম মুক্তিরই প্রেরণা।" সামন্ততন্ত্রেও শ্রম আছে, ধনতন্ত্রেও শ্রম আছে, আবার সমাজতন্ত্রেও শ্রম আছে। সামন্ততন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের শ্রম দাসত্বের নিগড়। সমাজতন্ত্র ও 'সর্বোদয়' সমাজের শ্রম মুক্তির আনন্দে ভরপুর। কাজে কাজেই চরকা দেখেই যাঁরা অতীতের ছবিতে চলে যান, গান্ধীজীকে তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, চরকা

মুক্তির হাতিয়ার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিল্পশক্তির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে জনতার জানা যা কিছু জ্ঞান আছে তাই দিয়ে কুটিরশিল্পকে দাঁড় করাক, তাতে যুদ্ধেরই একটা অবতারণা আছে, তাতে মুক্তির অভিযান সৃষ্ট হবে। আমরা যাই কেন না মনে করি সাম্রাজ্যবাদীরা এই কুটিরশিল্প ও চরকার অভিযানকে সেই চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখেছে এবং দেশের জনতা তাকে মুক্তি সংগ্রামের অভিযান হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। চরকা সংগ্রামেরই পতাকা বহন করে এসেছিল। যাঁরা এভাবে দেখতে পারেন নি, তাঁরা চরকার মধ্যে অতীতে ফিরে যাওয়াকে প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া অন্য কোন কিছু ধরতে পারেন্ নি। তিনি বলেছেন, "Even so the spinning wheel in itself has nothing which can teach Ahimsa or bring Swaraj. But you have to think in *with those attributes* and it is transformed."........এখানে 'with those attributes' বলতে স্থান কাল পাত্র ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বোঝায়। তিনি আবার বলেছেন, "Similarly the charka in the hands of a poor widow brlngs a paltry price to her. In the hands of Jawharlal it is an instrument of India's freedom. It is the office which gives the charka its dignity. It is the office assigned to the constructive programme which gives it an irresistible prestige and power." (Mahatma Vol. VI, page—40)

"একটা গ্রাম্য দরিদ্র বিধবার হাতে চরকা তার সামান্য ক-টি পয়সাই এনে দিতে পারে। কিন্তু জওহরলালের মতো লোকের হাতে চরকা ভারতের মুক্তির হাতিয়ার হয়ে গেলো। এইভাবে চরকাকে ব্যবহার করার জন্য চরকার ইজ্জত বেড়ে গেলো। গঠনমূলক কাজসমূহকে যদি সদুদ্দেশে ব্যবহার করা হয় তবে সেই উদ্দেশ্যের জোরেই তা অদমনীয় শক্তি ও সম্মান অর্জন করতে পারে।"

অতএব গঠনমূলক কাজগুলি কি উদ্দেশ্যে, কি সমাজ বিজ্ঞানের যুক্তি থেকে এবং কোন্ সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার দিকে খেয়াল থাকা চাই। সে জ্ঞান যদি থাকে তবে গঠনমূলক কাজে প্রাণ আসবে, সে সব উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে, লক্ষ্যহীন দিনযাপনের গ্লানি হবে না। যাঁরা গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারেন নি, তাঁরা এ-কাজগুলিকে একটা একঘেয়ে দিনাতিপাতের প্রোগ্রামে পরিণত করেছিলেন, ফলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কর্মীরা তার আকর্ষণ বুঝতে পারেন নি। এই গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি বাড়াবার কাজটায় অবহেলা করেছেন বলে যাঁরা বুদ্ধিমান কর্মী, তাঁদের মন তাতে ভরে নি। চতুর ও বুদ্ধিমান কর্মীদের যদি উপযুক্ত রাজনৈতিক খোরাক ও শিক্ষাদীক্ষা, বা আদর্শগত উন্নয়নের সুযোগ না থাকে, তবে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। গঠন-মূলক কাজ কেবল গায়েগতরে খাটা মাত্র, বুদ্ধি ও বিদ্যার স্থান সেখানে নেই—এমন ধরণের আবহাওয়া যদি তৈরী হয় তবে তা জাগ্রত যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী গোঁড়ারা বুদ্ধি বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি যে না করেছিলেন, তা নয়, ফলে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা গান্ধীবাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন

ঠাঁই বা সুযোগ নেই মনে করে গান্ধীজীর লেখা ও কাজ ভালো করে পড়বার ও বিচার করবার প্রয়োজন মনে করেন নি, এবং তাদের জ্ঞানের ক্ষুধা বিদেশের বই ও বিদেশের আন্দোলন দিয়েই চরিতার্থ করেছেন। গান্ধীজীর সহজ জীবন, সহজ কথার ভঙ্গী ও চাষাভুষাদের মধ্যে কাজ করবার জন্য জেদ ও তাঁর নিজের ব্যবহার অনেক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা করে দিয়েছিল যে বুঝি বা গান্ধীজী ভারতবাসীদের চাষাভুষোই বানিয়ে রাখতে চান এবং লেখাপড়া ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে গান্ধীজীর বোধ হয় বিরাগ আছে। এই ধারণা থেকে তাঁরা অনেকেই গান্ধীবাদ কি তা ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করেন নি। এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করার দায়িত্ব কতকটা গান্ধীবাদীদেরও আছে। তাছাড়া ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে স্কুলকলেজ বর্জননীতি অনেকটা এই জাতীয় প্রচারে সাহায্য করেছে যে সত্যি বুঝি বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের স্থান গান্ধী আন্দোলনে নেই, সবই বুঝি হৃদয়ের ভাবাবেগের ব্যাপার। অবশ্য যাঁরা ওয়াকিবহাল, যাঁরা গান্ধী-আন্দোলনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা এই জাতীয় ভ্রম করেন নি ; কিন্তু হুজুগ ও ফ্যাশানের ঝোঁক যাঁদের বেশী তাঁরা অত সব তলিয়ে দেখার কষ্ট স্বীকার করেন নি। এইরকম একটা ভ্রান্ত ধারণার জের টেনে অনেক বামপন্থী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্যটাও খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। এমন কি স্বাধীনতা আন্দোলন, যা গান্ধীজী চালাচ্ছিলেন, তা স্বাধীনতা আন্দোলনই নয়, এই জাতীয় বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার বশে গান্ধীজীর কথা তলিয়ে দেখবার কোনোপ্রকার প্রয়োজনই তাঁরা মনে করেন নি।

কিন্তু উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে যার ফলে গান্ধীজী শিক্ষিতমহল থেকে ও বিপ্লবীদের থেকে অনেকটা দূরে সরে গেলেন। কোন মতবাদই প্রথম থেকেই সর্বসাধারণের নিরপেক্ষ বিচার আশা করতে পারে না। জনপ্রিয়তা কেবলমাত্র যুক্তিযুক্ততার উপর নির্ভরশীল নয়। নানা প্রকারের জনপ্রিয় মনোবিজ্ঞান ও জনপ্রিয় সংস্কার সেই মতবাদের বিরুদ্ধে নানা বাধা ও সংকট ডেকে আনতে পারে। সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, শ্রেণীসংগ্রাম ও অন্যান্য অনেক প্রকারের স্বার্থ জাতির জীবনে এমন সব হল্লা, হুজুগ ও আতংক সৃষ্টি করতে পারে যাতে অনেক যুক্তিসঙ্গত কথাও লোকের কানে প্রবেশ করে না এবং তখন 'চিলে কান কেটে নিয়েছে' শুনে নিজের কানে হাত না দিয়েই চিলের পিছনে দৌড়াবার লোকের অভাব হয় না। সে অবস্থায় অনেক নেতার পতন ঘটাও সম্ভব হয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাজনদের পথেঘাটে লাঞ্ছিত হতেও দেখা যায়। এমন কি নানা ধরণের সংস্কার ও গুজব অনেক সময় বাস্তব সত্যকে চাপা দিতে সমর্থ হয়। শত্রুপক্ষ তার সুযোগ নেয় এবং সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে।

প্রথম যখন গান্ধীজী ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই সময়টায় গান্ধীজীর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও নাম অতি অদ্ভুত রকম ছিল। তখন মুসলমানেরাও গান্ধীজীর ভক্ত, খিলাফৎ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন গান্ধীজী। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই রবে ভারতের

আকাশবাতাস মুখরিত। বস্তুতঃ সাক্ষাৎ সংগ্রামের প্রোগ্রাম গান্ধীজী প্রথমে খিলাফৎ কমিটিতে আগে গ্রহণ করাতে (১৯২০) সমর্থ হয়েছিলেন, কংগ্রেসে পরে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম গান্ধীজীকে বিরাট খ্যাতি ও সমর্থন জুগিয়েছিল। চম্পারণের সত্যাগ্রহ ও তার সার্থকতা জনতার বুকে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর বাণী ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বহুকালের নির্যাতিত ভারত বহুদিনের অপমানিত লাঞ্ছিত জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মূর্ত প্রতীক হিসেবে গান্ধীজীকে পেয়ে উৎসাহে ও সাহসে অধীর হয়ে উঠলো। কুটিরশিল্পী ও সাধারণ শিল্পপতিরা স্বদেশীর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল। হরিজনেরাও মুক্তির ডাক শুনতে পেলো। মোটকথা সমগ্র ভারত তখন এক বাক্যে গান্ধীজীর পিছনে এসে দাঁড়ালো। তাছাড়া সর্বভারতীয় একচ্ছত্র নেতা হিসেবে তাঁর স্থানে তিনি একক হয়ে রইলেন, কারণ এর কিছুদিনের মধ্যেই তিলকেরও মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাক্ষাৎ দায়িত্ব গান্ধীজীর উপরই এসে পড়লো। গান্ধীজীর রাজনীতিতে ঢুকতে দ্বিধা থাকলেও অবস্থা ও জনতার আগ্রহের চাপে এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। সর্বভারত তাঁকে একবাক্যে মহাত্মা উপাধি দিল। তখন গান্ধীজীকে জনসাধারণ ভগবানেরই অবতার বলে ভাবতে লাগলো। এই সময়ে গান্ধীজীর বিশেষ কোন সমালোচকই ছিল না বলা যায়। অর্থাৎ তখন সকল শ্রেণীর, সকল জাতির, সকল স্বার্থের একটা অস্থায়ী সম্মিলন সৃষ্টি হয়েছিল গান্ধীজীকে ঘিরে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই জাতীয় একতা বেশীদিন রইল না। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরার ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতে একটা ধাক্কা এসে পড়লো। সেই আঘাতে এই একতা ভেঙে যেতে লাগলো এবং নানাদিক থেকে নানারকমের সমালোচনা গান্ধীজীর উপরে এসে পড়তে লাগলো। বিপ্লবীরা ও চরমপন্থীরা গান্ধীজীকে আঘাত করলো এই বলে যে গান্ধীজী গণবিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভয়ে পিছিয়ে গেলেন এবং সমস্ত আন্দোলন যখন বেপরোয়া ভাবে এগিয়ে চলেছিল, হঠাৎ সেই অগ্রগতির মুখে অহিংসার দোহাই তুলে তা বন্ধ করাতে দেশে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে জাতীয় ঐক্য ভেঙে পড়লো। প্রতিক্রিয়াশীলেরা মাথা তুলে দাঁড়ালো, তিনি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ইত্যাদি। যাঁরা চরমপন্থী নন অথচ গান্ধীজীর ভক্ত, তারাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, দেশবন্ধুর মতো লোকেরাও প্রশ্ন তুললেন যে সমগ্র ভারতের জনতা সর্ব অবস্থায়ই অহিংস থাকবে, এই যদি শর্ত হয় তবে ভারতে কখনোই অহিংস সংগ্রাম সম্ভব নয়, এই অদ্ভুত শর্ত কখনও মেনে নেওয়া চলে না। জওহরলাল প্রভৃতি নব যুবকেরাও হতাশ হলেন, যদি অহিংসার শর্ত এই ভাবে রক্ষা করতে হয় তবে তো কোন কালেই সংগ্রাম করা যাবে না। কারণ সমগ্র জনতার উপর সেই মতো কর্তৃত্ব স্থাপন করা ও রক্ষা করা সম্ভব নয়, শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এছাড়া শত্রুপক্ষের চরেরা মতলব করেও হিংসার ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে সমস্ত আন্দোলনকে বন্ধ করে দিতে পারে। এই যুক্তি গান্ধীজীকেও ভাবিয়ে তুলেছিল, কারণ পরবর্তীকালে

আবার যখন গণসংগ্রামের প্রয়োজন আসে, যেমন ১৯৩০ সালে, ১৯৩২ সালে, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে। তখন এবং বরাবরই এই প্রশ্ন গান্ধীজী, জওহরলাল, আজাদ, সুভাষচন্দ্র, বল্লভভাই প্রভৃতির মধ্যে গভীর বিতর্ক ও আলোচনার সৃষ্টি করে। কারণ আন্দোলন ঘোষণার পর যদি আবার কোথাও হিংসা ও চৌরিচৌরার মতো ঘটনা ঘটে তবে কি গান্ধীজী আবার সংগ্রাম বন্ধ করে দেবেন? গান্ধীজীর পক্ষে একথা স্বীকার করা আত্মহত্যারই সমান যে, সকল অবস্থায় অহিংসা কার্যকরী নয়। কেন না তিনি প্রমাণ করতে চান যে কোন অবস্থায়, যে কোন হিংসার মধ্যেও অহিংসার পথ ও অহিংস সংগ্রামের পথ থাকতে হবে, না হলে অহিংসা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, এই দাবি অচল হয়ে যায়। গান্ধীজীকে অনেকটা পিছিয়ে আসতে হলো এবং তিনি পরবর্তী যুগে এই ঘোষণা করলেন যে তিনি মোটামুটিভাবে দেশকে অহিংসার অনুকূলে এনে সংগ্রাম ঘোষণা করবেন এবং তারপরেও যদি হিংসা কোথাও দেখা দেয় তাহলে তিনি পিছু পা হবেন না। জওহরলালজী অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে এই দেখাতে চেয়েছেন যে গান্ধীজী কেবলমাত্র চৌরিচৌরার জন্যই আন্দোলন বন্ধ করেন নি, হিংসার বীভৎস রূপ বোম্বাইতেও তার পূর্বে ফেটে পড়েছিল, প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত পদার্পণ উপলক্ষে। তখন দেশে শৃঙ্খলাবোধ সামান্যই সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেসের শাসন (কনট্রোল) কেবল হিংসার উপরেই ছিল না, সংগঠনের কোন জোর তখন ছিল না। কোন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের উপযুক্ত অভিজ্ঞ শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্যাগ্রহীর দল সৃষ্ট হয় নি। তাছাড়া গান্ধীজী নিজেই বলেছেন জনতা হিংসার পথ নিয়েছিল বলে তিনি আন্দোলন বন্ধ করেন নি, কিন্তু কংগ্রেস ও খিলাফৎ-এর নেতা ও কর্মীরাও হিংসার সঙ্গে জড়িত দেখে তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দেন। দেশকে প্রস্তুত করতে হলে এক কঠোর গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে দেশের মধ্যে শক্তি তৈরী করতে হবে, যার উপর গান্ধীজীর বা নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তখন যদি আন্দোলন চালিয়ে যেতে হতো তবে অহিংসার কোন বালাই থাকতো না, বিশেষ বাণীর কোন মূল্যই থাকতো না, সরকারী প্রতিহিংসায় তা রক্তের বন্যায় নষ্ট হয়ে যেতো, সরকার অতি সহজেই সমগ্র জাতীয় আন্দোলন, গান্ধীজীর শক্তি সব নষ্ট করে দিতে পারতো। তখন আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে গান্ধীজীর নেতৃত্ব কায়েম থাকতো না। উচ্ছৃঙ্খল জনতাই গান্ধীজীকে পিছনে টেনে নিতো, কিন্তু গান্ধীজীর মতো শক্ত, একগুঁয়ে ও দৃঢ় লোককে তাঁর পথচ্যুত করা বা অন্যের হাতের পুতুল করা কখনোই সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ় হস্তে বলগা টেনে ধরলেন, তাতে যত প্রতিক্রিয়া, বিদ্রোহ বা আক্রমণই সহ্য করতে হোক। সেই দিনই ভারতকে তিনি হিংসার পথ থেকে হটিয়ে আনলেন বলা যায়। ভারতবর্ষ হিংসার পথে যাবে, না অন্য পথে যাবে এই বৃহত্তম সিদ্ধান্ত ১৯২২ সালেই হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে গান্ধীজীকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, তার জনপ্রিয়তার একচ্ছত্র সম্মান পথে ফেলে দিতে হয়েছে, অস্থায়ী ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যের মোহ ত্যাগ করতে হয়েছে, দক্ষিণ, বাম, বিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী সকল প্রকার দিক থেকে সমানে আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে, অবতারত্ব ঘোচাতে হয়েছে এবং তিনি আর দশজন নেতার মতোই জনমতের আদালতে বিচার প্রার্থী আসামীর

কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হন। তাছাড়া খিলাফৎ আন্দোলনের গতিবেগও তখন নষ্ট হতে শ্রুর হয়েছে। তুর্কীস্থানে কামাল পাশার উত্থান খিলাফৎ আন্দোলনের তাৎপর্য ও অর্থ দিল ম্ল্যহীন করে। ফলে ম্সলমানেরাও জাতীয় সংগ্রাম থেকে হঠে যেতে লাগলো। জাতীয়তাবাদী ম্সলমান, সরকার ঘেঁষা লীগপন্থী ম্সলমানদের মধ্যে প্যর্থক্য এসে যেতে লাগলো। স্যার সৈয়দ আহ্মেদের নীতি আবার ম্সলমানদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, অর্থাৎ হিন্দ্দের সাথে ভাগ্য না মিলিয়ে ইংরেজের সংগে সহযোগিতার নীতি উচ্চস্তরের ও শিক্ষিত ম্সলমানদের' টেনে নিতে লাগলো। ম্সলিম সাম্প্রদায়িক চিন্তা শেষপর্যন্ত দ্ই জাতিতত্ত্বে কিভাবে প্রকাশ পায় সে ইতিহাস সর্বজনবিদিত, অতএব আলোচনার দরকার হবে না। মোট কথা গান্ধীজীর প্রভাব ম্সলমান নেতাদের থেকে সরে যেতে থাকলো এবং ইংরেজরা তাতে উস্কানি দিতে লাগলো। সমগ্রভাবে ম্সলমানেরা আর কোন দিনই গান্ধীজীকে গ্রহণ করলো না। একমাত্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও বিদ্বেষই গান্ধীজীকে এবং গান্ধীবাদকে ঠেকিয়ে রাখলো ম্সলিম জগৎ থেকে। অথচ গান্ধীজী ম্সলমানদের জন্য কম করেন নি। শেষ পর্যন্ত ম্সলমানদের স্বার্থ ও জীবন রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে হয়। এমন কি আজ যে পাকিস্তান স্বাধীন, তাও ম্সলমানদের ত্যাগ ও সংগ্রামের ফল 'নয়, গান্ধী আন্দোলনেরই একটা পরোক্ষ ফল, একথা এখন স্বীকার না করলেও, কালে একদিন স্বীকার করতেই হবে। সমগ্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে আজ উভয়েই স্বাধীন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলেই ভারত ও পাকিস্তান আজ উভয়েই স্বাধীন। কিন্তু সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ম্সলীম লীগের দান কি? ম্সলমান জনতা, শ্রমিক ও চাষীরা অবশ্য নানা সংগ্রামে অনেক সময় অংশ নিয়েছে কিন্তু ম্সলমানদের জাতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যে বিরোধ তারই সুবিধাটুকু বসে বসে উপভোগ করেছে মাত্র, এবং পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পাকিস্তান কায়েম করে নিয়েছে। অবশ্য পাকিস্তান কায়েম হবার সময় যেসব রক্তারক্তি ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তাতে সাধারণ ম্সলমানদের কত ক্ষতিই না হয়েছে এবং তাকে যদি পাকিস্তান করার ও স্বাধীন ম্সলমান রাষ্ট্র তৈরী করার ম্ল্য বলে ধরে নেওয়া হয় তবে ইতিহাস হাসবে ; এবং এই ম্ল্য দিতে ম্সলীম লীগও প্রস্তুত ছিল না বা এই ম্ল্য দেবার জন্য ম্সলমান জনতার কাছে আগে থেকে দাবিও তাঁরা করতে পারতেন না। এই সুবিধাবাদী নেতৃত্ব দিয়েই ম্সলীম লীগ তৈরী হয়েছিল বলেই আজ এরই মধ্যে পাকিস্তানে ম্সলীম লীগের এমন শোচনীয় পতন ঘটলো। লীগের নেতৃত্বের ফাঁকা কথা জনতার সাম্প্রদায়িক মোহ ভাঙার সাথে সাথে ম্সলমান জনতার কাছে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ততই অতীতে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তানী ম্সলমানদের শ্রদ্ধাও ফিরে আসবে এবং তাঁদের জন্য গান্ধীজী কি করেছিলেন সে কথার সত্যিকার স্মরণ সেদিন হবে এবং তাঁরাও হয়তো গান্ধীজীকে তাঁদের জাতির, পিতা না হোক, পিতৃস্থানীয় কেউ বলে স্বীকার করবেন।

দেশবিভাগ ও পাকিস্তান স্ষ্টির বির্দ্ধে গান্ধীজী প্রায় শেষপর্যন্ত লড়াই করে

গেছেন একথা সর্বজনবিদিত। তবুও যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও অন্যান্য দল মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব মেনে নিল, তখন গান্ধীজীর কোনো আপত্তি টিকলো না। তখন গান্ধীজী আর বিরোধিতা করলেন না। কারণ তাঁর মতে তখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, গোটা ব্যাপারটাই খুব দেরী হয়ে গেছে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করার। ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে তিনি সেদিন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা বা সংগ্রাম করলে নেতাদের কারো সমর্থন তো পেতেনই না, জনগণের সমর্থনও কতটা পেতেন, তা বলা যায় না, কেন না জনতার মনও তখন বিষিয়ে গেছে। ভারত ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিণতিকে ঠেকাতে হলে তার বহু পূর্ব থেকেই ভারতের রাজনীতি অন্য পথে চালনা করার দরকার ছিল, যে পথে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে সাহস না পেতো। যাই হোক এই বাদানুবাদ ঐতিহাসিক এবং প্যারেলালজীর 'লাষ্ট ফেজ' এবং মৌলানা আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম্'-এ এবিষয়ে অনেক আলোকপাত করে ; কিন্তু তাই বলে তাঁদের বিচার ও মতামত অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

যখন বললাম যে পাকিস্তানের জনগণও একদিন স্বীকার করবেন যে মহাত্মা গান্ধী তাঁদেরও অতি আপনজন ছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে গান্ধীজী পাকিস্তান সৃষ্টি করতে অথবা পাকিস্তান আদায় করতে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। তার অর্থ এই যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা, প্রগতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা যখনই ভাববেন তখন গান্ধীজীকে অস্বীকার করতে পারবেন না। গান্ধীজী আবার একদিন ভারত ও পাকিস্তান স্বেচ্ছায় একত্র হবে এমন আশা পোষণ করতেন। তাছাড়া যদি দেশ খণ্ডিত হলো হিন্দু ও মুসলমানের ঝগড়া মেটাবার জন্য, তবে দেশ ভাগ হলো বলে দুই দেশে শত্রুতা তো থাকা উচিত নয়। যদি ঝগড়া বন্ধ না হয়, যদি তা বেড়ে যেতেই থাকে, যদি শান্তি না হয় তবে বুঝতে হবে আলাদা হয়েও সমস্যার সমাধান হলো না। হয়তো শান্ত মনে বিচারের ফলে এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যের বিনিময়ের ফলে ও শান্তি রক্ষার ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে যে দুই দেশের জনগণ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকবে এবং স্বেচ্ছায় পুনর্মিলিত হবে। এক দেশ অপর দেশকে যুদ্ধে অথবা অন্য উপায়ে বাধ্য করে নয়, কিন্তু পরস্পরের সম্মতি নিয়ে আবার তারা এক হতে পারে। দুই দেশের মধ্যে তাই সৌহার্দ্য স্থাপনের কথা বলে গেছেন এবং দেশ আবার এক হতে পারে এমন উক্তি তার মৃত্যুর কিছুদিন আগেও করেছেন।

যাক্ আলোচনার মুখে আমরা প্রসঙ্গ থেকে একটু বাইরে সরে এসেছিলাম। মোট কথা গান্ধীজীর সম্মানের স্বর্ণযুগ তখন ভেঙে গেল। নানা দিক থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগলো। গান্ধীজী সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েই চুপ করে রইলেন না। তখন তিনি পনেরো দফা গঠনমূলক কাজের বিখ্যাত প্রোগ্রাম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে পাশ করালেন এবং সমগ্রদেশকে এই গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত হতে নির্দেশ দিলেন। এই প্রতিক্রিয়ার যুগে গঠনমূলক কাজ উপযুক্ত সাড়া পেলো না, বরং জাতীয় প্রোগ্রামের প্রতি একটা অনীহাই সৃষ্টি হলো। যদি জয়ের মুখে, গান্ধীজীর সম্মান যখন শিখরে রয়েছে, তখন যদি এ প্রোগ্রাম চালু করার চেষ্টা

করতেন তাতে যত সহজে সবাইকে রাজি করাতে পারতেন; পরাজয়, নৈরাশ্য, ও প্রতিক্রিয়ার মুখে এই নিরস দীর্ঘকালীন প্রোগ্রাম চালু করা তত সহজ নয়। তাছাড়া তখন কংগ্রেস ও গান্ধীজী আইন পরিষদ বয়কট নীতি চালু রেখেছেন। কাজেই সাক্ষাৎ সংগ্রামও নিষেধ, আবার কৌন্সিল প্রবেশও নিষেধ, এমন ধরণের পরিস্থিতিতে রাজনীতি করাটাই যেন নিষেধ, এমনি অবস্থার সৃষ্টি হলো। কেবলমাত্র অরাজনৈতিক গঠনমূলক কাজটাই রইল, এই অবস্থায় গান্ধীজীকে অরাজনৈতিক ও অবৈপ্লবিক লোক বলে তখনকার দিনে ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। ঠিক এই সময় বুঝে সরকারও কোন কোপ দিতে কসুর করলো না। সরকার প্রতিআক্রমণ চালিয়ে দিলো, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলো এবং বিচার করে দীর্ঘ ছয় বছরের কারাদণ্ড দিয়ে দিল। তখন নেতাহীন কংগ্রেস কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লো। চারদিক থেকে ভাঙনের সুর মাথা চাড়া দিল। গান্ধীজী বাইরে থাকলে সে প্রতিক্রিয়া হয়তো সামলানো যেতো, গান্ধীজী হয়তো সর্বভারতেই গঠনমূলক কাজ গ্রহণ করাতে পারতেন এবং তার তাৎপর্য বুঝাতে পারতেন। কিন্তু সে সুযোগ সরকার কেন গান্ধীজী ও দেশকে দেবে? তারা তো মূর্খ নয়? যাক্ গান্ধীজী অনেকদিনের জন্য ভিতরে ঢুকে গেলেন, জনতা বিভ্রান্ত ও হতাশ হলো, গান্ধীবাদী ও গান্ধীবিরোধীদের মধ্যে নানা ভাগাভাগি, দলাদলি হতে লাগলো। গান্ধীজীর অবর্তমানে গান্ধীবাদ ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করার ভার অনেক যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিরা গ্রহণ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে বিবাদ দেখা দিল, বিভিন্ন মতবাদের লড়াই দেখা দিল।

কাণ্ডারীহীন কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুটি দল বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এক দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কৌন্সিল-প্রবেশকামীদের দল বা pro-changer, আর রাজা গোপালাচারী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে কৌন্সিল-বর্জন বা No-changer দল। বলা বাহুল্য আইনসভা বর্জন ও বয়কট নীতির, সমগ্র আন্দোলন বন্ধ করার জন্য, কোন পরিবর্তন গান্ধীজী করে যাননি। কাজে কাজেই কৌন্সিল-প্রবেশ নতুন করে কংগ্রেসের অনুমতি না পেলে করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর সম্বন্ধে সমস্ত ভারতে নানা প্রশ্ন উঠলেও এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে গান্ধীজীর প্রভাব দূর হয়ে গেল। বিশেষকরে জনতার মধ্যে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা তখনো বিরাট। শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই তাঁর প্রভাব সবচেয়ে আহত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কংগ্রেসে দেশবন্ধু ও মতিলাল তাই তাঁদের প্রস্তাব পাশ করাতে পারলেন না। রাজা গোপালাচারীর প্রস্তাব পাশ হলো, অর্থাৎ গঠনমূলক কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজে অগ্রসর হতে কংগ্রেস রাজি হলো না। অর্থাৎ গান্ধীজী যে প্রোগ্রাম রেখে গেছেন তার এক চুল এদিক-ওদিক করতে রাজা-গোপালাচারীর দল রাজি হলেন না। এই থেকে ওঁদের নাম হলো গোঁড়া গান্ধী-পন্থী। এদিকে দেশবন্ধু ও মতিলালের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি তৈরী হলো। কংগ্রেসের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা কলহ দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো। স্বরাজ্য পার্টি নির্বাচনে যোগ দিল, খুব চমকপ্রদভাবে জয়লাভ করলো এবং কৌন্সিল ও বিধানসভার ভিতর থেকে সরকারকে প্রতি পদে পদে বাধা দিতে লাগলো এবং স্বরাজ্য পার্টির কার্য-

কলাপে দেশে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াটা অনেকটা প্রতিহত হলো। নো-চেঞ্জারদল অর্থাৎ মূল কংগ্রেস বা গান্ধীবাদীরা গঠনমূলক কাজ নিয়েই পড়ে রইলেন। তাঁরা রাজনৈতিক কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করেই দিলেন, একমাত্র স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে তর্কাতর্কি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া। স্বরাজ্য পার্টি যতই সার্থক হতে লাগলো, গান্ধীবাদীদের গোঁড়ামী তত বেড়ে যেতে লাগলো। পরস্পর তর্কাতর্কির মধ্যে দু-পক্ষই অর্ধ সত্য নিয়ে লাফালাফি করতে লাগলো। কেন না তখনকার ভারতীয় পরিস্থিতি কৌন্সিল-প্রবেশ নীতি ও parliamentary use of struggle খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ, একথা গান্ধীজী ও গান্ধীবাদীরা পরে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কেবল পার্লামেণ্টারী কাজেই যদি নিমগ্ন থাকা যায়, গণসংযোগ ও গঠনমূলক কাজ যদি না করা হয় তবে পার্লামেণ্টারী নীতিও অচিরে অন্ধগলিতে বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। Parliamentary ও extra-Parliamentary কাজ একই সঙ্গে, একই দলের নেতৃত্বে হওয়া উচিত ছিল, যেমন লেনিনের নেতৃত্বে প্রাক্-বিপ্লবী রাশিয়ার ডুমাতে প্রবেশ ও তৎসঙ্গে গণআন্দোলন একই সঙ্গে হয়েছিল। রাশিয়ায় এক সময় 'ডুমাতে' প্রবেশ করা উচিত কি অনুচিত, কখন উচিত এবং কখন উচিত নয়, এসব তর্ক খুব হয়েছিল। এজাতীয় বিতর্ক প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জারদের মধ্যেও হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ার লেনিনের মত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নেতৃত্ব ছিল বলে সে বিতর্ক থেকে অনেক সুবিধা ও জ্ঞান তাঁরা লাভ করেছিলেন। আমাদের দেশে রাজনীতি কোন কালেই অতটা উচ্চ পর্যায়ে বা theoretical level-এ উঠতো না। অনেক সময় ভাবাবেগে ও নানারকম সংস্কার ও আবেগ দিয়েই চলা হতো। যাই হোক, বিতর্কের সময় শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী ভারত একযোগে গান্ধীবাদীদের ও গান্ধীজীকে আক্রমণ করেছে এবং গান্ধীজীর সত্যিকার চিন্তাধারাকে নিরপেক্ষ বিচার করেনি। তারই ফলে বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেখানে চিত্তরঞ্জনের মতো লোকপ্রিয় নেতা ছিলেন ও বিপ্লবীদলেরও অভাব ছিল না, সেখানে গান্ধীজীর কর্মপন্থা মোটেই ব্যাপক হতে পারলো না, বরং গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে একটা সংস্কারের সৃষ্টি হলো। অপরদিকে যাঁরা গোঁড়া গান্ধীবাদী তাঁদের গোঁড়ামী গেলো বেড়ে, আত্মরক্ষার খাতিরে। তাঁরা ক্রমশঃ প্রগতি বিরোধী কথাবার্তাও চালাতে লাগলেন এবং একটা revivalist tendency-ও সৃষ্টি করলেন। আর বিহার প্রভৃতি স্থানে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতা গঠনমূলক কাজ নিয়ে একেবারে ব্যস্ত থাকাতে বাংলা ও বিহারের মধ্যে একটা দূরত্ব ও রেষারেষির সুর প্রকাশ পেলো। প্রাদেশিকতাও প্রকাশ পেতে লাগলো। মুসলমানেরা তো আগে থেকেই হটে যাচ্ছে। দেশবন্ধু মুসলমানদের হাত করার জন্য অনেক প্রকার সুবিধা দিতে লাগলেন। আসাম ও উড়িষ্যা বাংলার প্রভাব থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। বিহার, ওড়িষ্যা ও আসামের সাথে বাংলার রেষারেষির ক্ষেত্র অনেকটা চাকরী-বাকরীর সুবিধা সংক্রান্ত দায়-দাবি নিয়ে পূর্ব থেকেই রচিত হয়েছিল, রাজনীতির মধ্য দিয়ে তার একটা পরোক্ষ প্রকাশের সুযোগ মিললো।

যাই হোক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে জিনিষটা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলো, তা হলো গান্ধীজী সম্পর্কেও অসত্য ধারণার সৃষ্টি, দেশবন্ধু সম্বন্ধেও তাই। এই

যুগেই গান্ধীজী শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে পড়ে গিয়েছিলেন। বছর দুই জেল খাটার পর গান্ধীজীর এপেণ্ডিসাইটিস্ অস্ত্রোপচারের জন্য সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। নিজের শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনে ভারতের রাজনীতি থেকে তিনি একটু আলগা হয়ে বোম্বাইতে জুহু নামক অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। মতিলাল প্রভৃতি নেতারা ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনি একটা চুক্তি করিয়ে দিলেন যে, স্বরাজ্য পার্টি যা করছে করুক, আর কংগ্রেস গঠনমূলক কাজ নিয়েই থাকুক, পরস্পরের মধ্যে কোন ঝগড়া ও কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি যেন না করা হয়। কিন্তু তিনি নিজে তখনো গঠনমূলক কাজের উপর জোর দিতেই বেশী পক্ষপাতি। তার এক বছরের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। গান্ধীজী তখন বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর গভীর রাজনৈতিক আস্থা প্রকাশ করার জন্য ও দেশের সেই পরিস্থিতিতে স্বরাজ্য পার্টির দান ও সার্থকতা স্বীকার করে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সমগ্র কংগ্রেসকেই স্বরাজ্য পার্টির কাজে সাহায্য করতে আদেশ করলেন। সেই থেকে স্বরাজ্য পার্টি ও কংগ্রেসে আবার মিল হয়ে গেলো, কংগ্রেস শক্তিশালী হলো। কংগ্রেস যে একটি সুতো-কাটা সংগঠনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তা থেকে গান্ধীজী তাকে উদ্ধার করলেন এবং রাজনীতির ও সংগঠনের যাবতীয় কাজে অগ্রসর হয়ে এলেন। গান্ধীজী অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষিত ভারত তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাই তিনি সেই সময়ে যেন একটু অভিমানের সুরে বলেছিলেন, "I must no longer stand in the way of the congress being developed and guided by educated Indians rather than one like myself who has thrown in his lot entirely with the masses, and who has fundamental differences with the mind of the educated India as a body. I shall want to act upon them but not by leading the congress. The best way in which I can help that activity is by removing myself out of the way, and by concentrating myself solely upon constructive work with the help of the congress and in its name, and that too, only so far as educated India will permit me to do so." (History of the National Congress or, Sitaramaya Vol, I—1,285. August 1925. N. K. B page 240)

"শিক্ষিত ভারতীয়দের নেতৃত্বে কংগ্রেসের পরিচালনায় আমি আর কোন অন্তরায় হতে চাই না, আমার মতো লোক যে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণীর ভারতীয়দের পার্থক্য মৌলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের উপরে নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করবো, কিন্তু তা কংগ্রেসের নেতা হয়ে নয়, পরিচালক হয়ে নয়। তা আমি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারি যদি আমি তাদের পথের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়াই এবং আমি সম্পূর্ণরূপে গঠনমূলক কাজ নিয়েই নিযুক্ত থাকি। গঠনমূলক কাজ আমি কংগ্রেসের নামেই করতে চাই এবং শিক্ষিত ভারত আমাকে যতটুকু অনুমতি দেবে ততটুকুই আমি করবো।"

এদিকে শিক্ষিত ভারতের শিক্ষিত রাজনীতিও যে খুব এগোতে পারছিল, গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে, তা নয়। স্বরাজ্য পার্টির কাজ ক্রমশঃ নতুনত্ব ও চমক হারিয়ে ফেলতে লাগলো। কংগ্রেসে ও স্বরাজ্য পার্টি মিশে গিয়ে কৌন্সিল এসেম্বলীতে ঢুকে যা কিছু হল্লা ও বাধা দিক, সে সবের একটা সীমা আছে। ক্রমশঃ সেই সীমায় পেঁছে গেলো। তারপর? ক্রমশঃ পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে যেমন ভাঁটা পড়তে লাগলো তেমনি দুর্নীতি ও লোভের আস্কারাও বেড়ে যেতে লাগলো। সরকার কিছু কিছু কংগ্রেসী সভ্যদের বা স্বরাজ্য পার্টির লোকদের চাকুরী, পদ ও মন্ত্রীত্বের লোভে লুব্ধ করতে লাগলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন। বুঝলেন দেশকে হয় আবার সম্মুখ সংগ্রামে নামতে হবে, নয়তো মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পথেও নেমে যেতে হবে। সেই সংকটময় সময়ে তিনি মারা যান। মতিলাল সর্বভারতের ব্যাপারেও অচিরে এই একই ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা পেতে লাগলেন। তখন আবার গান্ধীজীর কথাই সকলের মনে পড়তে লাগলো, কেন না এই লোকটি ছাড়া গণআন্দোলন করবে কে? শিক্ষিতশ্রেণীর দৌড় এ্যাসেম্বলী, কৌন্সিল পর্যন্ত, কিন্তু তারপর? এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনতা ছাড়া কে লড়তে পারে? এবং সেই শক্তি গান্ধীজী ছাড়া আর কারো নেই। এবং গান্ধীজী গঠনমূলক কাজের মারফৎ সেই শক্তির সাধনা চরম প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায়ও করে চলেছেন।

১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের এই নিয়ে কম তর্কবিতর্ক হয়নি। আদর্শগত এই তর্ক। এই বিতর্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি গান্ধীবাদের কোন কোন বিষয়ে যে প্রতিবাদ করেছিলেন, তার জের টেনে নিয়ে শিক্ষিত ভারত গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কম লড়াই করেনি। মোটকথা গান্ধীজীকে বহু মতবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছে, অবস্থার চাপে ও মতবাদের প্রভাবে গান্ধীজীরও ক্রমশঃ পরিবর্তন অনেক হয়েছে। সে লড়াইতে তিনি কোন কোন দিক থেকে হেরেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জিতেছেনও। সে এক বিচিত্র মহান কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শেষকালে যাদের সঙ্গে তাঁর কঠিন মোকাবিলা করতে হয়েছে তা হলো কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর প্রিয় শিষ্য, অথচ এই প্রিয় শিষ্যের সঙ্গেও তাঁর কম মতপার্থক্যের মোকাবিলা করতে হয়নি। সেসব কথায় আমরা পরে আসছি। কেবল এইটুকুই মনে রাখতে হবে গান্ধীজীকে কেবল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই লড়তে হয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী মতবাদের রণক্ষেত্রের মাঝখানে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর মতবাদের দুর্বলতা সবসময়েই একটিমাত্র শেষ অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ণ করে নিতেন এবং সবাইকে হারিয়ে দিতেন, সে হলো তাঁর গণঅস্ত্র বা গণসংগ্রামটি দিয়ে। শিক্ষিত ভারত ও পৃথিবী তাঁকে যতখানি আক্রমণ করেছে তত তিনি জনতার গভীরে আশ্রয় নিয়েছেন এবং গঠনমূলক কাজই সেখানে তাঁর প্রধান হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল প্রভৃতি শক্তির সাথে তাঁর সংঘাত ও সংযোগ হবার ফলে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা কতদূরে ও কীভাবে এগিয়েছিল সেকথা আমরা

যথাস্থানে আলোচনা করবো, আপাততঃ গঠনমূলক কাজের সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো।

এখন আমরা গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মতালিকার একটা একটা করে, তাদের রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে, কিছু কিছু আলোচনা করতে চাই। সেগুলো বিচার করার সময় তিনটি জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। এক, সেগুলির তৎকালীন রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা কি ছিল. অর্থাৎ তার সাময়িক মূল্য বিচার। দুই, সেগুলির সংগ্রামিক মূল্য বা বরাবরকার মূল্য কি ছিল। তিন, সেগুলির মধ্য দিয়ে দেশগঠনের যে চেষ্টা ছিল তাতে গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ স্বাধীন দেশের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণার যে আভাস রয়েছে তার বিশ্লেষণ। অর্থাৎ কতক আছে ঠিক সেদিনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে, কতকগুলির দীর্ঘকালীন মূল্য বা ভবিষ্যতের মূল্যও আছে। আমরা যদি গান্ধীজীর প্রতিটি কাজকে তাঁর চিরকালের ব্যবস্থা বলে বা গতি বলে ধরে নিই, তবে গান্ধীজীর প্রতি অবিচার করা হবে। কেননা, যদিও গান্ধীজীর মধ্যে একটা প্রাচীনপন্থী ভাব ছিল, তথাপি আমরা দেখেছি তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে পারতেন এবং অনেকক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবীদের চেয়ে ঢের বেশী বিপ্লবী হতে পারতেন এবং প্রত্যেকটি কাজকে ঐতিহাসিক মূল্য দিয়ে বিচার করা, গ্রহণ করা ও বর্জন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এখন আমরা এক একটা করে প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকে যাবো।

চরকা, কুটিরশিল্প, স্বদেশী ইত্যাদি

প্রথমতঃ আমরা এদের সাংগ্রামিক মূল্য বিচার করবো। একথা খেয়াল রাখতে হবে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল আমাদের দেশের আত্মশক্তি ও শিল্পশক্তিকে চূর্ণ করে তাদের শিল্পবাণিজ্যের উপর আমাদের একান্ত নির্ভরশীল করে রাখা। এদেশের যাবতীয় কুটিরশিল্প ও হাতের কাজের শক্তিকে জব্দ করতে পেরেছিল বলেই ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম এমন নির্জীব, প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। বৃত্তি হারিয়ে সব লোক যখন চাষের উপর নির্ভরশীল হতে লাগলো তখন চাষ গেলো ধ্বংসের পথে, গৃহপালিত পশু অর্থাৎ গরু-বাছুরের দুর্দশাও চরমে উঠলো। ইংরেজের পূর্বে ভারত বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, শাসিত হয়েছে, কিন্তু এমন করে তার সমাজ-জীবনে সর্বনাশ ঘটেনি। কেননা রাজা যেই থাকুক, গ্রামগুলি মোটামুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল বলে, অর্থাৎ চাষের সঙ্গে শিল্প বা কুটিরশিল্প একান্তভাবে নির্ভরশীল ও পরস্পর সহযোগী ছিল বলে, ভারতের সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি, যার জোরে এতকাল ধরে সমাজ টিকে ছিল। বহুসভ্যতা বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সত্বেও ভারত কেমন করে এতো দুর্যোগের মধ্যেও টিকে ছিল; তারও কারণ এই যে চাষ ও কুটিরশিল্পে গ্রামগুলি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাবলম্বী এক অর্থনীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। একথা কার্ল মার্কস্ 'ক্যাপিটেল' গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে লিখে গেছেন: "Owing to the peculiar form of rent in kind, by which it is bound to a definite kind of product and production, owing further more to the indispensable combination of agriculture and domestic industry

attached to it, also to the almost complete self-sufficiency in which the peasant family supports itself and to its independence from markets and from movements of introduction and history in the social sphere outside of it in short, owing to character of natural economy in general, this form is quite suitable for becoming the basis of stationary conditions of society, such as we see in Asia."

(Capital, Vol. III)

এই স্থাবর (stationary) অবস্থা সমাজ জীবনে সংরক্ষণশীলতা এনে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতের লোক কেন দীর্ঘ হাজার হাজার বছর ধরে এই অচলায়তন সমাজকেই রক্ষা করে চলেছিল? কেন তারা দ্রুত এগিয়ে যাবার প্রেরণাকে উৎসাহ দেয়নি? আজ আমরা দেখি সারা পৃথিবীতেই মানুষ কত গতিশীল হয়েছে, তাদের ভাগ্য নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট নয়. মানুষের এই স্বভাব ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে কোথায় লুকিয়ে ছিল? কুটিরশিল্প ও চাষের শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে যে জাতিভেদের নিগড় সৃষ্টি হলো তাও ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম মেনে চললো। কিন্তু কেন? তার কারণ হলো তার ভিতর দিয়ে তাদের একটা লাভও হলো, সে হলো আত্মরক্ষার লাভ। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদির অনিশ্চয়তার মধ্যেও যদি গ্রাম্যব্যবস্থাগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ থাকে, তবে তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে তারা যে কোন দুর্যোগেও টিকে থাকতে পারবে। খাওয়া-পরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই সংগ্রহ করা ও সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তাদের প্রতি পদে পদে রাজা ও শহরের বা বাণিজ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল হতে হতো না, আজ যেমনটি হয়েছে। তখনকার দিনে দেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যত বেড়েছে গ্রামগুলি তত বেশী আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য হয়েছে। বিদেশকে, দূরকে এমন কি পরবর্তী অঞ্চলকেও ভয়ের চোখে দেখেছে। দেখেছে, এইজন্য নয় যে তারা স্বভাবতই কূপমণ্ডূক ছিল, দেখেছে এইজন্য যে আত্মরক্ষা ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এই ছিল নিরাপদ পথ। রাজনৈতিক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অর্থনৈতিক এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত এই শক্তি গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন।

এখানে একটা কথা যেন মনে থাকে যে ভারতের প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম বাংলাদেশেই—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য থেকেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু করে, স্বদেশী প্রচার, বিদেশী দ্রব্যের বয়কট ও স্বদেশী শিক্ষার ব্যাপারে যে বিরাট আন্দোলন সেদিন বাংলায় শুরু হয়েছিল, তার স্পন্দন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা সেই আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি বা বাড়িয়ে নিতে পারেনি। গান্ধীজী বাংলার এই কাজের সহায়তা পেয়েছিলেন, সেই আন্দোলনের সর্বভারতীয় রূপ দিতে পেরেছিলেন এবং বৃহত্তম সংগ্রাম রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলা এ বিষয়ে পুরোগামী হয়েও কেন শেষপর্যন্ত এমন পিছিয়ে পড়লো সেই আলোচনা লেখক এই বইতে না করতে পেরে দুঃখিত, কারণ এরজন্য প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র লেখকের হাতে নেই।

আবার আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। গান্ধীজীও মনে করলেন, আবার যদি গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, আবার যদি মানুষেরা তাদের সাধারণ প্রয়োজনগুলি তাদের অতি নিকট প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে পারে, তবে বিদেশীর অর্থনৈতিক উপদ্রব ও লুণ্ঠনের ক্ষমতা জব্দ হবে। অর্থাৎ যেখান থেকে ভারত পরাধীন হয়েছে সেখান থেকেই, অর্থাৎ সেই গ্রামশিল্পের ভিত থেকেই গান্ধীজী স্বাধীনতার ভিত তৈরী করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু এখানে একটা ভুলও (fallacy) এসে যেতে লাগলো। তাহলো এই, যদি গ্রামশিল্পগুলি বিদেশী ও দেশীয় যন্ত্রচালিত দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পারবেই, তবে কুটিরশিল্পগুলি পরাজিত হলো কেন? তারা তো সহজে এই পরাজয় মেনে নেয়নি? অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কুটিরশিল্প হেরে গিয়েছিল। কাজেই জোর করে আবার এই কুটিরশিল্পকে দাঁড় করাতে চাইলেই বর্তমান জগতে এই শিল্পদানবের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া শিল্পদানব আজ এখন এতো শক্তিশালী যা প্রথমটায় ছিল না। প্রথমে বিদেশী শিল্পপতিরা রাষ্ট্রের সাহায্যে অসাধু চাপ ও অত্যাচার করে এবং লুণ্ঠন করে ভারতের কুটিরশিল্পকে পরাজিত করেছিল, কেবলমাত্র বাজারের প্রতিযোগিতায় নয়, তারা রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার করে দেশের শিল্পকে নষ্ট ও ধ্বংস করেছিল। কিন্তু আজ শিল্পশক্তি এতো বহুল উৎপাদনশীল ক্ষমতা অর্জন করেছে যে, রাষ্ট্রের জুলুম ব্যতিরেকেও কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অনায়াসে মুছে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে এখন এতকাল পরে আবার কি কুটিরশিল্পকে কোন প্রকারেই দাঁড় করানো যায়? কিন্তু গান্ধীজী জিনিষটাকে accademic বা general proposition-এর বিচার করেননি। তিনি প্রথমতঃ সংগ্রামের প্রয়োজনের দিক থেকেই স্বদেশী ও তাতে কুটিরশিল্পের স্থান ও কর্তব্য বিচার করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে এ লাভালাভের কথা নয়, লাভ কিংবা ঘাটতির ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে স্বাধীনতার যুদ্ধ। যুদ্ধ যেমন লাভক্ষতির হিসেব করে কেউ করে না, যুদ্ধের ফলে শেষপর্যন্ত লাভ কি হবে, তা অবশ্য বিচার্য, কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধের সময় লোকসান হয়, ধ্বংস হয়, বহুলোক প্রাণ হারায়, সেখানে সেই মূল্য দিতে কেউ পয়সার হিসেব করে না; তেমনি ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পয়সার হিসেব করলে তো চলবে না, দেখতে হবে যে কোনু মূল্য দিয়ে আমাদের স্বাধীন হতে হবে। যদি তাতে শৌখীন জীবন ও শৌখীন কাপড় আমরা পরতে না-ও পাই, যদি আমাদের আধুনিকতার নানা সুবিধা ত্যাগও করতে হয়, তথাপি পিছপা হলে চলবে না। যদি আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাহায্যেই কুটিরশিল্প ছাড়া অন্য কোন বিদেশী বা যন্ত্রচালিত শিল্পের জিনিষ ব্যবহার না করি, তবে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ টলটলায়মান হতে বাধ্য। কেউ কেউ, বিশেষতঃ দেশীয় ধনীরা যুক্তি দিয়েছে যে, দেশে বিদেশীদের বদলে যন্ত্রচালিতশিল্প শিল্পপতিরা গড়ে তুলুক। আমরা বরং সেই ধনতান্ত্রিক শিল্পপতিদের উৎসাহ দিতে পারি, কিন্তু কুটিরশিল্প, যা হবার নয়, যা শেষপর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, তাকে জাগাবার চেষ্টা করবো কেন? কিন্তু গান্ধীজী এই যুক্তিতে উৎসাহী নন। তিনি মনে করেন,

ভারতের প্রয়োজন ভারতের ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদীরা (ক্যাপিটেলিস্ট) মেটাতে পারবে না। তাছাড়া তাদের হাতেই যদি ভারতের শিল্পকে ছেড়ে দিতে হয়, তবে জনতার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। ধনতান্ত্রিক নির্যাতন বা শোষণ ও অন্যান্য দুর্নীতিকে গান্ধীজী কোন কালেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে পারেননি, এবং ভারতে অগণিত কোটি কোটি লোকের অন্নের সংস্থান ও বৃত্তি ধনতন্ত্রবাদীরা কখনোই দিতে পারবে না, এবং ভারতীয় পুঁজিবাদীদের দ্রুত বিস্তারশীল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। এবং ভারতীয় জনতাকে দেশীয় পুঁজিপতিদের পেট মোটা করবার জন্য বিদেশীদের সঙ্গে লড়তে অথবা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে তিনি উপদেশ দিতে রাজি নন। তবে ভারতীয় শিল্পপতিরা যতটা পারে করুক, এবং যেখানে জনতার স্বার্থে ও বৃত্তিতে তারা আঘাত করবে না, সেখানে তারা বাড়ুক এবং দেশীয় জনতার সমর্থন পাক, তাতে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল না। ভারতীয়দের জীবনে দেশীয় পুঁজিপতিদের অধিকার বাড়িয়ে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তবে তাদের সীমার মধ্যে চলবার ও আত্মরক্ষা করতে পারার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যত ভারতে পুঁজিপতিদের ঠাঁই কি কি হবে সে সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল। অর্থাৎ ধনতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে হবে এধারণাও তাঁর দিনকে দিন প্রখর হতে লাগলো। আমরা পরে তার বিশদ বিচার করছি।

এখানে সংগ্রামের বা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনের কথাটাই আসল কথা। সংগ্রামের প্রয়োজনে আমরা এক-পা পিছিয়ে যেতে পারি কিনা, অর্থনীতির দিক থেকে, এমন প্রশ্নও কেউ কেউ করতে পারেন। তারা হয়তো বলবেন যে জনতা যদি তার সংগ্রামের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে এক পা পিছিয়ে যান, তবে রাজনৈতিক দিক থেকে, সংগ্রামের দিক থেকেও তারা পিছিয়ে যাবে এবং তারা দুর্বল হয়ে যাবে। রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক শক্তির একটা সমান্তরাল বন্ধন আছে। কিন্তু এমন ধরণের কথা সর্বক্ষেত্রেই সত্য নয়। ঐতিহাসিক একটা দীর্ঘ সময়ের দিক থেকে একথা সত্য। কিন্তু একটা বিশেষ নির্দিষ্ট সময়সীমায় একথা সত্য এবং প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। বিশেষ করে যুদ্ধকালীন অবস্থায়। কতগুলি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক। যেমন, আজ মালয়ে কমিউনিস্টরা জংগলে গিয়ে তাদের সংগ্রামকে রক্ষা করে চলেছে, কত বছর ধরে। যেমন চীনদেশে মাও-সে-তুঙ শহর থেকে দূরে জংগলে, পর্বতে রেলপথবিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে সংগ্রাম করে চলেছিলেন। সাংহাই, নানকিং, ক্যান্টন ইত্যাদির শিল্পসম্পদ তাদের লড়াইকে সাহায্য করতে পারি নি, এবং এই সহায়তার ভরসায় তাঁরা শহরে বসে থাকতেও চান নি। লড়াইয়ের প্রয়োজনে মানুষ যদি সভ্যতা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে গেরিলা পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়, তবে কি তারা বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন? তাতে কি প্রগতি বিরোধী হয়ে গেলেন তাঁরা? তাতে কি তাঁরা কমিউনিজম্ ও শিল্পশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন? মোটেই তা নয়। এটা একটা সামরিক প্রয়োজন, এক পা পিছিয়ে গিয়ে পরে একদিন আবার তারা লাফিয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। যখন তারা সভ্যতা থেকে পালিয়ে গেলেন, তখন এই বলেই গেলেন যে সভ্যতার যাবতীয়

যন্ত্রশক্তি, বিজ্ঞান ও প্রগতি আজ একমাত্র শত্রুই ব্যবহার করতে পারে, এই শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ লড়াইয়ের নামে, অথবা তথাকথিত প্রগতির ও বিজ্ঞানের নামে যদি তারা শত্রুর সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রগতির প্রতিযোগিতা করতে যেতো, যদি শত্রুকে শত্রুর হাতিয়ার ও শত্রুর নিয়ম, কায়দা ও জীবনপদ্ধতি দিয়েই জব্দ করতে যেতো তবে তারা কবেই মুছে যেতো। যেখানে ট্যাঙ্ক যায় না, যেখানে আধুনিক যানবাহন অগ্রসর হতে পারে না, যেখানে দূরবীন কোন কাজেই সাহায্য করতে পারে না, যেখানে দূর পাল্লার কামান ও বোমারু বিমান লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পায় না, যেখানে টেলিগ্রাফ অচল, যেখানে সমস্ত বন্যপ্রকৃতি তার আদিম বিরুদ্ধতা দিয়ে সভ্যতার অসভ্য অগ্রগতিকে ব্যাঘাত হানতে পারে, সেই জঙ্গলে জংলী জীবন বেছে নিয়ে দীর্ঘকালীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে, বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে নেমে গিয়ে শেষপর্যন্ত তারা শত্রুকে পরাস্ত করলেন। এ ধরণের ইতিহাস সব দেশেই পাওয়া যায়। সব যুদ্ধেই কিছু না কিছু এই ধরণের ঘটনা পাওয়া যাবে। আফ্রিকায় মাও মাও-রা এই পদ্ধতি দিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছে, আলজিরিয়ায় স্বাধীনতাকামীরা তাই দিয়ে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে রুখে ছিল। অতএব একটা ধরাবাধা কথা দিয়ে সভ্যতা, অর্থনীতি. রাজনীতি ও সংগ্রামের নিয়ম বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। বিপ্লব ও যুদ্ধের নানা রকম কৌশলই আমরা পৃথিবীতে দেখি। রুশ বিপ্লবে অবশ্য বিপ্লবীদের পিছু হটতে হয় নি, শিল্প সমন্বিত সভ্য দেশ ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে তাদের ঘুরতে হয় নি। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও তাঁরা নিজেদের শিল্পসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অনেক সৌখিনতা ও সুখ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মোটা ভাত খেয়ে ও মোটা কাপড় পরেই অনেক কাল কাটাতে হয়েছে, তাই বলে সুখসুবিধার নামে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের লোভনীয় কোনও ফাঁদে পা বাড়ায় নি। আজও যদি কেউ আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের পথে সশস্ত্র সংগ্রামেও যায়, তবে তাকেও দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ প্রত্যন্ত দেশেই তার ঘাঁটি করতে হবে এবং সেখানে মান্ধাতা আমলের শিল্প ও কৃষি দিয়েই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, নিজের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পিছিয়ে পড়া মানদণ্ড নিয়েই থাকতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাহলে তাকে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে হলো।

গান্ধীজীর অবশ্য এই পিছিয়ে যাওয়া নীতিটা, সাময়িক নীতি হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে তাঁর সামাজিক আদর্শের কথাও আছে। সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ বক্তব্যটা একটু পরেই আলোচনা করবো। কিন্তু এখানে সংগ্রামের প্রয়োজনে যে আত্মসংকোচন ও আত্মনির্ভরতার কথা, সেটা বিবেচ্য। লড়াইয়ের প্রয়োজনে মোটা ভাত, মোটা কাপড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, শত্রুপক্ষকে অসহযোগিতা করতে গিয়ে যেন আমরা দুর্বল হয়ে না পড়ি, যাতে অসহযোগ করলে খেয়ে-পরে থাকতে পারি তা দেখতে হবে। না হলে অসহযোগ হবে না। সংগ্রামের প্রয়োজনে আমাদের জীবন সহজ সরল করতে হবে, জীবন ব্যয়বাহুল্য বিলাসী হলে চলবে না, তাতে লড়াই করা সম্ভব নয়, এবং তাছাড়া ভারতীয় দরিদ্র জনসাধারণের সাথে ঐক্য বা সমতা অনুভব করা সম্ভব নয়। ঐক্য ও সাম্যের আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতে হলে কেউ

নেংটি পরে লড়াইতে আসবে, আবার কেউ গলায় টাই চড়িয়ে বক্তৃতা করবে—এটা অনাচার। দরিদ্র ধনী সবাইকে খদ্দর পরে, হাতে কাটা সুতোর কাপড় পরে সংগ্রাম ক্ষেত্রে মিলিত হতে হবে, সেটাই স্বাধীনতা সৈনিকের পোষাক ও নতুন জীবনের প্রতীক, নতুবা একতার ও সমতার বাণীবাহক জাতীয় জীবনে এই সরলতা আমাদের অসভ্য করে নি, সত্যিকার সভ্য করেছে। আমাদের জীবনকে দরিদ্র করে নি, আমাদের জীবনকে আত্মসম্মানে ভূষিত করেছে। এই নয়া আত্মসম্মান বোধ, এই আত্মগৌরব, এই নিজেদের শ্রমজীবী চাষী, মজুর ভাইদের সাথে এক হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ ভারতকে একটা বিরাট রাজনৈতিক মর্যাদা, শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছে। এই থেকেই এসেছে জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক নীতিবোধ। এই রাজনৈতিক শক্তির সাহায্যেই, এই রাজনৈতিক দৃঢ়সংকল্প অথবা ইচ্ছাশক্তির জোরেই আমরা কুটিরশিল্পকে সাহায্য করবো। তাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেনিয়া হিসেব অনুযায়ী ক'পয়সা লোকসান হলো, অতো চুলচেরা হিসেব দেখালে চলবে না, আমরা পয়সার হিসেবে দেশ গড়বো না। তার হিসেব অন্যরকম—এই কথা গান্ধীজী বললেন। যদি হাতে তৈরী জুতোটা শক্ত ও অসুন্দরও হয় এবং পয়সা বেশী খরচ হয় তৈরী করতে, তথাপি আমরা সস্তায় সুন্দর বিলিতী জুতো কিনবো না। এই পয়সার লোকসানটা আপাতঃ দৃষ্টিতে খুব বড় মনে হলেও ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য, স্বাধীনতার জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়টা লোকসান নয়। এই খরচ আমাদের অনেক দিক থেকে শতগুণ হয়ে উঠে আসবে। তাছাড়া এ শুধু আত্মশক্তির জাগরণই নয়, শুধু নিজের পায়েই দাঁড়ানো নয়, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের হাঁটু ভেঙে দেবে। সাম্রাজ্যবাদের লালসা ও শোষণ আহত হবে, ভারতবর্ষে তাদের থাকা, একটা পরিপূর্ণ ক্ষতি ছাড়া লাভের ব্যাপার হবে না। যে পথে ইংরেজ এসেছে, তা হচ্ছে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথ, সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে হবে। দুদিকে ধার এই অস্ত্রের। এক স্বদেশী শিল্প ও জনতার শিল্পশক্তিতে উত্থান এবং দুই, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আঁতে ঘা।

এ পর্যন্ত গান্ধীজীর এই নীতিকে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না, কোন যুক্তিই এর বিরুদ্ধে নেই। কিন্তু তারপরেই নানা জটিল প্রশ্ন উঠবে এবং সেখানে ভিন্নমত দেখা দিতে বাধ্য এবং স্বাধীনতাকামী দলগুলি, এমন কি কংগ্রেসও গান্ধীজীর সঙ্গে একমত নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে স্বদেশী, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প ও আত্মনির্ভর গ্রাম ইত্যাদির যুক্তি বহু থাকলেও ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পায়ন ও তার আধুনিকীকরণ-এর প্রশ্ন সম্বন্ধে গান্ধীজীর সাথে আজ কংগ্রেসও একমত নয়, এবং কংগ্রেস সরকার দ্রুত শিল্পায়নের পথে তার নীতি নির্ধারণ করেছে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসছি। আমরা এই আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষার দিক থেকেই ভারতের অতীতকে যেমন বিচার করলাম, তেমনি তার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার দিকটাও বিচার করি। বেশ তো, ভারত স্বাধীন হলো, এবারে ভারতের স্বাধীনতা কি করে রক্ষা করা যায়? আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত বিরাট পদাতিকবাহিনী, যন্ত্রচালিত সৈন্যবাহিনী, নৌবহর, আকাশবাহিনী বা বিমানবাহিনী ইত্যাদির ব্যবস্থা চাই না-কি? এবং তা করতে হলে বিরাট যন্ত্রশক্তি চাই দেশে, শিল্প-

শক্তি, ভারীশিল্প ইস্পাতশিল্প, যানবাহনশিল্প ইত্যাদি অন্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনে দরকার না হলেও এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই কি এইসব শিল্প একান্ত প্রয়োজন নয়? জনজীবনে না হয় আমরা কতকটা সহজ, সরল জীবনই চালু করলাম, মোটা ভাত-কাপড় পরে উচ্চ চিন্তা নিয়েই খুশী রইলাম, নয়তো একটা পরিমিত মাপকাঠির জীবনযাত্রা বেছে নিলাম যা খুব উঁচুমানের নয় কিংবা একেবারে নীচু-মানেরও নয়, তথাপি ভারতের স্বাধীনতাটা রক্ষা করতে হবে। সেখানে তো আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকে, অথবা ছেলেখেলা করে ফের পরাধীন হবার পথ খোলা করতে পারি না, চারিদিকে যে দুষ্ট এবং লোভী শক্তিগুলি রয়েছে তারা ভারতকে স্বাধীন থাকতে দেবে কেন? ভারতবাসীরা চাষবাস, গৃহকার্য নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তে বসবাস করুক, এমনটি তারা মানবে কেন? এই যুক্তি থেকেই তো দেশকে দ্রুত শিল্পায়নের পথে নিয়ে যাওয়া দরকার। এটা প্রতিরক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজন, উচ্চ আদর্শে প্রস্তুত আমাদের সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা হবে?

গান্ধীজী উত্তরে বলেছেন, যে শক্তি দিয়ে ভারত স্বাধীন হবে, সেই শক্তি দিয়েই স্বাধীন ভারত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে। অর্থাৎ অহিংসার সাহায্যে ভারত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে। বলা যায়, এ বোধ হয় একটা অবাস্তব দাবি বা লম্বা দাবি (টল ক্লেম)। আমরা বুঝতে পারলাম যে অহিংসা একটা শক্তি, কিন্তু এই অহিংসার শক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে, অপব্যবহারের মধ্যে তার শক্তিও দেখা যায় না। স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় এই শক্তি কতকটা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর এই শক্তি কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। আমরা অন্যান্য স্বাধীন জাতির সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে কোনো হিসেবেই খুব উঁচুদরের লোক হয়ে গেছি, একথা বলা যায় না। বরং আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, গুপ্তহিংসা, দেশপ্রেমের অভাব, নোংরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রিয়তা ইত্যাদি মন্দগুণগুলি খুবই ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে, এবং যে কংগ্রেস আজ গদিতে আসীন, যে কংগ্রেস গান্ধীজীর অনুসরণ করবার জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছে, যে কংগ্রেস গান্ধীজীর তৈরী—সেই কংগ্রেস কর্মীরাও সাধারণতঃ অহিংসার গুণাবলী থেকে বহুদূরে হটে গিয়েছে। এই অবস্থায় অহিংসা দিয়ে, সত্যাগ্রহ দিয়ে আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবো, এই ভরসায় সৈন্যবল কি রদ করে দেওয়া যায়? সে হলো পাগলামী। সেই কথা গান্ধীজী নিজেও জানতেন ও স্বীকার করতেন এবং এরই জন্য গান্ধীজী পণ্ডিতজীকে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কেন না, তিনি জানতেন বিদেশী আক্রমণকে রুখবার মতো অহিংস শক্তি তখন দেশে ছিল না। তিনি জেনেশুনেই আদর্শকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন। এটা গভীর পরাজয় ও দুঃখের কথা, কিন্তু তাই বলেই তাঁর কথায় সমস্ত ভবিষ্যৎই নষ্ট হয়ে গেল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তিনি বারবারই বলেছেন, আদর্শ অহিংসা মানুষের অসাধ্য। অহিংসার পথে মানুষ ধীরে ধীরে বহু উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য, সেই দূরের ধ্রুবতারা যেমন আমাদের দিক্ নির্দেশকে সজাগ রাখে, অহিংসার আদর্শ মানুষকে তেমনি দিক্ জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হতে

দেবে না। অতি দূরগামী মানুষের যাত্রা, এ যাত্রার শেষ দেখা যায় না, আজকের চলাফেরা আমাদের যত নির্লজ্জ ও যতই মর্মান্তিক হোক, আজকের প্রয়োজনকে আমরা যত অশুভ ব্যবস্থার দ্বারাই মিটিয়ে থাকি না কেন, এই দূরের যাত্রা, এই লক্ষ্যকে আমরা ভুলতে পারি না। এই লক্ষ্যজ্ঞান, এই দূরের যাত্রার হিসেব আমাদের আজকের কার্যাবলীকেও নিয়ন্ত্রিত করছে, তা যত দুর্বলই হোক না কেন। একজন বিচারক নিজের সহৃদয়তার বিরুদ্ধেও মানবিকতাবোধের বিরুদ্ধেও খুনী আসামীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে যে ভাবে দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করেন তেমনি গান্ধীজী কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাবার অনুমতি দিয়ে বেদনাহত হয়েছিলেন। তাছাড়া কাশ্মীরে সৈন্য পাঠানো যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্য থেকে নয়; আত্মরক্ষা, লুণ্ঠনকারীদের রুখে দেবার জন্য। এই ব্যবস্থাকে যুদ্ধের চেয়ে পুলিশী ব্যবস্থাই বেশী বলা উচিত। বলতে পারেন এর মূল্য কি? এই বেদনাবোধ কার্যতঃ তো কোন কাজে এলো না। কিন্তু তা নয়। এই বেদনাবোধ, এই অন্যায় বোধ, এই অসহায়তা বোধ অর্থহীন বা মূল্যহীন নয়। এবং এই বেদনাবোধ একমাত্র গান্ধীজীরই নয়, এই বেদনাবোধ, যুদ্ধ সম্বন্ধে এই অযৌক্তিকতা ও অন্যায়বোধ আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ স্পষ্টতর দাবী তুলছে। সেই দিক থেকে লক্ষ্য করলে গান্ধীজীর চেষ্টা ও তাঁর ব্যর্থতা—কোনটাই শেষ মূল্য হারায় নি, এবং গান্ধীজী ব্যর্থ নন।

গত যুদ্ধে জাপান যখন ভারত আক্রমণে উদ্যত হলো, তখন ভারতকে রক্ষার প্রয়োজনে কিভাবে কংগ্রেস অহিংসা নীতি বর্জন ও গান্ধীনেতৃত্ব অস্বীকার করতে অগ্রসর হয়েছিল সেকথা আমরা পূর্বেও একবার বলেছি। এখানে তাঁর আত্মরক্ষা-মূলক তাৎপর্য থেকে কিছুটা আলোচনা দরকার রয়েছে। গান্ধীজীর বক্তব্য এই যে আমরা বা যে কোন দেশ যত অস্ত্রশস্ত্রেই সজ্জিত হই না কেন, যুদ্ধের সাহায্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে আবার স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে গিয়ে দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখে নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া পারমাণবিক বোমার যুগে কোনো দেশের স্বাধীনতাই যুদ্ধের সাহায্যে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এমন কি সমস্ত মানুষকে ধ্বংসও অসম্ভব নয়। কামান-বন্দুক দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, আর নিশ্চিত ভরসার ব্যাপার নয়। তিনি বলেন, এইসব যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ শক্তি বেড়েছে বলেই তা প্রায় অর্থহীন ও অচল। আণবিক বোমা অহিংসাকে ধ্বংস করে নি, অহিংসাকে অপরিহার্য করেছে। এবং অহিংসাই শেষ-পর্যন্ত জনতার শেষ শক্তি ও নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এই অহিংসার শক্তি আত্মনির্ভতায় ও স্বাবলম্বনে। আজ যদি বিদেশী কোন শক্তি অপর দেশের শহরগুলি দখল করে পরাজিত করতে পারে অথবা বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দিতে পারে, তাহলে তক্ষুণি সমগ্র দেশটাই পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। কেননা আজকালকার আধুনিক গ্রামগুলি অথবা দেশের ছোট ছোট শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। বৃহত্তম শহরগুলি ধ্বংস হলে তাদের চাষবাস, গৃহকর্ম সব অচল হয়ে যায়। কেন না

গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাদের নিজেদের শিল্পের প্রয়োজন গ্রামে মেটে না, এমন কি যা চাষ করে তা-ও বাজারে না নিলে চলে না। কারণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেয়ে শিল্পের কাঁচামাল তৈরীতেই তারা অনেকটা ব্যস্ত। ফলে তারা শহরের উপর খাদ্যের জন্য, বস্ত্রের জন্য, অর্থের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আপৎকালে তাদের মুহূর্তে পরাজিত করে দিচ্ছে। কিন্তু যদি গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট ছোট রিপাব্লিকে গঠিত হয়, অথচ পরস্পরের সাথে সহযোগিতায় শক্তিমান, যেখানে দরকার সেখানে সহযোগিতা আছে, অসহায় পর-নির্ভরতা নেই, তবে বিদেশীরা রাজধানী, কি দশটা শিল্পবাণিজ্যের শহর ধ্বংস করলো, তাতেই লক্ষ লক্ষ গ্রাম অন্নহীন, কর্মহীন, বস্ত্রহীন পঙ্গু হয়ে পড়লো না। বেশ সামলে নিতে পারবে তারা। অনটন ও অসুবিধা কিছুটা দেখা দিলেও শত্রু-পক্ষের পায়ে লুটিয়ে পড়বার প্রয়োজন থাকবে না। দীর্ঘকাল অসহযোগিতা ও সত্যাগ্রহী সংগ্রাম করে যেতে পারবে এবং আক্রমণকারী শক্তিরা বাধ্য হয়ে ফিরে যাবে, তারা শহর ধ্বংস করলো বটে কিন্তু জনতাকে হার মানাতে পারলো না। এই হলো গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির সংগ্রামিক মূল্য। এইভাবেই তিনি জাপানকে রুখবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। লিখেছেন, As I was picturing life based on non-violence, I saw that it must be reduced to the simplest terms consistent with high thinking. Food and raiment will always remain the prime necessities of life. Life itself becomes impossible if these two are not assured For non-violent defence, therefore, society has to be so constructed that its members may be able as far as possible to look after themselves in the face of an invasion from without or disturbances within." (Hnrijan, 3.1.40—N.K.B. 59)

"অহিংসা প্রতিরোধের কথা যখনই আমি ভেবেছি তখনই দেখেছি উচ্চতরের চিন্তাধারার সঙ্গে সরলতম জীবনযাপনের মধ্যে এই শক্তি রয়েছে। খাদ্য ও বস্ত্র জীবনের দুটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। এ দুটি ছাড়া জীবনধারণই অসম্ভব। কাজেই অহিংস আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যূনতম এই দুটি প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার মতো সামাজিক ব্যবস্থা থাকা চাইই চাই, বহিরাক্রমণের পরিস্থিতিতেই হোক অথবা কোন অন্তর্বিদ্রোহের পরিস্থিতিতেই হোক।"

"You cannot build non-violence on factory eivilization, but it can be built on self contained villages, even if Hitler was so minded, he could not devastate seven hundred thousand non-violent villages. He would himself become non-violent in the process. Rural economy as I have concieved it eschews exploitation altogether, and exploitation is the essenee of violence. You have therefore to be rural minded before you can be non-violent." (Harijan—4.11.39) N.K.B. 46.

"কারখানা-সভ্যতার উপর অহিংসা তৈরী করতে তোমরা পারবে না, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের উপর অহিংসা তৈরী করা যায়। যদি হিটলারের এমন বাসনাও থাকতো তাহলে এই প্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ অহিংস সাত লক্ষ গ্রামের উপর তার রাজ্য কখনো কায়েম হতে পারতো না, বরং নিজেকেই সে চেষ্টা করতে গিয়ে অহিংস হয়ে ফিরতো হতো। গ্রাম্য অর্থনীতি আমি যে ভাবে কল্পনা করেছি তাতে শোষণের কিছুমাত্র অবকাশ নেই এবং শোষণই হচ্ছে হিংসার জন্মদাতা ও মূল বীজ। কাজেই প্রকৃত অহিংস হতে হলে গ্রামকে ভালোবাসতে হবে, (অথবা গ্রামীণ সভ্যতার কথা ভাবতে হবে)"।

"To-day Sir William Vincent (the then Home Member of the Government of India) is able to make us dance to his tune. All this will be changed. Sir William Vincent will play a different tune when he finds that without British power and indeed, inspite of it, we are able to dispence with foreign aid for the supply of our vital needs." (Young India 6 10 21) NKB—31.

"ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট আজ আমাদের তার বাঁশীর সুরে নাচায়। কিন্তু অচিরে এই সবই বদলে যাবে। যখন দেখবে যে আমরা ইংরেজের সাহায্য ছাড়াও এবং ইংরেজ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারছি এবং বিদেশ থেকে আমদানী করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে না, তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর ধরতে বাধ্য হবেন।"

যাক্, আর বেশী উধৃতি দেবার দরকার মনে করি না।

আভ্যন্তরীণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ব্যাপারে তিনি বিরাট বিরাট শিল্পনগর ও কেন্দ্রীভূত শিল্পবাণিজ্যের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তা সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন হলেও তাতে তাঁর আপত্তির সুরটা কখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। সমাজতন্ত্রের পথে শিল্পায়নে শোষণ নেই, একথা তিনি মেনে ছিলেন শেষপর্যন্ত এবং পণ্ডিত নেহেরু শিল্পায়নে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী জেনেও শেষ পর্যন্ত নেহেরুকেই তিনি তাঁর উত্তরাধিকার দিয়ে যখন গিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন মেনে নিয়েছিলেন। তাহলেও শিল্পায়ন বা ইণ্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশন ও কেন্দ্রীকরণ বা সেণ্ট্রালাইজেশনের উপর তাঁর সন্দেহ কোন কালেই নিরসন হয় নি। মন্দের ভালো হিসেবেই হয়তো এবং হয়তো পণ্ডিত নেহেরু গান্ধীজীর আপত্তির স্পিরিটটা ধরতে পেরেছেন এবং সমাজতন্ত্রের শিল্পায়নে, ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের ও কেন্দ্রীকরণের ততটা ক্ষতি করবার ক্ষমতা থাকে না ; হয়তো এইসব ভেবেই তিনি ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন মেনে নিতে পেরেছিলেন শিল্পায়ন হলেও কেন্দ্রীয়করণে তাঁর ঘোর আপত্তি। কেন না কেন্দ্রীয়করণের ফলে আমলাতন্ত্র বেড়ে যেতে বাধ্য। বড় বড় সাহেব, দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক—মস্ত মস্ত ম্যানেজার, বিশেষজ্ঞ ও ব্যুরোক্রেটদের বা আমলাদের রাজ্যে তিনি জনতার মুক্তি দেখতে পান নি। শোষণ না থাকলেও, জনতার জীবনধারণের মান উন্নত হলেও জনতার স্বাধীনতা হয়তো

অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। জনতাকে সেখানে ব্যুরোক্রেটদের জুলুমেই বাস করতে হবে। এ সন্দেহ যে একেবারে অমূলক, তা নয়। যারাই আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অন্তর্নিহিত সমস্যার খবর রাখেন, তারাই জানেন সেখানকার একটা সর্বক্ষণের সমস্যা হলো ব্যুরোক্রেসীর কমাণ্ডিজম্ ও আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রীতাকে কি করে রোখা যায়। পারসনেলিটি-কাল্ট বা ষ্ট্যালিনিজমের বিরুদ্ধে আজ যে রাশিয়ায় এতো বড় একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেলো, তা থেকেই বুঝতে হবে ব্যুরোক্রেসী সম্পর্কে কতটা হুঁসিয়ার থাকতে হবে। এটা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়—রাশিয়ার অভ্যন্তরে ষ্ট্যালিনকেই এই নিয়ে কত লড়াই ও কত শাসন করতে হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেই তার জন্য চরম অপরাধী বলে আজ নিন্দিত ও তিরস্কৃত হয়ে গেলেন। চীন দেশে কমাণ্ডিজমের বা কর্তৃত্বপনা ব্যবহার বিরুদ্ধে কম সতর্ক হয়ে থাকতে হচ্ছে না, সমাজতন্ত্র হলেই সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায় না, এমন কি সমাজতন্ত্রে বা কমিউনিজমের অবস্থায়ও দ্বন্দ্ব থাকবে। দ্বন্দ্ব না থাকলে তো সমাজ অচলায়তন হয়ে যাবে, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতি ঘটবে—চিরকালই। কনসারভেটিভ বা প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তি একই সঙ্গে চিরকালই থাকবে, একদল এগোতে চাইবে, অপর দল অত দ্রুত এগোতে চাইবে না, এবং যে দলের হাতে ক্ষমতা থাকবে, সে দল চট করে রাস্তা ছেড়ে দেবে, মানুষের স্বভাব এমন নয়, এমন হতে পারে না। সেক্ষেত্রে যেখানে সমাজ অত্যন্ত বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যেখানে বিরাট বিরাট রাক্ষুসে শিল্পনগরে লক্ষ লক্ষ লোক বড়সাহেবদের সাথে চলাফেরা, কাজকর্ম করে চলেছে, সেখানে মুষ্ঠিমেয়র হাতে সেই ম্যানেজারিয়ান ক্ষমতা যথেষ্ট অনাচার করার সুযোগ পেতে পারে। আমরা রাশিয়ার ক্ষেত্রেও তার নমুনা দেখেছি। শোষণের জন্য নয়, অপরকে ঠকাবার জন্য নয়, কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার লোভটা সকলেই বর্জন করতে পারে না। শোষণ করে যে সমস্ত ধনী ধন পুঞ্জীভূত করে; তাদের ধনসঞ্চয়ের লোভ একমাত্র জীবনযাপনের মান উন্নত ও সুখে কালাতিপাত করাতেই নিবদ্ধ নয়। ওই ধন ও ঐশ্বর্যের সাহায্যে ক্ষমতা দেখাবার ও খাটাবার যে সুযোগ তারা পান, সেটি কম আকর্ষণীয় বিষয় নয়, তাদের কাছে। আজ যদি মানুষের সেই ক্ষমতাপ্রিয়তা ধনার্জনের পথে সফল না হয়, তবে তা অন্য রাস্তায় অনুসন্ধান করবে, রাজনীতির মাধ্যমে সন্ধান করবে, বড় বড় কারখানা চালনা করার অধিকারের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষমতাপ্রিয়তা ভোগ করার চেষ্টা করবে। তাছাড়া এ এমন একটা পাপ যা, যে ব্যক্তি নিজের সজ্ঞানে ক্ষমতার লোভে লুব্ধ ছিল না, সেই লোকটিও ক্ষমতায় আসীন হয়ে কিছুদিনের মধ্যে সেই সেই রোগে সংক্রামিত হতে পারে। তাই বলে ক্ষমতা যখন এমন রূপ পেতে পারে, এই ভয়ে যন্ত্রবিজ্ঞান বা কলকারখানার দরকার নেই এমন যুক্তি চলবে না। জলে নামলে ডুবতে পারে জানলেই জলে নামা উচিত নয়, এমন কথা কেউ বলবে না। বলবে যাতে কেউ না ডোবে, যাতে সাঁতার জানে, যাতে নৌকার ব্যবস্থা থাকে, এমনি কথা ভাবতে হবে এবং সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহারটাই আজ জনতার সম্মুখে একমাত্র ভয়ের কারণ নয়। অনাহার, শোষণ, দারিদ্র, অত্যাচার, ইত্যাদি যে সব সাক্ষাৎ যম তার মাথার উপর সর্বদাই খড়্গ

তুলে আছে, তার কাছে ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে, এই ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া মোটেই উচিত নয়। বস্তুতঃ আশু যেসব কারণ দারিদ্র ও লাঞ্ছনার হেতু, যারজন্য তার জীবনে বিড়ম্বনার অন্ত নেই, তা যদি যন্ত্রীকরণ ও শিল্পীকরণের সাহায্যে দূর করা যায়, তবে তাই করতে হবে। কিন্তু গান্ধীজী মানুষের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার কথা যা বলেছেন, অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসী ও ক্ষমতাবাজীর বিরুদ্ধে যে হুঁসিয়ারী তিনি জীবনভর দিয়ে এসেছেন, সেকথাও অগ্রাহ্য করা যায় না। শিল্পায়নের অতি-কেন্দ্রীকতা যেন না ঘটে, এই অতিকেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে এরমধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশেও রব উঠেছে। যুগোশ্লাভিয়াতে তো অনেকটা বিকেন্দ্রীকৃত সমাজতন্ত্র ও অর্থনীতি আগে থেকেই রচনা করার চেষ্টা চলেছে, যারজন্য এক সময় কমিনফর্ম জগৎ মার্শাল টিটোকে প্রতিক্রিয়াশীল ও অসমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করেছিল! আজ রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ স্বীকার করেছে যে যুগোশ্লাভিয়ার বিকেন্দ্রীত সমাজতন্ত্রও সমাজ-তন্ত্রেরই একটা রূপ। এমন কি ষ্টালিনোত্তর বর্তমান রাশিয়াতে ধীরে ধীরে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝোঁক পড়েছে। স্থানীয় প্রেরণা বা লোকাল ইনিসিয়েটিভের ক্ষেত্র বাড়াবার প্রয়োজন সবাই অনুভব করছে। তা নাহলে গণতন্ত্রের কোন মানেই থাকে না। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দলেই ক্ষমতালোভীরা দলের ক্ষমতা নিজেদের ক্ষমতায় পর্যবসিত করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা এবং একটা প্রতি-চেষ্টা থাকা সর্বদাই দরকার। এই কয়েক বছরের মধ্যে অতিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁকটা জব্দ হয়ে গেছে। ডিক্‌টেটরী মনোবৃত্তি আজ সর্বত্রই নিন্দিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ঝোঁকটাই প্রবল হয়েছে। লিডারশিপের ইনফলিবিলিটি বা নেতৃত্বের কখনো ভুল হয় না বা হতে পারে না এ অহংকার কোথাও আজ চলে না। সমষ্টিগত নেতৃত্বের বা কালেকটিভ লিডারশিপের দাবি উঠেছে সর্বত্র। সমষ্টিগত নেতৃত্ব মানে একজন নেতার পরিবর্তে দশজন নেতার নেতৃত্ব বোঝায় না, সমস্ত জনগণ নীচ থেকে উপর পর্যন্ত দেশের যাবতীয় ব্যাপারে মতামত দেবে ও গ্রহণ করবে, এই গণতান্ত্রিক আবহাওয়া দলের, কাজের, চাষের, কারখানায় সর্বত্র সর্বস্তরে চালু করতে হবে, এর নাম হলো কালেকটিভ লিডারশিপ বা সমষ্টিগত নেতৃত্ব বা প্রোলেটারিয়ান ডেমোক্রেসী। একথা মুখে স্বীকার করলেই হয় না, কাজে চালু করতে হলে এরজন্য সর্বদাই সচেতন চেষ্টা চাই, তাই নিয়ে সর্বদাই একটা সংগ্রাম থাকবেই থাকবে। কেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনও তো থাকতে হবে, জনতার গণতন্ত্র মানে যে যা খুশী করা নয়, জনতার সমবেত চেষ্টা সমষ্টিগত ভাবে কোন একটা কেন্দ্র দিয়ে তো প্রকাশ পাবে, নইলে মানুষ চলবে কি করে? কাজেই দেখা যায়, সমস্যাটা নিছক কেন্দ্রীয়করণের ব্যাপারও নয়, আবার শুধু বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারও নয়। সমস্যাটা কেন্দ্রীকতা বা সেণ্ট্রালিজম্‌ও নয়, আবার শুধু গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসী নয়। সমস্যাটা কেবল নেতৃত্বেরই নয়, আবার কেবলমাত্র গণতন্ত্রই নয়। সমস্যা হলো কি করে একই সাথে থাকবে কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণ আবার কেন্দ্রীকতা (সেণ্ট্রালিজম্‌) ও গণতন্ত্র, আবার একই সাথে অর্ডার বা আদেশ ও মুক্তি বা ফ্রিডম্‌⋯ এই পরস্পর বিরোধী ধারা-গুলির সমন্বয় সাধন। যারা চিন্তারাজ্যের সরল, সাদাসিধে পথের পথিক (সিম্পলটন)

তারা এক কথা ছাড়া অন্য কথা ধরতে প্রস্তুত নন, তাদের কাছে বলতে হবে, হয় এটা সত্য, নয় ওটা সত্য…দুটোতে মিলিয়ে একটা চলমান সত্য তারা বুঝতে চায় না। তারা হয় কেন্দ্রীয়করণের ঘোর পক্ষপাতী, নয়তো উল্টো। হয়তো কেন্দ্রীয়করণ শুনলেই আঁতকে উঠবে, আবার হয়তো বিকেন্দ্রীকরণ শুনেই চমকে উঠবে, এমনি ধরণের একপেশে চিন্তায় নিমগ্ন। অথচ আসল সত্য হলো এই যে পরস্পর বিরোধী ধারার মধ্য দিয়েই সামঞ্জস্য ও প্রগতি সম্ভব হচ্ছে। বিরোধী শক্তিগুলিকে একই সঙ্গে ধরতে পারার শিক্ষা যাদের হলো না, তারা কোন না কোন রকমে হতাশ হতে বাধ্য। মানুষ বহুও বটে, আবার এককও বটে। মানুষ আন্তর্জাতিকও বটে আবার অন্তর্দেশীয়ও বটে। মানুষের অর্ডার বা আদেশও যেমন চাই, স্বাধীনতাও তেমনি প্রয়োজন। মানুষ একটা উদ্দেশ্য বা means, আবার লক্ষ্য বা endও বটে। মানুষের কেন্দ্রীয়করণ যেমন চাই, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার বিকেন্দ্রীকৃত স্বকীয়তাও কিছু চাই। নাহলে সে দাঁড়াতে পারবে না। মানুষকে যেমন গোটা সমাজের উপর নির্ভর করতে হবে, আবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও শিখতে হবে ইত্যাদি। একপেশে চিন্তা ভুল। পৃথিবী ও সমাজ এক পেশে বা এক পায়ে এগিয়ে আসে নি, কখনো এ পায়ে ভর দিয়েছে, কখনো ও পায়ে। কখনো আদেশ, নির্দেশ বা অর্ডারের জন্য পাগল হয়েছে, আবার তারপরই মুক্তির নিশান তুলেছে, মানুষ কখনো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে, কখনো সে নিজের মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছে। প্রয়োজনের হেরফেরে জোরের বা emphasis-এর হেরফের করতে হয়েছে, একটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও দেখা গেছে, সে বাদ যায় নি, আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র। আজ নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষ অন্নবস্ত্রের জন্য পাগল, তা পাবার জন্য কেন্দ্রীয়কৃত শিল্প গড়ে তুলতে গিয়ে যদি তা ব্যুরোক্রেসী বা আমলাতন্ত্রের হাতে পড়ে, তাতেও ক্ষান্ত হবে না, কিন্তু যখনই সে অভাব মিটে যাবে, তখনই আমলাতন্ত্রকে আর সহ্য করবে না, তখন মুক্তির ঝাণ্ডা তুলে আমলাতন্ত্রের কবর খুঁড়তে লেগে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা ও শিল্পকরণের যে সমস্ত কদাকার চেহারা মার্কস্ এঙ্গেলস্ দেখে গেছেন, এবং ধনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকৃত শিল্পায়নের যে কদর্য লোকালয় গান্ধীজী বিলেতে বা দেশে দেখেছেন, সেরকম ধরণের কেন্দ্রীকরণের আজ কেউই সমর্থক নন। সেগুলো ছিল নির্লজ্জ লোভের মূর্তি মাত্র, তাতে না ছিল কোন পরিকল্পনা, না ছিল কোন নিয়ন্ত্রণ। অতি কদর্য বিরাট বপুবহুল শহরগুলি যত নোংরামীর আড্ডা ছিল। অমন কদর্য শহর ও কেন্দ্রীকরণ আজ আর প্রয়োজনীয় নয়, কেন না আজ জনসাধারণের দাবি, যেখানে সমাজতন্ত্র হয়নি, সেসব দেশেও জনসাধারণ কম জোরদার ও শক্তিমান নয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও আজ জনমতকে একদম অগ্রাহ্য করতে পারে না, বস্তুতঃ জনমতকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া ভয় দেখিয়ে ভোট বা ক্ষমতা পাওয়া সহজ নয়। ফলে জনতার অনেক কথা তাদের শুনতেই হয়। ফলে শহরগুলির সর্বত্রই অনেকটা পরিবর্তন ও উন্নতির দিকে এগিয়েছে।

তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পের গোড়ায় ছিল কয়লা ও স্টীম ইঞ্জিন, কয়লার উপর শিল্পনগরগুলি এক একটা জায়গায় মস্ত বড় এক একটা লোককেন্দ্র হয়ে ওঠে,

এর বিস্তৃতির ক্ষমতা কম বলে ঘণীভূত রূপটা বড় বেশী দেখা দিতে বাধ্য। ফলে এক একটা unweildy শহর গড়ে উঠেছিল কয়লাকে কেন্দ্র করে, কয়লাশিল্পের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তির উপর সভ্যতা আজ বড় বেশী নির্ভরশীল। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের স্থান থেকে সুদূর গ্রামে গ্রামে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন এক জায়গায় সমস্ত শিল্পকে তেমনি ধরণের কেন্দ্রীভূত করার একান্ত অবশ্যকীয়তা আজ আর নেই। বিদ্যুৎশক্তি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিলে সেখানে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো যায়। এ সম্ভাবনা হবার ফলে কেন্দ্রীভূত বিকেন্দ্রীকরণ (centralised decentralisation)বা কেন্দ্রীয় পরিচালনায় বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব। বিজ্ঞান মানেই প্রকাণ্ড নয়, জীবন মানেই হাতি নয়, সে পিঁপড়েও হতে পারে, পিঁপড়েতেও জীবনের রহস্য ও কারিগরি কম নেই। সহজ সরল লোকদের কাছে বিজ্ঞান মানেই হুস্ হাস্, ধাক্ধাক্, বাপ্ বাপ্ নয়, বিজ্ঞান নিঃশব্দ ব্যাপারও হতে পারে। গান্ধীজী বলেন, আমার চরকাও একটা মেশিন, কিন্তু এমন সহজ মেশিন যা অতি দরিদ্র ঘুঁটেকুড়োনিও পেতে পারে। তিনি বলেছেন, সিঙ্গার মেশিনটাও একটা মেশিন এবং তিনি তা খুব পছন্দ করতেন। তিনি রসিকতা করে বলেছেন, "Singer saw his wife labouring over the tedious process of sewing and seaming with her own hands, and simply out of love for her, devised the sewing machine in order to save her from unnecessary labour. He however, saved not only her labour but also the labour of everyone who could purchase a sewing machine."......"সিঙ্গার সাহেব বসে বসে তাঁর স্ত্রীর সেলাই ফোঁড়াই করার মেহনতটা লক্ষ্য করলেন, এবং স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়েই সেলাই-কলের উদ্ভাবন করলেন। তাতে যে তিনি তাঁর স্ত্রীরই মেহনৎ কমিয়ে দিলেন, তা নয়, যারাই সেলাইকল কিনতে পারে তাদেরই কষ্ট লাঘব করে দিয়ে গেছেন।"

তিনি অতীতেই ফিরে যেতে চাইতেন না। তিনি জানতেন,-"that the past was tarnished by social inequalities and exploitation and it was from there that the sin of untouchability has discended upon our shoulder."......তিনি জানতেন, অতীত চমৎকার ছিল না, সেখানে অসাম্য ও শোষণের ফলেই অছ্যুৎ প্রথার জন্ম হয়েছে এবং আমাদের উপর সেই কুপ্রথা ওই থেকেই এসে পৌঁছেছে। কাজেই crude handicraft-এ তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, চরকার উন্নতিই শুধু নয়, কি ধরণের সংগঠন করলে চরকা ও কুটিরশিল্প শোষণ মুক্ত হতে পারে, তারজন্য তিনি দিনরাত ভাবতেন। শোষণমুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে তিনি শেষ পর্যন্ত যৌথ মালিকানায় বা কালেকটিভ ওনারশিপে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে যদি গ্রামকে উন্নত করতে হয় তবে গ্রামকে শোষণমুক্ত করতে হবে, ভিতর থেকে শোষণ ও বাইরে থেকে শোষণ, উভয় প্রকার শোষণ থেকে যদি গ্রামকে মুক্ত না করা যায়, তবে গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। "The revival of the village is possible only when it is no more exploited. Therefore we have to concentrate on the village being self contained,

manufacturing mainly for use. Provided this charecter of the village industry is maintained, there would be no objection to villages using the modern machines and tools that they can make and can afford to use. Only they should not be used as a means of exploitation of others." (Harijan 29. 8. 36) N. K. B. 45। "শোষণ বন্ধ করতে না পারলে গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। অতএব গ্রামের নিজেরই প্রয়োজনে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি ভোগ্যপণ্য তৈরী করবে। নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার এই লক্ষ্য বজায় রেখে যদি গ্রামগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে তাতে দোষ নেই, যদি সেসব যন্ত্রপাতি তারা নিজেরাই তৈরী করতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। কেবল দেখতে হবে তার দ্বারা যাতে অন্যদের শোষণ করা না হয়।" এই শোষণ ও ক্ষমতাপ্রিয়তার উপর তাঁর চিরদিনকার রাগ ও লড়াই। "I am personally opposed to great trust and concentration of industries by means of elaborate machinery. But at the present moment I am concerned with destroying the huge system of exploitation which is ruining India. If India takes to Khadder and all it means, I donot lose the hope of taking only as much of the modern machinery as may be considered necessary for the amenities of life and for labour saving purposes." (Young India 24. 7. 24 N.K.B. Pg. 44) . "ব্যক্তিগতভাবে আমি বৃহৎ বৃহৎ ট্রাস্ট ও কেন্দ্রীভূত শিল্পব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কিন্তু বর্তমানে আমি যা নিয়ে ব্যস্ত, তা হলো ভারতের উপর যে শোষণের বিরাট ব্যবস্থা রয়েছে তাকে ধ্বংস করা। যদি ভারত খদ্দর ও তা বলতে যা বোঝায় তার স্পিরিটটা গ্রহণ করে, তবে আমি আশাকরি জীবনের প্রয়োজনে ও শ্রম লাঘবের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি গ্রহণে ভারতের আপত্তি থাকবে না।"

তাঁর এই কুটিরশিল্প ও গ্রামসভ্যতা শোষণহীন ও কার্যকরী করতে হলে তা যে ধনতান্ত্রিক বাজারী সভ্যতায় চলবে না বা চলা সম্ভব হবে না, সে বোধ গান্ধীজীর এসেছিল। গ্রামের উৎপাদন তাই ব্যবসার জন্য নয়, নিজেদের চাহিদা মেটাবার জন্যই, তাই ব্যবসায় নয়, বস্তুর বিনিময় ইত্যাদির কথাও তিনি তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি সেগুলি কাজে লাগিয়ে যান নি। ফলে কুটিরশিল্পের জন্য এতো কিছু করে গেলেও কুটিরশিল্পকে আপন পায়ে দাঁড় করিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর চরকার অবস্থা মরো মরো, তাছাড়া কুটিরশিল্পজাত জিনিস নিয়ে ফড়েরা ও দালালেরা ও ধনীরা নানা প্রকার শোষণ ও দাদনের অত্যাচার চালিয়ে চলেছে। অপর পক্ষে যন্ত্রচালিত জিনিষের সঙ্গে একই বাজারে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। তিনি মানুষের নৈতিকতার উপর এমন একপেশে অন্ধবিশ্বাস রেখেছিলেন যে ভারতীয়েরা এমন স্বদেশভক্ত ও দায়িত্বশীল জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছে যে গ্রামের দরিদ্রদের তৈরী মোটা জিনিস দু' পয়সা বেশী দিয়ে কিনতেও বুঝি বা কখনো পিছু পা হবে না। এইখানেই কুটিরশিল্প আজও পরাজিত হয়ে আছে এবং কুটিরশিল্প বিশেষ

কিছু উন্নতি করতে পারে নি। কোন্ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কুটিরশিল্প বাঁচতে ও বাড়তে পারে, একথা ভাবতে হবে। কেবলমাত্র নৈতিক সীমানা দিয়েই তাকে রক্ষা করা যাবে না। আর যাবেনা সরকারী সাহায্য দিয়ে। এখানেও এ বিষয়ে গান্ধীজী পরিষ্কার পথ বেছে নিতে পারেন নি, বা সে অবকাশ তাঁর হয় নি। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত চেষ্টার মধ্যে কুটিরশিল্প ও গ্রামগুলি বাঁচবে না। তাই শেষ দিকে, জীবনের শেষ ভাগে তিনি collective ও co-operative-এর কথা খুব জোরের সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "The world today is moving towards the ideal of collective or co-operative effort in every department of life. Much in this line has been and is being accomplished. It has come into our own country also, but in such a distorted form that our poor have not been able to reap its benifits. Pari Passu, with the increase in our population, land, holdings of the average farm are daily decreasing. Moreover, what the individual possesses is often fragmentary. For such farmers to keep cattle in their homes is suicidal policy, and yet this is their condition today……I firmly believe too that we shall not derive the full benifits of agriculture until we take to co-operative farming. Does it not stand to reason that it is far better for a hundred families in a village to cultivate their lands collectively and divide the income therefrom than to divide the land anyhow into a hundred portions ? And what applies to land applies equally to cattle......In reality the individual can only safegaurd his independence through cooperation, in cattle farming the individual effort has led to selfishness and inhumanity whereas the collective effort can abate both the evils if it does not remove them altogether." (Harijan—15.2.42, N.K.B 52-3) "পৃথিবী জীবনের সকল ব্যাপারে ক্রমাগতই সমষ্টিগত ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। এ পথে অনেকটা এগিয়েছে এবং আরো অনেক কিছু হতে চলেছে। এসব চেষ্টা আমাদের দেশেও এসেছে, যদিও খুব বিকৃত রূপে, যার ফলে আমাদের গরীবেরা তার উপকার কিছু বুঝতে পারে নি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাষীদের জমি প্রতিদিন ভাগের পর ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার আজ চাষীর যা দাঁড়াচ্ছে, তা অতি ক্ষুদ্র। নিজের বাড়ীতে আজ গরু পালন করা তাই প্রায় আত্মহত্যার সামিল হয়ে উঠেছে। (সমবেত বা কো-অপারেটিভ গোপালনের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন এসব কথা)...আমার দৃঢ় বিশ্বাস কো-অপারেটিভ চাষ ভিন্ন জমির পরিপূর্ণ ব্যবহার আর আমরা করতেই পারবো না। জমিকে আলাদা আলাদা টুকরো অবস্থায় চাষ ও

ভাগ করার নামে শত-শত টুকরো করার চেয়ে সবাই একত্রে চাষ করে ফসল ভাগ করে নেওয়া অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা নয় কী? জমি সম্বন্ধে যে যুক্তি, গো-পালন সম্বন্ধেও এই একই যুক্তি।......বস্তুতঃ আজকে ব্যক্তি একমাত্র সমষ্টিগত কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে। গো-পালন ব্যাপারে ব্যক্তিগত চেষ্টা চরম স্বার্থপরতা, অমানুষিকতার পর্যায়ে নেমে এসেছে, একমাত্র সমবেত গো-পালনের পথেই এই সব দোষ দূর না হোক, সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।" এইভাবেই গান্ধীজী ধীরে ধীরে কালেকটিভ সোসাইটি বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যতঃ স্বীকার করতে বাধ্য হন। মূল বা প্রধান শিল্প যথা, রেলওয়ে, লৌহ, জাহাজ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি তো তিনি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দিতে রাজি ছিলেন না, গ্রাম্যজীবনকেও ক্রমশঃ সমবেত জীবন করে নিতে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ পথে ছাড়া কুটিরশিল্পকে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। চীনদেশে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সমস্ত কুটিরশিল্পকে সংহত করে তোলা হচ্ছে এবং কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে সোসিয়েলিজমের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া ছাড়া কুটিরশিল্পকে বাঁচানো, রক্ষা করা, উন্নতি করা ও আধুনিক করা সম্ভব নয়। বলতে হবে গান্ধীজী এই কো-অপারেটিভ বা কালেকটিভের পথে প্রথম থেকেই জোর দেন নাই, যদিও কুটিরশিল্প, চরকা, গ্রামোদ্যোগ ইত্যাদি কাজ সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না, সে কথা তিনি অনেকবার বলেছেন কিন্তু সে সহযোগিতা যে কো-অপারেটিভ, যে কালেকটিভ বা সোসিয়েলিস্ট পথে চালিত করতে হবে সে চেষ্টা তিনি করেন নি। ফলে কুটিরশিল্পের প্রয়োজন ও স্থান সবাই স্বীকার করলেও তা কি করে কার্যকরী ও সুপ্রতিষ্ঠ করা যায় তা নিয়ে গান্ধীবাদীদের মধ্যে মতৈক্য নেই, এবং আজও অনেক পরস্পরবিরোধী মনোভাব রয়েছে। মোট কথা কুটিরশিল্পকে অস্বীকার করা বাতুলতামাত্র, অথচ কুটিরশিল্পকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, নয়া সমাজব্যবস্থার পথে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে, সমবায়ের পথে এবং বিজ্ঞান ও আধুনিক উপায়ে তাদের উন্নতি সাধন করতেও হবে, যাতে তাদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে ও উন্নতধরণের জিনিস তৈরী হয়। এখানে বিদ্যুৎচালিত ছোটখাট যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনও হবে। বিদ্যুৎটা হবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, অথচ তার ব্যবহার হবে বিকেন্দ্রিকভাবে, গ্রামে গ্রামে তাদের নানা কাজে, নানা ব্যবহারে, অথচ মূল জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্গত থাকবে প্রত্যেকের কাজ, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান।

ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন, অভিজ্ঞতার সমষ্টিকরণ, সহযোগিতামূলক উন্নতি ও চিন্তা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয়করণে গান্ধীজী কারো চেয়ে কম উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণকে ভয় করতেন, যেখান থেকে আমলাতান্ত্রিক আভিজাত্য সৃষ্টি হতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

Question—Formation of Central Board then means centralisation?

Answer–Not quite. The districts will be the working centres. The central office will be the watch tower for the whole of India,

issuing instructions, but not a board of administration. It will be a sort of a correspondence school through which the various agents will carry on mutual exchange of thought and compare notes. We want to avoid centralization of administration, we want centralization of thought, ideas and scientific knowledge,"

(Mahatma Vol. IV, page—9)

"প্রশ্ন—কেন্দ্রীয় বোর্ড তাহলে কেন্দ্রীয়করণের সামিল ?

গান্ধীজীর উত্তর, "ঠিক তা নয়। জেলাগুলিই হবে কাজের কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অফিসটা হলো একটা watch tower-এর মতো পর্যবেক্ষণ করার সুবিধাজনক উচ্চতম মঞ্চ বিশেষ, যেখান থেকে কি করতে হবে তার নির্দেশ ভারতেরসর্বত্র পেঁছাবে, কিন্তু সেখানে শাসনকেন্দ্র থাকবে না বা হবে না। এই কেন্দ্রীয় মঞ্চটি হবে একটি খবরাখবর বিতরণ ও যোগাযোগ কেন্দ্র বিশেষ, যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন এলাকার চিন্তা, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার ও উপদেশ সম্বন্ধে একটা যোগাযোগ প্রথা চালু হবে। আমরা শাসনের কেন্দ্রীয়করণটা এড়াতে চাই, কিন্তু চিন্তা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীয়করণ চাই।"

অতএব জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা অভিজ্ঞতা থেকে ছিন্ন করে এক একটি গ্রাম বা অঞ্চলকে কূপমণ্ডূক করে তোলা গান্ধীজীর উদ্দেশ্য নয়। এখানে গান্ধীজীর কোন revivalist মোহ ছিল না। তিনি বিজ্ঞানের দানকে প্রত্যেক গ্রামে পেঁছে দিতে চেয়েছেন, বিজ্ঞানের অপব্যবহার চান নি। বিজ্ঞানের উপরে জ্ঞানের শাসন, নীতির শাসনকে বজায় রাখার ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় দেশ গঠন করা, আর সমস্ত শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা, এক কথা নয়। আবার বিকেন্দ্রীকরণের নামে প্রান্তীয়তা ও স্থানীয় কূপমণ্ডূকতা তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। সমস্ত ভারতকে এক জাতীয়তাবোধ, এক মানবিক ঐক্যবোধে গঠিত করে তোলার ব্যাপারে গান্ধীজীর মতো আর দান কার আছে ? "এক জাতি এক প্রাণ, একতার" বাস্তব মূর্তিটা গান্ধীজীই গড়েছেন। অতএব তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা প্রান্তীয়তার কোন স্থান নেই।

তিনি বিজ্ঞান ভক্ত কম ছিলেন না, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া তিনি চলতেন না। তাঁর সারা জীবনটাকেই একটা বিজ্ঞানাগার বলা যায়। শহরগুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য গ্রামগুলি ধ্বংস হবে, এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, বরং শহর ও শিল্পনগরগুলি যা আছে ও যা অপরিহার্য হবে তার সাহায্যে গ্রামগুলিকে আধুনিক করে তোলা তিনি দরকার বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ শহরের জন্য গ্রাম নয়, গ্রামের উন্নতির lever বা হাতিয়ার হিসেবেই শহরকে ব্যবহার করতে হবে, এই ছিল তাঁর আদর্শ বা ধারণা। তিনি বলেন, "I do visualise electricity, ship-building, iron-works, machine-making, and the like side by side with village handicrafts. But the order of dependence will be reversed. Hitherto the industrialisation has been so planned as to

destroy the villages and village crafts. In the state of future it will subserve the village and their crafts." (Harjan—27.1.40), আমি বিদ্যুৎশক্তি, জাহাজতৈরী শিল্প, লৌহ-ইস্পাত কারখানা, যন্ত্রতৈরীর কারখানা ও এই জাতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ ভারতে স্বীকার করি, গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পের সাথে সাথে। কিন্তু নির্ভরতার সম্পর্কটা আমি উল্টো করে দিতে চাই। আজও পর্যন্ত এই সমস্ত বৃহৎশিল্প ও শক্তি গ্রামশিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে গ্রামগুলির স্বার্থ ও গ্রামগুলিকে সাহায্য করার জন্যই ঐ সব শিল্প ও শক্তি নিয়োগ করতে হবে।"

তাঁর স্বদেশী সম্বন্ধে ধারণার একটি ছবি মনে রাখা দরকার। তাঁর স্বদেশী মানে পৃথিবী থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে কূপমণ্ডূক হয়ে থাকা নয়। সমস্ত পৃথিবীর ভাগ্য গঠনে, বিপদে আপদে তিনি ভারতবর্ষকে চরম মূল্য দিতে অগ্রসর হতে বলেছেন। আন্তর্জাতিকতা বোধ তাঁর কম ছিল না। ধর্ম ও অন্তরের অনুভূতি দিয়েই তিনি আন্তর্জাতিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, অর্থনীতি ও রাজনীতির মাধ্যমে নয়। কমউনিস্ট ও সোশিয়েলিস্টরা সাধারণতঃ অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্রমবিকাশ হিসেবেই আন্তর্জাতিকতাকে বিশেষকরে গ্রহণ করেছেন: আর গান্ধীজী ধর্ম, প্রেম ও মানবিকতার আন্তরিকতাবোধ থেকে সকল জাতির সকল মানুষের আন্তর্জাতিকতা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন উপায়ে আন্তর্জাতিকতাকে গ্রহণ পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, বরং তা পরিপূরক, কিন্তু কোন্ পথে এ মহান সত্যকে কায়েম করা যায়, কোথায় জোর দিতে হবে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, মানবিকতায় না ধর্মে বা হৃদয়ের গুণাবলীর উপর এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধারণা আছে। কিন্তু গান্ধীজী যে কারো চেয়ে কম আন্তর্জাতিক ছিলেন, তা নয়। তবে তাঁর দেখবার ভঙ্গীটা ছিল ভিন্ন রকমের। তাঁর স্বদেশীর অর্থ হলো এই যে, প্রত্যেককে তার প্রতিবেশীদের আগে সাহায্য করতে হবে। প্রতিবেশীর কাছ থেকে যা নিয়ে নিজের চাহিদা মেটানো যায় তা মেটাবার জন্য বিদেশ বা দূর থেকে আহরণ করা হবে না। গ্রামের নাপিত, মুচি থাকতে তাদের কাজ ব্যবহার না করে বাইরের বা দূরের কারখানার ব্লেড বা "বাটার" জুতো ব্যবহার করা অন্যায়। যদি গ্রামের শিল্পগুলি একটু মোটা ধরণেরও হয় তা-ও বরং ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের উৎপাদনগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করে নিতে হবে। প্রতিবেশীকে যদি অবহেলা করা হয়, তথাকথিত আন্তর্জাতিকতার নাম করে অথবা বিজ্ঞানের নাম করে, তবে তা অন্যায় হবে। গ্রামের মুচি, নাপিত, তাঁতী, ছুতোরদের কাজ যাতে উন্নত ধরণের হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই স্পিরিট না থাকলে স্বাদেশীকতা গড়া অসম্ভব ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করাও যায় না। ঘরের ভাইকে অস্বীকার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব করে বেড়ানোর কোন অর্থ নেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর মানে এই নয় যে বাইরের জগত অথবা দূরের পল্লীগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে হবে অথবা তাদের বিপদে আপদে দৌড়ে সাহায্য করতে যেতে হবে না। তিনি বলেছেন, In free India whose interest shall be supreme ?

If a neighbouring state is in want, would India adopt an attitude of isolationism, saying that her own needs must come first ?

A truly independent and free India would rush to the help of her neighbours in distress. A man whose spirit of sacrifice does not go beyond his own community, himself becomes and makes his community selfish. The logical sequel of self-sacrifice is that the individual sacrifices himself for the community, the community for the districts, the district for the province, the province for the nation and the nation for the world. A drop torn from the ocean perishes without doing any good. As a part of the ocean, it shares the glory of carrying on its bosom whole fleets of mighty ships,"

"স্বাধীন ভারতে কাদের স্বার্থ সর্বাগ্রগণ্য ? যদি কোন পার্শ্ববর্তী দেশ বিপন্ন হয় তবে কি স্বাধীন ভারত এই বলে সাহায্য করতে গররাজী হবে যে তাদের নিজের স্বার্থ অগ্রগণ্য ?

"সত্যিকার স্বাধীন ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপদে দৌঁড়িয়ে সাহায্য করতে যাবে। যে মানুষ তার নিজের গোষ্ঠীর জন্য ছাড়া কোন ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, সে নিজেকেও যেমন স্বার্থপর করে তেমনি তার গোষ্ঠীকেও স্বার্থপর বানিয়ে ছাড়ে। আত্মত্যাগের যুক্তিসঙ্গত নিয়মই এইযে, ব্যক্তি গোষ্ঠীর জন্য ত্যাগ বরণ করে নেবে, গোষ্ঠী জেলার জন্য আত্মত্যাগ করবে, প্রদেশ দেশের জন্য, শেষপর্যন্ত দেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে। সমুদ্র থেকে একটি বারি বিন্দুকে আলাদা করে আনলে তার লয়ই ঘটে। কিন্তু সমুদ্রের অংশ হিসেবে সে মিলিত থাকলে বিরাট নৌবহর বক্ষে ধারণ করার গৌরবও সে অর্জন করে।"

মহাত্মা গান্ধী হিন্দু বা ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করলেও তাঁর মানবিকতা বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের জন্য। তিনি সকল ধর্ম ও সকল দেশকে সমান শ্রদ্ধা করতেন, এমন কি ইংরেজকেও তিনি ভালবাসতেন। পৃথিবীতে আজ তাই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তের অভাব নেই। কূপমণ্ডূকতা তাঁর মধ্যে ছিল না। ভারতের কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য আবেষ্টনীতেই তাঁর সৃষ্টি হয় নি, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ ব্যাপী নানা রাজনৈতিক ঘটনা ও শিক্ষাদীক্ষাতে তিনি তৈরী হয়েছিলেন। নেংটী পরা বলেই মনে করার কারণ নেই যে তিনি অশিক্ষিত বা অমার্জিত পাড়াগাঁয়ের পরিবেশের সৃষ্টিমাত্র। বিশ্বসভ্যতারই একটি উৎপাদন বা প্রডাক্ট ছিলেন তিনি, তবে বিশ্বকে তিনি ভারতীয় দূরবীণ দিয়েই দেখেছিলেন।

যন্ত্রসভ্যতার পাগলামীর তিনি নিন্দা করেছেন। যন্ত্রের নামে একদল লোক এমন নেচে ওঠে যে একদিন হাতের বদলে কোন যন্ত্রের সাহায্যে মুখে ভাত তুলে নিতে পারলেও হয়তো তাঁরা বিজ্ঞানের সাধনা করলেন বলে মনে করবেন। ক্ষেতে ধান চাষ করার বদলে যদি ল্যাবরেটারীতে চাল তৈরী করা যায়, তবে তাঁরা বেশী আনন্দ

পাবেন। পুকুর থেকে জল তোলার বদলে যদি জল তৈরী করতে পারেন ঘড়া ঘড়া, তবে খুব বিজ্ঞান ও প্রগতি হলো বলে এরা মনে করেন। আসলে কোন বৈজ্ঞানিকই এমন মনে করেন না, কিন্তু আজ বিজ্ঞানভক্ত হুজুগপ্রিয়দের বিজ্ঞান বিলাসিতা এমনি হাস্যকর। এ-ও একটা ফ্যাশান। তাঁরা জানেনই না যে স্বয়ং মানুষ তার দেহ ও মন নিয়ে এক বিস্ময়কর মূর্তিমান বিজ্ঞান, যার তুলনা কোন বিজ্ঞানজাত সৃষ্টির সঙ্গেই হয় না। এ হেন মানুষকে তাঁরা একটা বাজে এবং অনাবশ্যক উপদ্রব বলে মনে করেন। সহজ কথা, নিকটতম সত্যটাকে সত্য বলেই মনে হয় না, দূরের ছায়াটাকেও সত্য বলে মেতে ওঠে। অতিরিক্ত বিজ্ঞানবাদীতা বা যান্ত্রিকতা একটা রোগ বিশেষ এবং এ রোগ যথার্থ জ্ঞানী লোকের হয় না। কোন কিছুকে যদি জটিল করে না ধরা হয় তবে তাঁরা স্বীকার করেন না যে তার কোন অর্থ আছে, কোন কিছু কিম্ভূতকিমাকার না হলে তাঁদের মনতুষ্টি হয় না। তাই গান্ধীজীর সহজ ও সরল পথ তাঁদের মনে সন্তোষ আনে না। গান্ধীজী আফশোষ করে বলেছেন, "I have pleaded for the simplest things before the people of India, simplest things calculated to bring about revolutionary changes, e g khadi, prohibition, revival of handicraft etc. But unless you can get over the intoxication of the existing regime, you will not see the simplest things." (Harijan—28.10.39)—"খুব সহজ জিনিস আমি ভারতবাসীর সম্মুখে ধরেছি, সবচেয়ে সহজ প্রোগ্রাম, যার সাহায্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো যায়, যেমন খাদি, মদ্যবর্জন, গ্রামশিল্পের পুর্ণপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা বর্তমান যুগের নেশা থেকে মুক্ত না হতে পারবে ততক্ষণ সহজ সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে না।" অর্থাৎ জটিলতা ও উত্তেজনায় আমরা বিভোর, সোজা পথটা, সহজতম কাজটাও কঠিন মনে হয়, আমাদের ধ্যানধারণা সবটাতে একটা বিকৃত নেশা জুটে যায়। এই মোহ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে শেখায়।

এই সহজ হুজুগে বিচার থেকেই পরের দেশকে অন্ধ অনুকরণ করতে লোভ জাগায়। ভারতের মৌলিক অবস্থাটা কি তা বুঝতে চেষ্টা করে না। মনে করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারলেই বুঝি অর্থ সংকট দূর হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক যে দেশে বেকার, সেখানে শক্তির অভাবে কাজ বন্ধ হয় কি করে! বুঝতে হবে অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থাটাই এমন যে, লোকবলই হোক আর বিদ্যুৎবলই হোক কোনটাই কাজে লাগানো যাচ্ছে না। যে সামান্য উৎপাদন হয় তা-ও বিক্রী হতে চায় না যেখানে, সেখানে আরো উৎপাদন যদি তাদের বিতরণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে তবে সংকট আরো ঘণীভূত হবে। সমাজব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন না করলে জল, বিদ্যুৎ কোনটাই কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাই, যাতে সকলের শ্রমই ব্যবহার করা চলে, কারো বেকার থাকা সম্ভব না হয় এবং সেই অবস্থায়ই মানুষের শ্রমশক্তিকে বাড়াবার জন্য বিদ্যুৎ ও আনবিক শক্তির সাহায্য দাবি করা চলে। শ্রম লাঘব করার অর্থ কি? আজ

যে কোটি কোটি লোক বেকার ও অর্ধবেকার, আজ যে গ্রামে গ্রামে চাষ ছাড়া আর কোন জীবিকা বৃত্তি নেই, তাদের কাজ না দিতে পারলে বৈজ্ঞানিকতার বড়াই করা হাস্যকর।

ওয়েল ফেয়ার ষ্টেট (welfare state) করার জন্য ভারতে যাঁরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছেন, তাঁরা জানেন যে এই পাঁচ বছরের চেষ্টায় বেকারের সংখ্যা গিয়েছিল বেড়ে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষেও বেকার সমস্যার সমাধান হয় নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও হস্তশিল্পের মারফৎই বেশীর ভাগ কাজ বেকারদের জন্য সৃষ্টি করবার কথা হয়েছিল। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পথে মূল শিল্পের দ্রুত প্রসারণের চেষ্টা করেও ভারতকে সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে, তা হলো বেকার সমস্যা ও সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে। কেন না এই দুটি জিনিস সমাধান করতে না পারলে দেশের কোন স্থায়ী উন্নতিই সম্ভব নয় এবং এমন কি ক্রয়ক্ষমতা লোকের যদি না বাড়ে তবে শিল্পজাত জিনিসের কাটতিও হবে না এবং দেশের লোকের অবস্থার উন্নতি না হলে শিল্পায়ণের খরচ ও মূলধন উঠবে না। এই সাধারণ লোকের কাজ যোগাড় করা, ক্রয়শক্তি বাড়ানো, অবস্থা একটু উন্নত করা বর্তমানে কুটিরশিল্প ছাড়া অন্য কোন কিছুতে দিতে পারে না বলেই, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে গ্রামীণশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের সংরক্ষণের ও সাহায্যের উপর জোর দিতে হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে তথাকথিত প্রগতি ও তথাকথিত বিজ্ঞানবাদীরা যত সহজে দেশকে কলকব্জায় যন্ত্রচঞ্চল করতে চায়, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। ফলে, বৃদ্ধ গান্ধীজীর কথা আধুনিকতম কমিউনিষ্টদেরও অবজ্ঞা করা চলছে না, কমিউনিষ্টদেরও কুটিরশিল্পের রক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করাতে হচ্ছে।

অলস সময়টাকে কি করে ব্যবহার করা যায়, চাষ ছাড়া ও প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় আয় (সাবসিডিয়ারী ইনকাম) কিভাবে করা যায়, তাই ভাবতে গিয়ে গান্ধীজী চরকা ও সেই জাতীয় হস্তশিল্পকে এতো জোরের সঙ্গে প্রচার করে গেছেন। ফেলে দেওয়া সময়টাকে নিজেদের মোটা প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে নেবার কথাটাতো ফেলে দেবার মতো কথা নয়। The problem is how 'to utilise these millions of hours of the nation. চরকা ছাড়া তিনি আর কোন উপায় এতো সহজ মনে করেন নাই, কেন না খাবারের পরেই মানুষের যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হলো পরা বা পরিধান করা, অর্থাৎ কাপড়। তাই অবসর সময়ের আয় এই কাপড় তৈরীর কাজেই সর্বসাধারণের প্রয়োজনে আসতে পারে। শুধু চরকাই নয়, যে কোন হাতের কাজকে তিনি সর্বজনীন শখ বা ইউনিভারসেল হবি হিসাবে সকলের জন্য করতে চেয়েছেন। এই চরকারও অবশ্য যতদূর সম্ভব উন্নতি করবার জন্য তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। আজ যদি চরকা, অম্বর চরকার রূপ নেয় এবং অম্বর চরকা মূল্য, উৎপাদনও ব্যবহারিক সুবিধার দিক থেকে চরকার মতই সহজ করা সম্ভব হয়, তবে এ-ও একটা পথ সৃষ্টি করলো। চরকাকে তিনি মিলের প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড় করাতে চান নি, গ্রামবাসী সর্বসাধারণের অলস সময় ব্যবহারের পথে

ও বাড়তি আয় বাড়াবার পথে একটা পরিপূরক বা কমপ্লিমেণ্টারী ব্যবস্থা হিসেবেই বেশী মূল্যে দিয়েছিলেন। তাঁর এই কমনসেন্স, ইকনমিক্‌সের সোজা কথাটা আর বড় বড় রাষ্ট্রবিদেরা অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। কথাটা হলো, আমাদের সমস্যাটা একটা তাত্বিক সমস্যা নয় বা কেতাবী তর্কবিলাস নয়। আমাদের সমস্যাটা হলো বাস্তব ও গুরুতর (প্রেকটিক্যাল ও প্রেসিং), নিছক অর্থনীতি শাস্ত্র নিয়ে কাগজেপত্রে এক্ষুনি কুটিরশিল্পকে, বেকারসমস্যাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় এবং দেশে কলকারখানায় ভরা বিশ্বকর্মার জগৎ সৃষ্টি করে ফেলা যায়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি আলাদিনের প্রদীপের মতো তাজ্জবকারী ফল দেয় না। এখানে একটা সমস্যাকে ছাড়াতে গিয়ে দশটা সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে। কঠিন পরিশ্রম ও ধৈর্যশীল কর্মব্যবস্থা ও পরিকল্পনামূলক ব্যবস্থার দ্বারা কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনা দরকার এবং তারই মধ্য দিয়ে মূল শিল্পগুলি গড়ার সাথে সাথে কো-অপারেটিভ ও কালেকটিভের পথে চাষ ও কুটিরশিল্পকে পরিকল্পিত উপায়ে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটাতে হবে।

রাশিয়াতে হঠ্‌ হঠ্‌ করে শিল্পকরণ হয়ে গেলো, আমাদের কেন হবে না? রাশিয়াতে তো কুটিরশিল্প আর বেকারসমস্যা নিয়ে এতো মাথা ঘামাতে হয় নি? রাশিয়াতে চোখের পলকে কালেকটিভ ফার্ম এসে গেলো, আর দূর, দূর করে ট্রাকটার দিয়ে চাষ করতে লেগে গেলো, এখানে এতো গরু, বলদের কথা ভাবা হচ্ছে না কেন? গরুবলদগুলি মুসলমানদের কেটে ফেলে দিতে বলা হয় না কেন? এজাতীয় চিন্তা যে কত হাস্যকর তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। ভারতের চেয়ে আটগুণ বড়ো রাশিয়ায় ভারতের তিন ভাগের একভাগ লোকের বাস। সেখানকার বিস্তৃত জমির সদ্ব্যবহার করতে হলে কলের চাষ প্রবর্তন ছাড়া কোন উপায়ই নেই। রাশিয়ার মতো বিরাট দেশের শিল্পকরণ করতে হলে ভারতের অর্ধেক লোক কখনো বেকার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না, বরং সেখানে লোকের অভাবটাই পদে পদে অনুভব করতে হবে। ফলে লোকবলের অভাবটা যন্ত্রবল ও বিদ্যুৎ বল দিয়েই পূরণ করতে হবে। শেষপর্যন্ত কোন দেশের সমস্যা হলো, তার লোকদের সমস্যা। চাষের সমস্যা, শিল্পের সমস্যা ও অন্যান্য যাবতীয় যা কিছু সমস্যা, তা কাকে নিয়ে? মানুষকে নিয়ে। মানুষের সমস্যা মেটাবার জন্যই চাষবাস, কাজকর্ম, শিল্পবাণিজ্য। কাজেই ভারতের মতো জনবহুল ও স্থানসংকীর্ণ দেশের মৌলিক অবস্থাটা রাশিয়ার মত জনবিরল ও স্থান-বহুল দেশের থেকে ভিন্ন। কাজেই এর সমাজতান্ত্রিক গঠনপ্রণালী রাশিয়ার সমাজ-তন্ত্রের গঠনপ্রণালীর মতো এক নয়। যদিও সমাজতন্ত্র আজ দুয়েরই সমান দরকার, সব দেশেরই জন্য আজ সমাজতন্ত্র ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের গঠন কৌশল ভিন্ন হতে বাধ্য। এক দেশ থেকে অপর দেশ শিক্ষা নিতে পারে, অভিজ্ঞতা নিতে পারে, কিন্তু নকল করা সম্ভব হবে না। কেন না আইডিয়া বা ভাবধারা আমদানী করা যায়, অবস্থাটা আমদানী করা যায় না।

বিকেন্দ্রীকরণের আওয়াজ একদল গান্ধীবাদীর মুখে হরদম শোনা যায়। তাদের

সকলের উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, গান্ধীজী কোন্ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়করণের বিরুদ্ধে ছিলেন। জনতার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ও জনতার সংগ্রামশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার প্রয়োজন তিনি বলেছেন। কিন্তু শুধু বিকেন্দ্রীকরণ কথাটার অর্থ হয় না। কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপ বা ফর্ম মাত্র। সেই অর্থনীতির কনটেন্ট বা মূল বস্তুটা কি তাকে বাদ দিয়ে কেবল বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা বলার কোন মানে হয় না। সেই বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি ধন-তান্ত্রিক না সমাজতান্ত্রিক না সামন্ততান্ত্রিক, এ প্রশ্নটাই প্রধান প্রশ্ন। সভ্যতার মূল বস্তুটা খেয়াল না করে তার ফর্মটা বা রূপটা নিয়ে চীৎকার করলে তো কোন লাভ নেই। অনেক সময় এই আসল প্রশ্নটাকে এড়াবার চেষ্টা হয়ে থাকে। শোষণহীন সমাজ বললেও কোন পরিষ্কার ধারণা হয় না। কেন না এমন অনেক ধনতন্ত্রবাদী আছেন যারা ধনতন্ত্রকেও শোষণহীন সমাজ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। যেমন আজকাল এমন অনেক কংগ্রেস নেতা আছেন যারা ওয়েল ফেয়ার ষ্টেট শব্দটা ব্যবহার করেন, সোশিয়েলিষ্ট ষ্টেট কথাটা না বলতে পারলেই খুশী হন। অথচ আমরা জানি সকল রাষ্ট্রের মালিকেরাই বলবে যে তাদের রাষ্ট্র হলো ওয়েলফেয়ার ষ্টেট। জনতার ওয়েলফেয়ার বা মঙ্গল করার জন্য ফ্যাসীবাদীরাও কম দাবী করে নি। ওয়েলফেয়ার ষ্টেট কথাটা যেমন অস্পষ্ট, শোষণহীন কথাটাও কম অস্পষ্ট নয়। জমিদাররাও মনে করতো যে তারা কোন শোষণ করেন না। সোশিয়েলিষ্ট সমাজ বলতে তেমন কোন অস্পষ্টতার স্থান নেই। জমিজায়গা, ধনসম্পত্তি, কলকারখানা সব কিছুরই মালিক সমস্ত দেশ এবং শ্রমজীবীদের দ্বারা সে দেশ পরিচালিত এবং পরিকল্পিত উপায়ে তার উন্নতি সাধন, এমন ধরণের স্পষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামোতে অস্পষ্টতার স্থান নেই। সমাজতন্ত্রের রূপ আলাদা হতে পারে, কিন্তু তার মূল কনটেন্ট বা বিষয় সম্বন্ধে, অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বা এসেনটিয়াল রিকায়ারমেণ্ট সম্বন্ধে কোন গোঁজা-মিল দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোদয় সমাজ বলতে অবশ্য কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বোদয় সমাজের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্ম কিভাবে চলবে, কে চালাবে ইত্যাদি কোন স্পষ্ট কথা আজও কেউ বলেন নি। ভাবের আবেগ ঐ কথাটাতে যত আছে, অর্থনীতির তত্ত্বটা তত স্পষ্ট নয়। কেউ বলছে রামরাজ্য, কেউ বলছে গ্রাম-রাজ্য, যেসব কথার স্পষ্ট রূপ আমরা জানি না, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের মতো বা আদর্শের মতো একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাতে সত্য, কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপটা তার কি, সে বিষয়ে কোন স্থিরতা নেই। তা যেন কতকটা মানুষের ভাল হবার অপেক্ষায় বসে রয়েছে, এবং যতক্ষণ মানুষ ভাল না হচ্ছে, সবাই ধর্মভীরু না হচ্ছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে—এমনি ধরণের ব্যাপার। এ ধরণের একটা নৈতিক আন্দোলন চলতে পারে এবং তাতে সমাজে একটা ভালো আবহাওয়া হয়তো তৈরী হতে পারে, কিন্তু তাই দিয়ে রাজনীতি চলে না এবং অর্থনীতিও ওতে তৈরী হয় না। গান্ধীজী কেবলমাত্র নীতিবাদী ছিলেন না, তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতা ছিলেন, একথা ভুলে গিয়ে সবাই ভালোমানুষ হবার জন্য কেবল ধর্ম করে বেড়ালে চলবে না,

অন্ততঃ তাতে কেবল গান্ধীজীর ধর্মের দিকটাই হয়তো প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু তার রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক দিকটা বর্জন করা হবে।

ভূদান আন্দোলনকারীদের তাই বড্ড বেশী অস্পষ্ট কথা বলতে শোনা যায় এবং ভাবাবেগের উপরেই তাঁরা একটা নতুন সমাজ স্থাপন করতে চান। তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ (মেটিরিয়াল ফাউন্ডেশন) সম্বন্ধে এক একজন এক একরকম কথা বলেন। বিনোবা ভাবে অবশ্য এক ধরণের গ্রামীণ কমিউনিজম্ বা ভিলেজ কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়, কিন্তু অন্যান্যরা অনেকেই সেদিকেও অতটা উৎসাহী নয়। ভূদান আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বিনোবাজী গ্রামদান পর্যন্ত এগিয়েছেন, কিন্তু অন্যান্যরা অনেকেই সেদিকেও অতটা উৎসাহী নন। ভূদান আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বিনোবাজী গ্রামদান পর্যন্ত এগিয়েছেন, কিন্তু সমগ্র গ্রামের জমি সবাই দিয়ে দিলেও তিনি সেই জমি পুনর্বণ্টন করবেন, না একত্রে কালেকটিভ চাষ করবেন, এ বিষয়ে পরিষ্কার কোন কথা বলেন নি। জমিগুলি আবার ব্যক্তিদের মধ্যে আলাদা আলাদা করে বিলি করে দিলেই সর্বোদয় সমাজ হবে? জমির পুনর্বণ্টন বা রি-ডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড হলেই মস্ত কথা হলো না, অন্ততঃ সমাজতন্ত্রের জবাব তাতে হলো না। তাছাড়া একমাত্র জমিতে গ্রামের সকলের সম্মিলিত অধিকার স্থাপন হলেই নতুন সমাজ গ্রামে প্রাচুর্য্য এনে দিতে পারে না। শিল্পের কথা ভাবতে হবে। গান্ধীজী বলেছেন একমাত্র জমি নিয়ে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে না, এত লোকের কাজ জমিতে নেই, শিল্পের পূর্ণ প্রয়োগ করা দরকার হবে। সম্মিলিত বা কালেকটিভ চাষ বা কালেকটিভ শিল্পোদ্যোগের কথা দূরে থাক, গ্রামদানে প্রাপ্ত জমিতে সমবায় বা কো-অপারেটিভ চাষের প্রবর্তনও এখনও করা হয় নি। একথা ঠিক, সমস্ত গ্রামের জমি পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা ঐ গ্রামদানের ভিত্তির উপর খুবই সহজ হতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ভূদানবাদীরা এখনো নীরব, স্বয়ং জয়প্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত নীরব। যে সমস্ত গ্রাম পাওয়া গিয়েছে সেখানে জয়প্রকাশজী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে চাষে, শিল্পে ও সামাজিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক গ্রাম তৈরী করতে অগ্রসর হচ্ছেন না কেন? সমাজতন্ত্র তেমন ভালো নয়, একদম সর্বোদয় করবেন এই আশা থেকেই কি? সমাজতন্ত্রও চলবে না, একবারে কমিউনিজম্ চাই, এমনি ধরণের অবাস্তব দাবী এটা। বিনোবাজী স্বয়ং বলেছেন যে গঠনমূলক কাজ করার সত্যিকার ভিত্তি এবারে গ্রামদানী গ্রামগুলিতেই তৈরী হয়েছে, এবারে ওখানে প্রাণভরে গঠন কাজ করার মতো উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়া যাবে, কিন্তু সে কাজের তেমন কোন খবর আমরা আজও পাই নি। সমগ্র ভারতে ভূদানের জন্য জমি চেয়ে বেড়ানোর চেয়ে যেখানে গ্রামদান পেয়েছেন সেখানে যদি সর্বোদয় সমাজ কি, তার শিল্প ও বিনিময় কীভাবে হয়, কেমন ধরণের আদর্শ সমাজ তাতে হয়, তা যদি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারতেন এবং তা যদি সত্যি সর্বোদয় হতো, তবে গ্রামের পর গ্রাম পদযাত্রার দরকার হতো না, ঐ দৃষ্টান্ত দেখে সর্বত্রই গ্রামদান হতো।*

* ভূদান আন্দোলন সম্বন্ধে যে আশা ব্যক্ত হয়েছে এখানে, তা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে, দেখা যায়। ভূদান, গ্রামদান ও শেষপর্যন্ত জেলাদান (যেমন কোরাপুট জেলা দান) এসবই স্বপ্নের মতো অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। উল্টে এর মধ্যে অনেক দুর্নীতি ও ছলনাও ধরা পড়ে। শেষপর্যন্ত বিনোবা ভাবেজী নিজেও হয়তো নিরাশ হয়েই বিদায় নিয়েছেন।

যাক্‌ বিনোবাজী বা জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো যাঁরা আদর্শবাদী ও সর্বত্যাগী, তাঁদের মুখ থেকে যদি আমরা সমাজতন্ত্রের কথা না-ও শুনি তাতে ভয় পাবার কারণ নেই। কেন না এঁরা কখনও শোষণমূলক বা অত্যাচারিত সমাজ কায়েম করতে যাবেন না, বা এঁদের মধ্যে কোন কপটতার স্থান নেই। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা আজ ভূদানের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেদের আদর্শের অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করছেন বলে আশংকা হয়। যাঁরা সমাজতন্ত্রে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা কমিউনিষ্ট-সোশিয়েলিষ্টদের আওয়াজ ও পণ্ডিত নেহেরুর সমাজতন্ত্রের আওয়াজে শঙ্কিত হয়ে উঠছেন, তাঁদের দলও আজ ভূদান ও সর্বোদয়ের আড়ালে রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছেন বলে মনে হয়। এঁরাও বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্র কি, ধনতন্ত্র কি, এসব কোন কিছু আলোচনায় আসতে চান না। বিকেন্দ্রীকৃত সমাজতন্ত্র চান কিনা, তারও কোন কিছু আলোচনায় আসতে চান না। বিকেন্দ্রীকৃত সমাজতন্ত্র চান, না ক্ষুদে পুঁজিপতি ও ক্ষুদে মালিকদের বিকেন্দ্রীকরণ চান? মনে রাখতে হবে পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর লোক সংখ্যায় অগণিত, তারা ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কেন্দ্রীকরণকে যেমন ভয় করে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক শিল্পকরণ ও রাষ্ট্রীয়করণকেও তেমনি ভয় করে, ফলে তারা বিকেন্দ্রীকরণের নামে নিজেদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করবেই। সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ও শিল্পীকরণের সঙ্গে রাষ্ট্রীয়করণের সম্পর্ক আছে; কেন না রাষ্ট্র ক্রমশঃ অনেক শিল্প ও পরে বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলে এই রাষ্ট্রীয়করণের ধুম আরও বেড়ে যাবে। তাই এইসব মালিকের দল সে সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এদের পক্ষে সোজা ভাবে ধনতন্ত্র রক্ষিত হোক্‌, তাদের সম্পত্তিতে যাতে হাত না পড়ে, এমন দাবী করা সহজ নয়। তাই তাদের কোন আদর্শের আড়ালে সে স্বার্থকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেই হবে। ফলে বিকেন্দ্রীকরণের নাম করে তথাকথিত গান্ধীবাদী আওয়াজ ওঠাচ্ছে। বস্তুতঃ এই জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণের সাথে গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের কোন সম্পর্ক নেই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি সমাজতন্ত্রের সাথে কেন্দ্রীকরণের সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু সমাজতন্ত্রের রূপ অপরিহার্যরূপে কেন্দ্রীভূত হতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। কেন না যুগোশ্লাভিয়া বিকেন্দ্রীকৃত সোশিয়েলিজমের রূপও দেখিয়েছে এবং আজকের রাশিয়াতেও অনেক বিষয়ে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও মস্ত কথা এই, সোশিয়েলিজম্‌ মানেই সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রীয়করণ নয় এবং রাষ্ট্রীয়করণের পথ ছাড়া সোসিয়েলাইজেশন হতেই পারে না, এমন ধরণের অপরিবর্তনীয় ও অপরিহার্য নিয়মও নেই। কতগুলো বিষয় প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ই রাষ্ট্রীয় করতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। নন-অফিসিয়েল পথেই সমাজ তার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অনেক বিষয়ে গ্রহণ করতে পারে। রাশিয়াতে যেমন কালেকটিভ ফার্মগুলি এখন রাষ্ট্রের সম্পত্তি নয়, কালেকটিভের সদস্যদের সমবেত সম্পত্তি, কিন্তু সেগুলিকে সমস্ত জাতির সম্পত্তিতে কীভাবে পরিণত করা যায় তা নিয়ে রাশিয়াতে স্টালিন জীবিত থাকতেই বিতর্ক উঠেছে। স্টালিনের

চেয়ে বড় কেন্দ্রিকতাবাদের ও রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের পক্ষপাতী আর কে ছিলেন? বস্তুতঃ তাঁর ক্ষমতার লোভটা নাকি আজ রাশিয়াতেই নিন্দিত হচ্ছে। অথচ তিনি হেন ক্ষমতাবান রাষ্ট্রনায়ক স্টালিন Economic Problems of U. S. S. R. নামক পুস্তকে বলেছেন, "These comrades believe that the conversion of the property of the individuals or group of individuals into state property is the only or even the best form of nationalization as Engels quite rightly says in Anti-Duhring. Unquestionably, so long as the state exists, conversion into state property is the most natural-initial form of nationalization. But the state will not exist forever. With the extension of sphere of socialism in the majority of the countries of the world, the state will die away, and of course, the conversion of the property of the individuals or groups of individuals into state-property will lose its meaning. The state will die away, but the society will remain. Hence the heir of the public property will then not be the state, which will have died away, but society itself in the shape of directing economic body."

"এই সমস্ত কমরেডরা মনে করেন যে ব্যক্তির অথবা গ্রুপের বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি জাতীয়করণ করার একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ পথ হলো তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ব্যক্তি ও গ্রুপ-সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা জাতীয়করণের পথ, একমাত্র পথ নয়, শ্রেষ্ঠ পথও নয়, বরং এঙ্গেলস্ 'এন্টিডুরিং' পুস্তকে যা বলেছেন, অর্থাৎ প্রাথমিক পথ মাত্র; সেইটা হলো সত্য কথা। এতে সন্দেহ নেই যে যতক্ষণ রাষ্ট্র আছে ততক্ষণ রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা জাতীয়করণ স্বাভাবিক কায়দা। কিন্তু রাষ্ট্রের চিরকাল অস্তিত্ব থাকবে না। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হলে রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে এবং তখন কাজে কাজেই ব্যক্তি সম্পত্তি ও গ্রুপসম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ করার দাবিটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। রাষ্ট্র বিলীন হবে বটে, কিন্তু সমাজ বেঁচে থাকবে। যে রাষ্ট্র বিলীন হয়ে গেল সে রাষ্ট্র তখন জাতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কিন্তু তখন উত্তরাধিকারী হবে রাষ্ট্রহীন সমাজ, অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রাতা হিসেবে।"

এখানে সি. ডি. এইচ. কোলে-এর 'গিল্ড সোশিয়েলিজমে'র কথাগুলি একেবারে অবাস্তব হবে না। টিটো নির্দেশিত 'ওয়ার্কার ম্যানেজমেণ্ট'-এও এই ঝোঁকটা প্রবল। অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয়করণের একপেশে ঝোঁকের বিরুদ্ধে কোলে-র (Cole) অনেক যুক্তি আছে, Guild Socialism-এর ভাব বা আইডিয়া কতকটা এই প্রেরণা থেকে।

কেন্দ্রীয়করণ জিনিসটা আতঙ্ক সৃষ্টিকারক হয় বেশীর ভাগ এইজন্য যে তার সাথে রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাপারটাও যুক্ত থাকে বলে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার সাথে কেন্দ্রীকৃত শিল্পের ক্ষমতা একত্র হলে রাক্ষুসে শক্তির লক্ষণ দেখা দেবে বলে আশংকা হতে পারে। কিন্তু যদি সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণের সাথে রাষ্ট্রীয়করণ অবশ্যম্ভাবী না হয়, তবে অতটা

ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা যদি একই সাথে কারখানারও কর্তাব্যক্তি হয় তবে ক্ষমতার আত্যন্তিকতা দেখা দিতে পারে এবং হয়তো জনসাধারণের সে ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা কমে যেতে পারে, কিন্তু যদি ভারতের সমাজ-তন্ত্রীকরণের পথে প্রত্যেক ব্যাপারেই রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না থাকে, যদি প্রথম থেকে জনতার নিজস্ব প্রেরণায়, কর্তৃত্বেও নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাধারণ কাজগুলি সম্পন্ন হতে থাকে তবে কেন্দ্রীয়করণের অনেক দোষ সীমাবদ্ধ হতে পারে। এবং গান্ধীজীর ভয়ের কারণগুলি কমানো সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু সে ভয় যতই থাকুক, বাজারে চালু বিকেন্দ্রীকরণবাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁসিয়ার থাকার কারণ আছে, কেন না এরা সমাজতন্ত্রের বদলে বিকেন্দ্রীকরণবাদ চালাতে চান। বস্তুতঃ বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির কোন নিজস্ব এবং মৌলিক নীতি ও ভিত নেই। ওটা একটা নেতিবাচক শ্লোগান মাত্র। এর ভিতরকার ইতিবাচক কথা যদি কিছু থাকে তা হলো পাতিবুর্জোয়া ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল স্থিতা-বস্থার প্রতি মোহ। এরা প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রবাদীই বটে, তবে ক্ষুদে ধনীর দল হলো এরা। এরা ব্যবসা, বাণিজ্য, লাভ ইত্যাদি সব চায়, তবে একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণ চায় না। এরা লাভ, বাজার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি সব কিছুই রাখতে চায়, অথচ ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি অর্থাৎ সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ বা কনসেণ্ট্রেশন অব ওয়েলথ চায় না। এ হলো একটা পাতিবুর্জোয়া আদর্শ। এই পাতিবুর্জোয়া মতবাদের উপর যদি গান্ধীজী বা বিনোবার সর্বোদয় চাপিয়ে দেওয়া যায় তবে তা হবে ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মতো অথবা মেষচর্মাবৃত নেকড়ের মতো। বিনোবা ভাবে অবশ্য পাতিবুর্জোয়া রোগে ভোগেন না, তিনি কতকটা ইউটোপিয়ান-কমিউনিজমে এক্ষুণি লাফিয়ে যেতে চান, তাঁর মধ্যে ছোট অথবা বড় কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই আশ্রয় পাবার কথা নেই, কিন্তু পাতিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়া ধনপতিরা চারিদিকে সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি ও ক্রমবর্ধমান দাবী দেখে, এমন কি নেহেরু-কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক দাবীতেও শংকিত হয়ে বিকেন্দ্রীকরণ কথাটায় আশ্রয় খুঁজছেন। শোষণহীন সর্বোদয় সমাজের ধ্বনিটাকে তাই এমন পরিষ্কার করতে হবে যাতে এতদ্বারা সুবিধাবাদীদের আশ্রয় না মেলে এবং তা করতে হলে শোষণহীন সর্বোদয় সমাজ ও বিকেন্দ্রীকরণের দাবীর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্কটা কি তা পরিষ্কার করে বলতে হবে, দেখাতে হবে তার অর্থ সমাজতন্ত্রই, এবং তার অর্থ ইচ্ছামতো কর্তিত বা বর্ধিত করা চলে না। অতএব গান্ধীবাদীদের, প্রকৃত গান্ধীশিষ্যদের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সলজ্জ থাকলে চলবে না, সমাজতন্ত্রের পথে ছাড়া গান্ধী আদর্শের সার্থকতা সম্ভব নয়, এবং তাহলেই সমাজতন্ত্র যেমন গান্ধীকে গ্রহণ করে অনেক বিষয়ে সমৃদ্ধতর হবে, তেমনি গান্ধী-বাদও সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে সমৃদ্ধতর হবে। এই দুই মতবাদ পরস্পরকে বিরোধিতা করলে উভয়েরই ক্ষতি হবে এবং সহযোগিতা করলে উভয়েই লাভবান হবে।

আবার একদল নীতিবাদী বিকেন্দ্রীকরণপন্থী আছেন যাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রীয়-করণের যেমন দরকার নেই তেমনি সমাজতন্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। মানুষকে যদি এমন নীতিবোধের উপর দাঁড় করানো যায় যে আইনের শাসন বা অবস্থার বাধ্য-

বাধকতার দরকার নেই, তবে নৈতিক সীমানা মেনে নিয়েই যতটুকুই দরকার ততটুকু গ্রহণ করবে, সংব্যবসা করে ন্যায্য লাভ নেবে, অতিলোভ করবে না বা উচ্চতম লাভ বা মেক্সিমাম প্রফিট করতে যাবে না। তাঁরা বলেন, সমাজতন্ত্রও নাকি শেষপর্যন্ত নৈতিকতার সীমা নিয়ন্ত্রিত। অথচ মজার কথা এই, এঁরা ব্যক্তির নৈতিকতায় বিশ্বাসী কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত রূপ বা রাষ্ট্রের নৈতিকতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁরা একথা খেয়াল করেন না যে নীতিবোধটা আসলে একটা সামাজিক ব্যাপার। যে জঙ্গলে বাস করে, সমাজে থাকে না, তার কোন নীতির দরকার নেই। সামাজিক প্রয়োজন দিয়েই, সমবেত মানুষের স্বার্থেই নীতির উদয় হয়, মাপ হয়, আদর্শ সৃষ্টি হয়। একক মানুষের কোন নীতির বালাই নেই। কাজেই সমাজ যদি নীতির জন্মদাতা, তবে সমাজের যেটা সমষ্টিগত রূপ, অর্থাৎ রাষ্ট্র তার নীতিবোধে এত আশংকা করার মানে? রাষ্ট্রের, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনকানুন এই নীতিকেই কায়েম করার হাতিয়ার মাত্র। ধনীর রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদীর রাষ্ট্র সকল প্রকার আইনে মানবিক নীতি রক্ষা করে না, একথা সত্যি, তারা শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই নীতি তৈরী করে, এ-ও সত্য; কিন্তু তাদের পক্ষেও কতগুলি সর্বসাধারণের হিতের জন্য নীতি মানতে হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক-রাষ্ট্র অথবা গান্ধী নির্দেশিত রাষ্ট্রে যে আইনকানুন হবে তা প্রকৃত নীতি সমর্থিতই হওয়া উচিত। আসলে এই সব নীতিবাদী বিকেন্দ্রীকরণওয়ালাদের বক্তব্যটা অতি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এরা নীতি কি এবং তার শক্তি কোথায়, সে সম্বন্ধেও স্বচ্ছ দৃষ্টিবান নয়। তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র, সমাজ, আইনকানুন নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা, এসবের কোন কিছু দরকার করে না। তাঁদের freedom বা স্বাধীনতা দিয়ে দাও, তারা তাঁদের ব্যবসায় ও লাভালাভ করার ক্ষমতায় দিব্যি দৌরাত্ম করে বেড়াক। তাঁদের মতে সমাজের ব্যক্তিরাই বেশী নির্ভরশীল, এরা হলেন ব্যক্তিবাদী বা individualist-Philosophical Anarchism-এর ধুয়ো তুলে এঁরা ব্যক্তির যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দাবী করেন।

অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র (Economics & Ethics)

অর্থনীতিবিদদের গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, গান্ধীজী অর্থনৈতিক নিয়মের স্বাধীনতা স্বীকার করেন না, তিনি অর্থনীতিতে নীতিশাস্ত্র বা এথিক্স্ এনে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। অর্থনীতির একটি নিজস্ব নিয়ম আছে, তার আইনকানুন, অবজেক্টিভ, লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো-মন্দ জ্ঞান সামান্যই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, দরদাম, মূল্য, লাভলোকসান, মন্দা, সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির উপর নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতার কোন হাত নেই বরং নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতাকে অবজেকটিভ অর্থনীতির আইনকানুনের শাসন মেনে চলতে হবে। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে এই কথা মানতে হয়, বিশেষকরে ধনতান্ত্রিক যুগে অর্থনৈতিক নিয়ম অত্যন্ত স্বৈরাচারী, কোন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার উপর সমাজের কোন নিয়ন্ত্রণ তার থাকে না, অন্ধ নিয়মের নিয়তির মতো তা ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। মার্কস্ ধনতন্ত্রের ভিতরকার এই

অন্ধতা দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, যতদিন ধনতন্ত্র থাকবে ততদিন সমাজের অর্থনীতির উপর সমাজের প্রত্যক্ষ ও সচেতন নিয়ন্ত্রণশক্তি কায়েম হবে না, কিন্তু সমাজতন্ত্রে অর্থনীতি পরিকল্পিত উপায়ে সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজতন্ত্রে উপস্থিত হলেও অর্থনীতির অবজেকটিভ-আইন ও শক্তি নিঃশেষিত হয় না, তখনও অর্থনীতির কানুন স্বাধীনভাবেই থাকে, তবে তার সঙ্গে মানুষের সচেতন চেষ্টার কোন সংঘাত বা বিরোধিতা ঘটে না, তার ভিতরকার স্বৈরাচার বা এনার্কি নষ্ট হয় এবং মানুষের পরিকল্পনা সচেতন নিয়ন্ত্রণে কায়েম হয়, অর্থাৎ মানুষ অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব আয়ত্ত করতে পারে। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আয়ত্ত করতে পারলেও অর্থনৈতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে পারে, তা নয়।

সে যাই হোক, ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির পণ্ডিত ও সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ, উভয়দলই অর্থনীতিতে নীতিশাস্ত্রের বা এথিক্‌সের প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নন। ধনতন্ত্রবাদীরা তো সে দাবি মোটেই গ্রাহ্য করেন না, এবং করতে পারেনও না। তবে আমরা দেখাবো, সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতির পণ্ডিতেরা নৈতিকতা বা নীতিশাস্ত্রকে কার্যতঃ অস্বীকার করতে পারে না। সামন্ততন্ত্রের ও ধনতান্ত্রিক যুগে যে সমস্ত হৃদয়বান ধর্মভীরু নেতা এসেছেন, তাঁদের নৈতিক দাবি সেই সব সমাজে কার্যকরী হয় নি। ন্যায়, সততা, দয়া, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যেসব আবেদন তাঁরা করেছেন ধর্মের নামে, ভগবানের নামে, যীশুর নামে, বুদ্ধের নামে, রামকৃষ্ণের নামে—সেসব মোটেই কার্যকরী হয় নি। এই নৈতিকতার আবেদন ও ধর্মীয় আবেদন ব্যর্থ হয়েছে বলেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্কসবাদের অস্ত্র ও ঝাণ্ডা নিয়ে পৃথিবীর নিপীড়িত জনতা নিজেদের মুক্তি ও অধিকার কায়েম করতে অগ্রসর হয়েছে। কেন না তারা দেখেছে আবেদন নিবেদন যেমন ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ নীতি ধর্ম, বিবেকের ও ভগবানের দোহাই। মার্কস এসে দেখালেন যে নীতির কথা, ধর্মের কথার কোন দাম হলো না, হতে পারে না ; যে অর্থনৈতিক নিয়মের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এই দারিদ্র, অনাচার, অশান্তি, যুদ্ধ এসেছে, সেই অর্থনৈতিক শক্তির আরও বিকাশের পথেই ঐসব অনাসৃষ্টি দূর হয়ে যাবে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে মানুষের নীতির রাজ্য কায়েম হতে পারে। কাজেই মানুষের মুক্তির চাবিকাঠি নীতিশাস্ত্রে নেই, আছে অর্থনীতিতে এবং সেখানেই সমস্ত আঘাত ও মনোযোগ নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম, নীতি, বিবেক ইত্যাদির সাধনা করলে কোন ফল হবে না, বরং মানুষের দৃষ্টিভ্রম হবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে মাত্র। এই যুক্তির সারবত্তা প্রথমে রাশিয়ার বিপ্লবে প্রতিপন্ন হয়ে যাওয়াতে মার্কসবাদী মহলে নীতিটিতি নিয়ে আর কেউ কোন কথা তুলতেই উৎসাহী নয়, এবং তারাও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের মতো অর্থনীতিতে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতার স্থান দিতে প্রস্তুত নয়। তার উপর দরিদ্র জনসাধারণের বাস্তব অবস্থাটায় ভালো থাকাটা এতো বেশী প্রয়োজনীয় (মেটিরিয়াল ওয়েলবিয়িংটা এত প্রেসিং নেসেসিটি) হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সেখানে নীতির কথাটা অবান্তর কথার মতো শোনায়, এবং শাসকশ্রেণী ধর্ম ও নীতির উপদেশ দিয়ে সমাজের বর্তমান

অবস্থায় সকলকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে চেষ্টা করে থাকেন তাতে নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনপ্রকার ভক্তি তো থাকতেই পারে না বরং বিদ্বেষই গজাতে থাকে।

এ হেন বিদ্বেষ ও বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য করেও এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা দেখেও গান্ধীজী কখনো নীতির কথা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর মতো একগুঁয়ে ও সাহসী লোক পাওয়া বিরল, সস্তা বাহবা ও চলতি কথায় বা চলতি ফ্যাশনে সায় দিয়ে তাঁর নিজের পথকে কখনো একটু সহজ করতে চেষ্টা করতেন না, তাঁর যা বিশ্বাস, তা বললে যদি দুনিয়ার শিক্ষিত সমাজ, বিজ্ঞানী সমাজ, অর্থনীতি-রাজনীতির সমাজ মহল তাঁকে ঠাট্টা করেন এবং ছেলের দল তাঁকে দুয়ো দিতে থাকে, তার দিকে গান্ধীজীর ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি তখন আরো জোরের সঙ্গে সেকথা বলতে থাকতেন, যদিও তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে। তিনি অর্থনীতিতে নীতিজ্ঞান আনবেনই আনবেন। তাঁর কাছে বিজ্ঞান বড় কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তারও উপরে আছে জ্ঞান বা ধর্ম। অর্থনীতিশাস্ত্র যত বড় শাস্ত্রই হোক, তাকে কখনো তিনি নীতিশাস্ত্রের উর্ধে স্থান দিতে প্রস্তুত নন। তাঁর কাছে, পূর্বেই দেখিয়েছি, নীতির জীবন, ধর্মের জীবন, সাধারণ জীবন ধারণের চেয়ে আলাদা নয়। মানুষকে তিনি খণ্ড খণ্ড করে দেখেন নি, সপ্তাহের অন্যান্য বারের মানুষ এক ধরণের মানুষ আর রবিবার দিনের মানুষ ধর্মের বা গীর্জার মানুষ, এরকম কথা তিনি স্বীকার করেন না, সেরকম ধর্ম তাঁর কাছে আত্মপ্রতারণা ও ভণ্ডামী মাত্র। জীবনের কাজগুলিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জলস্পর্শবিহীন ওয়াটার টাইট কক্ষে কক্ষে আলাদা করতে প্রস্তুত নন। কাজে কাজেই প্রচলিত বাজার, ব্যবসায়, উৎপাদন, বণ্টন, লাভলোকসান, দরের ওঠানামা ইত্যাদির নৈর্ব্যক্তিক স্বাধীনতা মানতে প্রস্তুত নন। এই অদ্ভুত দাবি সবাই মানতে রাজি নয়, গান্ধীজীর এটা একটা প্রিয় ধারণা মনে করে বা fad মনে করে তাঁর অনুগামীরাও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য কতকটা সহ্য করতেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর নৈতিক-অর্থনীতির আইনকানুন মানতেন না। যেমন একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি। তিনি দেখলেন চরকা কেটে দৈনিক আয় দু' আনা, দশ পয়সার বেশী হচ্ছে না এবং চরকার সুতো ও কাপড়ের উপরও ফড়েদের ব্যবসায় চলছে। তিনি বিরক্ত হলেন, চিন্তিত হলেন, কেন না চরকায় সারাদিন কাজ করে যদি একটা লোকের গ্রাসাচ্ছাদনও না হয় তবে তো সেটা অত্যাচার বিশেষ। তিনি হুকুম দিলেন চরকা সঙ্ঘ ও এ. আই. ডি. আই. কে যে, চরকা কাটার দৈনিক মজুরী কমসে কম আট আনা দিতেই হবে। অনেকেই মাথায় হাত দিলেন, সে কি করে হবে, এতো মজুরী কোথা থেকে আসবে, ঘাটতি টাকা কি করে সংকুলান হবে; গান্ধীজী বললেন, কোন ওজর আপত্তি চলবে না, তাতে ঘাটতি পড়ুক আর যাই পড়ুক। তাতে খদ্দরের দাম অসম্ভব বেড়ে গেলো। তাঁর অনুগামীরা ভয় দেখালেন, এতো দাম দিয়ে খদ্দর বিক্রি হবে না, মিলের কাপড় সস্তা, গরীবেরা খদ্দর কিনতে পারবে না, সাধারণ লোকেরা মিলের কাপড় পরবে, খদ্দর বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া অর্থনীতিবিদরা দেখালেন যে এ এক আজগুবি হুকুম। সস্তায় মিলের কাপড় কিনবার মৌলিক অধিকার জনসাধারণের আছে ইত্যাদি। কিন্তু

গান্ধীজী বিচলিত হলেন না, তাঁর সিন্ধান্ত থেকে সরলেন না, খদ্দরের দাম চড়েই রইলো। আজও খাদি বোর্ডকে ঘাটতির উপরেই চলতে হচ্ছে। গান্ধীজীর আদেশ ও সারা জীবনের এই খদ্দর প্রচার আজকের ভারত সরকার এখনো অস্বীকার করেন নি। বছর বছর কয়েক কোটি টাকা খাদি বোর্ডকে সাবসিডি বা ভর্তুকী দিয়ে যাচ্ছেন ভারত সরকার। তাছাড়া অম্বর চরকা প্রবর্তন করার জন্য সরকারকে কয়েক শত কোটি টাকা খরচ করার কথাবার্তা চলেছে। কথা হচ্ছে, গ্রামের গরীবদের রুজি-রোজগারের জন্য, তাদের কাজ জোটাবার জন্য সাধারণের তহবিল থেকে এত টাকা ভর্তুকী কতকাল দেওয়া যায় এবং এর কোন অর্থনৈতিক সার্থকতা আছে কি? প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বিনাদ্বিধায় তা 'দূত্তোর ছাই নীতিশাস্ত্র' বলে এক্ষুনি তা বন্ধ করে দিতে বলবে এবং কাপড়ের কলকেই একমাত্র কাপড় তৈরী করতে হুকুম দেবে। এমনি ধরণের নৈতিকতার বা এথিক্সের দাবি গান্ধীজী সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত করতেন। আবগারী শুল্ক থেকে সরকারের হাতে সহজে টাকা আসে এবং যত সহজে টাকা আসে এবং যত প্রচুর পরিমাণে আসে, তা এমন আর কিছুতেই হয় না। অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কাজে কত শত কোটি টাকার দরকার, ট্যাক্সও আর বাড়াবার যো নেই, কিন্তু গান্ধীজী বলবেন যে, মদ খাইয়ে লোককে শিক্ষিত করার চেষ্টা পাপ বিশেষ, বরং শিক্ষা দু'বছর পরে হবে, লোকের চরিত্র নষ্ট করে শিক্ষা চলবে না। জুয়াখেলার টাকা দিয়ে, ঘোড়দৌড়ের আয় দিয়ে দেশ তৈরী করার মধ্যে তিনি নেই, ইত্যাদি।

এমনি করে গান্ধীজী অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতার "জুলুম" এনে দিয়েছেন। গান্ধীজীকে কেউ অর্থনীতিবিদ বলবেন না, অথচ গান্ধীজীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহজাত আবেগ (ইসাইট ও ইনসটিংট) এমন স্বচ্ছ ও আশ্চর্যজনক ছিল যে তাঁর বেয়াড়া নৈতিক-অর্থনীতি বা নৈতিক-রাজনীতির প্রভাব থেকে দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও দেশনায়কেরাও মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর বালসুলভ কথাবার্তা সত্ত্বেও তাঁর কথার যেন মূল্য থাকতোই থাকতো, যা বাস্তবে দেখা যেতো আজগুবি নয়, যত আজগুবি প্রথমটায় মনে হয়। তাকে দূর-ছাই করে সরিয়ে দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি। কুটিরশিল্পের দাবি ও তার প্রয়োজন আজও অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি, সে কথার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। ফলে এই বুড়োকে আজও তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরেও একেবারে জমিতে কবর দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু কেন? কেন এই বুড়ো মরেও মরছেন না, কেন পৃথিবীর লোক, এমন কি রাশিয়ানরাও আজ তাঁর অনেক কথার মূল্য নতুন করে দিতে শুরু করেছে? এই ধাঁধাটা বুঝতে হবে। এটা কেবলমাত্র একটা লোকের প্রতি হৃদয়াবেগ বশতঃ শ্রদ্ধা দেখানো নয়, এর তাৎপর্য তারও চেয়ে বাস্তব ও গভীর। আমরা এর কারণ ব্যাখ্যা করবো।

এই যে গান্ধীজী বাঙাল বা অজ্ঞের মতো যেন এক একটা কথা বলতেন বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে, অর্থনীতির প্রচলিত গুরু গম্ভীর শব্দের পরিবর্তে সহজ শব্দ ব্যবহার করতেন, এই থেকে কারো ধারণা করা উচিত নয় যে গান্ধীজী অজ পাড়াগেঁয়ে

লোক ছিলেন। মনে রাখতে হবে তিনি ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টার। ব্যবসায়, বাণিজ্যে ও আধুনিক অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তত্বগত জ্ঞান কিছু কম ছিল না। জগতের সব রকম চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁকে অনবরত সংঘাতে আসতে হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সাথে তাঁকে টক্কর দিতে হয়েছে। সেই মানুষটি নেংটি পরে বেড়াতেন বলেই মূর্খ ছিলেন বা জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, এমন হঠকারী কথা আশাকরি কেউ বলবেন না। তাছাড়া মার্কসবাদীদল, পণ্ডিত ও আদর্শের সাথেও তাঁর প্রতিযোগিতা চলতো। পণ্ডিত নেহেরুর মত সমাজতন্ত্রবাদী ও আধুনিক বিজ্ঞানবাদী প্রগতিশীলের সাথেও তাঁর অহরহ ঘাতপ্রতিঘাত চলতো। বামপন্থী দলগুলির সাথেও'। জাতির পিতা বলে তাঁকে কেউ ছেড়ে কথা বলতেন না। এ হেন জ্ঞানবিজ্ঞানের সমরক্ষেত্রেও তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, "I venture to think that the scriptures of the world are far safer and sounder treatises on the laws of economics than many of the modern text books." (Lecture before Muir Central College of Economic Society of Allahabad.)

"আমি সাহস করে বলছি অর্থনীতির আইন সম্বন্ধে আধুনিক পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা জগতের ধর্মগ্রন্থগুলি বেশী জ্ঞানবান ও বেশী নির্ভর যোগ্য।" তিনি যীশু সম্বন্ধে বলেছেন—"He is himself the greatest economist of his time." "যীশু তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ছিলেন।" গান্ধীজীর আবার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হলো তাঁর পুরোনো শব্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। পুরোনো একটি শব্দকে তিনি সহজে ছাড়তেন না। প্রয়োজন মতো তাঁর অর্থকে বদলে দিতেন। কিন্তু শব্দটা ঠিক রাখতেন। এটা তাঁর ধর্মপ্রবণতা থেকে এসেছে। বৈজ্ঞানিকতা তাঁর মধ্যে অনেক ছিল, সে কথা আমরা বলেছি। তিনি কোন জিনিষকে বিনাযুক্তিতে গ্রহণ করতেন না, পুরোনো কথা বলেই তার প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধা যেমন ছিল না, আবার হাল আমলের কথা বলেই শ্রদ্ধা তাঁর আসতো না। যা কিছু তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য হতো না তিনি তক্ষুনি তা বর্জন করতেন। তাই হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুই তিনি ত্যাগ করেছিলেন, যেমন জাতিভেদ, অছ্যুৎ, বাল্যবিবাহ, বালবৈধব্য ইত্যাদি। সত্য ও অহিংসা ছাড়া তিনি অন্য কোন জিনিষকে সনাতন বলে মনে করতেন না। তাহলেও সেই পুরাতনের মধ্যেই তিনি নতুন অর্থ করে নিতেন। স্বকীয় অর্থ করতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। যেমন গীতার মত একটা লড়াই করার শাস্ত্র। যা যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে উৎসাহ দিচ্ছেন, তাকেও তিনি তাঁর ব্যাখ্যা মত অহিংসার প্রধান পুস্তক হিসেবে প্রচার করে ছাড়লেন। গীতার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি নিজেকে সোসালিষ্ট বলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলতেন যে তিনি গীতা থেকে সোসিয়েলিজম্ পেয়েছেন, সেই একটি মাত্র শ্লোক থেকে যেখানে অপরিগ্রহবাদের কথা আছে। কেন না তাঁর মতে অপরিগ্রহবাদকে মানতে হলে ব্যক্তিগত ভোগসম্পত্তি রাখা চলে না, তাকে সোসালিষ্ট হতেই হয়। এইভাবে রক্ষণশীল বা কনসারভেটিভ ও বিপ্লবী বা রিভলিউশনারী এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি তাঁর ভিতর একই সাথে

কার্যকরী ছিল। মূলতঃ তিনি প্রগতিবাদীই ছিলেন, কেননা তিনি জনসাধারণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে ইতিহাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতেই হ'তো। কিন্তু তিনি পুরোনো কথার মধ্যেই নতুন সুরটা ফুটিয়ে তুলতেন। ফলে অনেক সময় তাঁর কথা বোঝা মুশকিল হতো, বিশেষ করে তাদের, যারা আধুনিক প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গেই পরিচিত।

যাই হোক, এখন আমরা আসল প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ কেন গান্ধীজীর নীতি কথা ও নীতির দাবি এখনও অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। সোসালিষ্ট বা মার্কসবাদীরা যতই কেন না বলুক যে তারা অর্থনীতিতে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতার স্থান দেননা, তা হলেও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে একথা অবশ্য সত্য যে Capitalist Anarchy ও blind economics-এ morals বা মানুষের সদিচ্ছার স্থান সম্ভব হয় না। কেননা, সেখানে products govern the producers। কিন্তু সোস্যালিষ্ট সমাজে সে নিয়ম নয়। সোস্যালিষ্ট সমাজ আসা মাত্র মানুষই কর্তা হয়, অর্থাৎ Producers govern products-এই নিয়ম আসতে থাকে। কাজেই সমাজ যখন সচেতনে ও সজ্ঞানে পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদন ও বণ্টন চালু করে তখনো কি মানুষের ethical বা moral কথাটা আসে না? তখন মানুষ তার প্রয়োজনগুলি বিচার করার সময় তার নীতিজ্ঞানকে ব্যবহার করে না? নিশ্চরই করে। বরং তখনই মানুষ নীতিজ্ঞান দিয়েই তাদের পরিকল্পনাকেও নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। সমাজতন্ত্রও চালু হবার পরে তো করেই, এমন কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরমুহূর্তেই, সমাজতন্ত্র চালু করার মুখেই তাদের নীতিশক্তিটাই প্রধান শক্তি হতে বাধ্য হয়। কারণ যখন বিপ্লব হয়, ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ে। শ্রমজীবী শোষিত শ্রেণীরা রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়, তখনই তো আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম হয় না, বরং তখনও সমাজে ধনতন্ত্রের নানা জিনিষই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তখন বিপ্লবী শ্রেণী তাদের নতুন বৈপ্লবিক নীতি আদর্শের জোরেই নতুন সমাজ গড়তে লেগে যায়। তখন ideas, politics, morals-ই হলো প্রধান শক্তি, যার সাহায্যে নতুন অর্থনীতি গঠন করা হয়। অতএব এই দিক থেকে দেখতে গেলে socialist era যত এগিয়ে আসছে নীতিবোধ তত তীব্র হয়ে উঠছে। জনসাধারণের মধ্যেও অন্যায় ও অত্যাচার বোধ তত সজাগ হয়ে উঠছে এবং এঙ্গেলস্ একদা বলেছেন, যখনই দেখবো প্রচলিত জনমানসে কোন প্রথা সম্বন্ধে ধিক্কার উঠেছে তখনই বুঝতে হবে, সে সমাজের নৈতিক পতন ঘটেই গিয়েছে, কেবল বাস্তব পতনের অপেক্ষা মাত্র। এ হেন সময়ে জনমানসে নীতিবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। আগে যা খেয়াল হতো না, আগে যে-সব অন্যায় লোকে দেখেও দেখতো না, তখন তা অসহ্য হয়ে ওঠে। আগে যীশুর কথা, সাম্যের কথা বিবেকের কথা, ধর্মের দোহাই, কোন সার্থকতা, কোন সাড়া জাগাতো না। কিন্তু আজ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অবসানের যুগে ও সমাজতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজের আগমনের যুগে গান্ধীজীর নীতির কথা, বিবেকের কথা আজ তাই আর একটা মিথ্যা আফশোষ বা অলীক কল্পনা বা অবাস্তব utopia বলে মনে হয় না। আজ বুদ্ধের শান্তির কথাও

নতুন করে সবার ভাবনালোকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এবং এটা নেহাৎ revivalism-এর প্রেরণা থেকেই আসেনি। আজ যাবতীয় নৈতিক utopia বাস্তব রাজনীতির সমান্তরালে এসে উপস্থিত হয়েছে। ফলে গান্ধীজীর নৈতিকতা ও মার্কসের বস্তু-তান্ত্রিকতার মধ্যে একটা পরস্পর আকর্ষণ ঘটেছে। তাই গান্ধীজীর অবাস্তব বা absurd দাবি আর তত absurd মনে হচ্ছে না। গান্ধীজী বলেছেন,

"True economics never militates against the highest ethical standard, just as all true ethics to be worth its name must at the same time be also good economics. An economics that inculcates mammon-worship, and enables the strong amass wealth at the expense of the weak, is a false and dismal science. It spells death. True economics, on the otherhand, stands for social justice, it promotes the good of all equally including the weakest, and it is indispensable for decent life."—(Harijan, 9.10.37)

পূর্বের উল্লিখিত উদাহরণ থেকেই এই কথাটি বুঝবার চেষ্টা করা যাক। অর্থাৎ চরকার সুতো কাটা বা যে কোন কায়িক শ্রমকে বাজার দরের বাইরেও উচ্চ মূল্য দেবার দাবি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র স্বীকার করে কিনা দেখা যাক্। গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ ডঃ বি. কুমারাপ্পা একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতির একটা জটিলতত্ত্ব সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন রাশিয়াতে দ্রব্যের মূল্য এত বেশী কেন, সেখানে জামা, জুতো, কাপড় ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এতো বেশী দেখে অনেকেই, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক দেশের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যান। এবং তারা দেখাতে চান যে রাশিয়াতে নিদারুণ কষ্ট চলেছে; জিনিষপত্রের দাম খুব বেশী। অথচ প্রকৃতপক্ষে রাশিয়াতে জিনিষপত্র কম তৈরী হয়, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। যদি তাই করতো তবে সমাজতন্ত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন হতো। কারণ উৎপাদিকা শক্তির মুক্তির প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্র, যদি উৎপাদনই না বাড়ে তবে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন কি? ডঃ কুমারাপ্পা দেখিয়েছেন এটা হলো রাশিয়াতে equality (equal pay for equal work and according to his work.)-র মূল্য। তিনি দেখিয়েছেন, To each according to his work এইটাই একমাত্র law—আইন নয়, যদি একমাত্র socialist law of distribution হতো তবে তা capitalist ধনতন্ত্রী বা ক্যাপিটেলিষ্টরাও দাবি করতে পারে। কারণ ধনতন্ত্রবাদিরাও বলেন যে, তাঁরাও যার যতটা কাজ, সেই মতই বেতন ও মজুরী দিয়ে থাকেন। যে বেশী কাজ করে সে বেশী পায়। কিন্তু একথাতে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি আছে, তা হলো সর্বনিম্ন পাওনাটা কি? নিম্নতম পাওনার উপরে অবশ্য যে যত বেশী কাজ করবে, সে তত বেশী মজুরী পাবে, একথা ঠিক। এই ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হয়তো একই নীতি গ্রহণ করছে। নিম্নতম হারটির বেলায়ই যত মার-প্যাঁচ। ধনতন্ত্রের যদি নিম্নতম মানটি হয় ত্রিশ টাকা, সমাজতন্ত্রের মানটি হবে এক শত টাকা, এই যা তফাৎ। ধনতন্ত্র ত্রিশ টাকায় নিম্নতম মান করছে, আর সমাজতন্ত্র একশত টাকায় কেন? তার

কারণ, ধনতন্ত্রের কোন নীতিবোধ নেই, সবচেয়ে বেশী লাভ ছাড়া তার অন্য কোন চেতনা নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্রের নীতিবোধ আছে, সেখানে লাভটা বড় কথা নয়। উৎপাদকের সবচেয়ে বেশী পরিতৃপ্তি বা maximum satisfaction of producers হলো সমস্ত কাজের প্রেরণা। কাজেই সেখানে নীতিবোধ দিয়েই সেই মানদণ্ড সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত না হোক, প্রচুরভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না এইজন্য যে, যেহেতু অর্থনৈতিক ক্ষমতার হিসেব করতে হচ্ছে, সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা যে পরিমাণে বাড়ছে, সেই পরিমাণে নীতিরই উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকারও এসে যাচ্ছে। তাছাড়া নীতিবোধ আর এক দিক থেকে তার অধিকার প্রসার করছে, তা হলো dignity of labour বা কায়িকশ্রমের সমান ইজ্জত বা মর্যাদাজ্ঞানের মধ্য থেকে। বলাবাহুল্য শ্রমজীবীরাজে শ্রমের ইজ্জত বা মান শ্রেষ্ঠ হতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রে কায়িক-শ্রমের মর্যাদা মানসিক শ্রমের চেয়ে কম হবে না। এই মর্যাদা কেবল মুখের কথা অথবা চোখের লজ্জা ও সম্মান দিয়েই পুরস্কৃত হবে না, তার একটা অর্থনৈতিক অধিকারও থাকতে হবে। অর্থাৎ কায়িক শ্রমের মূল্য বাড়িয়ে দিতে হবে, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের পার্থক্য অনেকটা দূর করতে হবে, দেনাপাওনার দিক থেকে। যদিও রাশিয়াতে মার্কসবাদের মতে একজন সাধারণ শ্রমিকের দাম একজন দক্ষ কারিগরের চেয়ে কম। কারণ দক্ষ কারিগরের উৎপাদিকা শক্তি বেশী, কিন্তু সেখানে দক্ষ মুচির অধিকার একজন অধ্যাপকের চেয়ে কম হবে, এমন নীতি নেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমের মর্যাদা দানের দিক থেকে নয়। অথচ এখানেও এই নিয়ম সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্র দিয়েই তৈরী, যদিও মস্তিষ্কজীবীর মূল্য ওস্তাদ কারিগরের ঠিক সমান হবে কিনা, এই নিয়ে তর্ক থাকতে পারে socialist era সমাজতান্ত্রিক যুগে পর্যন্ত, কিন্তু কমিউনিজম যখন আসবে তখন প্রত্যেকের পাওনা তার মূল্য দিয়ে হবে না, হবে প্রয়োজন দিয়ে, to each according to his needs। তখন সমস্ত শ্রমের মূল্য-পার্থক্য দূর হতে বাধ্য। আজও অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক যুগে রাশিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের বেতনের হার নিয়ে অনেক তর্কের ও তারতম্যের অবকাশ হয়তো আছে, কিন্তু রাশিয়াতে যে পরিমাণ কমিউনিজম অগ্রসর হতে থাকবে, প্রাচুর্যের মধ্যে সমান অধিকার সম্পূর্ণ-রূপে কায়েম হতে থাকবে। তাই ডঃ কুমারাপ্পা দেখিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে forces of equality খুব (এক্টিভলি) জোর কাজ করছে। ফলে একজন দক্ষ মুচির আয় একজন অধ্যাপকের চেয়ে বেশী কম হতে পারছে না। তাই তিনি দেখাচ্ছেন যে যদি একজন অধ্যাপককে মাসিক তিনশত টাকা দিতে হয়, তবে সেই দক্ষ মুচিকেও তিনশত টাকা দিতে হবে এবং তা যদি দিতে হয়, তবে জুতোর দাম বাড়তে বাধ্য। কারণ যদি মুচিমহাশয় মাসে পনেরো জোড়া জুতো তৈরী করতে পারেন, তবে জুতো তৈরীর অন্যান্য মালমশলা খরচ বাদে প্রতি জোড়া জুতোর বিশটাকা করে মজুরীর খরচই হতে বাধ্য (১৫ × ২০ টাকা বা ৩০০ টাকা)। ফলে জুতোর দাম খুব বেশী হচ্ছে, এমনি করে যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যমান রাশিয়াতে বেশী। আবার সকলেরই আয় বেশী বলে কারো কাছে তা বোঝা হচ্ছে না। অবশ্য রাশিয়াতেও জিনিষপত্রের দাম কমে যাচ্ছে, তার কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতির বহুল

ব্যবহার হেতু উৎপাদন যে পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে তাতে সেই পরিমাণে জিনিষপত্রের দামও কমে আসছে। মোটকথা, এই equality ও dignity of labour ও maximum wage-এর দাবিগুলি সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করতে হয়। ফলে, সকলেরই যাতে পোষায় এমন মজুরী দিতেই হবে। এখানে লাভালাভের কথা নেই, অন্ততঃ মুনাফার স্থান নেই, এখানে একটা প্রকাণ্ড নীতিবোধও কাজ করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি চরকার মজুরী ও গান্ধীজীর হুকুমে নিম্ন মজুরীকে বাড়িয়ে দেবার কথাটা আবার বুঝবার চেষ্টা করি, তবে দেখা যাবে যে গান্ধীজী সত্যিই নীতির কথা তুলে কোন অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু প্রস্তাব করেননি। এই দাবিকে যদি অবাস্তব বলতে হয় তবে গোটা সমাজতন্ত্রটাই একটা অলীক কথা। এটাকে যদি নীতি-বাগিশতা বলা হয় তবে সোসিয়েলিজমও তাই। এই থেকেই বুঝতে শক্ত হবে না যে সোসিয়েলিষ্টরা ও মার্কসবাদীরা যতটা নীতিবিরোধী বলে নিজেদের মনে করেন, ততটাতো নয়ই, তাঁরা নিজেরাও জানেন না যে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে ও কর্মপন্থার মধ্যে নীতি-বোধটাই প্রধান সম্বল ও শক্তি।

দেশ সমাজতন্ত্রের অন্তর্গত হওয়া মাত্র এই সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধ আরো প্রবল হয় এবং যাবতীয় পরিকল্পনা ও উন্নতির প্রোগ্রাম নীতিশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যাতে লাভ হয়, এমন শিল্প নিয়েই মেতে থাকে না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বরং প্রচুর ক্ষতি হয় এমন বহু কাজকেও প্রধান কাজের অন্তর্গত করতে হয়। লাভ হয় না, এমনি বহু কাজও করতে হয়। যেমন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে এদেশে বছরে দুইশত কোটি টাকার দরকার, অথচ এতে লাভ হয় না, কিন্তু সমাজতন্ত্রকে তাই করতে হবে। আফিঙের চাষ মস্ত লাভজনক হলেও তা বন্ধ রাখতে হবে। মদের ব্যবসা করে খুব লাভ থাকলেও তা বন্ধ করে দিতে হবে। এইভাবে আমরা দেখছি যে মুহূর্তে আমরা সমাজতন্ত্রে পা দিলাম, সেই মুহূর্তে আমাদের অনেক নীতির জুলুম মেনে চলতে হবে। কেননা অর্থনীতির অন্ধশক্তির উপর মানুষের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব কায়েম হবে, এনার্কি বা স্বৈরতন্ত্র-স্বৈরাচার বন্ধ হবে, মানুষ স্বহস্তে নিজের ভাগ্য গঠন করে চলবে। কাজেই অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও এথিক্‌স্‌ হু হু করে বেড়ে যাবে। তাই গান্ধীজীর এথিক্‌স্‌ ও নৈতিকতার দাবি অবাস্তব বলে মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে অবাস্তব প্রমাণিত হচ্ছে না। ক্যাপিটেলিষ্ট-এরাতে অর্থনীতির সঙ্গে নৈতিকতা ও এথিক্‌সের সহযোগিতা করা সম্ভব হতো না। কিন্তু আজ সমাজতান্ত্রিক যুগে নৈতিকতা ও এথিকস্‌কে অর্থনীতি থেকে আলাদা করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়।

কিন্তু কেবল নীতি দিয়েই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। নীতির পিছনেও অর্থনৈতিক অবস্থার জোর থাকা চাই। যদি মনে করা হয় যে চরকা অথবা গ্রাম্য কুটিরশিল্প জাত জিনিষের উচ্চমূল্য চিরকালই রাখতে হবে, গ্রামবাসীদের জীবিকার মান ও রুজি-রোজগার রাখার জন্য, তাহলেও তা টিকবে না। কারণ এটা শুধুমাত্র নীতিগত ব্যাপার নয়। প্রত্যেকের জন্য কাজ দিতে হবে, তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত যন্ত্রশিল্প ও কারখানা বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেক গ্রামকে তাদের যাবতীয়

প্রয়োজনের জন্য নিজেদের হস্তশিল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ তাতে সবার কাজ থাকবে। তাহলে সভ্যতা পিছন দিকে যেতে থাকবে, এবং তা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কাজের প্রয়োজন মানে ধান ও চাল মিশিয়ে বাছাই করার কাজও হতে পারে, এমন ধরণের একঘেঁয়েমীর কোন স্থান নেই, অর্থও নেই। সহরজাত দ্রব্যের বিনিময়ে চাষীদের তৈরী জিনিষ ও চাষজাত জিনিষের যখন বিনিময় হবে, তখন দেখতে হবে, যে সমপরিমাণ শ্রমের সাথে তা বিনিময় হচ্ছে কিনা? যদি শহরের দু-ঘণ্টার শ্রমের জিনিষের সাথে গ্রামের পাঁচঘণ্টার শ্রমের বিনিময় করতে বাধ্য হয় তবে বুঝতে হবে গ্রামগুলোকে শোষণ করা হচ্ছে। এবং বর্তমানে তাই হয়ে থাকে। গ্রামের লোকেরা কাজ করে, চাষীই হোক আর কুটিরশিল্পীই হোক, অতি পুরোনো ধরণের কায়দায়, যাতে বহু শ্রমের প্রয়োজন হয় অথচ উৎপাদন তেমন হয় না। আর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে জিনিষ হয় তাতে কম শ্রমে বহু পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন হয়। ফলে প্রত্যেকটি জিনিষের দাম ও তার পিছনে শ্রম অনেক কম পড়ে। কাজেই শহরের দু ঘণ্টার জিনিষের সঙ্গে গ্রামের বা হস্তশিল্পের পাঁচ ঘণ্টার জিনিষের বিনিময় হয়। চাষীদের পক্ষে এই অসমান প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা নেই, তার উপর একচেটিয়া পুঁজির অন্যায় অধিকার ও দাদনদার মহাজনদের ব্যবসাবাণিজ্যের উপর নানারকম চাপ দেবার ক্ষমতা রাখে। ফলে অর্থনীতির শাস্ত্রে scissor যাকে বলে তাই ঘটে। অর্থাৎ চাষীরা শহরের দ্রব্য কিনতে গিয়ে বরাবরই ঠকতে বাধ্য হয়। এই কাঁচি-শোষণ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক গঠনের প্রথমযুগেও যথেষ্ট ছিল। এর মূলে রয়েছে উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্য। একে তো গ্রামদেশ পিছিয়ে পড়ে উৎপাদনের পদ্ধতির বা টেকনিকের দিক থেকে, তার উপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিবহুল শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির কোন সীমা নেই। অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদিকা শক্তি দশ-বিশ গুণ করে ফেলাও অসম্ভব নয়, কিন্তু চাষের উন্নতি, পশুপালনের উৎপাদনে উন্নতি তাতো তাড়াতাড়ি এই হারে বাড়তে পারে না। তাদের সীমা লঙ্ঘন করতে অনেক বেগ পেতে হয়। তাছাড়া প্রকৃতি, জল, বায়ু ইত্যাদির উপর তা নির্ভরশীল বলে তাদের উৎপাদন ততো নিশ্চিতও হয় না। ফলে দেখা যায় রাশিয়াতে শিল্পস্থাপনের ব্যাপারে তেমন কোন বেগ পেতে হয় না,-অথচ চাষ ও পশুপালন সম্পর্কিত ব্যাপারে রোজগার করতে হলে সেখানেও বেগ পেতে হয়, রাশিয়াতে এই সমস্যা নিয়ে অনেক রাজনৈতিক সংকটও ভিতরে ভিতরে সৃষ্টি হবার ইতিহাস আছে। চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখী কারো হুকুমে রাতারাতি বাড়তে পারে না, তার পিছনে বছরের পর বছর ধরে নানারকমের শ্রম, ধৈর্য ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। অথচ বিদ্যুৎ, আণবিকশক্তি ও অভিনব নিত্যনতুন যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পকে অতি দ্রুত উন্নততর অবস্থা থেকে উন্নততম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যদিও শিল্পকে শেষপর্যন্ত চাষজাত কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলেও নানা ধরণের সিনথেটিক ও প্লাষ্টিক-শিল্পের রাস্তা খুলে যাওয়ায় শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এর সুবিধা গ্রহণ করে পিছিয়ে-পড়া গ্রাম-প্রধান ও চাষ-প্রধান দেশ ও উপনিবেশগুলোর উপর এতকাল বহু অন্যায় সুবিধা আদায় করে

নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে। শ্রমের অসম বণ্টন হলো এই অন্যায় সুবিধার গোড়াকার মূল সূত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা, একচেটিয়া পুঁজি ও ব্যবসার সাহায্যে এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে রাখাতে ওদের তাই এতো চেষ্টা।

যেদিন গ্রামের চাষ ও শিল্পের প্রয়োজন দুই-ই গ্রাম থেকে মিটতো, অর্থাৎ যেদিন সমমানের শ্রম বিনিময় হতো, সেদিন এই জাতীয় সমস্যা ছিল না। ফলে দীর্ঘ হাজার হাজার বছরের গ্রামসভ্যতা প্রায় একইভাবে চলে আসছিল, ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যদেশে। আজ আর তা নেই। গ্রামীণশিল্পের মেরুদণ্ড গেছে ভেঙ্গে এবং বহুক্ষেত্রেই তা ধুয়েমুছে গেছে। দেশের শিল্পপতিদের হাতেও যদি শিল্প চলে যায়, সেক্ষেত্রেও গ্রামের লোকেরা সেই একই বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, যেমন ভুগেছিল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের দেশে শিল্পশক্তি চলে যাওয়াতে। ফলে গান্ধীজী ভাবলেন যে কলকারখানা বিদেশে বিদেশীদের হাতে রয়েছে, তার ফলে দেশে যে দুরবস্থা হয়েছে, তার বদলে যদি দেশীয় পুঁজিপতিরা কলকারখানার মালিক হয়, তাহলে ভারতের সাতলক্ষ গ্রামবাসীদের কোন উদ্ধার হবে না। সেই অবস্থায়ও গ্রামের কুটিরশিল্পকে কলকারখানার সাথে প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ফলে তিনি ধনতন্ত্রকে ও শিল্পায়নকেও অস্বীকার করলেন। তিনি ভাবলেন গ্রামগুলিকে যথাসম্ভব স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ শ্রমবিনিময়ে কোন কাঁচি বা সিক্কার ব্যবহার করা হবে না, প্রায় একই মানের শ্রমের ভিত্তির উপর গ্রামগুলি দাঁড়াবে। এই হলো গান্ধীজীর মৌলিক ভিত্তি বা অরিজিন্যাল ষ্ট্যাণ্ড। এই বোধ থেকে তিনি ধীরে ধীরে সরে এসেছিলেন অবস্থার চাপে ও অভিজ্ঞতার ফলে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে গান্ধীজী সম্পূর্ণভাবে ও খোলামনে কখনও পণ্ডিত নেহেরুর শিল্পনীতিকে সমর্থন করে যান নি। এবং আজকালও একদল গান্ধীবাদী, গান্ধীজীর এই ঝোঁকটাকে সম্বল করে কেবলই কুটিরশিল্প, গ্রামীণশিল্পকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত গ্রাম্যবস্থার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন।

এই স্পিরিটের পিছনে যত মূল্যবান ভাবধারাই থাকুক না কেন, গোটা কয়েক প্রশ্নকে কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ভারতের লোকসংখ্যা কত বেড়ে গেছে, সেই আগের দিনের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যব্যবস্থার তুলনায় জনসংখ্যা দ্বিগুণের উপর বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব এতো লোকের ভরণপোষণের ক্ষমতা সেই যুগের উৎপাদিকা শক্তি দিয়ে করা আজ সম্ভব নয় লোকসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, উৎপাদন সেই পরিমাণে বাড়েনি। তাছাড়া উৎপাদন সেই পরিমাণে বাড়লেও চলবে না। উৎপাদনের হার বাড়াতেই হবে, কারণ জমি তো সীমাবদ্ধ। জমি যদি সেই পরিমাণে বাড়তো তবে আমাদের সেই কালের গয়ংগচ্ছ তালে বা গদাইলস্করী চালে চললে মাথাপিছু আয় হয়তো সমানই থাকতো। অতএব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই কেবলমাত্র উৎপাদনের সাধারণ সম্প্রসারণ হতে পারছে না। তাকে নিবিড় বা ইনটেনসিভ উৎপাদনের পথে যেতেই হবে, অর্থাৎ সেই জমিতেই বেশী ফসল ফলাতে হবে, শিল্পকে নয়া উৎপাদিকা শক্তির সাহায্য নিয়ে বাড়াতে হবে। ফলে এভাবে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করতেই হবে। কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদনের হার বৃদ্ধি তো দূরের কথা, মোট

উৎপাদনটাও সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জন্য কমতে শুরু করলো। গ্রামদেশে মাথাপিছু উৎপাদিকা শক্তির হার কমে যেতে লাগলো। ফলে অর্থনীতির কাঁচিকলের অত্যাচার আরও নির্মমভাবে বাড়তে লাগলো। দ্বিতীয় কথা হলো এইযে, পূর্বে আমাদের যে অবস্থা ছিল, তাকে কোন রকমেই আদর্শ অবস্থা বলে গণ্য করা যায় না। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে দারিদ্র ছিল না, দুর্ভিক্ষ ছিল না, অত্যাচার, শোষণ ছিল না, একথা গান্ধীজী বলেন নি। অচ্ছুৎ প্রথার মত একটা নিপীড়িত শ্রেণীর অস্তিত্বই সেই প্রকার দাবীকে ভূমিস্যাৎ করে দেয়। তাছাড়া এদের ভিতরকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ও অন্যান্য কারণে ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে আসছিল, নয় তো একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার বলেই বিদেশী বণিকেরা এদেশের এত বড় দুরবস্থা ও বৃত্তিহীন পরনির্ভরতা এনে দিতে পারতো না। একমাত্র রাষ্ট্রের জুলুম দিয়েই কোন সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তিকে, বিশেষ করে এতবড় একটা মহাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে চূর্ণ করে দিতে পারে না, তা পাঠান, মোগল বাদশাহদের শাসন থেকেই প্রমাণিত হয়। স্বয়ম্ভর অর্থনীতির ফাঁকে ফাঁকে নানা সংকট ও বণিকসভ্যতার নানা নাগপাশ জড়িয়ে উঠেছিল এবং ভিতর থেকে নানা অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছিল। যার ফলে ইংরেজের বণিকসভ্যতার আঘাতে আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রাম পরাজিত হলো। অবশ্য নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও রাজনৈতিক জুলুমও এই বিবর্তনে একটা সক্রিয় অংশ নিয়েছে। মোট কথা, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের চিত্রটা ভাল দেখালেও তা অনেকদিনই তার অন্তরের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। তার পিছনেও রয়েছে উৎপাদিকা শক্তিকে না বৃদ্ধি করতে পারার দুর্বলতা। **উৎপাদিকা শক্তির কথা চেপে রেখে একমাত্র স্বয়ম্ভর কথাটা অচল হতে বাধ্য।** তৃতীয় কথা হলো, মানুষ আজ সেই পুরাকালের কঠিন শ্রমকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে কেন? বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উন্নতি ও প্রসারের ফলে মানুষের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে, তার ব্যবহার করে তার শ্রমকে লাঘব করবে না কেন? তার জীবিকার মানদণ্ডকে কতকটা উন্নত করবে না কেন? মানুষের এই ন্যায্য দাবিকে আজ কোনমতে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না। চতুর্থ কথা, একথা যেমন সত্যি যে সকলকে কাজ দেবার প্রয়োজনে ও বেকারসমস্যা দূর করার জন্য কুটিরশিল্পের সাহায্য নেওয়া ছাড়া বর্তমানে কোন উপায় নেই, আবার একথাও সত্যি যে কুটিরশিল্প বর্তমান ধনতান্ত্রিক প্রথায় বেশী লোককে কাজও দিতে পারছে না। অর্থাৎ নিজস্ব শক্তিতে ধনতন্ত্রকে ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়াতে পারছে না, এবং এই ব্যবস্থার কাছেই তার আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ দাবি করছে ফলে একটা গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সংকট নানা দিক থেকে দেখা দিয়েছে। একে তো রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ যোগান দিতে হচ্ছে মৃতপ্রায় কুটিরশিল্পকে দাঁড় করাবার জন্য, অথচ এতো খরচ করেও তাকে সত্যিকার কোন নিরাপদ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিত্তি তৈরী করে দিতে পারছে না। একটা সিংকিং ফাণ্ডে বা একটা ডুবন্ত অবস্থাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ ঢালার মত অবস্থা হচ্ছে। অথচ জনসাধারণ এবং চাষীদের উপর ট্যাক্স চাপিয়েই এই অর্থ শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করতে হচ্ছে। উপরন্তু কুটিরশিল্পজাত জিনিষের দাম বেশী বলে সেই জনসাধারণকেই

অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে দিতে হচ্ছে। তার উপর কলকারখানার উপর কুটিরশিল্পের রক্ষা করবার খরচ ও বোঝার ভার বহন করার চাপ কলকারখানার মালিকদেরও অসন্তুষ্ট করে তুলছে এবং তাদেরকেও ব্যবসা বাড়াতে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ মূলধনী প্রথায় ক্রমাগত মূলধন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকলে মূলধনী প্রথাও চালু থাকতে পারে না। এবং বিদেশীদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না।* ফলে কলকারখানার মালিক পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার দাবি স্বীকার করতে হচ্ছে। যাতে করে কলকারখানার তৈরী জিনিসের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই অতিরিক্ত দাম ক্রেতাসাধারণকেই বহন করতে হচ্ছে। একটা বিষাক্ত সার্কেল তৈরী হচ্ছে চারদিক থেকে। এরফলে একটা বিরাট সামাজিক সংকট নানা বিভ্রান্তির মূর্তি ধরে দেখা দিচ্ছে। দেশের

---

* আমার এই বিশ্লেষণটাকে আজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু সংশোধন করার দরকার আছে। কুটির ও হস্তশিল্পকে সত্যিই কতটা ভর্তুকী দিতে হচ্ছে সরকারকে? খাদি এবং গ্রামীণ হস্তশিল্প সংস্থার (কে ভি আই সি) বাৎসরিক বাজেট কত কোটি টাকা? মাত্র চার কোটি টাকা। একথা ঠিক, তাঁত ও অন্যান্য কুটিরশিল্পকে ভর্তুকী দিতে হচ্ছে, কিন্তু এত লোককে যে কাজে নিযুক্ত রাখা হয়েছে সে কথা ভাবা হচ্ছে কি? চাষের পরেই বৃহত্তম কর্মদাতা, আজও তাঁত। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উপর কর বসিয়ে ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এ তথ্যও ঠিক নয়। বরং আজকের ভারতীয় অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্পগুলিকেই প্রচুর পরিমাণে নানাভাবে সাহায্য করতে হচ্ছে, রাষ্ট্রকে। প্রায় সব বড় শিল্পেই, বিশেষ করে, রাষ্ট্রচালিত বা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেই লোকসান চলছে, শত শত কোটি টাকা বাৎসরিক। রপ্তানি বাণিজ্য ভর্তুকী ছাড়া চলছে না। পাটকলগুলি, সুতোকলসমূহ চলছে না, অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে আছে। পরিবহন ব্যবস্থা প্রচুর লোকসানে ও ভর্তুকীতে চলে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে আজকের বৃহৎশিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্তশিল্পগুলি এমন লোকসানের সঙ্গে চলছে যে তাদের মাথা উঁচু করে কিছু বলার নেই। অতএব ত্রিশ বছর পূর্বে আমি যেভাবে একথা লিখেছিলাম, তা ভুল। এই ভুল সিদ্ধান্ত প্রচলিত 'প্রগতিবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রের' ধুয়ো ধরেই চলতে গিয়ে তখন আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল।

তার মানে এই নয় যে গ্রাম্যশিল্প ও ছোট ও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্থান নেই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, কায়িকশ্রমের কঠোরতা কমিয়ে, অথচ উৎপাদিকাশক্তি বাড়িয়ে (চাষবাস ও কুটির ও ছোট শিল্পে) কোন্ কোন্ প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রামবাসীদের পক্ষে হিতকর ও লাভজনক হয়, অথচ তাদের স্বাধীনতার ক্ষতি না হয়, তার একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। যেমন বিদ্যুতের কথা পূর্বেই বলেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রটা হয়তো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থারই মাধ্যমে হতে হবে, কিন্তু তার ব্যবহার গ্রামে গ্রামে সর্বত্র যাতে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং চাষবাস ও হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের কাজে লাগাতে পারে। যেমন ইলেকট্রোনিক্সও গ্রামদেশে ছোট ও কুটিরশিল্পের কাজে লাগতে পারে, অথচ গ্রামের জীবনও কিছুটা সহজ ও সুন্দর করা সম্ভব। মোটকথা বিজ্ঞানকে দেখে শুনে নিতে হবে, যা ভাল তা নিতে হবে, যা ভাল নয় তা পরিহার করে চলতে হবে। কি ভাল আর কি ভাল নয়, এর বিচার হবে বাজার আর লাভলোকসান দিয়ে নয়, সভ্যতার মূল্যমান দিয়ে—যে সভ্যতা অসাম্যকে, শোষণকে স্বীকার করবে না, বরং তার প্রভাব দূর করে দিয়ে, সকল মানুষ সমান ও এক, এই লক্ষ্য ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ভারী বা বড়শিল্প, মাঝারী শিল্প, ছোট ও ক্ষুদ্রশিল্প ও শেষ পর্যন্ত চাষ, এদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কি জাতীয় হতে হবে? এর সবই থাকতে হবে। কিন্তু অগ্রাধিকারের চেহারাটা কি রকম? ভারীশিল্প, চাষ, ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প মাঝারী শিল্পকে সাহায্য করবে। ভারীশিল্পের কাজ নয়, অন্যান্য ছোট, বড়, মাঝারী শিল্পকে বাজার থেকে তাড়ানোর। পরিকল্পিত উপায়ে পরস্পরের সাহায্যে আসছে, এমনভাবে শিল্পায়নের অগ্রাধিকার স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ আজ যা হচ্ছে, তার উল্টোটা করে দিতে হবে। যেমন শহরের জন্য গ্রামগুলি নয়, গ্রামগুলির সারভিস-কেন্দ্র বা সারভিস্ সেণ্টার হিসেবেই শহরগুলিকে ঢেলে নতুন করে গড়তে হবে। কেননা, ভারতের গ্রামদেশে আজও শতকরা আশী শতক লোক বাস করে, এবং তাদের আর শহরে ঠাঁই দেওয়া যাবে না...দেওয়া উচিতও নয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে, 'সাপও মারবো আবার লাঠিও ভাঙ্গবো না', এমনি ধরণের নীতি সংকটকে বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য। ফলে কঠিন কথার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই হবে। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থাটা এইরকম রেখেই কুটিরশিল্পকে রক্ষা করা, অথচ ধনতন্ত্রকেও আঘাত না করা, এরকম সোনার পাথর-বাটির নীতি কতদিন চলতে পারে? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া এর কোন সমাধান নেই। যদিও কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই চায় বলে ঘোষণা করেছে, তথাপি এই ঘোষণার মধ্যে কংগ্রেসের সকলের সুর এক রকমের নয় এবং শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব যেসমস্ত অফিসাররের হাতে আছে, তারাও এই সমাজতন্ত্রকে এখনও গ্রহণ করেননি এবং জনগণকেও এই আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়নি। আবার যারা ভূদানপন্থী, গান্ধীবাদী ও বিকেন্দ্রীকরণবাদী এবং নিরংকুশ কুটিরশিল্পবাদী, তারা মোটামুটিভাবে সর্বোদয় নামক একটা অস্পষ্ট সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু শিল্পায়নের বিরুদ্ধেই তাদের চাপটা যেন বেশী। বিনোবাজী অবশ্য কুটিরশিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি এমন কি আণবিক শক্তির ব্যবহারকেও তত্ত্বের দিক থেকে আপত্তিজনক বলে মনে করেন না, কিন্তু সেসব শক্তি কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তার দিকে মনোযোগ দেন নি। তর্কের দিক থেকে সেটা মেনে নেওয়া হলেও কাজের দিক থেকে তা মানবার উপায়টা কি সে সম্বন্ধে তিনি উৎসাহ দেখাননি। বিনোবা অবশ্য বলেছেন, "Many are under the impression that this Baba, a disciple of Gandhiji, is against the use of electricity and he is only for village industries. I may tell you that I am even for Atomic energy." (Form an address to the legislators of Andhra at Kurnul on 12.3 56) "অনেকের ধারণা গান্ধীজীর এই বাবাজী শিষ্যটি (বিনোবা) বিদ্যুৎশক্তির বিরুদ্ধে এবং একমাত্র গ্রামীণশিল্প ছাড়া কিছুই তিনি মানেন না। কিন্তু আমি ঘোষণা করছি, আমি এমন কি আণবিক শক্তির ব্যবহারেরও পক্ষপাতি।" যাই হোক বিনাবাজীকে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে দেখা যায় না। গান্ধীজীর মত বাধ্য হয়েই তাঁকে অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক টেকনিক বা কলাকৌশল গ্রহণে স্বীকৃত হতে হয়েছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ কথাটার উপর তাঁদের জোর যতটা বেশী, মূল সমাজ-তান্ত্রিক কথাটার উপর তত নয়। তবে ক্রমশঃই সমাজের মৌলিক কাঠামো সম্বন্ধে প্রশ্নটা সকলের সামনে প্রথম প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। গান্ধীজীর শিষ্য পণ্ডিত নেহেরু, সমাজতন্ত্রের কথাটাকে কেন্দ্রীয় সমস্যা বলে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করতে অগ্রসর হচ্ছেন। গান্ধীজীর অপর প্রধান শিষ্য বিনোবাজী সমাজ-বিপ্লবের কথাটাকে অগ্রগণ্যতা দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু গান্ধীবাদের এই দুই দিকই এখনো পরিষ্কার হয় নি। পণ্ডিত নেহেরুর সমাজতন্ত্রের আড়ালে অনেক বর্ণচোরা ধনবাদী পুঁজিপতি ও আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ দীর্ঘ জীবনের রক্ষা ব্যবস্থায় ব্যস্ত, আবার বিনোবাজীর পতাকার আড়ালে অনেক সমাজতন্ত্র বিরোধী ও পাতি-বুর্জোয়া মতবাদী লোক রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। যাক্, এসব কথার পরে আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে, আবার এসব কথার পরে আলোচনার প্রয়োজনও হবে।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে জনতার সকলের জন্যই কাজ শুধু দেখলেই চলবে না, সে কাজের আয় যেন শহরবাসীদের থেকে অনেক কম না হয়। গ্রামে কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা করে শহরে বেকার মজুরদের ভীড় বাড়ানো বন্ধ করার সময় দেখতে হবে গ্রামের মজুর যাতে এমন মজুরী পায় যা শহরের মজুরের মজুরীর অনেক বেশী কম না হয়। তা যদি না হয় তবে শহরে ভীড় করে, গ্রাম থেকে পালানো বন্ধ করাও সম্ভব নয়। পরবর্তী কথা হলো, গ্রামের লোকেদের যদি শহরের শিল্পজাত জিনিষের সঙ্গে বিনিময় করে চলতে হয় এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিতে হয় তবে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবেই। নাহলে কাঁচি-কল থেকে নিস্তার নেই। অবশ্য একথাও ঠিক যে উৎপাদনশীলতাই একমাত্র সামাজিক প্রয়োজনের মানদণ্ড নয়। এমন অনেক কাজ থাকবে, বিশেষ করে পশুপালন, চাষ ইত্যাদিতে যেখানে উৎপাদনশীলতা শিল্পের উৎপাদনের অপেক্ষা কম বরাবরই থাকবে। যার উৎপাদনশীলতা কম, তার কদর কম বা প্রয়োজন কম, এমন নয়। হয়তো প্রয়োজন তাদের অনেক বেশী বলেই কম উৎপাদনশীলতা থাকা সত্ত্বেও সমাজ তার উপর এতো বেশী নজর রাখতে বাধ্য হয়। তবে আজকাল উৎপাদনশীলতার যুগ এসেছে বলে অর্থনীতিতে অনেক রকমের নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার সমাধান নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নতুন উৎপাদিকা শক্তি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গঠনের তাগিদ দিচ্ছে. এবং সমাজ বিপ্লব না হলে নয়া-উৎপাদিকা শক্তি অনেক সমাধানের চেয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে মাত্র। নতুন উৎপাদিকা শক্তি একটা নতুন অবস্থার সূচনা করেছে প্রত্যেক শ্রমজীবীর জন্যেও। কারণ শ্রমজীবী অপেক্ষা শ্রমজীবীর উৎপাদনের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যন্ত্রশক্তি বা টেকনিকের এমন অভূত বিকাশ হয়েছে যে আগের দিনের দশ ঘণ্টা মেহনতে যে মাল প্রস্তুত হতো, নতুন টেকনিকে তা এক ঘণ্টায় করা সম্ভব। অথচ সকল প্রকার মেহনতই সমান-ভাবে আধুনিক হয়ে ওঠেনি। পিছিয়ে পড়া গ্রামপ্রধান দেশের মেহনত সেই আদিমকালেই পড়ে আছে, তার চেয়ে বেশী উৎপাদনকারী বড় একটা হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ আধুনিকতম মেহনত ও সেকেলে মেহনত, উভয়কেই একই বিশ্বের বাজারে উপস্থিত হতে হচ্ছে। ফলে মূল্যে ও দরদামে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে। অথচ বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থে, একচেটিয়া স্বার্থ, সীমানা ও পদ্ধতি থাকার জন্য শুদ্ধ অর্থনৈতিক নিয়মে সে সব দরদামের পার্থক্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারছে না। অর্থনৈতিক লেনদেনের সূত্রগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। বিশ্বের ব্যাপারেই এই অসামঞ্জস্য রয়েছে, তাই নয়, দেশের ভিতরেও সেই সংকট ও বিরোধ বর্তমান, ফলে গ্রামবাসীরা মনে করছে শহরের জন্য তাদের সর্বনাশ হচ্ছে। শহরবাসী পুঁজিপতিরা মনে করছে তাদের ঘাড় ভেঙে কুটিরশিল্প ও চাষকে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। মজুরেরা ভাবছে, বেকার চাষীদের রক্ষার জন্য তাদের উচ্চমূল্যে জিনিষ কিনতে হচ্ছে, জনসাধারণ ভাবছে, ভূতের বোঝা বইবার জন্য ট্যাক্স বয়ে মরতে হচ্ছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেকেই ভাবছে, তার মাথায় অপরেরা কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। প্রায় সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অথচ কারোরই কোন উপকার বা ভবিষ্যৎ গড়া

হচ্ছে না।

এই সমস্ত চিন্তার সংকট ও কর্ম সংকটের মধ্য দিয়ে ভারত চলেছে। তার ভিতর দিয়ে বহু রকমের স্বার্থ ও রাজনৈতিক বিরোধ নানা চক্র ও আবর্ত সৃষ্টি করেছে কিন্তু ভারত বসে নেই। ইতিহাসের গতিপথে তাকে এগোতেই হচ্ছে, যদিও তা গুরুতরভাবে ঠোক্কর খেতে খেতে, টলতে টলতে। এর মধ্য দিয়ে যে জিনিসটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা এই, প্রথমতঃ ভারতকে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করতেই হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁকটাও প্রতিহত হচ্ছে। প্রয়োজনের খাতিরেও বটে এবং কতকটা গান্ধী-আন্দোলনের ফলেও বটে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনে কো-অর্ডিনেশন, বা সংযোগ, শিল্পায়নের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয়করণ ইত্যাদির ঝোঁকের সাথে সাথে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও জাতীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনে ও পিছিয়ে পড়া দেশকে দ্রুত অগ্রবর্তী দেশে পরিণত করার জন্য ক্ষমতাশালী ও দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয়-করণের দিকে ঝোঁকটাও কম হয়নি। কেন্দ্রীয়করণ যতটা হোক আর নাহোক, একটা অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার। এখানে অখণ্ড বিকেন্দ্রীকরণ বা ইন্টিগ্রেটেড ডিসেন্ট্রেলাইজেশন কথাটা হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের একমাত্র কেন্দ্রীয় রূপ বা সেন্ট্রেলাইজ্‌ড্‌ ফর্মই আছে, এমন নয়, যেমন আমরা দেখেছি যুগোশ্লাভিয়াতে বিকেন্দ্রীকৃত রূপটার বা ডিসেন্ট্রেলাইজ্‌ড্‌ ফর্ম-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ খন্ডীকরণ কিংবা ডিস্‌ইন্টিগ্রেশন নয়, অথবা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত (ইউনিফাইড ও কোঅরডিনেটেড) নেতৃত্বের অস্তিত্বহীনতা বোঝায় না। নেতৃত্বের ঐক্য, সম্মিলিত পরিকল্পিত উন্নয়ন (কোঅরডিনেটেড প্ল্যানফুল ডেভালাপমেণ্ট), মূলশিল্প, যানবাহনশিল্প ইত্যাদি যেমন একদিকে দরকার, তেমনি গ্রামগুলিকে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে শিল্পায়িত করে তোলাও প্রয়োজন। আর সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এই সমন্বয় করাও সম্ভব নয়। আবার সমাজতন্ত্র ছাড়া কুটিরশিল্পকে সমবায় পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গঠন করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে গঠিত ও আধুনিক কুটিরশিল্পের সমবায়গুলি এখন বৃহৎ শিল্পের সাথে একত্রে জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে সুসামঞ্জস্য আনতে পারে। তাহলেই সামাজিক জীবনের অখণ্ড মূর্তিটি প্রকাশিত হবে। অথচ এর মধ্যেই যথাসম্ভব স্থানীয় লোকের ভূমিকা, স্থানীয় স্বাধীন সত্ত্বা ও স্থানীয় স্বাবলম্বন গড়ে তোলা সম্ভব। মনে হয় ভারতবর্ষ আপাত-বিরোধী এই দুই শক্তিকে এইভাবে সুসমন্বিত করতে পারবে। এই পথেই জনসাধারণের জীবনের মানদণ্ড বাড়ানো, উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক জীবনের (কালচারেল লাইফের) জন্য অবসর, আমলাতান্ত্রিক আত্যন্তিকতা থেকে আত্মরক্ষা, একই সঙ্গে সর্ব-ভারতীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয় ইত্যাদি লক্ষ্যগুলিকে বাস্তবে কায়েম করতে পারবে। একপেশে ঝোঁক এইভাবেই এড়ানো সম্ভব। তা না হলে একদল লোক বলবে, সবাইকে যদি কুটিরশিল্পে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে বেকার কেউ থাকবে না, সারাদিন কাজ করতে হবে, জীবিকার মান তাতে যতই কমুক, বেকার কেউ থাকবে না।

অন্যদল আবার বলবে, কুটিরশিল্পকে ধ্বংস হতে দাও, আমরা বরং বৃহৎ বৃহৎ শিল্পই গড়ে তুলি, তাতে যদি ভারতের দশ ভাগের একভাগ লোকও কাজ পায়, সেই একভাগ লোকের উৎপাদন ও সমগ্র ভারতের কল্পিত, কুটিরশিল্পের মোট উৎপাদনের তা দ্বিগুণ হবে। আমরা বরং বাকি লোকগুলিকে, অর্থাৎ নয় ভাগকে বসিয়ে খাওয়াবো, পরাবো ডোল দিয়ে, কিন্তু সকলের জন্য কাজ দিতে কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করার অর্থ কুটিরশিল্পের বোঝা কাঁধে বয়ে বেড়ানো। এইযে দুই প্রকার চিন্তাধারা, দুটিই একপেশে ও ভুল। প্রথমটা দারিদ্র বন্টনের ব্যবস্থা হবে মাত্র এবং তাতে অর্থনৈতিক অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষ্টির প্রসার সবই বন্ধ হবে। আবার দ্বিতীয় পদ্ধতিটাও অবাস্তব ও মূর্খের বেপরোয়া অহংকার মাত্র। তার ফলও অর্থনৈতিক অরাজকতা। তাছাড়া বসিয়ে বসিয়ে বেকারভাতায় মানুষ পোষার মত এমন কদর্য অধঃপতনের রাস্তা আর নেই।

অমরা বড্ড ভবিষ্যতে চলে যাচ্ছিলাম। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই আলোচনা করার জন্য স্থগিত রাখছি। এখন আমরা গান্ধীজীর অতীত কার্যাবলী নিয়ে আলোচনায় ফিরেযাই। এখানে অর্থাৎ গঠনমূলক কাজের আলোচনার সময়ে গান্ধীজীর চরকাপ্রীতির কথাটা আরও একটু আলোচনা করার দরকার রয়েছে। কুটিরশিল্প চরকা ও রাজনীতিতে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেছি, তবুও আরো দু-একটি বিশেষ কথা এই সঙ্গে বলে যাওয়া দরকার।

গান্ধীজী চরকাকে তার সত্যিকার স্পিরিট সহ বুঝতে বলেছেন। একটা যন্ত্র মাত্র, পাঁচটা হাতিয়ারের মত এ-ও একটা হাতিয়ার মনে করেই ক্ষান্ত হন নি, গরীবের হাতে দুটো পয়সা যোগাড় করে দেওয়া ও রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি গড়ে তোলা, এসব ছাড়াও ব্যক্তি চরিত্র গঠন, জনসংযোগের বাহন এবং জনজীবনের সাথে মিলিত হবার উপায় হিসেবেও গান্ধীজী চরকার একটা বিশেষ মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। গান্ধী যখন চরকা দেখেনও নি, অর্থাৎ ১৯০৮ সালে, তাঁর 'হিন্দস্বরাজ' নামক পুস্তক লেখার সময়ে, আফ্রিকাতে বসেই চরকার মতো একটা কিছু যন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন। ভারতে এসে প্রথম যখন তিনি অতিকষ্টে একটি চরকা যোগাড় করতে পারলেন, তখন তাঁর আনন্দ ধরে না। তিনি যার ধ্যান এতদিন ধরে করে এসেছিলেন, তা যেন সশরীরে আবির্ভাব হলো, তাঁর একান্ত প্রার্থনার ফলে। কি এই চরকা যার জন্য তিনি এতো কঠিন পরিশ্রম, এত চেষ্টা, জীবনভর অক্লান্তভাবে প্রচার করে গেছেন? চরকাকে তিনি এতো ভালবাসতেন যা বলার নয়। তিনি তাঁর সমস্ত আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে চরকাকে বসিয়েছিলেন, সূর্যমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যস্থলে যেমন সূর্য, তেমনি সমস্ত কর্মোদ্যমের মাঝখানে তিনি রেখেছিলেন চরকাকে। এ এক আশ্চর্য জেদ। কি অসীম শক্তি গান্ধীজী রাখতেন তার প্রমাণ, এই চরকাকে চালু করার চেষ্টাতে ধরা পড়ে। এই যুগে যখন যন্ত্র ছাড়া লোকে উন্নতির কোন কথাই ভাবতে রাজি নয়। আমার মনে হয় সাম্রাজ্যবাদকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার ভিতরে এই জেদী নেতার সবচেয়ে বড় শক্তির প্রকাশ পায় নি, তাঁর জেদের শক্তি বরং

চরকাকে চালু করিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যেই আছে। আজ অবশ্য চরকা তেমন চালু শক্তি নয়, চরকা-আন্দোলন ঝিমিয়ে এসেছে, তথাপি তাঁর দীর্ঘ জীবিতাবস্থায় চরকাকে গ্রহণ করিয়ে তিনি ছেড়েছিলেন, হাজার বিদ্রূপ, হাজার প্রতিক্রিয়া, হাজার বাধা সত্ত্বেও। চরকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধেও আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন তার কতগুলো ব্যক্তিগত চারিত্রিক তাৎপর্য ও কৃষ্টিগত তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

দরিদ্রতম জনতার সন্ধান, দরিদ্রনারায়ণের সন্ধান তাঁর জীবনের একটা বিরাট নেশা ছিল। সমস্ত ভারত এতো ঘুরেছেন, এতো গ্রামে গিয়েছেন যে, কোন লোকই আজও পর্যন্ত তা করে নি এবং সর্বত্র দরিদ্রনারায়ণকে দেখেছেন এবং দরিদ্রনারায়ণ তাঁকে দেখেছে তথাপি তিনি মনে করতেন সত্যিকার দরিদ্রনারায়ণের সংস্পর্শে তিনি আজও আসতে পারেন নি। ১৯২৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউটে তিনি অভ্যর্থিত হয়ে যে বক্তৃতা দেন বৈজ্ঞানিকদের কাছে, তারমধ্যে তাঁর দরিদ্র-নারায়ণের জন্য আকুলতা কী গভীরভাবে ফুটে উঠেছে! আমি তাঁর সমস্ত বক্তৃতাটা এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। মহাত্মা গান্ধীর হৃদয়টা কত মহান ছিল, তা-ও তাঁর এই ছোট্ট ক্লাসিক বক্তৃতাটি যত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারবে, আমার অক্ষম লেখনী শত পৃষ্ঠায়ও তা ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। গান্ধীজীর জীবনের লক্ষ্য বা মিশন এই কথা ক'টির মধ্যে ফুটে আছে:

"I was wondering where do I come in", he exclaimed with a sigh. "There is no place here for a rustic like me who has to stand speechless in awe and wonderment. I am not in a mood to say much. All I can say is, that all these huge laboratories and electric apparatus you see here are due to the labour—unwilling and forced—of the millions. For Tata's thirty lakhs did not come from outside, nor does the Mysore contribution come from anywhere but this '*bager*' world. If we are to meet the villagers and to explain to them, how are we utilizing the money on buildings and plants which will never benefit them, but might perhaps benefit their posterity, they will not understand it. They will turn a cold shoulder. But we never take them into confidence, we take it as a matter of right, and forget that the rule of 'no taxation without representation' applies to them too. If you will really apply to them and realize your responsibility to render them an account, you will see that there is another side to all these appoitments. You will then find not a little but a big corner in your hearts for them, and if you will keep it in a good nice condition, you will utilize your knowledge for the benefit of

millions on whose labour your education and research depend. I shall utilize the purse you have given me for Daridranarayan. The real Daridranarayan even I have not seen, but know only through my imagination. Even the spinners who will get this money are not real Daridranarayan, who lives in remote corners of distant villages which have yet to be explored. I was told by your's professors, that the properties of some of chemicals will take years of experiments to explore. But who will try to explore these villagers ? Just as some of the experiments in your laboratories go on for all twenty four hours, let the big corner in your heart remain perpetually warm for the benefit of the poor millions.'

"I expect far more from you than the ordinary man in the street. Don't be satisfied with having given the little you have done, and say, 'we have done what we could, let us now play tennis and billiards.' I tell you, in the billiard room and on the tennis court, think of the big debt piled against you from day to day. But beggars cannot be choosers. I thank you for what have you given me. Think of the prayer I have made and translate into action. Don't be afraid of the cloth the poor women make for you, don't be afraid of your employers showing you the door if you wear khadi. I would like you to be men, and stand up before the world firm in your convictions. Let your zeal for the dumb millions be not stifled in the search for wealth. I tell you, you can devise *a far greater wireless instrument*, which does not require external research, but internal, and all research will be useless if it is not allied *to internal research*, which can link your hearts with those of millions. Unless all the discoveries that you make have the welfare of the poor as the end in view all your workshops will be really no better than 'satan's workshop' as Rajagopalachari has said in joke. Well, I have given enough food for thought, if you are in reflective mood, as all research students ought to be."

(Young India, 21.7.1927) page—1.

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গান্ধীজীর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, "আমার বিস্ময় লাগে যে কোথায় আমি আজ এসেছি। আমার মতো একটা গ্রাম্য লোকের পক্ষে এই গবেষণাগারে মূক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ? বেশী কিছু বলবার মতো মনের অবস্থা বোধ করছি না। আমি কেবল এইটুকুই স্মরণ

করিয়ে দিতে চাই, এইসব বিরাট গবেষণার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পেছনে কত লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক শ্রম রয়েছে। কেননা টাটার ত্রিশলক্ষ টাকা বাইরে থেকে আসে নি এবং মহীশূররাজের দানটাও এসেছে "বেগার" জনতার শ্রম থেকেই। যদি আমাদের গ্রামের এইসব জনতার কাছে যেতে হয় এবং তাদের যদি বলি এইসব বিজ্ঞানাগার ও গবেষণাগার যা আমরা তাদের ঘাড় দিয়েই তৈরী করেছি, তার ফল তারা পাবে না, তাদের বংশধরেরা হয়তো ভোগ করতে পারবে, তারা সেকথা বুঝতে পারবে না। তারা নীরবে নিরুৎসাহে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু আমরা তো তাদের সঙ্গে পরামর্শ করি না, আমরা আমাদের অধিকার হিসেবেই তাদের শ্রম গ্রহণ করে থাকি এবং ভুলে যাই তাদের বেলায়ও এই নীতি প্রযোজ্য যে 'প্রতিনিধিত্ব নেই তো ট্যাক্স নেবারও অধিকার নেই'। যদি তোমরা তাদের বেলায়ও এই নীতি স্বীকার করো এবং দায়িত্ব মনে মনে গ্রহণ করতে পারো, তবে বুঝতে পারবে এই সমস্ত কর্মোদ্যমের একটা অন্যদিকও আছে। তাহলে তোমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য একটু সামান্য স্থান হবে না, তোমাদের হৃদয়ের একটা বড় অংশ তারা জুড়ে বসবে এবং এই বোধ ও চেতনাকে যদি সদাই স্বচ্ছ করে রাখো তবে তোমাদের সকল গবেষণা, সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে এই লক্ষ লক্ষ জনতারই মঙ্গলের জন্য, যাদের খরচায় আজকের গবেষণা ও শিক্ষা সম্ভব হয়েছে।

"আমি সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তোমাদের কাছ থেকে আজ যা পেয়েছি তা ব্যয় করবো। সত্যিকার দরিদ্রনারায়ণ আমিও দেখতে পাই নি। আমি তাঁকে আমার কল্পনাশক্তি দিয়েই অনুভব করি। এই টাকা যারা সুতো কাটে, তাদের পিছনে আমি খরচ করবো বটে কিন্তু তারাও দরিদ্রনারায়ণ নয়। যে দরিদ্রনারায়ণ এমন সব দূর দূরতম গ্রামের দূরান্তে বাস করে, যাদের এখনো আবিষ্কার করাই সম্ভব হয় নি। এখানকার অধ্যাপকদের কাছে আমি শুনেছি যে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের সমুদয় গুণাবলী আবিষ্কার করতে বহু বছর ধরে গবেষণার দরকার হয়। কিন্তু কে এইসব গ্রামবাসীদের আবিষ্কার করার মেহনত নেবে? এখানকার কোন কোন গবেষণা যেমন দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই করা হয়ে থাকে, তেমনি দরিদ্রনারায়ণের জন্য তোমাদের হৃদয়ে যে বৃহৎ স্থানটি আছে, তা যেন সর্বক্ষণের জন্যই উষ্ণ থাকে।

"সাধারণ লোকের চেয়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক বেশী কিছু আশা করি। যে সামান্য আজ তোমরা আমাকে দিয়েছো, এ দিয়েই যেন মনে না করো যে তোমাদের যা করার ছিল করে ফেলেছো এবং এখন তোমরা টেনিস্ এবং বিলিয়ার্ড খেলতে পারো। আমি বলছি, টেনিস্‌কোর্ট ও বিলিয়ার্ড খেলার ঘরেও স্মরণ রেখো যে জনতার কাছে তোমাদের দেনা আছে এবং তা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। যাক্, ভিক্ষুকের পক্ষে দাবির জুলুম করা চলে না। তোমাদের কাছ থেকে আজ যা পেলাম, তারজন্য তোমাদের ধন্যবাদ। আমি যে প্রার্থনা করলাম, তোমাদের কাছে আজ, তা মনে রেখো এবং জীবনে তা কাজে লাগাতে চেষ্টা করো। গ্রাম্য দরিদ্র মেয়েরা তোমাদের জন্য যে কাপড় তৈরী করছে তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না, খদ্দর পরলে যদি তোমাদের মালিকেরা তোমাদের তাড়িয়ে দেয়, তাতে ভয় পেয়ো

না। তোমরা মানুষ হয়ে গড়ে ওঠ, নিজেদের বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখো, সমস্ত জগতের সামনে। অর্থ রোজগারের নেশায় যেন জনতার কথা ভুলে যেও না। আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা এমন বেতারযন্ত্র তৈরী করতে পারো, যাতে বাইরের কোন গবেষণার অপেক্ষা রাখে না, যা অন্তরের গবেষণা থেকেই তৈরী করা সম্ভব, এবং সমস্ত গবেষণাই ব্যর্থ হবে যদি তাতে অন্তরের সঙ্গে সংযোগ না থাকে। সেই অন্তরের বেতার তোমাদেরকে জনতার সঙ্গে সংযোজিত করে দেবে। তোমরা যা কিছু করছ তা যদি লক্ষ লক্ষ জনতার মঙ্গলের জন্য না হয়ে থাকে তবে এই গবেষণাগার রাজাগোপালাচারীর কৌতুকপূর্ণ ভাষায়—'একটা শয়তানের কারখানায়' পরিণত হবে মাত্র। যাক্, আমি অনেক চিন্তার খোরাক আজ তোমাদের দিলাম, যদি অবশ্য তোমাদের তেমন মননশীলতা হয়ে থাকে, যেমন প্রত্যেক গবেষণার ছাত্রেরই থাকা উচিত।"

জনজীবনের স্বার্থে কর্মীদের অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হবার উপায় হিসেবে চরকাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। জনতার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা ছাড়া কেউ প্রকৃত কর্মী হতে পারে না। বিশেষ করে শিক্ষিতশ্রেণীকে অশিক্ষিত দরিদ্রশ্রেণীর সাথে এক আসনে ও এক জীবনে বসানো সম্ভব নয়, এমনি একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল গান্ধীজীর। জনগণের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম করে দেখা বা থাকা, এই উদ্দেশ্য থেকে চরকার উপর তাঁর এতো জোর। মুখের কথা, বক্তৃতা, কালেভদ্রে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, এটাকে তিনি গণসংযোগ বলে মনে করতেন না। পরশ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে শ্রমজীবীদের যে বিচ্ছেদ ও পার্থক্য থেকে যাচ্ছে, তাকে একমাত্র শ্রমের মধ্য দিয়েই পুনরায় সংযুক্ত করা যায়। কায়িক শ্রমের মর্যাদা ও কায়িকশ্রমের মহিমাকে প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীকে নিজেদের কোন না কোন কায়িকশ্রম দিয়েই দেখাতে হবে। বুদ্ধিজীবীকেও কায়িক শ্রম করতে হবে তার অবসর সময়ে এবং তারই ভিতর দিয়ে শ্রমজীবী জনতার জীবন, আশা আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখবেদনার সঙ্গে নিজেদের জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে হবে; শুধু কল্পনার অনুভূতি দিয়ে নয়। গান্ধীজীর এই কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

শ্রীলংকার রামনাথন বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের কাছে তিনি বলেছিলেন, "So I say, in order to follow out that act of worship, take up the spinning wheel, sit at it for half an hour and think of these millions that I have described to you and say in the name of god, "I spin for the sake of them." If you do it with heart, with the knowledge that you are the humbler and the richer for this real act of devotion, if you will not dress for show, but for covering your limbs, you will certainly not have any hesitation in wearing khadi and establish that bond between yourselves and the millions." (Gandhiji in Ceylon, page, 146-149, 21. 11. 27)

"তাই বলছি তোমরা যদি সেই সাধনার পথে সত্যি চলো, তবে চরকা ধরে

প্রতিদিন তাই নিয়ে আধঘণ্টা সুতো কাটো এবং সেই সময়ে জনতার কথা ভাবো এবং ভগবানের নাম করে ভাবতে শেখো যে, "যে আমি জনতার জন্য সুতো কাটি।" যদি অন্তর থেকে একথা গ্রহণ করতে পারো, যদি বুঝতে পারো এই সাধনায় তোমাদের হৃদয় যেমন বিনম্র হচ্ছে তেমনি হচ্ছে মহীয়ান, যদি তোমরা দেখাবার জন্য পোষাক আষাক না পরো, কিন্তু নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যেই পরো, তাহলে খদ্দর পরতে তোমরা কখনো কুণ্ঠিত হবে না, এবং এভাবে অসংখ্য জনতার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করতে এগিয়ে আসবে।"

তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "If you have closely followed my reasoning, you will at once understand the message of the spinning wheel. It is because I see in the spinning wheel the hard hand of God working ; it is because I see in the spining wheel the satisfaction of the needs of meanest human beings, that in season and out of season. I think about it, work at it, pray about it and speak about it. If there is any other thing which can bring nearer the tarnishing people of the earth, let alone India for the time being, that can put you at once on a level with a scavenger, I will withdraw the spinning wheel and hug that other thing in a moment. Now you will perhaps understand why I go about from door to door shamelessly and ceaselessly with the begging bowl and beg of every one to put something into it if they will do so with a willing heart." (Gandhiji in Ceylon. page, 128-34, To the students)

"যদি তোমরা আমার যুক্তি ভালো ভাবে অনুসরণ করে থাকো তাহলে চরকার বাণী বুঝতে তোমাদের কোন বিলম্ব হবে না। ভগবানের শক্ত হাত আমি চরকার মধ্যে নিয়ত দেখতে পাই। দীনতম ব্যক্তির চাহিদা মেটাবার উপায় আমি চরকায় দেখতে পাই, এবং তারই জন্য দিনরাত্রি শীত, বসন্ত, বর্ষা সকল সময়ে চরকার কথা ভাবি, চরকায় কাজ করি, চরকার জন্য প্রার্থনা করি এবং চরকার প্রচার করি। শুধু ভারত কেন, পৃথিবীতে ক্ষুধিত জনতার নিকটবর্তী হবার জন্য এবং দীনতম মেথরের সাথেও একাসনে বসার জন্য যদি চরকা ছাড়া তোমরা অন্য কিছু উৎকৃষ্টতর যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারো, তবে মুহূর্তমাত্র সময় দ্বিধা না করে আমি চরকাকে বিসর্জন দেবো এবং সেই অন্য কিছুকে গ্রহণ করে নেবো। এখন হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে কেন আমি দিনের পর দিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে নির্লজ্জের মতো ক্লান্তিহীন ভাবে ভিক্ষা করে বেড়াই চরকার জন্য, যারাই যা কিছু হৃদয়ের টানে দেয়, তা আমি গ্রহণ করি।"

এই যথেষ্ট। আশাকরি এখন বুঝতে কষ্ট হবে না যে চরকার স্পিরিটটা গান্ধীজী

কিভাবে ধরতে চেয়েছিলেন। সমস্তপ্রকার দরিদ্র জনতার সঙ্গে একাত্মা হবার উপায় হিসেবেই চরকা একটা সাধারণ মাধ্যম বা মিডিয়াম ও জীবন্ত যোগসূত্র। চরকাটাই শেষ কথা নয়। চরকা কোন উদ্দেশ্য নয়, চরকা হচ্ছে একটি সিদ্ধান্তে পেঁছাবার সূত্র মাত্র, (means to an end), এর সাহায্যে সকলকে আলিঙ্গন করা যায়। দিনরাত্রি অনবরত কত না ঘুরিয়েছেন চরকা, এবং কত সুতোই না কেটেছেন। মহা-মহা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, জটিলতম বিষয়ে আলোচনা করার সময়েও চরকা কেটে চলেছেন তিনি। নিজের প্রয়োজনে যতটুকু কাপড় দরকার, তা তো তিনি কাটতেনই, নিজের যাবতীয় খাইখরচের দামও হয়তো চরকা থেকেই তাঁর ওঠে আসতো। টলস্টয়ের ব্রেড-লেবার (Bread Labour) নীতিও গান্ধীজী গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ যে যত বুদ্ধিজীবী বিদ্বান, শিল্পী, বিজ্ঞানী হোক না কেন, প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কায়িক শ্রম করতে হবে। নিজের মোটা কাপড় এবং খাদ্যের খরচটা কোন না কোন কায়িকশ্রম থেকেই তুলে নেওয়া উচিত এবং সম্ভব...একথা গান্ধীজী বলেছেন, এবং নিজের জীবনে তা অনুসরণ করেছেন। বিদ্বান লোকের হাতের কাজ করতে নেই, বা করার সময় নেই, একথা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, ওটা একটা বাজে ছুতো, আর অহংকার মাত্র। তাছাড়া কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী হলে মানুষের চরিত্রের ও প্রতিভার সবদিক খোলে না, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটাতে হলে জীবনের সব রকম কাজের মধ্যে, বিশেষকরে কায়িকশ্রমের সাথে নিযুক্ত থাকা চাই। তা নাহলে একপেশে ও বিকৃত রুচি জন্মে। গান্ধীজীর পুত্র মনিলাল বলেছেন, তাঁর পিতার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের প্রতিদিন মাটি কাটতে হতো কোদাল দিয়ে। কিন্তু দুপুরের চড়া রোদ্দুরে গান্ধীজী মাটি কাটতেই থাকতেন, ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তো। বুদ্ধির দিক থেকে প্রতিভা ও শিক্ষার দিক থেকে গান্ধীজী কিছু কম লোক ছিলেন না, কিন্তু তিনি টলস্টয়, এমারসন, ও থরোর মতো শারীরিক শ্রমটাকে একটা পরম আনন্দের জিনিস বলে মনে করতেন।

শারীরিক শ্রম সম্বন্ধে আজকে আমাদের যে একটা বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা এসেছে, তার কারণ ঐতিহাসিক সামন্তযুগে ও ধনতন্ত্রে শ্রমজীবী জনসাধারণের যে দুঃসহময় জীবন ও বিশ্রামহীন ক্লান্তিকর কাজ করতে হতো, এবং যে নির্যাতনে অপমানের মধ্যে পশুর মতো খাটতে হতো, তাতে শ্রম জিনিসটার সঙ্গেই একটা দাসত্বের চিহ্ন যেন জড়িয়ে আছে। সেই শ্রমনিপীড়িত জনতার কাছে শ্রমহীন সর্বৈব বিশ্রামপূর্ণ বিলাসিতা ও অলসতাপূর্ণ ধনীদের জীবনকেই আদর্শ ও পরমারাধ্য জীবন বলে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই কুৎসিত ও জঘন্য ক্লান্তিকর দাস পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের শ্রমবিমুখতা আসা স্বাভাবিক। ধনতন্ত্রের পরিণত অবস্থায় নানা যন্ত্রশিল্পের ব্যবহারের দরুণ মানুষের শ্রমের লাঘব হয়েছে সত্যি, কিন্তু শ্রমিক জীবনে কাজগুলি এমন একঘেয়ে, রুচিহীন দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়েছে যে তাতে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে সৃষ্টিশীলতার আনন্দ, না আছে বুদ্ধিবৃত্তি খাটাবার মতো অবসর। 'A cog in the wheel'—যন্ত্রেরই একটা নিরুপায় অংশ হিসেবে তাকে দিনের পর দিন কাজ করে যেতে হয়। কুটিরশিল্পের যুগে প্রত্যেক শিল্পীকে তার শিল্প নিয়ে

অনেক মাথা ঘামাতে হতো। নিজের হাত ও বুদ্ধিকে পটু করবার দরকার হতো, জনতার রুচিকে খুশী করতে হতো। ফলে, তার আর্টিস্টিক গুণগুলিও বিকশিত হতো, কিন্তু আজ কারখানার শ্রমিকের সে সবের বালাই নেই। অব্যবহারে তাদের বুদ্ধি ও সৃষ্টিশক্তি যাচ্ছে ভোঁতা হয়ে, কাজটা তার কাছে একটা একঘেয়ে মেহনৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে কাজ সম্বন্ধে তার উৎসাহ ও আনন্দ নেই। তার উপর মালিকের শাসন ও ধনতান্ত্রিক শোষণ তো আছেই। ফলে কর্মবিমুখতা ও কর্মের প্রতি বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া সম্মানিত জীবন আজ তারই, যার কোন কাজ করতে হয় না, এই হলো ধনতান্ত্রিক জগতের আদর্শের মাপকাঠি। ফলে কাজ যাতে না করা যায়, এমনি ধরণের চেষ্টা লেগেই আছে, সমাজের সর্বস্তরে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, ভারতের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের মধ্যেও এই মনোবৃত্তির একটা সূক্ষ্ম প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তারাও কাজটাকে একটা প্রয়োজনীয় খারাপ জিনিষ (নেসেসারি ইভিল) হিসাবেই গ্রহণ করে। জীবনটাকে যতদূর সম্ভব একটা বিশ্রামাগার হিসেবেই তৈরী করবার মোহ যে তাদের চিন্তাকে আকৃষ্ট করেনি, একথা বলা যায় না। ফলে তারা কেবলই যন্ত্রপাতির স্বপ্ন দেখে থাকে, অতি যান্ত্রিকতার মোহে তারা গান্ধীজীর কায়িকশ্রমবাদকে নিন্দা করে, যেন একদিন গোটা কয়েক সুইচ টিপেই যদি চাষবাস, কলকারখানা, লোকের শোবার ঘরে বসেই তৈরী করে নেওয়া যায়, তবেই স্বর্গরাজ্য তৈরী হবে। অবশ্য এটা তাদের সুচিন্তিত মত নয়, বা বইয়ের লেখাও নয়। তবু মনোভাব হিসেবে, কায়িককাজের প্রতি বিরাগটা তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও কথাবার্তার ঢং থেকে ধরা পড়ে। এই কাজের প্রতি বিরাগটা ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে নেওয়া, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আমরা ভুলে যাই ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতি-ক্রিয়া হিসেবে আমাদের চোখে যেসব স্বপ্ন জাগে, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে আদর্শ হিসেবে নাও থাকতে পারে। ধনতান্ত্রিক সমাজে কাজের দ্বারা উৎপীড়িত সাধারণ মানুষ গলদঘর্ম হয়ে হয়তো এমন স্বপ্ন দেখতে পারে যে, এমন সমাজ যদি হয় যাতে মানুষকে কাজ করতে হবে না, শারীরিক শ্রমই করতে হবে না, তবে সেটা বাস্তব বা সুন্দর স্বপ্ন নয়, একটা অবাস্তব প্রতিক্রিয়া মাত্র। একটা নিরন্ন ভিখারীর কাছে এমন স্বপ্ন মোটেই অযৌক্তিক বা অন্যায় নয় যে তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সমাজ এমন হবে যে, চব্বিশ ঘণ্টা খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই তার থাকবে না। কিন্তু আমরা জানি তেমন স্বপ্ন ভিখারীটি খাবার পাওয়া মাত্র আর দেখবে না। এটা স্বাভাবিক নিয়মও নয়। কর্মহীন, শ্রমহীন জীবন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিকূল। যত আমরা প্রকৃতির সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুর দিকে নজর দিয়ে দেখি, ততই আমরা বুঝতে পারি, মানুষের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অণু-পরমাণু থেকে প্রতিটি জীবনের কোন না কোন কাজ আছে, এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্যেই সকলের জীবনের পূর্ণতা রয়েছে, তা যদি ব্যবহার না করা হয় তবে সেই জীবনের অঙ্গ সমূহ শীর্ণ, দুর্বল ও অক্ষম হয়ে শেষপর্যন্ত শূন্য হয়ে যেতে বাধ্য। জীবন একটা চলমান শক্তি এবং এই শক্তি কেবল মস্তিষ্কশক্তি নয়। মস্তিষ্কটাও শরীরের খরচে তৈরী হয় না, যেমন মস্তিষ্কের খরচে শরীরও গঠিত হয় না। ডঃ ভারতন কুমারাপ্পা শ্রমহীন জীবনের বিষম পরিণতি

সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিশুদের জীবনকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "Watch a child, who is nearer to nature than we, who have become spoilt through dead habit and custom. In so far as it is full of life, it is full of activity. It hates being told to do this and not to do that. It never tires of repeating the same sound or movement, On the other-hand, it enjoys it for the sheer fun of activity. What it hates most is bed, a symbol to it of rest and inaction. Nature evidenty meant us for well neigh incessant activity" (Capitalism, Socialism or villagism, page-88 Dr. Kumarappa)

"শিশুদের লক্ষ্য করুন, শিশুরা আমাদের চেয়ে প্রকৃতির খুব কাছে আছে··· আমরা মৃতপ্রায় অভ্যাস ও প্রথায় নষ্ট হয়ে গেছি। শিশুরা যে পরিমাণে যত সক্রিয়, সেই পরিমাণে তারা জীবন্ত। এটা কর, ওটা কর না···এমন ধরণের বাধানিষেধকে ওরা ঘৃণা করে। একই শব্দ, একই প্রকার অঙ্গসঞ্চালনে ওদের ক্লান্তি নেই। বরং এই করে ওদের আনন্দের অবধি নেই। এই সক্রিয়তাই ওদের আনন্দের উৎস। যা ওরা সবচেয়ে ঘৃণা করে, তা হলো বিছানা, যা হচ্ছে বিশ্রাম ও নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। প্রকৃতি আমাদের জন্য বিরামহীন কর্মতৎপরতারই ব্যবস্থা করেছে।" শ্রমের লাঘব করা, শ্রমের কদর্যতা দূর করা, পরশ্রম চুরির ব্যবস্থা রদ করা এক জিনিষ, তার শ্রমবিমুখতাকে কৃষ্টি বা কালচার বলে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। শোষণমুক্ত স্বাধীন শ্রমজীবীরা কাজ করে আনন্দ পাবে এবং তা পাওয়া উচিত···এই কথা গান্ধীজী বলেছেন। বিশ্রামাগার তৈরী করে ফেলাই আদর্শ-সমাজের লক্ষ্য নয়, যারা বিশ্রামেই জীবন কাটিয়ে দেয়, আজকের ধনীলোকেরা যেমন, তাদের বিশ্রাম দিয়ে তারা কি করে? অলস বিলাসিতার স্বর্গ কি তাদের জীবনকে কুৎসিত করে তোলে নি, তাদের জীবন অর্থহীনতায় ভরে ওঠে নি? কাজ করে না বলেই মদ, ঘোড়দৌড়, ছুটোছুটি ইত্যাদির সাহায্যে তারা জীবনে একধরণের বিকৃত উত্তেজনা খুঁজে বেড়ায়, ফলে নানা পাপের সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্র মানে সকলের জন্য ধনতন্ত্রের জীবন-বিলাসকে কায়েম করা নয়, ধনতন্ত্রের মূল্যবোধ ও জীবনবোধ দিয়ে সমাজতন্ত্রের মূল্য ও জীবনবোধ যারা সৃষ্টি করতে চায়···তারা ভুল করছে। গান্ধীজীর মতে শারীরিক পরিশ্রমে যে আনন্দ আছে এবং তাকে যে আনন্দের আধারে দাঁড় করানো যায়, এই তথ্যকে অবহেলা করা উচিত নয়। একমাত্র চরকাই যে এই কাজের উপায়, তা নয়। কোন না কোন উপায়ে শারীরিক শ্রম প্রত্যেককেই দিতে হবে। তবে তাঁর কাছে, সবার পক্ষেই, সব অবস্থার লোকের পক্ষেই চরকা চালানো যত সহজ, এমন সর্বজন প্রযোজ্য ছোট হাতযন্ত্র তিনি আর কিছু ভেবে পান নি। তাছাড়া কাপড়ের প্রয়োজন সবারই। এজন্য চরকাজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাব হওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ সমাজ চিরকালই চরকার সাহায্যেই বাধ্যতামূলক শ্রম দেবে, এমন কোন কথা তিনি বলেননি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সব দিক বিবেচনা করে তিনি চরকাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে দেখতে পান। বাস্তবিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে, অর্থাৎ যে যে উদ্দেশ্যে সবাইকে চরকা

ধরতে বলেছেন, সেইসব উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এমন কোন অন্য জিনিষ বা যন্ত্র চরকা ছাড়া অন্যকিছু কেউ বাংলাতেও পারেন নি। ফলে কংগ্রেস-অনুগামী মাত্রেই চরকা ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন, চরকা সম্বন্ধে অনেক ওজর-আপত্তি ও মতানৈক্য থাকা সত্বেও। চরকা ছাড়া এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কোন উপায় দেখাতে পারলে গান্ধীজী তা নিতে রাজী ছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এবং শ্রম বলতে তিনি চরকাকেই বোঝান নি। যে কোন উপায়ে শ্রম দেওয়া চাই, সমাজের কল্যাণ-মূলক কাজে শারীরিক উপায়েও যুক্ত থাকা চাই। তিনি যে চরকাকে চিরকালের যন্ত্র হিসেবে ধার্য করে যাননি, সেকথা ডঃ ভারতন্ কুমারাপ্পার লেখা থেকে বোঝা যায়। ডঃ কুমারাপ্পার বই Capitalism, Socialism or Villagism, মহাত্মাজীর মুখবন্ধ দিয়ে শুরু। তার মানে মহাত্মাজী কুমারাপ্পার বক্তব্য হুবহু তাঁর মত এতটা না বললেও, তাতে যে তাঁর সমর্থন আছে তা বুঝতে হবে, নাহলে তিনি কুমারাপ্পার বই পাঠকদের জন্য অনুমোদন করবেন কেন? তাছাড়া আমরা সবাই জানি, ডঃ ভারতন্ কুমারাপ্পা গান্ধীজীর একজন প্রধানতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি তাতে লিখেছেন, "If spinning is recommended today, it is only because our masses are becoming demoralised for lack of adequate employment. For them to earn even a pice an hour through spinning is better than to lose all hope and faith in themselves. When everyone is otherwise profitably engaged, there will be no need for people to spin and one can conceive of yarn being manufactured at that time by spinning mills run by the state, or co-operatively by the people. and being woven into cloth by cottage weavers." (Dr. Bharatan Kumarappa, Capitalism, Socalism or Villagism, page-135)

"উপযুক্ত কাজের অভাব বলেই আজ জনতাকে চরকা গ্রহণ করার প্রয়োজন। সুতো কেটে ঘণ্টায় এক পয়সা যোগাড় করতে পারাটাও আজ তাদের কাছে শ্রেয়, কেন না তা নাহলে তাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস থাকছে না, নৈতিক পতন ঘটে যাচ্ছে। একদিন যখন তারা অন্য কোন উপায়ে লাভজনক রুজিরোজগার করতে পারবে, তখন তাদের চরকার প্রয়োজন থাকবে না, এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়োজিত সুতোকল বা জনতার সমবায়ের পরিচালিত সুতোকল থেকে সুতো তৈরী এবং ঘরে ঘরে তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনে নেওয়ার প্রবর্তন হতে পারবে।" এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গান্ধীজীর মতে ভবিষ্যতে সুতো তৈরীর কাজটা সর্বসাধারণের সুতোকল দিয়েও করতে পারা যাবে, কিন্তু যে সময় সকলের সুতো কাটা ছাড়া অন্য উপায়ে বেশী রোজগার করার মতো সঙ্গতি ও অবস্থা আসবে, সে রকমের পরিস্থিতিতে। এতে অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের শ্রমদান সম্পর্কিত দায়িত্ব শেষ হয় না। ভদ্রলোকেদের, ভদ্রমহিলাদের শ্রমদানের কাজটা এর-ফলে অবসান হয় না। আপন আপন শিক্ষা ও বুদ্ধিসম্মত কাজ ছাড়াও তাদের যে কোন ধরণের শারীরিক শ্রমের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করার অপেক্ষা অবসর সময়ে চরকা কাটা অতি সহজ উপায় বলেই মনে হবে। যাই হোক,

শ্রমের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী জনতার সাথে একাত্ম হবার যে প্রাত্যহিক কাজ, সেটাকে গান্ধীজী একটা নিত্যকার পূজার মতোই সাধনা বলে মনে করতেন। গান্ধীজীর এই শ্রমযোগটা কর্মযোগেরই একটা বাস্তব রূপ। ভারতন্ কুমারপ্পার ভাষায় গান্ধীজীর মর্মকথাটা বেশ ফুটে উঠেছে—"Work in such a society will be a worship in the real sense of the word, a means of identifying oneself, not merely in thought but in deed, with the wider self of community and thus with the universal self of all being. Economic life will then be raised to a spiritual level, and instead of work being degraded into servitude done anyhow merely with the idea of earning one's bread, it will become transformed into a means of reaching Divine, a labour of love, done for the good of one's neighbours, and leading the individual out of his little self into the widerself of the community and thus to the Universal self which abides in all alike." (B. K.) Ibid page-198)

"এরকম সমাজে শ্রম হবে সত্যিকার পূজা, যার সাহায্যে শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও সমাজের বৃহত্তর সত্বার সাথে নিজেকে বিলীন করার উপায় হবে এবং সর্বভূতে যে একই সত্বার সাথে নিজেকে বিলীন করার উপায় হবে এবং সর্বভূতে যে একই সত্বা, তারই সাথে যোগসাধনের উপায় হবে। অর্থনৈতিক জীবনটাও তখন একটা আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হবে। তখন শ্রমের এমন দাসত্বের রূপ থাকবে না, আজকের মতো, যখন কোনও রকমে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য দায়সারা হিসেবে কাজ করতে হয়। পরমাত্মাকে লাভ করার সোপান হিসেবে, মানুষের প্রতি প্রেমের প্রকাশ হিসেবে, নিজের প্রতিবেশীর উপকারে কাজ হবে মহান এবং তা নিজেকে নিজের ক্ষুদ্র আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে বৃহৎ সমাজের সাথে যুক্ত করবে ও যে মহান সত্য সকলেরই মধ্যে বর্তমান, তাকে উপলব্ধি করার উপায় হবে।" কর্মযোগী গান্ধীর শ্রমযোগের গূঢ়তম তাৎপর্য হলো এই।

গান্ধীজী এখানেই শেষ করেননি। তিনি আরো এগোলেন। ধীরে ধীরে এই পথ অনুসন্ধান করতে করতে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা বা বেসিক এডুকেশন-এর আবিষ্কার করে যান, তা-ও একটা বিরাট ব্যাপার। সে কথায় আলোচনা পরে করা হবে। এখন শুধু এটাই জেনে রাখা দরকার, কায়িকশ্রমের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, কায়িকশ্রমের মধ্যে আনন্দ আছে, তা দেখিয়েও তিনি চুপ করে থাকেন নি, কায়িকশ্রমে মুক্তি আছে, এটাও শেষ কথা নয়, তিনি কোন না কোন শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের পথকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে প্রদর্শন করেছেন···যার নাম বুনিয়াদি শিক্ষা। যে পদ্ধতি সম্পূর্ণ কার্যকরী ও অত্যন্ত আধুনিক বলে বিশ্বজগতে স্বীকৃত হয়েছে। অতএব শ্রমটাকে তিনি কদর্যতার আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে গেছেন। তাঁকে আদর্শশ্রমিক ও শ্রমজ্ঞানী বলা যায়।

নৈতিক দিক থেকে প্রত্যেকের কেন চরকা কাটা উচিত সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে বাদানুবাদ করার সময় অদ্ভুত জোরের সঙ্গে বলেছেন, "Give them work that they may eat. 'Why should I, who have no need to work for food, spin ?' may be the question asked. Because I am eating what does not belong to me. I am living on the spoilation of my countrymen. Trace the source of every coin that finds its way into your pocket, and you will realize the truth of what I write. Every one must spin. Let Tagore spin, like the others. Let him burn his foreign clothes, that is the duty today. God will take care of the morrow. As it says in the Gita, Do right !

"এই নিরন্ন জনতা যাতে খেতে পায় তারজন্য কাজ কোথায় ! প্রশ্ন হতে পারে, 'যার খাবারের জন্য কাজ করার দরকার নেই, সেই আমি কেন সুতো কাটবো ?' যেহেতু যা আমি খাই তা সত্যি আমার নয়। আমার দেশবাসীকে লুণ্ঠন করে আমি বেঁচে আছি। তোমার পকেটের প্রত্যেকটি পয়সার আগমন কাহিনীটির সন্ধান করে দেখো, তক্ষুনি আমার কথা মানতে হবে। প্রত্যেকের সুতো কাটা চাই। অন্য সকলের সাথে রবীন্দ্রনাথও সুতো কাটুন। তাঁর বিলিতী কাপড় পুড়িয়ে ফেলুন, আজকের দিনে এইটেই কর্তব্য। আগামীকালের ভাবনা ভগবানের। গীতাতে রয়েছে—কোন কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কর্তব্য করে যাও।"

শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার যে পথ গান্ধীজী আবিষ্কার করেন, তার নাম দিয়েছেন, 'নই-তালিম'। শিক্ষাজগতে এ এক বিরাট পদক্ষেপ। ইংরেজরা আমাদের দেশে যে কেতাবী বিদ্যার ব্যবস্থা করেছিল, তা ছিল কেরাণী তৈরীর প্রয়োজনে, আমাদের স্বাধীন চিন্তা করবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেবার জন্য এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের ও শিক্ষিতদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দেবার নিমিত্ত। এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে বিরাট গলদ ছিল, একথা আজ সবাই স্বীকার করেছেন। গোলামখানা তৈরী হয়েছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় ভারতবাসীর হয়েছিল, তা এইসব বিদ্যালয় থেকে মোটেই হয় নি, কিন্তু পরিণাম দিয়ে যদি কোন নীতির বিচার করতে হয়, তবে এদের দান মোটেই মস্ত বড় কিছু একটা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হতাশাব্যঞ্জক। জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে আমাদের যতটুকু পরিচয় হয়েছিল তা এমনি ভাসা ভাসা যে, জনজীবনে তার কোন শিকড় গজায় নি। বরং বলা যায় যে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় আসলে জনসাধারণ যত নিরক্ষর ও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছিল, এই ধরণের জ্ঞানহীন ভারতবাসীরা পূর্বে কোন কালেই ছিল না। মনে হবে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতের জনজীবনে অন্ধকারই সৃষ্টি করেছিল। আর যারা মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক প্রত্যক্ষভাবে লেখাপড়া করবার সুযোগ পেয়েছে, তারা বেশীরভাগ জনতা থেকে ছিন্নমূল হয়ে পরগাছার মতো শহরে বাস করছে এবং তাদের জীবন অতিশয় হালকা ও মেকী জ্ঞানের চাকচিক্যে অলংকৃত ও অহংকৃত। তাদের চরিত্রবল অতি সামান্যই

বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় বাহন হিসেবেই কাজ করেছে। ব্যতিক্রম যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনো সাধারণ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে না। শিক্ষিত শ্রেণীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত হয়তো দাঁড়িয়েছিল, সেটা ততটা বৈপ্লবিক কারণে নয়, যতটা প্রতিক্রিয়াজাত। হয়তো এই বর্ণনার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু আজ ভারতের নানা দিকে যে সমস্ত গ্লানি ধরা পড়েছে এবং স্বাধীন ভারতেও শিক্ষিত সমাজের চারিত্র্যগুণের অভাব যে বিপুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে তাতে এ ধরণের বিচারকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যাই হোক, এই নিয়ে হয়তো অনেক তর্কের স্থান আছে। অভিরুচি অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিপরীত মত নিয়েও হয়তো অনেকে গলাবাজী করতে পারেন, কিন্তু কোটি কোটি ভারতের নিরক্ষর জনতার হিসেব নিতে যখন আমরা বসবো, তখন এইসব তার্কিকেরা বেশী আড়ম্বর করে বলতে পারবেন না নিশ্চয়। তাছাড়া আজকের স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানপিপাসা বিমুখী হয়েছে, যে পরিমাণে, শিক্ষিত সমাজে হতাশা বা ফ্রাস্ট্রেশনের ঢল নেমেছে, যে পরিমাণে হালকা রুচির জোয়ারে ভেসে চলেছে, সেই পরিমাণে চিন্তাশীলতা ও মননশীলতার অভাব দেখা দিয়েছে। তাতো এই শিক্ষাভিমানীর দলও চুপ হয়ে বসে দেখে যাচ্ছেন এবং চারদিক থেকে আজ এই প্রত্যয়টা মাথা চড়া দিয়ে উঠছে যে আমাদের শিক্ষাটা যেন পরগাছা-জাত, এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন-সংগ্রামের কোন বাস্তব সম্পর্ক নেই, এর সঙ্গে দেশগঠনকার্যের কোন সহযোগিতা নেই, এর সঙ্গে কর্মের কোন যোগাযোগ দেখা যায় না। এ শিক্ষা না থাকলেও লোকে বোকা বলে, কিন্তু এই শিক্ষায় দুটি অন্ন সংগ্রহ করাও সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষিত লোকেরা শুধু চাকুরী পায় না তাই নয়, তারা কাজের অযোগ্য বলেও বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণ জ্ঞান বা কলাবিদ্যাশাখা শিক্ষা তো দূরের কথা, এখনকার বিজ্ঞানের শিক্ষাটাও ভাসা ভাসা। প্রত্যক্ষ জীবন ও কর্মজীবনের সাথে তার নাড়ীর যোগ আজ ছিন্ন হয়ে আছে। অবশ্য আজকাল টেকনিক্যাল এডুকেশন বা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার উপর খুব জোর পড়েছে এবং দেশ গঠনের সাথে সাথে এই প্রযুক্তি শিক্ষারও বিস্তার ঘটেছে বহুল পরিমাণে।

কিন্তু শতকরা সত্তর ভাগ লোক যেদেশে নিরক্ষর, তাদের শিক্ষার সমস্যাটাই হলো সত্যিকারের শিক্ষার সমস্যা। বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি কারণ এই শিক্ষা প্রবর্তন করতে গেলে বছরে দুইশত কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার বলে হিসেব নেওয়া হয়েছে। আমাদের যা হচ্ছে তা হলো, দেশগঠনের জন্য আমরা শিল্প তৈরী করবো, না শিক্ষার জন্য অতো টাকা খরচ করতে যাবো—এ যেন হলো 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' জাতীয় সমস্যা। দ্বিতীয় কথাটি হলো, আমাদের এই জনসাধারণ এই তথাকথিত শিক্ষা দিয়ে করবে কি? এই ভাবনাটা গ্রামের দরিদ্র জনসাধরেণের মধ্যেও যে জাগছে না তা নয়। কারণ তারাও দেখছে যে, যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে তাদের জীবনযাপন সমস্যার কোন উন্নতি হয় না। চাষার ছেলে ইস্কুলে পড়লে চাষই শুধু ভুলে যায়, তাই নয়, তারা এই শিক্ষাতে চাষটাকেও ঘৃণা করতে শেখে এবং অশিক্ষিত চাষী বাপ-মাকে অবজ্ঞা করতে শিখে

যায়। কুটিরশিল্পীর দরিদ্র ছেলে ঘর থেকে হয়তো বাপকে একটু আধটু সাহায্য করে, কিন্তু স্কুলে পড়াশোনা করার পর তার সঙ্গে আপন গৃহের অন্তর থেকে একটা বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে। এদিকে কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় সেই বিদ্যেতে সে না পারে কিছু রোজগার করতে, না পারে বাপ-পিতামহের কাজ করতে। ফলে দেখা যায় বছরে বছরে অক্ষরজ্ঞান যতটা বাড়ছে, ছেলেমেয়েরা তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় অক্ষর জ্ঞান ভুলে যাচ্ছে। তাই গ্রামে স্কুল-পাঠশালা ইত্যাদি জনজীবনে শিক্ষার কোন স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে না, পড়ুয়ারা একদিকে যা শেখে, অন্যদিকে তা ভুলে যায়। কেন এমন হয়? যেহেতু শিক্ষার কোন অর্থনৈতিক ভিত নেই, এ শিক্ষার কোন সামাজিক তাৎপর্য নেই, এই শিক্ষার অধিকাংশ ভাগটাই একটা সাজানোর অলংকার মাত্র। জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার দেহে অলংকার শোভা পায় না, তা সুদৃশ্যও হয় না, উপরন্তু তা বদহজম হয়ে অযথা অনেক রকম উৎপাত সৃষ্টি করে। তাছাড়া এই শিক্ষার খরচই বা আসবে কোথা থেকে? যেখানে দিনকে দিন লোকের প্রকৃত আয় যাচ্ছে কমে, সেখানে এই অর্থহীন শিক্ষার অলংকার একটা বোঝা মাত্র। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে কুশিক্ষাই জোরদার হয়, মিথ্যা অহংকারের প্রশ্রয় হয়, ব্যক্তিবাদী চিন্তা, অসামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বার্থপর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। পতনশীল ও স্বার্থপরতার আবহাওয়া বিষিয়ে ওঠে। ধনীসমাজের অন্ধ অনুকরণ বেড়ে যায়।

গান্ধীজী দেখালেন যে কোন না কোন প্রকার কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতের কাজের মধ্য দিয়ে (ক্রাফ্‌ট্‌) ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হলো বুনিয়াদি শিক্ষা। লোককে লেখাপড়া বা জ্ঞানবিজ্ঞান শিখিয়ে কোন লাভ নেই, তাদের হাতের কাজ শেখাতে হবে বা প্রযুক্তি জ্ঞান দিতে হবে, একথার অর্থ কিন্তু তা নয়, একেবারেই নয়। আবার কতকটা লেখাপড়া ও কতকটা হাতের কাজ, এমন ভাগাভাগিও নয়। হাতের কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক জ্যামিতি, কৃষিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানাদি শেখাতে হবে। তিনি বলেন যে এই হাতের কাজের মধ্য দিয়ে, বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে মাথার ও হৃদয়ের জ্ঞান দ্রুততর ভাবে বিস্তার লাভ করে ও স্থায়ীভাবে সেই জ্ঞান সঞ্চিত হয়। এই ধরণের শিক্ষার এক সুদূরপ্রসারী দার্শনিক যুক্তি আছে। লোকে ভাববে এ আবার কি কথা? এতে মানুষ মজুর তৈরী হবে, জ্ঞানী হবে না, বিদ্যা বুদ্ধির বিরুদ্ধে এ একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা মাত্র, কেননা তারা এই ভেবে এসেছে যে তাদের ছেলেমেয়েদের যদি কখনো কোন কাজ করার ঝামেলা না থাকে, সংসারে দাসদাসী রেখে সকল প্রকার ঝঞ্ঝাট থেকে ছেলেকে সরিয়ে রেখে যদি সর্বদাই পড়ার টেবিলে পড়ার পর পড়া, জ্ঞানের পর জ্ঞানের বোঝা দিয়ে আটকে বেঁধে রাখা যায়, তবেই সবাই পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক হয়। তা যে হয় না, হচ্ছে না, তা তো আমরা ঘরে ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। বরং পড়াশোনার উপর ছেলেমেয়েদের বিতৃষ্ণা যে পরিমাণে বেড়ে চলেছে, ভাবনা চিন্তা করার ব্যাপারটি যেভাবে এড়িয়ে চলবার সহজ পন্থতি হয়ে আছে, তাতে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত। তার চরিত্র গঠনের কথাতো বাদই দিলাম। গান্ধীজী বহু পূর্ব থেকেই এই 'নই-তালিমের' মাধ্যমে শিক্ষার নানা

গবেষণা করে এসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ফিনিক্স্ সেটেলমেণ্টে' টলস্টয় ফার্মে ১৯০৪ সাল থেকেই তাঁর গবেষণা চলেছে, কি করে সত্যিকার প্রাণবান শিক্ষা দেওয়া যায়। সাধারণ কায়িকশ্রম দিয়ে ছেলেদের ধীরে ধীরে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিজের ছেলেদেরও তিনি কোনও দিন স্কুল কলেজে পড়ান নি। এ নিয়ে তাঁর স্ত্রীর ও পরিবারবর্গের অন্যান্যদের কম অসন্তোষ তাঁকে সামলাতে হয়নি। কিন্তু তিনি নির্ভীক বৈজ্ঞানিকের মতো শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব আনবার জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত নঈ-তালিম নামক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামোটা তৈরী করে যান। যদিও বেসিক-এডুকেশনের যাবতীয় বিষয়াদির ও নানা সমস্যার সবই তিনি মীমাংসা করে যান নি, অতো সময়ও তাঁর ছিল না কখনো। তাঁর বিপুল কর্মবহুল জীবনে কোন বিশেষ একটি কাজের জন্য বেশি ফুরসত বা অবসর তাঁর কখনো মেলে নি। কিন্তু তিনি পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। এবং আজ ভারতে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই নঈ-তালিমের ভিত্তিতে নতুন করে স্থাপন করার আয়োজন চলেছে এবং বিশ্বে তাঁর এই নঈ-তালিমের দানকে অনেকেই স্বীকার করতে শুরু করেছেন।*

আমরা এ-ও দেখবো, এই জাতীয় চিন্তা একা গান্ধীজীর মাথায়ই আসে নি, এর পূর্বেও অনেক মনীষী এই ধরনের চিন্তায় কতকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা গান্ধীজীর মতো এতোটা হাতে কলমে অগ্রসর হতে পারেন নি। সেকথা পরে হবে। এখানে গান্ধীজীর কথাটাই বলা যাক্। শিক্ষার নয়া ব্যবস্থাটা কি করে চালু করতে হবে সে সম্বন্ধেও গান্ধীজী গোটাকয়েক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। তার একটি হলো, এই শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। শিশু ও ছেলেমেয়েরা হাতের যেসব কাজ করবে তা থেকে যে আয় হবে তাতে শিক্ষার অনেকটা খরচ উঠে আসবে। এই ব্যাপারে অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন এই বলে যে এর দ্বারা

* একথা ঠিক নয়। যদিও খুব ধুমধাম করে নঈ-তালিমের শিক্ষা চালু করা হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে সমর্থনের অভাবে তা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এর কারণ অবশ্য সভ্যতার লক্ষ্যচ্যুতি। নঈ-তালিম শিক্ষাদীক্ষায় যে ধরনের সেবামূলক মনোবৃত্তি গঠিত হয়ে ওঠার কথা, তার সঙ্গে বর্তমান আগ্রাসী ও রাক্ষুসে সভ্যতার কোন মিল হচ্ছিল না। ফলে কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে দুই ধরণের শিক্ষার, দুই রকমের নাগরিক সৃষ্টি হচ্ছে। যারা গরীব ও গাঁয়ের লোক, তাদের জন্য নঈ-তালিম, আর যারা অবস্থাপন্ন, তাদের জন্য সাহেবী ধরনের পাবলিক স্কুল-কলেজ, ইংরেজী মিডিয়ামের স্কুল, বিদেশে পাঠিয়ে পুরো সাহেব বানাবার শিক্ষাদীক্ষা। এমন কি নঈ-তালিম বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে পড়াতে শুরু করেন! ফলে গোটা জিনিষটাই একটা প্রতারণা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু প্রচলিত এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠছে বা শিক্ষা পেয়েছে বলে ডিগ্রি মিলেছে, তারা না পাচ্ছে কোথাও চাকুরী, না পারে কোন হাতের কাজ করতে। কায়িকশ্রমের প্রয়োজন হয়, এমন কোনো কাজেও তাদের মন নেই। ফলে অকর্মণ্য এক তথাকথিত লেখা-পড়া জানা ছেলেমেয়ের দল একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার শুরু হয়েছে এক নতুন প্রচেষ্টা, যাকে বলা হয় 'ওয়ার্ক-এডুকেশন'। যদি নঈ-তালিম শিক্ষাব্যবস্থাই হেরে বা ফেল করে থাকে তবে ওয়ার্ক এডুকেশন সার্থক হবে কেন? এখানেও চলছে ফাঁকিবাজি। আসলে সভ্যতার মডেলটি আমাদের ভুল। সভ্যতা সম্বন্ধেই যদি নানা বিকৃত ধারণা থেকে থাকে, তবে শিক্ষায় ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন প্রথমেই পড়বে।

শিশুশ্রমের অপব্যবহার হবে। অর্থাৎ শিক্ষার খরচ যদি শিক্ষার্থীকেই পরিশ্রম করে ওঠাতে হয় তবে তাতে শিশুশ্রম শোষণ ব্যবস্থাই চালু হবে। কিন্তু গান্ধীজী শিশুদের শ্রম শোষণ করতে বলবেন বা সেদিকে উৎসাহ দেবেন, এ-ও-কি বিশ্বাস করতে হবে! তাঁর মতো শিশুদরদী কম লোকই ছিল। তিনি অনেক যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, শিশুরা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে যেসব কাজ করবে, তার একটা উৎপাদন হবে। প্রথম বছর তাতে কোন আয় না হলেও পরবর্তী বছর থেকে আয় হতে থাকবে এবং দেশের লোক নিজেদের ছেলেমেয়েদের তৈরী জিনিষ ক্রয় করতে বরং গর্বই অনুভব করবে। প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষাকাল তিনি স্থির করেছেন সাত বছর ক'রে। এই সাত বছরে কোনও একটি শিল্পে তাকে দক্ষ হতে হবে। এই শিক্ষার মান হবে ইংরেজীভাষা বাদে ম্যাট্রিকুলেশন। অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সে যখন ছেলেমেয়েরা এই প্রাথমিক বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তাদের মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানের মান হবে ম্যাট্রিকুলেশনের মতো, অথচ কোন একটি শিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পারদর্শী হয়ে উঠবে। এই থেকে দ্বিতীয় আনুষঙ্গিক কথাটাও এসে গেলো। অর্থাৎ চৌদ্দবছর বয়সে কোন পরিবারের ছেলে অথবা মেয়ে যখন সংসারে এসে দাঁড়ালো, তখন তার পিতামাতা এ-ও দেখলেন যে তাদের সন্তান শুধু লেখাপড়াই শেখে নি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটা শিল্পবিদ্যাও শিখে এসেছে। এবং গান্ধীজী একথাও বলেছেন যে, তখন ওই শিল্পে কাজ যোগাড় করে দেওয়া অথবা ওই শিল্পের উপর নিজের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ এক ঢিলে তিনটি পাখী মারার আয়োজন গান্ধীজী করতে চেয়েছেন, যথা, এক, শিক্ষার খরচ শিক্ষা থেকেই তুলতে হবে; দুই, শিক্ষার প্রথম স্তর শেষ হতে না হতেই শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে, তাকে বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের মতো রোজগারের জগতে অসহায় করে ছেড়ে দেবে না; তিন, সত্যিকার শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ —যে শিক্ষা ও জ্ঞান তার জীবনভর স্থায়ী হবে এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করবে সব দিক থেকে।

আমরা এর বিশদ বিবরণে গেলাম না। বিশদ আলোচনা করা আমাদের এখন কাজ নয়, যাঁরা এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে চান, তাঁদের বেসিকশিক্ষা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আলাদা করে পড়তে হবে এবং তার জন্য বইপত্রেরও আজকাল অভাব নেই। আমরা এ সম্বন্ধে মোটা কথাগুলি ও দার্শনিক ভিত্তিটাই কিছুটা আলোচনা করবো। গান্ধীজী বলেছেন, Our education has got to be revolutionised. The brain must be educated through the hand. If I were a poet, I could write poetry on the possibilities of the five fingers. Why should you think that mind is everything and hands and feet nothing? Those who do not train their hands, who go through the ordinary rut of education, lack 'music' in their life. All their faculties are not trained. Mere book knowledge

does not interest the child so as to hold his attention fully. The brain gets weary of mere words, and the child's mind begins to wander. The hand does things it ought not to do, the eye sees the things it ought not to see, the ear hears the things it ought not to hear, and they do not do, see or hear respectively, what they ought to. They are not taught to make the right choice and so their education often proves their ruin. An education which does not teachus to discriminate between good and bad, to assimilate the one and aschew the other is a misnomer." (Harijan 18.2.39.)

"আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে হবে। হাতের সাহায্যে মাথার বিকাশ ঘটাতে হবে। যদি আমি কবি হতাম তবে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল নিয়ে কবিতা রচনা করতাম। কেন তোমরা মনে করো যে মাথাই সব, হাত-পা কিছু নয়? যারা কেবল প্রচলিত শিক্ষা নিয়েই ব্যস্ত আছে, যারা হাতের শিক্ষা নেয় নি, তারা জীবনের অনেক গানই শুনতে পায়নি। তাদের সকল ইন্দ্রিয় পটু হতে পারে নি। শিশুর সমস্ত মনকে কেতাবী বিদ্যা কখনো আকৃষ্ট করতে পারে না। শিশুর মস্তিষ্ক কেবল শব্দ শুনে ক্লান্তি বোধ করে, এবং তার মন উড়ে বেড়ায়, বসতে চায় না। যা করা উচিত নয়, হাত তাই করে বসে, যা দেখা উচিত নয় চোখ সেদিকেই চলে যায়, যা শোনা উচিত নয়, কান সেদিকেই চলে যায়, অথচ যা করা, দেখা ও শোনা উচিত তা হয় না। তারা ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাদের শিক্ষা অনেক সময় তাদের সর্বনাশও ঘটিয়ে থাকে। যে শিক্ষা আমাদের ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোঝাতে সাহায্য করে না, যে-শিক্ষা ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করার ক্ষমতা দেয় না, সেটা শিক্ষাই হতে পারে না।"

এখানে আমরা দুটো কথা দেখছি। এক, শিক্ষা অপর, জ্ঞান ও চরিত্রশক্তি। কাজ বা অ্যাকশনের প্রয়োজনেই চিন্তার তাগিদ আসে, তা থেকে আসে বিদ্যা ও জ্ঞান। Knowledge is the guide to action. এই কাজের তাগিদ কাজ থেকে ছিন্ন করে আসে না এবং কাজের প্রয়োজনের তাগিদ ও তার বাস্তব সমস্যা মাথাকে উত্তপ্ত করে তোলে, বুদ্ধিকে খুঁচিয়ে দেয়, ফলে বিদ্যার উদয় হয়। এটা মনোবিজ্ঞানেরও কথা। বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা ডায়লেকটিক মেটিরিয়ালিজমের কথাও তাই। ফলে কাজের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার প্রতি বিরাগ জন্মে না। বরং শিক্ষা প্রাণবন্ত হয়, সৃষ্টিশীল প্রেরণা হৃদয়ে জাগরূক হয়। কণ্ঠস্থ করার নাম চিন্তা নয়। স্মৃতি-শক্তির উপর বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে বিদ্যার গুদাম সৃষ্টি করলে তা মানুষের পক্ষে এক সময় দুর্বহ হয়ে ওঠে, শিশুরা বিরক্তি বোধ করে।

গান্ধীজী বলেন, "The old idea was to add a handicraft to the ordinary curriculum of education followed in schools. That is to say, the craft was to be taken in hand wholly separately from education. To me that seems to be a fatal mistake. The teacher

must learn the craft and correlate his knowledge to the craft, so that he will impart all the knowledge to his pupils through the medium of the particular craft that he chooses. What we need is educationists with originality, fired with zeal, who will think out from day to day what they are going to teach their pupils. The teacher cannot get this knowledge through musty volumes. He has to use his own faculties of observation and thinking and impart his knowledge to the children through his lips with the help of a craft. This means a revolution in the method of teaching, a revolution in the teacher's outlook." (Harijan, 18.2.39)

"আগের ধারণা ছিল এই যে, প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতের কাজও শিখিয়ে দেওয়া। তার অর্থ, হাতের কাজটাকে শিক্ষার থেকে স্বতন্ত্র করে দেওয়ার ব্যবস্থা। আমার মতে সেটা একটা ভয়ানক ভুল। শিক্ষককে হাতের কাজটা প্রথমতঃ ভালো করে আয়ত্ত করে নিতে হবে, তারপর সেই শিল্পের মধ্য দিয়েই তাঁর ছাত্রদের (জ্ঞানবিজ্ঞান) শিক্ষা দিতে হবে।···আজ আমাদের এমন শিক্ষক দরকার, যাঁদের ভিতর স্বকীয়তা আছে, যাঁরা আদর্শের দ্বারা উদ্দীপ্ত, যাঁরা দিনের পর দিন ভেবে ঠিক করবেন কিভাবে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে সংঞ্চারিত করতে পারেন। শিক্ষক এই জ্ঞান বড় বড় গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করতে পারেন না। তাঁকে তাঁর নিজের দৃষ্টিশক্তি ও মননশীলতা থেকে জ্ঞান ছেলেদের দিতে হবে মুখে মুখে, সেই শিল্প বা হাতের কাজের মধ্য দিয়ে। তার মানে, শিক্ষাজগতে একটা বিপ্লব আনতে হবে। শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও একটা বিপ্লব আনতে হবে।"

তিনি বলেছেন, "I hold that true education of the intellect can only come through a proper exercise and training of the bodily organs, e.g., hands, feet, eyes, ears, nose, etc. In other words, an intelligent use of the bodily organs in a child provides the best and quickest way of developing his intellect. But unless the development of the mind and body goes hand in hand with a corresponding awakening of the soul, the former alone would prove to be a poor lop-sided affair. By spiritual training I mean education of the heart. A proper and all round development of the mind, therefore, can take place when it proceeds *pari passu* with the education of the physical and moral faculties of the child. They constitute an indivisible whole. According to this theory, therefore, it would be a gross fallacy to suppose that they can be developed piecemeal or independently of one another. Man is neither intellect, nor the gross animal body, nor the heart or soul

alone. A proper harmonious combination of all the three is required for making of the whole man and that constitutes the true economics of education." (Harijan—8.5.37)

"আমি মনে করি সত্যিকার জ্ঞানশিক্ষা একমাত্র শরীরের যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথা হাত, পা, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার ও শিক্ষার মধ্য দিয়েই আসতে পারে। এক কথায় শিশুর শারীরিক কার্যকলাপ ও শক্তির যুক্তিসম্মত ব্যবহার ও তার শিক্ষার মধ্য দিয়েই তার মানসিক উন্নতি সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব। কিন্তু মন ও দেহের শিক্ষার সাথে সাথে যদি আত্মার বা হৃদয়বৃত্তির বিকাশ সাধন না করা যায়, তবে সবটাই একটা একপেশে বিকৃতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। আত্মার শিক্ষা বলতে আমি অন্তরের বা হৃদয়ের শিক্ষাকে বুঝি। সর্বাঙ্গীন শিক্ষা বলতে আমি শরীর, মন ও হৃদয়ের একই সঙ্গে বিকাশ বুঝি। কেন না তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না। এটা একটা মস্ত ভুল যে আলাদা আলাদা করে এইসব শিক্ষা দেওয়া চলে, আমার নতুন থিওরি বা তত্ত্বের এই হলো মত।··· মানুষ কেবল বুদ্ধিই নয়, কেবল দেহই নয়, আবার শুধু হৃদয় বা আত্মাই নয়। এই তিনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনেই পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি হয়।"

দেহের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা, শ্রমের এই তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষার উপরে, এই সব বিষয় নিয়ে অতীতেও আরো অনেক মনীষী ভেবে গেছেন। কাল্ মার্কস্ তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে ভাবীযুগের শিক্ষা পদ্ধতি কি হবে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "The success of those clauses (English Factory Act. and clause) proved for the first time the possibility of combining education and gymnastics with manual labour, and consequently, of combining manual labour with education and gymnastics The factory inspectors soon found out by questioning the schoolmasters, that the factory children, although receiving only half the education of the regular day-scholars, yet learnt quite as much and often more. 'This can be accounted for by the simple fact that, with only being at school for one half of the day, they are always fresh and nearly always ready and willing to receive instruction. The system on which they work, half manual labour, and half school, renders each employment a rest and a relief to the other ; consequently both are far more congenial to the child, than would be the case, were he kept constantly at one. It is quite clear that a boy who has been at school all the morning, cannot (in hot weather particularly) cope with one who comes fresh and bright from his work.' (Rep. Ins. Fact– 31st Oct. 1865, pg. 118) (A footnote by Marx—A silk manufacturer naively

states to the children's Employment Commissioners : "I am quite sure that the true secret of producing efficient work people, is to be found in uniting education and labour from a period of childhood. Of course the occupation must not be too severe, nor irksome, nor unhealthy. But of the advantage of the union I have no doubt. I wish my own children could have some work as well as play to give variety to their schooling.") Further information on this point will be found in Senior's speech at the School Science Congress at Edinburgh in 1883. He there shows, amongst other things, how monotonous and uselessly long school hours of the children of the upper and middle classes, uselessly add to the labour of the teacher, while he not only fruitlessly and absolutely injuriously wastes time, health and energy of the children. From the factory system budded, as Robert Owen has shown us in detail, the germ of education of the future, an education that will, in the case of every child over a given age, combine productive labour with instruction and gymnastics, not only as one of the methods of adding to the efficiency of production, but as the only method of producing fully developed human beings". (Capital, Volume I, page—483-84 (483-84) Moscow Edition).

দেখা গেলো স্বয়ং কার্ল মার্কস্‌ এই প্রকার শিক্ষাকেই, অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শিক্ষাকেই ভবিষ্যতের একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং তারও পূর্বে রবার্ট ওয়েন একথা ভেবেছেন। বর্তমান রাশিয়াতে এই জাতীয় শিক্ষার প্রভাব বর্তমান। তার বাস্তব রূপ হয়তো ঠিক গান্ধীজীর মতো নয়। কারণ গান্ধীজী যে শিল্প বা ক্রাফ্‌টের সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন তা হলো গ্রামীণ শিল্প বা কুটিরশিল্প। গ্রামবাসী দরিদ্র জনসাধারণের বর্তমান জীবনধারণ পদ্ধতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা চাই। তাছাড়া শিশুরা নিরাপদে ও সহজে যা ব্যবহার করতে পারে তেমন শিল্পই উপযোগী। জটিল যন্ত্র দিয়ে তাদের কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্পপ্রধান রাশিয়ায় আধুনিক টেকনিক্যাল ক্রাফটের বা শিল্পের সাহায্যেই শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়েছে, তার নাম দিয়েছে তারা Politechnikisation. Sydney and Beatrice Webb-এর বিখ্যাত বই Soviet Communism —A New Civilization থেকে আমরা কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি।

"It was in September 1931 that a resolution in the Central Committee of the Communist Party insisted, as part of the general reform of the school system, on the 'Poletechnikisation'. At the begining of 1934 the Sovnarkon of the R S F S R took in hand

the systematic improvement of the teacher's training colleges, and the necessary raising of the teachers' qualifications." (Moscow Daily News, March 3, 1934—Soviet Communism, page—728)

"It is with this end in view that the teachers' lessons in science are to comprise description of the various products, including some amount of their history and their specific utility, together with the different processes of material production, in close relation to the teachers' expositions and explanations of the scientific principles, mechanical or physical, chemical or biological, of which the process of production are based" (Ibid, page 726)

"At all stages, and in all branches, the pupil is made to do more for himself than is usual in other countries. It is held that within reason, the more manual work that can be found for him to do, in the course of his mental education, the better will be that education. Even in the Kindergartens the visitors may see the toddler taught to serve by doing." (Ibid, page 732)

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজীর এই নঈ-তালিম মার্কস্‌বাদ ও বর্তমান রাশিয়ার শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। দার্শনিক দিক থেকে গান্ধীজীর এই কথাগুলির হুবহু অনেক সমর্থন এঙ্গেলসের লেখা থেকে পাওয়া যায়। Dialectics of Nature গ্রন্থে Part Played by Labour In The Transition From Ape to Man নামক অসমাপ্ত প্রবন্ধটি আমরা পাঠককে এই সঙ্গে পড়তে বলি। তাহলে তিনি দেখতে পাবেন শ্রম, কায়িকশ্রম, হাতের ব্যবহার ইত্যাদি মানুষের চিন্তাজগত ও সভ্যতার বিকাশের পথে কতটা স্থান অধিকার করে আছে। দুটি-একটি উধৃত করে যাচ্ছি মাত্র, যথা—"Labour is the source of all wealth, the political economist asserts. It is this—next to nature, which supplies it with material that it converts into wealth. But it is infinitely more than this. It is the primary basic condition for all human existence, and this to such an extent that, in a sense, we have to say : Labour created man himself" (Dialectics of Nature, page—228)

"Thus the hand is not only the organ of labour, it is also the product of labour. Only by labour, by adaptation to ever new operations, by inheritance of the thus acquired special development of muscles, ligaments, and over longer periods of time, bones as well, and ever renewed employment of these inherited improvements in new, more and more complicated operations, has the

human hand attained the high degree of perfection that has enabled it to conjure into being the pictures of Raphael, the statues of Thoravldsen, the magic of Paganini.

"But the hand did not exist by itself. It was only one member of an entire, highly complex organism. And what benefited the hand, benefited also the whole body". (Ibid, page 230-31)

"The reaction on labour and each of the development of the brain and its attendant senses, of increasing clarity of consciousness, power of abstraction and judgement, gave ever-renewed impulse to the further development of both labour and speech". (Ibid– page 234)

"Hundreds of thousands of years, of no greater significance in the history of the earth than one second in the life of man, certainly elapsed before human society arose out of a band of tree-climbing monkeys. Yet it did finally appear. And what do we find once more as the characteristic difference between the band of monkeys and human society? Labour". (Ibid, page 234-35.

"All merit for the swift advance of civilization was ascribed to the mind, to the development of the brain. Men become accustomed to explain their actions from their thoughts, instead of from their needs (which in any case are reflected, come to consciousness in the mind) and so there arose in the course of time the idealistic outlook on the world, which especially since the downfall of the ancient world, has dominated men's minds. It still rules them to such a degree that even the most materialistic natural scientists of Darwinian school are still unable to form any clear idea of the origin of man, because under that ideological influence they do not recognise the part that has been played therein by labour". (Ibid—page 238-39.)

আশাকরি এরপর কোন মার্কসবাদী গান্ধীজীর হাতের সম্বন্ধে কবিতা লেখার ইচ্ছাকে আর ঠাট্টা করতে চেষ্টা করবেন না এবং শ্রম মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের পথে কতটা স্থান অধিকার করে আছে সে সম্বন্ধেও আর সন্দেহ করবেন না। বাঁদর থেকে মানুষ হবার রাস্তায় শ্রমই তার প্রধান সহায়, আশাকরি একথা যেন মনে থাকে।

যাই হোক, অন্যান্য মনীষীরাও শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা ও চিন্তার বিকাশ সম্বন্ধে বলেছেন। টলষ্টয় কতকটা এরকম ভাবতেন। ইমারসনও ভেবেছেন। ইমারসন

বলেছেন—"A man should have a farm or a mechanical craft for his culture. We must have a basis for our higher accomplishments, our delicate entertainment of poetry and philosophy, in the work of our hands. We must have an antagonism in the tough world for all the variety of our spiritual faculties, or they will not be born. Manual labour is the study of the external world".

যাই হোক এ জাতীয় চিন্তার টুকরো টুকরো কথা ও ইঙ্গিত আমরা ইতিহাসে পাই। গান্ধীজীই প্রথম এই জাতীয় চিন্তাকে একটা বাস্তব রূপ দিয়েছেন, জীবনে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করেছেন এবং একে সমগ্র দেশে প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা গান্ধীজী সম্বন্ধে খুব সামান্যই আলোচনা করেছি, কিন্তু মনে রাখতে হবে গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষাকে একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় দাঁড় করিয়ে গেছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পর্যন্ত ভেবে গেছেন। অবশ্য পাঠ্যক্রমের বিবরণীতে অনেক এদিক ওদিক অদল-বদল হবে এবং হচ্ছেও। আজ যে বুনিয়াদি শিক্ষা ভারতের সর্বত্র প্রবর্তিত হতে চলেছে, তা সম্পূর্ণ গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা থেকেই নয়। ডাঃ জাকির হোসেন ও অন্যান্য শিক্ষাবিদদের দানও তাতে আছে। তাছাড়া পুরোনো শিক্ষাপদ্ধতির সবটাই খারাপ বলে প্রমাণিত হয় নি। তারও অনেক জিনিস থেকে যাবে এবং বাইরের পৃথিবীর শিক্ষাদীক্ষার অনেক কিছু অভিজ্ঞতাও গ্রহণ করতে হবে। তবে শিক্ষাজগতে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করতে গান্ধীজী অনেক কিছু করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

১৯২১-২২ সালে গান্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট বিতর্ক হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ বিদেশে। দেশে ফিরবার পথে তিনি রোঁমা রোঁলার কাছে বলেন যে, তিনি দেশে ফিরে গান্ধীজীকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করবেন। কিন্তু তিনি গান্ধীজীর আন্দোলনের রূপ দেখে শংকিত হয়ে উঠলেন। গান্ধীজীর জীবনাদর্শ, কর্মপন্থা, কর্মোদ্যম, প্রত্যেক ব্যাপারেই কবিগুরুর মতানৈক্য ঘটলো। প্রথমতঃ তিনি বললেন, গান্ধীজীর এতটা অসহযোগিতাকে বা নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের নেতিবাচক ভাবকে তিনি সমর্থন করেন না। ভারতের যা অবস্থা তাতে পশ্চিমের সভ্যতার সাথে সহযোগিতা করেই ভারত মুক্ত হতে পারে, কিন্তু গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলন যত সমর্থনযোগ্যই হোক, তাতে এত বেশী পশ্চিম-বিরোধিতা আছে যে তাতে ভারত আরো পিছিয়ে পড়বে। পশ্চিমের যন্ত্রসভ্যতা ও বিজ্ঞানকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করতে হবে। ভারতকে পশ্চিমের সভ্যতার ঐশ্বর্যকে আপন করে নিতে হবে। কিন্তু গান্ধীজী চরকা ও গ্রামীণশিল্পকে নিয়েই ভারতকে খুশী থাকতে বলেছেন, এতে ভারত এগোতে পারবে না। তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখতাও সৃষ্টি হচ্ছে গান্ধী-আন্দোলনের ফলে। একটা অতীত-প্রীতি বা রিভাইভালজম হচ্ছে চারদিক থেকে। পুরোনো সভ্যতার উপর অযথা একটা পিছুটান থেকে যাচ্ছে। গান্ধীজীর অহিংসার বাণী ভারতেরই শ্রেষ্ঠ কথা হলেও, গান্ধীজী অহিংসাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করাতে অহিংসার আদর্শও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অহিংসাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাও হিংসারই নামান্তর। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবন-আদর্শও গান্ধীজীর মতো কৃচ্ছ্রসাধনা ও বৈরাগ্যধর্মী নয়। তিনি বলেছেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" ঐশ্বর্যবান জীবনই তাঁর কাছে শ্রেয়। গান্ধী-আন্দোলনে বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন ও ধর্মান্ধতার ঝোঁক বর্তমান। একটু বিশদভাবে একটা একটা করে এইসব অভিযোগগুলির বিচার করবো এবার। কারণ কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নয়, পশ্চিমীসভ্যতায় শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই। তাছাড়া সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট প্রভৃতি সকলেরই নালিশ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই জাতীয়। স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই সংশয় ও আশংকা বার বার প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজীকে তাই শুধু রবীন্দ্রনাথকেই উত্তর দিতে হয় নি, সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন ও নেতাদের এই জাতীয় আক্রমণ তাঁকে জীবনভরই সহ্য করতে হয়েছে; এবং পরে দেখাবো, এই আক্রমণ ও প্রতিরোধের সংগ্রামে গান্ধীবিরোধীরা কতটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। উভয়পক্ষই যে যাঁর মৌলিক ধারণা নিয়ে স্থির হয়ে বসেছিলেন, তাই নয়, দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উভয়দলই উভয় দলের অনেক কথা মানতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রথমে চরকা সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ এই চরকাসভ্যতায় ফিরে যেতে প্রস্তুত নন। চরকায় অতিরিক্ত শ্রমমহিমা দেওয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, গান্ধীজীর এই চরকাআন্দোলন 'কুলিগিরির' সাধনা মাত্র ও বিজ্ঞান-বিমুখতার নিদর্শন। (৪০৫-৬, ২৪'শ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ) শ্রম মহিমায় "কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না।" বিজ্ঞানের"চাকা অসংখ্য শূদ্রকেশূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে।" (ঐ, পৃষ্ঠা ৪০৬) আমাদের জনতার এই পশুর মতো মেহনত করা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হলো বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে রক্ষা করা। চরকাসভ্যতায় জীবনের দারিদ্র ও কৃপণতাকে পূজা করা হচ্ছে। মানুষের মন তাতে কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তিনি বলেন, "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" (এই ভূমার আবেগ মানুষকে নিরন্তর বেড়ে চলবার প্রেরণা দিয়ে চলেছে, একে খর্ব করলে মানুষের ঐশ্বর্যবোধ নষ্ট হয়। কৃপণতার উপাসনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিড়ম্বনায় ভারত বহু ভুগেছে। আর নয়, তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবারে পশ্চিমের সাথে সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। শৌর্যের বীর্যের ঐশ্বর্যের ভারতকে তিনি দেখতে চান। অতএব চরকার বাণী তিনি গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, এবং দেশবাসীকে তা গ্রহণ করতে তিনি এক রকম নিষেধই করলেন।

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং গুরুদেব বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সম্যক উত্তর দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি তেজস্বিতার সাথে ও যুক্তির সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও চরকা ধরতে বললেন, আমরা সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি দেখালেন, রবীন্দ্রনাথ মহান ভারতের ছবি দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন। যে দারিদ্র ভারতের কোটি কোটি জনতাকে অন্নহীন, বৃত্তিহীন, বস্ত্রহীন করে ছেড়েছে, তাতে বিজ্ঞানের ও যন্ত্রের স্বপ্ন দেখলেই তার সমাধান হয় না। রোঁমা রোঁলা যেমন বলেছেন যে, "The problem is not an academic one but practical and pressing".

বছরে প্রায় ছয় মাস যারা নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে তাদের হাতে কাজ যোগাড় করে দেওয়ার উপায় বর্তমানে চরকা ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি দেখতে পাননি। কেউ যদি তা দেখাতে পারেন, তিনি তা গ্রহণ করতেও রাজী আছেন। যে যন্ত্র ও বিজ্ঞানের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে যন্ত্র ও বিজ্ঞান জনতার হাতে দেবে কে? ইংরেজ দেবে না, দেশীয় ধনীরা তা দিতে পারে না, জনসাধারণের তা গ্রহণ করার শক্তির বাইরে। আমরা আজ বুঝতে পারি যে, যন্ত্র চাই বললেই যন্ত্র নেওয়া সম্ভব হয় না, সাম্রাজ্য-বাদ ও ধনতন্ত্র দেশকে শিল্পায়িত করতে পারে না, যন্ত্রসভ্যতা যদি ভারতে ব্যাপক-ভাবে সকলের জন্য গ্রহণ করতে হয় তাহলেও ঐসব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় করা সম্ভব নয়, সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু সকলের স্বার্থে সকলকে যন্ত্র দিতে পারে না। কোন্ সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতের জনতা শোষণহীন যন্ত্রসভ্যতা গ্রহণ করতে পারে, আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলে যান নি। এখানেই তাঁর চিন্তার প্রকাণ্ড ফাঁক ধরা পড়ে। তিনি সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদ কি তা ধরতে পারেন নি,

সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রসভ্যতা ভারতের শিল্পকে চূর্ণ করে দিয়েছে এবং ভারতের শিল্প-শক্তিকে পুনর্জাগরিত হতে দিচ্ছে না, দিতে পারে না, এমন জাজ্বল্যমান কথাটা তিনি ধরতে পারেননি কি ? শুধু তিনি কেন, তথাকথিত প্রগতিবাদী পশ্চিমীবাদী মাত্রেই এই ফাঁকাটা ধরতে পারেননি বা ধরতে চাননি ! তাঁরা বিজ্ঞান, যন্ত্র ইত্যাদি শক্তি-গুলিকে নির্বস্তুক উপায়ে বা abstract উপায়ে ভাবতে চান। কোন্ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় বিজ্ঞান ও যন্ত্র একটা উপনিবেশ গ্রহণ করতে পারে, এই কথাগুলো না বুঝে কেবল বৈজ্ঞানিকতার দোহাই দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। ফলে দেখা গেছে ঐ সমস্ত বিজ্ঞানবাদীদের বক্তব্যটা একটা উড়ো কথায় পরিণত হতো মাত্র। সেটা একটা ফ্যাশন বা আধুনিকতার মোহ হয়ে দাঁড়াতো মাত্র। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, গান্ধীজী বিজ্ঞান-বিরোধী ছিলেন না। বরং যা বাস্তব, যা সকলের জন্য সম্ভব এবং যা শোষণ ও অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে বসবে না, এমনভাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে তিনি কারো চেয়ে কম আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, "If we should have electricity in every village home, I should not mind villages plying their implements and tools with the help of electricity. But then the village communities or the state would own power-houses just as they have their grazing pastures. But where there is no electricity what are the idle hands to do ?"

"যদি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় তবে গ্রামবাসীরা তাঁদের কাজকর্ম ও যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার পূর্বে দেখতে হবে যে গ্রামবাসীদের যেমন পশুচারণ ভূমি আছে তেমনি তাঁদের জন্য নিজেদের পরিচালিত বিদ্যুতাগার আছে অথবা সরকার থেকে তার ব্যবস্থা হয়েছে। তার পূর্বে তাঁরা তাঁদের অলস সময়গুলিতে কি করবেন ?"

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর তথাকথিত বিজ্ঞানবাদীরা কেউ দিতে পারেন নি। এই আলস্য-পীড়িত দারিদ্রপীড়িত হতভাগ্য গ্রামবাসীদের অবস্থার সম্যক বিচার না করে বিজ্ঞানের নামে কুটিরশিল্পকে নিন্দে করা কার্যতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকেই জিইয়ে থাকার সাহায্য করে মাত্র এবং বিজ্ঞানের এতটুকু সাহায্য হয় না। অথচ গান্ধীজীকে যদি বলা হয়, তিনি কৃচ্ছ্রতাবাদী, অর্থাৎ বৈরাগ্য সাধন করতে ভারতকে বলছেন, তবে তার চেয়ে অন্যায় আর হয় না। তিনি কতবার কতরকমে বলেছেন, ভগবানকে যদি আজ দরিদ্রের কাছে উপস্থিত হতে হয়, তবে তাঁকে অন্নরূপে আবির্ভূত হতে হবে। তিনি জানতেন দারিদ্রের মধ্যে কতখানি গ্লানি আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত যে ত্যাগের দারিদ্রই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র কুৎসিত। তিনি দরিদ্রকে কিভাবে দুটি পয়সা, দুটি অন্ন যোগাড় করে দিতে পারেন সেকথাই জীবনভর ভেবে গেছেন। আমরা পূর্বেও দেখিয়েছি যে কার্যক্ষেত্রে গান্ধীজী এদেশীয় মার্কসবাদীদের চেয়েও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় মূল্য বেশী বুঝতেন। তিনি ইকনমিক-প্রোগ্রাম নিয়ে জনতার কাছে উপস্থিত হতেন। ভাববাদী আইডিয়া সম্বল করে অগ্রসর হতেন না।

তিনি দরিদ্রকে অন্ন বিতরণে সাহায্য করতে চাননি, তিনি মনে করেন, দানখয়রাতিতে তাদের আরো অধঃপতন হবে মাত্র, তাই তিনি কাজ দিতে চেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন গানের, ঐশ্বর্যের স্বপ্ন তৈরী করছেন, তখন গান্ধীজী তেজস্বিতার সঙ্গে তাঁকে উল্লেখ করেই বলেছেন, "When all about us are dying for want of food, the only occupation permissible for me is to feed the hungry. India is a house on fire. It is dying of hunger because it has no work to buy food with. Khulna is starving. The ceded districts are passing successively through a fourth famine. Orrisa is a land suffering from chronic famine. India is going daily poorer. The circulation about her feet and legs has almost stopped. And if we do not take care, she will collapse altogether·····

"To a people famishing and idle, the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages. God created man to work for his food and said that those who ate without work were thieves. We must think of millions who to-day are less than animals, almost in a dying state. Hunger is the argument that is drawing India to spinning wheel.

"The poet lives for the morrow, and would have us to do likewise. He presents to our admiring gaze the beautiful picture of the birds in the early morming singing hymns of praise as they soar into the sky. Those birds had their day's food and soared with rested wings in whose veins new blood had flown the previous night. But I have had the pain of watching birds who for want of strength could not be coaxed even into a flutter of their wings. The human bird under the Indian sky gets up weaker than when he pretended to retire. For millions it is an eternal vigil or an eternal trance. I have found it impossible to soothe the suffering patients with a song from Kabir······

"Give them work that they may eat! 'Why should I, who have no need to work for food, spin?' may be the question asked. Because I am eating what does not belong to me. I am living on the spoliation of my countrymen. Trace the source of every coin that finds its way into your pocket, and you will realize the truth of what I write. Every one must spin. Let Tagore spin, like the others. Let him burn his foreign clothes;

that is the duty to-day. God will take care of the morrow. As it says in Gita, Do right !" (Tagore "Great Sentinel", Young India, Oct. 13, 1921, Romain Rolland—"Mahatma Gandhi" pp 111.)

Non-cooperation বা অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ বিরূপ হয়ে পড়লেন। কেন না তাঁর কাছে বিশ্বমানবতা এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের স্বপ্ন তখন অত্যন্ত প্রবল। তিনি মনে করলেন স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ভারত কূপমণ্ডূকই থেকে যাবে। পশ্চিমের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রাখা তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনও একটা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন বলে মনে হলো। ফলে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেই দূরে রয়ে গেলেন। অবশ্য ১৯০৮ সালেই তিনি রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য গান্ধীজী ভারতে পদার্পণ করার সাথে সাথে তিনি আবার রাজনৈতিক কাজে নামতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু অসহযোগের দুর্বার বিদেশীবর্জন ও চরকা গ্রহণের ছবি দেখে তিনি আবার পিছিয়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো আন্তর্জাতিকতার নীতি এতে নেই। কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথ অবাস্তব ও স্বপ্নবিলাসী মাত্র বলে প্রমাণিত হলেন। গান্ধীজীও বিশ্বমানবতায় বিশ্বাস করতেন, তিনিও ভারতকে কূপমন্ডূক করতে চাননি। কিন্তু বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিকতা স্থাপন করতে হলে কেবল ঐক্যের কথাটাই ভাসাভাসা ভাবে ভাবলে চলে না, বর্তমান পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলিকে অস্বীকার করলে চলবে না। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড করে নিজেদের কুক্ষিগত করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, তাকে পরাস্ত না করে, এই আন্তর্জাতিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা যায় না এবং বিশ্বমানবতার abstract ডাক একটা নিস্ফল স্বপ্নে পরিণত হয় এবং অনেক প্রকার কপট বিশ্বপ্রেমের সৃষ্টি করে। যে ন্যাশনাল বা জাতীয় ও ক্লাস কনট্রাডিকশনগুলি বা শ্রেণী বৈষম্যগুলি আছে, তার সমাধান না করে উপর থেকে এক-বিশ্ব বা ঐক্য সৃষ্টি করা যায় না। যাঁরা মার্কসবাদী, তাঁদের একথা সবচেয়ে আগে বোঝা উচিত। অথচ তাঁরাও এদেশে এমন মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে জাতীয়তার সংগ্রাম গান্ধীজী উঠিয়েছিলেন, তাকে কূপমণ্ডূকতা ও বুর্জোয়া জাতীয়তা মনে করে তাঁরাও গান্ধীজীর বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী-আন্দোলনকে প্রাণ খুলে সমর্থন করতে পারেন নি। মার্কসবাদীদের পক্ষে যদি এ ভুল করা সম্ভব হয়, তবে কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন ভুল করা অসম্ভব হবে কেন? কবিধর্মী স্বপ্নাচারী রবীন্দ্রনাথ তাই সংগ্রামকে আশংকার চোখে দেখতেন। যে কোন উপায়ে সকলে মিলিত হয়ে যাক্, এমনি ধরনের একটা ভালোমানুষীভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ফলে তিনি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার বাণীটা ব্যর্থ বা ভুল, তা নয়। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে তা একপেশে ও স্বপ্নবিলাসী।

অনেকে বলেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন যে তিনি কবি, তাঁর পক্ষে

রাজনীতি করা সম্ভব নয়। তিনি কাব্যের মধ্য দিয়েই সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন এবং তা সম্ভব এমন প্রত্যয়ও তাঁর ছিল। কবি হলেই যে রাজনীতিতে থাকতে পারেন না, এমন কোন কথা নেই। আসলে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অন্যরকম। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের গূঢ়তম তাৎপর্যটা ধরতে পারেননি। ফলে পশ্চিমের সম্পর্কে, ইংরেজের সম্পর্কে, বিশ্বমানবতা ও বিজ্ঞানের দিক থেকে ভ্রমাত্মক ধারণায় তিনি কিছুটা প্রভাবান্বিত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি তাঁর ভ্রমটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মিস রথবোনের কাছে লেখা চিঠি, 'সভ্যতার সংকট' এবং বিভিন্ন কবিতায় তাঁর সেই পূর্বেকার ভ্রম ও ইলিউশন কেটে গেছে বলে আমরা দেখতে পাই। তখন তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তথাকথিত পশ্চিমী বিজ্ঞান সভ্যতাকে কোন্ গভীর ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। জাপানের কবি নোগুচির কাছে লেখা পত্রেও সেকথা উল্লিখিত আছে। কাজেই জীবনের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি থেকে সরে থাকার অযৌক্তিকতার দায় থেকে কেবলমাত্র কবি বলেই তাঁকে রেহাই দিতে পারা যায় না, নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে। একথা দ্বারা অবশ্য বোঝায় না যে জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান নেই। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, বিশেষকরে ভাবের দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে, প্রাণ সম্পদের দিক থেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা তাঁর লেখনীর সর্বশক্তি দিয়ে জাতীয় সংগ্রামকে যদি শক্তিমান করতে চাইতেন তবে আরো অনেক কিছু দিতে পারতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ তিনি অনেক সময় অভিমানে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, এবং অনেক সময় নিরুৎসাহও করেছেন। সমস্ত দেশ যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মত্ত, তখন তিনি এমনও বলেছেন, "It is criminal to transform moral force into a force." (Modern Review, 1924)

এই থেকেই তাঁর গান্ধী সংগ্রামের প্রতি বিরূপতা দেখা যায় কিন্তু তার বদলে রক্তাক্ত সংগ্রামকে চেয়েছেন, এমনও নয়। তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামটাকেই এড়াতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশ দখল নয়, দেশ গঠন কর। গান্ধীজীও বলেছেন যে দেশের স্বাধীনতা গঠন কর। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! গান্ধীজীর গঠনকর্ম সংগ্রামেরই প্রোগ্রাম, আর রবীন্দ্রনাথের গঠনকর্ম সংগ্রাম এড়াবার প্রোগ্রাম। এই সংগ্রামকে কূপমণ্ডূক, বিদ্বেষ-প্রসূত, বিজ্ঞানবিমুখ ও বিশ্বমানবতা বিরোধী ইত্যাদি ভারী ভারী কথার চাপে রিভাইভালিজম্ বা পুনর্জাগরণ বলে নিন্দিত করা যায় কি? গান্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন তর্কটা বুঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি এখানে :

"স্বরাজ সাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা, জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী বেহারা নেই।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, 'চরকা' ২৪ খণ্ড, পৃঃ ৪০৭)

(গুপীবেহারা নামক চাকরটি জগন্নাথকে একটি টমেটো দিয়েই ফলদানের দায় থেকে মুক্ত হয়েছিল, কারণ জগন্নাথকে যে ফল দেওয়া হয়, তা নাকি আর খাওয়া নিষেধ।)

"দেশশুদ্ধ লোক মিলে তাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামানবন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে, দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিককালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, একথা মানি। আর এ-ও না হয় আপাততঃ মেনে নেওয়া গেলো যে, এই উপায়ে সরকারী থুৎপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে, তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশ্যে চরকা চালানো সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।" (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৪০৮)

অবসর সময়টাকে চরকা কাটায় নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে ভাতের ফেন ফেলে না দেওয়ারই মতো একটা আন্দোলনের সামিল মনে করতেন।

"স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতে পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের উপর তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্য তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ মনে করে। আমি মনে করি এরকম মতি স্বরাজ লাভের অনুকূল নয়।" (২৪শ খণ্ড, 'স্বরাজসাধন', পাতা ৪২০)।

"দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণই মুক্তি। মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এইতো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন সকলে মিলে কেবলমাত্র সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'অয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা?' এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?" (সত্যের আহ্বান—২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩)।

আবার গান্ধীজী যে সত্যি সত্যি একজন 'মহাত্মা', সত্যিকার আবির্ভাব ভারতের জন্য, এ সত্য বুঝতেও রবীন্দ্রনাথের কোন সময় লাগে নি, তাই লিখছেন ১৯২০ সালেই, গান্ধীজীকে সাক্ষাৎ না দেখেই, "বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিক্যাল নেতারা ইংরেজী পড়ার বাইরে তাকাননি। কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজী-ইতিহাস পড়া পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজী ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক, গ্ল্যাডস্টোন, ম্যাটসীনি, গ্যারিবল্ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াতো। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে, তাদেরই আপন বেশে। এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদেরই ভাষায়। এ একটা সত্যিকার জিনিষ ও এরমধ্যে পুঁথির কোন নজির নেই। এইজন্য তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে, এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার করে আর কে দেখেছে? আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে, তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শে।

সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো অমনি তা খুলে গেলো। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে-নীতি বন্ধ্যা। অনেকদিন থেকে আমাদের শিক্ষার দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৬।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা সম্বন্ধে আশঙ্কিত কম ছিলেন না, তা পূর্বেই দেখিয়েছি। আরো দেখুন তিনি বলছেন, "অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হলো। অপবিত্র (বিদেশী বস্ত্র অপবিত্র) কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা, অর্থের নিয়মের উপরের কথা।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫।)

"আজ এই বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে কোনো জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তাহলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছিনে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেবো। সকাল বেলার পাখী যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সাড়া দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্ব-মানবের চিত্ত আমাদের ডাক পাঠিয়েছে, আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি, আজ যখন পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্স ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জন নীতি পোষণ করতে চাচ্ছি।" (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯।)

গান্ধীজীর সঙ্গে এই বিতর্ক রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আর চালান নি, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর অনেক তথাকথিত প্রগতিবাদী ও তথাকথিত বিপ্লববাদীরা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই সুর বরাবরই রক্ষা করে গেছেন এবং আজও হয়তো করছেন। তবে আজকাল কমিউনিষ্ট সোশিয়ালিষ্টরাও কুটিরশিল্পের মধ্যে প্রতিক্রিয়াই দেখেন না। এটা সৌভাগ্যের বিষয় এবং স্বদেশী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বুঝতে পারেন। একথাও তাঁরা আজ হয়তো বুঝতে পারেন যে, যন্ত্র চাই বললেই যন্ত্র হয় না, তার জন্য সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার হয়, দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, জনগণের হাতে রাজ্যভার আসার দরকার হয়, এবং সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এখানে একথাও বলে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-চেতনা, সাম্রাজ্যবাদের অবসান, সামন্ততন্ত্র, জমিদারী-প্রথা, ধনতন্ত্র প্রভৃতির অবসান চাওয়া পর্যন্ত পৌঁছায় নি। তিনি কখনো সমাজতন্ত্র চাইতেন কিনা একথা শোনা যায় নি, এ সম্বন্ধে তিনি নীরব। এমন কি 'রাশিয়ার চিঠি' নামক বইতেও একথা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। অথচ গান্ধীজীর এসব সম্বন্ধে কত স্পষ্ট মতামত রয়েছে এবং তারজন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন জীবনভর। এই থেকে বুঝতে হবে

বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নাম করেও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হতে পারেন নি। অথচ গান্ধীজী সর্বদা 'রাম-নাম' করলেও কার্যক্ষেত্রে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদের অবসান ও ভারতের জনতার মুক্তির প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশী দান করে গেছেন এবং ভারতকে বিজ্ঞানের পথে শোষণহীন সমাজের পথে এগিয়ে যেতে প্রভূত শক্তি দিয়ে গেছেন।

ভাবধারার দিক থেকে গান্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের অনেক মিলও ছিল। পরস্পর পরস্পরকে অশেষ শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন। দুজনেই ভগবদ্ভক্ত ছিলেন অসাধারণরূপে। দুজনেই ভারতের অতীত দান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তবে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। গান্ধীজী কর্মযোগী, সংগ্রামবাদী, রবীন্দ্রনাথ কবি, সৌন্দর্যের পূজারী, ঐশ্বর্যের উপাসক। অথচ তিনি ভোগবাদী আদর্শ প্রচার করেন নি। তাঁর আনন্দরূপমমৃতম্ ও ভূমার আদর্শ সুখবিলাসী নয়, স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করাকে ও ত্যক্তেনভুঞ্জিথা-র বাণীকে তিনি মানতেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে যে সম্পূর্ণ এবং সমগ্র সভ্যতার সৃষ্টি হবে, তাকেই বিশ্বসভ্যতা বলে জেনেছেন। তিনি দেখেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীতে মত্ত হয়ে আছে। তাঁরই ভাষায় তাঁর আদর্শকে তুলে দিই :

"মানুষের উদ্যম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে, তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা নহে। সেইজন্য আজ য়ুরোপের যে বেদনা, আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের স্বধর্ম্য আছে, সে আপনার ঐশ্বর্য চিন্তা না করিয়া বাঁচেনা। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়, রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে,—এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে। ক্ষণকালের জন্য যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদের এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে। যেমন করিয়াই হোক আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে, কেন না কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক, কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবর সৃষ্টির সম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ নাই, কোন পরিমাণ নাই; এইজন্য কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ার মত খেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।" (আরব সমুদ্র– ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। রচনাবলী—২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯-৯০।)

চিন্তার দিক থেকে এই সামগ্রিক ছবিটা কতই না সুন্দর। বস্তুত বিশ্বমানবতার ঐশ্বর্যবান অথচ ত্যাগমহান ছবি রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকার তৈরী করেছেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর ব্যবহার ও এই চিত্রকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে ইতিহাসকে যে আরো অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মিটিয়ে নিতে হবে, এই কঠিন ও নির্মম সত্যকে তিনি পছন্দ করতে পারতেন না। তিনি কবি কীট্‌সের মতো truth is beauty beauty truth—এই কথাই মানতেন। গান্ধীজীর মতো Truth is God বলে এমন নির্মম ও দুর্গম পথ বেছে নিতে পারেন নি। গান্ধীজীর truth, beauty খুঁজে বেড়াতো না, বরং জনজীবনের কুৎসিত, নির্মম, নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম তাঁকে আকর্ষণ করত। Beauty-র প্রতি কবিজনসুলভ আকর্ষণই অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে অত্যাচার, যুদ্ধ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলতো। কিন্তু তিনি সেগুলিকে আকস্মিক ও অন্যায় উৎপাত বিশেষ মনে করে এড়াতে চাইতেন, ফলে তাঁকে যে লোকে escapist বলে অপবাদ দিয়েছিল, একথা একদম ভুল বলা যায় না। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান গণসংগ্রামের ক্ষেত্রে আজ সংগ্রামী জনতার মুখে মুখে নেই, তা আজ ভদ্রসন্তানদের, শহরবাসীদের বিলাসপুরীতেই বেশী আদৃত হয়ে থাকে।

সৌন্দর্যের গান, ঐশ্বর্যের গান কবিসম্রাট গেয়েছেন, এবং বলেছেন যে বৈরাগ্য সাধন তাঁর জন্য নয়। ভারতের জন্য কোন কৃচ্ছ্রসাধনের পথও গান্ধীজী প্রচার করেন নি। যদিও সাধক গান্ধী নিজের জন্য সে নীতি রেখেছেন। Plain living and high thinking-এর আদর্শ অবশ্য গান্ধীজী প্রচার করেছেন এবং বলেছেন, যা জনসাধারণের পক্ষে লভ্য নয় তা তিনি গ্রহণ করা অন্যায় বলে মনে করেন। জীবনকে উপভোগ করার কথা রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, কমিউনিষ্ট, সোশিয়ালিষ্ট সবাই বলেন। All good things of life to be enjoyed. এই নীতি আজ সর্বত্রই প্রায় গ্রাহ্য। তথাপি গান্ধীজী এই জাতীয় আস্কারা ভারতকে খুব দেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসাধারণ সবাই উন্নতস্তরে এসে পৌঁছতে পারছে। তাছাড়া ক্যাডিলাক গাড়ী আর মিংককোট-এর বিলাসিতাকে চিন্তাশীল কমিউনিষ্ট জগৎও পছন্দ করেন না। এসব হলো ভবিষ্যৎ জীবন ধারণের মানদণ্ডের কথা মাত্র। আজকের যে দারিদ্রময় পরিস্থিতি, তাতে ঐ জাতীয় জীবন উপভোগ করতে চাওয়া মানে কপটতা ও শোষণের আশ্রয় নেওয়া। আজকের জন-জীবনের মান কত নীচে একথা কি ভুলতে পারা যায়? তাছাড়া সংগ্রামের পথে চলতে হলে জীবনকে শক্ত নিয়মে তৈরী করে নিতে হবে। বিলাসিতার কোমলতাকে প্রশ্রয় দিলে সংগ্রাম চলবে না। তাই সেনাপতি গান্ধী তাঁর দেশকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করার পথে নিয়ম, কৃচ্ছ্রসাধন ও কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি শক্ত বিধানের সাহায্য নিয়েছিলেন, তাতে বৈরাগ্যপনা বোঝায় না। এছাড়া সংগ্রামের শক্তি সম্ভবই নয়। সংগ্রামের প্রয়োজনে আরো কত কি বর্জন করে চলতে হয়, সেকথা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

তাই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনকে গান্ধীজী একদিকে যেমন ভালোবাসতেন, আর একদিকে তেমনি মাঝে মাঝে হুঁসিয়ারও করে দিতেন, যেন দেশকে গান শেখানোর নাম

করে যেন হালকা-জীবন প্রচার করা না হয়। একথা ঠিক যে এই নিষ্প্রাণ ভারতীয় জীবনে আনন্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন, প্রাণের মহান জাগরণের পথে আনন্দের দান, কলাশিল্পের দান সম্বন্ধে গান্ধীজী কম পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু একটা বিষয় তাঁর সর্বদা খেয়াল ছিল যে, দেশ চায় সবার উপরে যে জিনিষ সে হলো শক্তি, সংগ্রাম-শক্তি। তাই গান্ধীজী একবার শান্তিনিকেতনেই এক উৎসবে বলেছেন—"I have a suspicion that, perhaps, there is more of music than warranted by life, or I will put the thought in another way. The music of life is in danger of being lost in the music of voice. Why not music of walk, of the march, of every movement of ours and of every activity ? I think that our boys and girls should know how to walk, how to march, how to sit, how to eat, in short, how to perform every function of life." (Mahatma Vol. VII, page - 28)

এখন revivalism সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা যাক। চরকা, কুটিরশিল্প, স্বদেশী, নৈতিকজীবন, অহিংসা, হরিজন ইত্যাদি আন্দোলন গান্ধীজী অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকেই বিচার করে প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতের মধ্যে পিছু হাঁটার দল ও কুসংস্কারবাদী প্রাচীনপন্থী সনাতনপন্থীরা ও অজ্ঞ জনসাধারণ এইসব আন্দোলনগুলিকে অনেকক্ষেত্রে এতটা বিকৃত করে ফেলতো যে তাকে revivalist আন্দোলন বলে সন্দেহ করা রবীন্দ্রনাথ বা জওহরলালের পক্ষে অন্যায় হতো না। গান্ধীজী যে-মতলব করেই এইসব আন্দোলন করুন না কেন, তাঁর অগণিত শিষ্যমণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দ তাকে ভিন্ন অর্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ দিতেও চেষ্টা করেছে। সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান হচ্ছে মনে করে রবীন্দ্রনাথ ও অনেক প্রগতি-বাদীরা আঁতকে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রগতিবাদীরা এমন সব ভালো ভালো কথা, আপত্তি ও বিজ্ঞানসুলভ যুক্তি এবং দেশবিদেশের অভিজ্ঞতার কথা তুলতেন, যাতে মনে হতো যে গান্ধীজী বুঝি সত্যিই প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু আজ ইতিহাসের ধারাবাহিক বিচার করে যদি দেখি তবে দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে বিজ্ঞানবাদী প্রগতিবাদী নয়া সভ্যতাবাদীদের দান ভারতের সত্যিকার অগ্রগতির পক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে গান্ধীজীর চেয়ে কত কম। তাছাড়া আরো একটা paradox বা ঐতিহাসিক ধাঁধা দেখতে পাই যে, তথাকথিত বিজ্ঞান বিরোধী গান্ধীবাদী আন্দোলন কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কর্ণধারের কাজ করলো, অথচ বিজ্ঞানবাদী যুক্তিবাদীদের কার্যকলাপ বেশীরভাগই এই জীবনমরণ সংগ্রামে নিরপেক্ষ, এমন কি অপর পক্ষের সহায়ক হয়েও পড়লো স্থানে স্থানে। কিন্তু কেন এমন হলো ? তার একটা দার্শনিক গূঢ় অর্থ আছে। সত্যের সংগ্রাম, প্রগতির সংগ্রাম, বিজ্ঞানের অগ্রগতি কেবলমাত্র নির্বস্তুক স্তরে জয়ী হতে পারে না, মাটির মানুষকে বা জনতাকে বহন করে যদি তা না অগ্রসর হতে চায়, তবে তাদের আপাতঃ প্রগতিশীল চেহারাটাও কার্যতঃ প্রগতি বিরোধী হয়ে পড়ে। Actual peoples' struggle বা প্রকৃতরূপে জনগণের সংগ্রামের সাথে যদি আদর্শগত সংগ্রামের যোগ না হয়, তবে তা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থও পেয়ে যেতে

পারে। জনতার জাগরণ, জনতার ন্যায়সংগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ভাবধারার সৃষ্টি হয় তা প্রথম দৃষ্টিতে যত প্রতিক্রিয়াশীল, যত অপরিপক্বই মনে হোক না কেন, তা কার্যতঃ এবং শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল হতে বাধ্য। আর যে ভাবধারা গণসংগ্রামের থেকে দূরে বৈঠকখানায় অথবা কৃষ্টির শীসমহলেই লালিতপালিত হয়, তা যতই বৈজ্ঞানিক বলে মনে হোক, কেন না শেষ পর্যন্ত তা কোন কাজে আসে না এবং তার বৃদ্ধি ও উন্নতিও হয় না। আমরা প্রথম থেকেই দেখেছি, গান্ধীজী যা কিছু বলেছেন, যা কিছু ভেবেছেন, সবই জনতার প্রয়োজনে, জনতার সংগ্রাম ও মুক্তির প্রয়োজনে। তাঁর চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথের মতো বা জওহরলালের মতো বা কমিউনিষ্টদের মতো সুদূরপ্রয়াসী বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হয়তো প্রথম থেকেই ছিল না, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচারক্ষেত্রে গান্ধীজী হয়তো তাঁদের তুলনায় "অশিক্ষিত" বলেও কেউ কেউ দাবি করতে পারেন, কিন্তু কি শক্তি তাঁকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী সত্যদ্রষ্টা হিসেবে কার্যতঃ প্রতিপন্ন করে গেল? কেন আর সব প্রগতিবাদীরা তাঁর কাছে হার মেনে গেলেন, কেন তিনি শেষপর্যন্ত ভারতকে সত্যি সত্যি প্রগতির পথেই প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেন? কেন সব বিজ্ঞানবাদীরা ম্লান হয়ে গেলেন? সেই একই শক্তি, অর্থাৎ জনতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের শক্তি। জনতার সংগ্রামের সাথে তাঁর ভাবধারাকে মিলাতে পেরেছিলেন বলে, জনতার জীবনমরণ সংগ্রামে তিনি ideology বা আদর্শের হাতিয়ার দিতে পেরেছিলেন বলেই সত্য ও বিজ্ঞান তাঁরই হাতে বেশী করে সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর ভাবসম্পদকে এমনিভাবে গণসংগ্রামের সাথে যুক্ত করে দিতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য রকম চিত্র আমরা দেখতে পেতাম। কমিউনিষ্টরাও যদি তাঁদের প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে পারতেন, তবে তাঁরাই আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বা আইডিওলজিষ্ট বলে প্রতিপন্ন হতেন। যদি ইউরোপে মুগ্ধ-আসক্ত ইংরেজী শিক্ষিত নেতারা ভারতের গণসংগ্রামে নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা দেখাতে পারতেন তবে তাঁরাই গান্ধীজীকে সত্যি সত্যি চালেঞ্জ জানাতে পারতেন। এমন কি যদি গান্ধীজী গণসংগ্রাম জাগাতে না পারতেন, তবে তাঁরও দশা একজন সনাতন ধর্মপ্রচারক বলেই প্রতিপন্ন হতো। বাস্তব ইতিহাস ও জনসংগ্রামের সাথে সামাজিক চিন্তাধারা বা সোশিয়াল আইডিওলজির এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটা মনে রাখতে হবে। তাছাড়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুরু করলো, তখন তাদের মধ্যে একটা রিভাইভালিষ্ট বা পুনরভ্যুত্থানের সুর ওঠা অপরিহার্য। কেন না পশ্চিমের যে যন্ত্রসভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান, তা এই নিপীড়িত জনতার কাছে কোন মঙ্গলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি। তারা দেখেছে যে, যন্ত্রসভ্যতা তাদের কুটিরশিল্পকে দিয়েছে চূর্ণবিচূর্ণ করে, রেলগাড়ী তাদের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞান তাদের নিরক্ষর করে ছেড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞান-যন্ত্র তাদের জীবনকে ধ্বংস করেছে, কাজেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে প্রথমটায় তাদের পুরোনো হৃতগৌরবের কাহিনী, ফেলে দেওয়া চরকা ও তাঁত, অপমানিত ধর্ম, এ সবের

সাহায্যও নিতে হয়েছে, কাজেই তখন জাতীয়তার সাথে সাথে একটা পুনরভ্যুত্থানের মোহও সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এই মোহ কখনও প্রতিক্রিয়ার পথে নিয়ে যেতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের চাপেই তাকে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী হতে বাধ্য করে। তাই এশিয়ার কোন জাতিই আজ প্রতিক্রিয়াশীল নয়। তারা ইউরোপের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রগামী চিন্তা গ্রহণ করেছে এবং সবাই সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে চাইছে। বস্তুতঃ প্রতিক্রিয়াশীলতার শিকড় বা জড়, কায়েমী স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যেই প্রতিনিয়ত পুষ্ট হয়ে থাকে, হৃতসর্বস্ব জনতার জীবনে প্রতিক্রিয়াশীলতার শিকড় বেশী দূর যেতে পারে না। প্রগতির শক্তি জ্ঞানের উচ্চ স্তম্ভে লালিত ও বর্ধিত হয় না, হয় জীবনসংগ্রামের ন্যায্যতার মধ্যে, জনজীবনের মুক্তির অভিযানে। এই বিচারভঙ্গী থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে কেন গান্ধীজী কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী প্রগতিশীল বলে প্রমাণিত হয়ে গেছেন। প্রগতি ও মুক্তির শক্তি কেন জনতা গান্ধীজীর কাছ থেকেই বেশী পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বলতে হয়েছে, "He explains his point of view in lines of great beauty, but detached from real life. His words are like the dance of Nataraja, a play of illusions.. (p. 100)...The bird-poet, the eagle-sized lark, as Heine called a master of our music, sits and sings on the ruins of time. He lives in eternity. But the demands of the present are imperious," (Mahatma Gandhi, page—109)

গান্ধীজীর নিজের কোন revivalist মোহ ছিল না। গান্ধীজীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তেমন ভাবনা বা সংশয় ছিল না। কিন্তু গান্ধীবাদীদের বা গান্ধী-অনুগামীদের প্রাচীনপন্থী ঝোঁক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল। গান্ধীজীর নিজেরও সে বিষয়ে লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ তাঁর নাম করে কেউ ভেজাল জিনিস চালিয়ে না দেয় সে সম্বন্ধে তিনি অনেকবার হুঁসিয়ার করেছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। তিনি বলেছেন, "You will not therefore consider that I have given you a warning against being misled into wrong doing under the name of revival of culture." (To the Students—p. 115)

সিংহলে তিনি এক বক্তৃতায় বলেছেন, "And working along these lines of truth and non-violence, I also discovered that I must not attempt to revive ancient practices if they were inconsistent with, call if you will, modern life as it must be lived. Ancient practices may have been perfectly good and perhaps absolutely necessary at the time when those practices were adopted, but they may be entirely out of date with modern needs and still not be contrary to truth and non-violence." (Gandhiji in Ceylon— pages— 128-29)

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর মত-পার্থক্য এবং সে কারণে তাঁদের বাদ-বিসম্বাদের পর্ব দুবছরেরও কম, ১৯৩৯ সালের ফেবরুয়ারি থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত— সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধান অবধি। এই দুটি বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস বহু তিক্ততায় কণ্টকিত। ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম আশ্রমে ১৯৩৯ সালের ১৫ ফেবরুয়ারি দেশ ও পৃথিবীর তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই সময় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি। সুভাষচন্দ্র যখন প্রথমবার কংগ্রেসের সভাপতি হন, সেসময় গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে জওহরলাল নেহরুই তাঁর নাম উত্থাপন করেছিলেন এবং সর্বজনের সমর্থনে বিপুল উৎসাহের মধ্যে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই দেশের ভিতরে ও বাইরে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হল। সুভাষচন্দ্র ইতিপূর্বে ইয়োরোপে থাকার সময়েই দেখে এবং বুঝে এসেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য জোর প্রস্তুতি চলেছে— জার্মানীর তরফ থেকে। এ খবর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির অজানা নয়। ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ আতঙ্কিত, তারা প্রস্তুতও হতে চলেছে। নেতাজীর মতে আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ ভারতকে নিতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য এটাই মহা সুযোগ। একটা পরাধীন জাতির শত্রুর শত্রু তার মিত্র, রিয়্যালপলিটিকের এই সূত্র কোনপ্রকার আদর্শবাদের নবনীত কোমল হিতবাদ দিয়ে অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়। গান্ধীজীর মতে শত্রুর বিপদের সুযোগ নেওয়া অহিংসার আদর্শ নয়। পণ্ডিত নেহরু এবং তৎকালীন ফ্যাসীবিরোধী প্রগতিবাদীদের মতে এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া চলে না যা ফ্যাসীপন্থী হিটলারের সমর্থনে যায়। কারণ ভারতবর্ষ যে ফ্যাসীবিরোধী চিন্তাধারায় অঙ্গীকৃত একথা মনে রাখা দরকার। ১৫ ফেবরুয়ারি দীর্ঘ বৈঠকে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার দাবি একটা আলটিমেটাম হিসাবে রাখা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশকে আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হোক। আর তার নেতৃত্ব গান্ধীজী নিজের হাতে নিন।

দেশের মধ্যে তখন সাতটি রাজ্যে রয়েছে কংগ্রেস সরকার। আর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সারা ভারতের জন্য কেন্দ্রে ফেডারেশনের প্রস্তাব উপস্থিত হয়ে রয়েছে। ফেডারেশন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে থাকলেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও সংগ্রামবিরোধী মহল থেকে ফেডারেশনের প্রস্তাব একটু উল্টে পাল্টে নেবার লোভ কোনকালেই দূর হয়নি এবং ব্রিটিশের সঙ্গে আপোস রফায় একটা সমঝোতা করে দিল্লির মসনদে বসবার বাসনাও তাঁদের একদম দূর হয়ে গিয়েছে সেটা বলা যায় না। তাছাড়া যে সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস-সরকার রয়েছে সেখানকার মন্ত্রীরাও

ক্রমশ ক্ষমতা ভোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আবার গদি ছেড়ে সহসা মাঠে ময়দানে লড়তে নেমে যাবেন ততটা আশা রাখা বড় সহজ বোধ হচ্ছে না। এদিকে যদিও কোন আলটিমেটাম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নীতি নেওয়া হচ্ছে না, তথাপি ব্রিটিশ সরকারের নানা এজেন্ট দাবার ঘুঁটি সংগ্রহের জন্য সর্বত্র নেমে পড়েছেন। প্রকাশ্যে ও গোপনে ভারতের সব দল ও গোষ্ঠী বিশেষ করে কংগ্রেস, লীগ, দেশীয় রাজন্যবর্গ এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রভাবিত করার নিরন্তর চেষ্টা চলেছে। কাজেই সবরকম আপোসবিরোধী বামপন্থী নেতৃত্বের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের উপর এসে বর্তায়। তিনি সকলরকম আপোসসন্ধানীদের সম্ভাব্য ছিদ্রগুলি বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। দেশের বামপন্থী দল উপদলগুলি সুভাষচন্দ্রকে এ ব্যাপারে প্রথম প্রথম খুবই উৎসাহ দেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষাণ সভার নেতারা কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে সুভাষচন্দ্রকে খুবই সমর্থন করতে থাকেন। দেশের বাইরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্ন প্রস্তুতি ও আশংকা, দেশের ভিতরে একদিকে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী চেতনা অন্যদিকে শান্তিসোয়াস্তির অছিদার নরমপন্থী বা দক্ষিণপন্থীদের আপোসের ইচ্ছা—এই উভয় পরিস্থিতির ঘনায়মান সংকটের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণপন্থী ও গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য দ্বিতীয়বার দাঁড়াতে হয় এবং তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন বাঘা বাঘা নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং স্বয়ং গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি নির্বাচিত হয়ে যান।

কিন্তু তৎপরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র হেরে গেলেন। ওয়ার্কিং কমিটির কার্যকলাপ ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে যে পন্থ-প্রস্তাব ত্রিপুরী কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করা হয় তা ভোটে জিতে যায়, সুভাষচন্দ্রের পক্ষ হেরে যান। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন সহসা সুভাষচন্দ্রের পিছন থেকে সরে যান। সে এক অভাবনীয় বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, যার ফলে সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে কোণঠাসা হতে থাকেন, বাইরে বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সংগঠনে তাঁর স্থান ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। তাঁকে প্রথমে কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করতে হয়, পরে তাঁকে ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক তখন কংগ্রেসের বাইরে চলে যেতেই বাধ্য হয়। সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, আপোস বিরোধী কংগ্রেস (রামগড়) ইত্যাদি সংগঠন ও মোর্চার মাধ্যমে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম চালু করার চেষ্টা করেন, হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ যার অন্যতম অঙ্গ। আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেসের সভাপতি। আজাদের নেতৃত্বে (আসলে প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী ও নেহরুর নেতৃত্বে ও গান্ধীর সমর্থনে) তখনকার কংগ্রেসে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাগিদের চেয়ে সুভাষ-বিরোধী বা ফরওয়ার্ড ব্লক বিরোধী সংগঠন গড়ার তৎপরতাই যেন বেশি। বিহারের বিখ্যাত কৃষাণ নেতা স্বামী সহজানন্দকে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষা আইনে বন্দী করেছে, আরও অনেক সুভাষপন্থী নেতা

একে একে বন্দী হচ্ছেন। এমনকি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে বন্দী করা হয়েছে। (এই বন্দীদশা থেকেই জয়প্রকাশ নারায়ণ গোপনে লোক মারফৎ সুভাষচন্দ্রের কাছে এক দীর্ঘ পত্র পাঠান, যাতে জয়প্রকাশ তাঁর ভুল অকপটে স্বীকার-পূর্বক সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে কতকগুলি প্রস্তাব রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে চলে যাবার ঠিক প্রাক্‌কালে পত্রবাহক চিঠিটি তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন কিন্তু তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বাইরে চলে যাবার সিদ্ধান্তের আর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। (চিঠিটি এখন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে রক্ষিত আছে।) হলওয়েল মনুমেণ্ট বিরোধী সত্যাগ্রহ চলা কালে সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তৃতার অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে আটক করে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয় প্রেসিডেন্সী জেলে। এই প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার সময়েই তিনি দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি আমরণ অনশন ঘোষণা করেন এবং তৎকালীন লীগ মন্ত্রিসভা ভয়ে ভয়ে বাধ্য হয়ে তাঁর বন্দীদশার আদেশ স্থগিত করে তাঁকে এলগিন রোডের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে একদিন রাত্রিতে তিনি ভারত থেকে অন্তর্ধান করার পথে বেরিয়ে যান। কাবুল, রাশিয়া, জার্মানী হয়ে ডুবোজাহাজে শেষ পর্যন্ত জাপানে চলে আসেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে রেডিও মারফৎ গান্ধীজীকে প্রথমেই প্রণাম জানিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আশ্চর্যের কথা, এত তিক্ততার পরেও সুভাষচন্দ্র (তখন তিনি নেতাজী) টোকিও থেকে প্রথম বক্তৃতাতে মহাত্মা গান্ধীকেই প্রথমে স্মরণ করেন। তাঁকে জাতির পিতা বলে সম্বোধন করতে তাঁর একটুও বাধেনি।

এই কথাটুকুর তাৎপর্য আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে, শেষপর্যন্ত গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত অতি সরলীকৃত লাভ অ্যাণ্ড হেট-এর সম্পর্ক এটা নয়। ১৯৩৯ সালের ফেবরুয়ারি থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী ও বসুর মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তা জাতির ইতিহাস রচনার জন্য অপরিহার্য দলিল। নেতাজী রিসার্চ-ব্যুরো থেকে Cross Roads নামে যে একটি অমূল্য গ্রন্থ বের হয়েছে তার মধ্যে Bose-Gandhi Correspondence (পৃঃ ১৪৫-১৮৯) অধ্যায়টি মূল্যবান দলিল হিসাবে ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্র এবং গবেষকদের কাছে অবশ্য-বিচার্য বিষয় বলে গৃহীত হবে সন্দেহ নেই। ঐ গ্রন্থ ও বিশেষ করে ঐ অধ্যায়টি গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য বুঝবার পক্ষে অপরিহার্য। এবং শুধু তাঁদের দুজনের মধ্যে বিতর্ক বুঝবার জন্যই নয়, অহিংসা ও হিংসা, সংগ্রাম ও সহযোগিতা, বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তর বিচারবিতর্কের খাদ্যও এখানে পাওয়া যায়। ভারতের পক্ষে দ্বিখণ্ডিত না হয়েও অন্য কোন বিকল্প ঘটনা ঘটতে পারত কিনা বিচার করারও রসদ পাওয়া যায়। আমাপর এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ তার সবটা আলোচনা করতে পারি না। কেবল গান্ধী চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বিকল্প পথের পরি-প্রেক্ষিতে গান্ধীনীতি ইতিহাসের ধোপে কতটা টিকে ছিল কি টেকেনি, সেই চিত্রটুকুই মাত্র উপস্থিত করব। মননশীল ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকা তা থেকে হয়ত

গভীরতর গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন।

তাত্ত্বিক ও সংগ্রামী কৌশলের দিক থেকে গান্ধীপন্থা ও সুভাষপথের মিল ও অমিল কোথায় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। তবে তা খুবই সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

১। ব্রিটিশ সরকারের নিকট আলটিমেটাম দিতে গান্ধীজীর আপত্তি কোথায় ছিল? গান্ধীজীর মতে আলটিমেটাম দিলে তা পালন করার জন্য যে অহিংস সত্যাগ্রহী গণশক্তি প্রয়োজন তা সে সময়ে দেশে উপস্থিত ছিল না। তাঁর মতে দেশে তখন প্রচণ্ড হিংসার বাতাবরণ, তিনি জাতির নিশ্বাস প্রশ্বাসে তার উত্তাপ অনুভব করছেন। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের মধ্যে তখন ভীষণভাবে দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছে। তার মেম্বারশিপ একেবারেই বোগাস বা ভুয়ো, ফলে তা থেকে সত্যাগ্রহী আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে না। সুভাষচন্দ্রের মতে কিন্তু সে সময় ভারতবর্ষে সাধারণভাবে হিংসা বা হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির প্রভাব তেমন কিছু ছিল না। যে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য ছিল, ১৯৩৯ সাল নাগাদ সেখানকার সংগ্রামপন্থীরাও আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহকেই স্থায়ী রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন। কিন্তু গান্ধীজী তা স্বীকার করছেন না বা তার উপর নির্ভর করে সংগ্রাম শুরু করতে রাজি হতে পারছেন না।

২। গান্ধীজী উল্লেখ করেন, দেশের মুসলিম লীগ নেতৃত্বে হিংসাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ অবস্থায় সংগ্রাম শুরু করলে সাম্প্রদায়িকতার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সুভাষচন্দ্রের মতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সর্বব্যাপী সংগ্রাম শুরু করলেই সাম্প্রদায়িকতার শক্তি ক্ষয়ে যাবে। তাছাড়া সংগ্রাম শুরু না করার মানে সাম্প্রদায়িক মুসলমান ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংগঠনগুলিকে নিজেদের গুছিয়ে নেবার সময় বা অবসর দেওয়া মাত্র। যত দিন যাবে, জনগণের উদার দেশচেতনার বহিঃপ্রকাশে যত অন্তরায় ঘটবে, ততই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করে নেবে। যদিও সুভাষচন্দ্র এ যুক্তি পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করেননি, তবু লেনিনের ভাষায় বলা যায়, যদি ঠিক ঠিক সময়ে বিপ্লবের ডাক দেওয়া না যায় তবে প্রতিবিপ্লবই জোরদার হয়ে আক্রমণ করে। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব মল্লযুদ্ধের জন্য সর্বদাই সময় ও সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর নিজের অহিংস সংগ্রামের দর্শনেও হিংসাকে দেখে চুপ করে থাকার নীতি সমর্থিত হয় না। তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন, হিংসার আগুন কোথাও জ্বলছে দেখে অহিংসা নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারে না, 'Ahimsa must enter the jaw of himsa, willingly, deliberately' অর্থাৎ অহিংসা হিংসাকে এড়িয়ে যাবে না, বরং তার রক্তরাঙা চোখ ও ভয়াল আগ্রাসী মূর্তিকে নির্ভয়ে চ্যালেঞ্জ জানাবে। অহিংসা যদি হিংসারই মোকাবিলা করতে না পারে, তবে অহিংসার ক্ষেত্র বা কার্যকারিতা কতটুকু? অহিংসার সঙ্গে তো অহিংসার কোন লড়াই থাকতে পারে না। তবে দুর্বলের অহিংসা ও সাহসী বা সবলের অহিংসা এক নয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে নোয়াখালিতে বসে বিনিদ্র রজনীতে গান্ধীজী বারবার আত্মজিজ্ঞাসা করেছেন, তবে এতদিন ভারতে কোথায় কতটুকু তাঁর অহিংসা

কার্যকর ছিল? তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, অহিংসার নামে যারা তাঁর দলবল ভারী করত তারা আসলে ভীরু, মৃত্যুভীরু, সুবিধাবাদী। তাদের অহিংসা ছিল ভীরুর অহিংসা। তাই যে মুহূর্তে দেশে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল সেই মুহূর্তে তাদের অহিংসা উধাও হয়ে গেল, দেশ জুড়ে এমন একটা লজ্জাকর, গ্লানিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, এমন কদর্য হিংস্রতা জ্বলে উঠল যা প্রকৃত সুশিক্ষিত ভায়োলেন্ট স্ট্রাগল-এ থাকতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহের একটা নিয়ম আছে—যদিও তা হিংস্রাশ্রয়ী। কিন্তু ভারতে সেদিন যে হিংসা ফেটে পড়েছিল তার কোনো ন্যায় ছিল না, নীতি ছিল না, ধর্মাধর্ম জ্ঞান ছিল না, নারী পুরুষ শিশু ভেদাভেদ-বোধ ছিল না। তাঁর স্বপ্নের ভারতে এত কদর্য জঘন্য হিংসা এল কোথা থেকে—তাঁর ত্রিশ বছরব্যাপী অহিংসার সাধনা ও সত্যাগ্রহ সত্ত্বেও?

৩। এদিকে সুভাষচন্দ্রকে বরাবরই বিপ্লবী পথের পথিক বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে প্রথমবার নির্বাচিত হওয়ার পর ঐ পদে থাকাকালীন তিনি পুরোপুরি গান্ধী নেতৃত্বে বিশ্বাসী। সেসময় অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যেই তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও কৌশলের সীমা নির্ধারিত দেখতে পাই। গোড়া থেকেই তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবেননি। আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়েই দেশ স্বাধীন করতে হবে এমন কথাও তিনি বরাবরই ভাবেননি। যদিও যুদ্ধবিগ্রহ বা অস্ত্রশস্ত্রকে কোন নিষিদ্ধ ব্যাপার বলে বর্জনও করেননি চিন্তার দিক থেকে। যদি তা করতেন, যদি আগাগোড়া বিপ্লবী পথই তিনি অনুসরণ করতেন, তবে এতদিন কংগ্রেসের মধ্যে বসে থাকা বা গান্ধী-নেতৃত্বে বিশ্বাস করে চলা কি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? প্রথম থেকেই কংগ্রেসের বাইরে গণসংগঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করা উচিত ছিল না কি? তিনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে থাকতে পারলেন? অবশেষে তাঁকেই কি তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হলনা?

৪। কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর থাকা ও গান্ধীনেতৃত্ব মেনে নেওয়ার পক্ষে একটিই মাত্র যুক্তি ছিল, ভারতের অগণিত জনগণের সঙ্গে তাহলে যুক্ত থাকা যায়। রাজনীতিকে জনগণের দুয়ারে পেঁৗছে দেবার কৃতিত্ব গান্ধীজীরই, একথা সবাই স্বীকার করেন এবং সুভাষচন্দ্রও সেকথা জানতেন। কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃত্বের বাইরে তৎকালীন সর্বস্তরের ভারতীয়দের ধরবার কোন ক্ষেত্র বা ক্ষমতাই তাঁদের ছিল না। গান্ধীজীর হাতেই যেন জনতার চাবিকাঠি। কেমন করে গান্ধীজী এই অদ্ভুত অপূর্ব গণসংযোগ করতে পেরেছিলেন যে জন্য বামপন্থীদের (এমন কি সুভাষচন্দ্রকেও) বারবার বলতে হতো Gandhiji, give us the marching order! বামপন্থীরা নিজেরা কেন সেই মার্চিং অর্ডার দিতে পারতেন না? এখানেই রয়েছে গান্ধীজীর আসল শক্তি। একদিকে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, অপরদিকে সত্যাগ্রহী গণআন্দোলনের সাহায্যে তিনি এই শক্তি অর্জন করেছিলেন। গঠনমূলক কাজ ও সংগ্রাম এই উভয় শক্তিকে তিনি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন, একটার বিকল্প বা সাবস্টিটিউট হিসাবে অপরটিকে দাঁড় করাননি। সুভাষচন্দ্র, নেহরু বামপন্থী নেতাদের চমকপ্রদ সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব বা মতাদর্শগত আকর্ষণ যতই থাকুক, কার্যকালে ঐ বৃদ্ধের সাহায্য

ছাড়া এদেশে সেদিন কেউ কিছু করতে পারতেন না। ঐ বৃদ্ধ বেঁচে থাকতে এদেশে কিছু করা যাবে না, শেষ পর্যন্ত এই তিক্ততার বশবর্তী হয়েই সুভাষচন্দ্র ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে একদিন রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁর অতদিনের সাধনার সবকিছু ত্যাগ করে এক বেপরোয়া জুয়াড়ির মত অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আজ একথা বুঝতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র যখন গান্ধীজীর কর্মপন্থাকে ঠাট্টা করে spinning the way to swaraj ইত্যাদি কটাক্ষ করেছিলেন তখনও বামপন্থী বিপ্লব বা নিজের কর্মপন্থার দুর্বলতা কোথায় ছিল তা নজর দিয়ে দেখেননি। আর পণ্ডিত নেহরু, জয়প্রকাশ ও কমিউনিস্টরা এদেশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের গরমাগরম বুলি আনয়ন করলেও গান্ধীজীর প্রতি নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক মজদুর জনসাধারণের একান্ত আনুগত্যকে কেন তাঁরা সেদিন ছিনিয়ে নিতে পারেননি, কেন সেদিন জনগণ নেহরু সুভাষ জয়প্রকাশ কমিউনিস্টদের চেয়ে গান্ধীজীকেই বেশি নির্ভরযোগ্য নেতা বলে মনে করতেন সেকথাও বিচার করতে হবে সমস্ত ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের সাক্ষ্য প্রমাণ সহ, সমাজ ও দর্শনের যাবতীয় সম্ভারের বিচারাদি সহ।

৫। এতদসত্ত্বেও গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত ফেল করলেন কেন? কেন তাঁকে চূড়ান্ত নৈরাশ্য নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটাতে হল? নাথুরাম গডসেই তাঁর শেষরক্ষা করে দিলেন! অহিংসার নামে তিনি রাজনীতিকে যেমন কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি অহিংসার ডগমাই হয়তো তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভাকে খর্ব ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ অনেকেই হয়ত এ প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেন অহিংসার স্বার্থে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামকে এত দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত করেছিলেন, যার ফলে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিই শক্ত হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছিল? ভারতে যে জনশক্তি সেদিন জেগেছিল তার যথাযথ প্রয়োগ করলে হয়তো এত রক্তারক্তি হত না, দেশ ভাগ না হয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে ও এক থাকতে পারত। পৃথিবীতে অনেক দেশই তো স্বাধীন হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে, তাদের তো সেজন্য অহিংসার দরকার হয়নি। কিন্তু গান্ধীবাদীরা হয়তো বলবেন, অদূরে বা নিকটবর্তী কালের ক্ষেত্রে গান্ধীজী ফেল করতে পারেন কিন্তু শাশ্বত কালের পটভূমিকায় পথিকৃৎ হিসাবে গান্ধীজীর স্থায়ী মূল্য থাকবে, যতটা সুভাষচন্দ্রের থাকবে না।

৬। কংগ্রেসের সভাপতিত্বের জন্য সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় দক্ষিণপন্থী ও গান্ধীবাদীদের মনোনীত পট্টাভি সীতারামাইয়া তাঁর কাছে পরাজিত হন। গান্ধীজী অকপটে বলে দেন, এটা আসলে তাঁরই পরাজয়, সীতারামাইয়ার নয়। এই উক্তিতে তখনকার বাঙ্গালী ও বামপন্থীরা গান্ধীজীর উপর অসন্তুষ্ট হন। কেন তিনি সুভাষচন্দ্রের জয়কে ভাল চোখে দেখতে পারলেন না, কেন সেটা তাঁর নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন? গান্ধীজী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও তখন বলেছিলেন, তাঁর নিজের নীতির পরাজয় হলেও দেশবাসীর তাতে শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই, কারণ যতই হোক সুভাষ বসু দেশের শত্রু নন। এই উক্তিটাও অনেকেই খুব অপছন্দ করেন। সুভাষচন্দ্র দেশের শত্রু নন এ ধরণের নেগেটিভ সার্টিফিকেট

দেবার মত কার্পণ্য কেন? সুভাষচন্দ্রকে সোজাসুজি 'দেশনায়ক' বলে রবীন্দ্রনাথ বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর উক্তির সঙ্গে গান্ধীজীর এই নেগেটিভ স্যার্টিফিকেট মেলাতে গেলেই দুইয়ের প্রকৃত তফাৎ বোঝা যাবে। সুভাষচন্দ্র নিজেও গান্ধীজীর এই উক্তিটিকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি, তাঁর একটি বিবৃতিতে তা প্রকাশ পেয়েছে।

৭। সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক বিতর্ক ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পন্থ-প্রস্তাবের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামী নেতাদের হুইপ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন অবস্থাগতিকেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে একটা অনাস্থার বাতাবরণ এসে যায়। ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য হিসাবে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ তখন উক্ত প্রস্তাব পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসের এ. আই. সি. সি. বৈঠকে উপস্থিত করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে পাস করিয়ে নেন। সেই প্রস্তাবে গোটা তিনেক প্রধান বক্তব্য ছিল। এক, ওয়ার্কিং কমিটি ও তাঁর সদস্যদের প্রতি বা তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি আস্থা প্রকাশ। দুই, তৎকালীন সংকটজনক পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর নীতির উপরে আস্থাজ্ঞাপন। তিন, নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি যে নতুন করে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বেছে নেবেন, তাঁর জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন নিতে হবে।

পন্থ প্রস্তাব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর মতামত চেয়ে পাঠালেন। মহাত্মা গান্ধী তখন রাজকোট সমস্যা, সেখানকার সত্যাগ্রহ ও তজ্জনিত অনশন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত এবং অসুস্থও। এদিকে কংগ্রেস মহলে দক্ষিণপন্থীরা রটিয়ে দিয়েছেন যে পন্থ-প্রস্তাব গান্ধীজীকে দেখিয়েই তোলা হয়েছে। অথচ তা আদৌ হয়নি। অনেক পরে এলাহাবাদে গান্ধীজী তা দেখতে পান। অবশ্য রাজকোটে যখন তিনি সেখানকার সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে ব্যস্ত ও নিজে অসুস্থ, তখন তাঁর কোনো এক অনুগামী তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য (সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর) একটা প্রস্তাব পাস করা হবে। গান্ধীজী তাতে আপত্তিজনক কিছু আছে বলে মনে করেননি। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র যখন বারবার গান্ধীজীর স্পষ্ট মতামত দাবি করতে থাকেন, পন্থ প্রস্তাবের তাৎপর্য সম্পর্কে—তখন ১৯৩৯ সালের ১০ এপ্রিল রাজকোট থেকে এক পত্রে তিনি তাঁকে পরিষ্কার বলে দেন, 'Pandit Pant's resolution I cannot interpret, the more I study it, the more I dislike it.'

পন্থ প্রস্তাব যদিও কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী বেআইনী তবু ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যদের খাতিরে ও গণতন্ত্রের খাতিরে সুভাষচন্দ্র এর প্রতিবন্ধকতা করেননি। বেআইনী হলেও তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে তা পেশও করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাবের নির্দেশনা মত এবার তাহলে মহাত্মা গান্ধীকেই নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বেছে দিতে হয়। কিন্তু তিনি তাতে রাজি নন, কিছুতেই কোনো শর্তেই রাজি নন। তিনি বারবার জানিয়ে দেন, সুভাষ যেন নিজের পছন্দমত নতুন সদস্য মনোনীত করে নেন এবং অকুতোভয়ে নিজের প্রোগ্রাম মত কংগ্রেস ও দেশকে পরিচালিত করতে অগ্রসর হন। সুভাষচন্দ্রের

মতে ওই সময়ে কেবল তাঁর মতাবলম্বী বামপন্থী সদস্যদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি করতে গেলে কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন আসবে, দেশের ক্ষতি হবে। তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের যখন একতাবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের কাছে তথা বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আলটিমেটাম দেবার প্রয়োজন, তখন দেশের মধ্যে ও কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানো অন্যায় এবং অনুচিত। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর কাছে লেখা এক পত্রে পরিষ্কার জানিয়ে দেন I feel it galling to my conscience to hold on to office if the greatest personality in India today feels, though he may not say it openly, that the passing of the resolution (Pant resolution) should automatically have brought in my resignation'.......

তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, পন্থ প্রস্তাবে কি তাঁর প্রতিই অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে? তবে কি গান্ধীজীর মতে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত? তার উত্তরেই গান্ধীজী জানিয়েছিলেন যে, পন্থ প্রস্তাবটি তিনি যত দেখছেন ততই বিরক্ত হচ্ছেন। আর সুভাষ যদি মনে করে থাকেন পন্থ প্রস্তাবটিই বেআইনী তাহলে তাঁর প্রতি অনাস্থার কথা ওঠেই না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর মত ও পথ অনুযায়ীই কংগ্রেসকে পরিচালিত করুন। তাতে গান্ধীজীর সমর্থন বা বিরোধিতা কোনটার কথাই ওঠে না। একটি টেলিগ্রামেও পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন MY ADVICE FORM CABINET AND PUBLISH PROGRAMME.

আবার ১০ এপ্রিলের চিঠিতে লিখছেন, 'I cannot and will not, impose a cabinet on you, nor can I guarantee approval by AICC of your cabinet and policy. It would amount to suppression. Let the members exercise their own judgment. If you do not get the vote, lead the opposition till you converted the majority.'

সুভাষচন্দ্র বারবার অনুরোধ করলেন, গান্ধীজী যেন কোনো পক্ষ না নেন, অথবা কোনো পক্ষকে তাঁর নাম ও প্রভাব ব্যবহার করার সুযোগ না দেন, তাঁর ভাবমূর্তিকে যেন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সাহায্য না করেন। দেশ ও দলের মধ্যে এই আসন্ন ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে একটি ব্যক্তিই সেদিন কার্যকর হতে পারতেন, তিনি গান্ধীজী। কিন্তু গান্ধীজী দেখা যায় প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছেন, 'Nobody put me against you. What I told you in Sewagaon was based on my own personal observations. You are wrong if you think that you have a single personal enemy among the old guard'.

কিন্তু গান্ধীজীর এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভুল। তৎকালীন রাজনৈতিক কোন্দলের এতটুকুও খবর যিনি রাখেন তিনিই বলবেন সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের শক্তিতে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বা মুরোদ সেদিন old guard ও তাঁদের অনুগামীদের সামান্যই ছিল। গান্ধীজীর নাম ও প্রভাবকে ব্যবহার করেই এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও সি পি আই-এর ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ছোবল দিয়েই সুভাষচন্দ্রকে তাঁরা কাবু

করে ফেলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে তাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত শত্রু ওল্ড গার্ডদের মধ্যে কেউ ছিলেন না, তৎপরবর্তী ঘটনার বিচারে একথা একান্তভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ভুল বিচারের পরিণাম মহাত্মা গান্ধীকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে হয়, ঘোর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে দেশ ভাগের সময়, তাঁকে কতকটা বাদ দিয়েই ইংরেজদের সঙ্গে ওল্ড গার্ডদের সমঝোতার সময়। তখন সর্ববিষয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ এই একক নেতা আর একবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে কাকে কাকে সহায়কারী পাবেন তা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে তাঁকে তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে। সেদিন নির্ভরযোগ্য কোন সাথী খুঁজে পাননি তিনি। এমনকি তখন disillusioned জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতির উপরে নির্ভর করেও আবার সংগ্রামের ডাক দেওয়া যায় কিনা তাও সঙ্গোপনে বিচার করে দেখে-ছিলেন। কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পাননি। সেই নিঃস্ব দিনগুলিতে মহাত্মা গান্ধী একমাত্র সুভাষচন্দ্র বা জাপানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষের উপর আবার নতুন করে একটা টান অনুভব করতেন। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি এবং সুভাষ মৃত, তিনি আর নেই, নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্তও গান্ধীজী এ-কথা বিশ্বাস করে যাননি।

সুভাষচন্দ্র নিজে জানতেন, Nobody has done more harm to me personally and to our cause in this crisis than Pandit Nehru. If he had been with us—we would have a majority. But he was with the old guard at Tripuri. His open propaganda against me has done me more harm than the activities of the 12 stalwarts. What a pity !' (১৯৩৯ সালের ১৭ এপ্রিল জামাডোবা থেকে ইংল্যান্ডবাসী অমিয়নাথ বসুকে লেখা।) তাছাড়া ১৯৩৯ সালের ২৮ মার্চ জওহরলালকে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় a brutally frank letter, প্রায় বিশ পৃষ্ঠার সেই দীর্ঘ চিঠির জবাব পণ্ডিত নেহরু কোনোদিনই দেননি। একেবারে চারপাশ থেকে পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা করে সুভাষচন্দ্র ঐ পত্রটি দিয়েছিলেন। জওহরলালের আন্তরিকতা ও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও তিনি সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন, 'I should now invite you to clarify your policy and programme not in vague generalities but in realistic details. I should also like to know what you are, socialist or leftist or centrist or rightist or Gandhist or something else ?' দুঃখের বিষয় পণ্ডিত নেহরু তারপর দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলেও এবং দীর্ঘদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকলেও সুভাষচন্দ্রের ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে পারেননি, তিনি শেষ পর্যন্ত কি ছিলেন !

৮। আমি বলতে চেষ্টা করেছি, মত ও পথের যত পার্থক্যই থাকুক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে গান্ধীজী যদি সঙ্গী হিসেবে সুভাষচন্দ্রকেই বেছে নিতেন, পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাস তাহলে এমন বিয়োগান্তক নাও হতে পারতো। অথচ

মত ও পথের ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ছিল বিরাট। অহিংসার সঙ্গে realpolitik-এর মিলন কঠিন, অসম্ভব না হলেও। Realpolitik-এর রীতিনীতিতে সশস্ত্র-নিরস্ত্র সহিংস-অহিংস সংগ্রামের অচ্ছুৎ সম্পর্ক থাকতে পারে না। সেখানে কোন ব্যাপারেই কোন জলঅচল ভাগ রাখা যায় না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর গভীরতম মিশন ছিল পৃথিবীকে সংগ্রামের একটা নতুন হাতিয়ার দেওয়া, অহিংসা, যে সংগ্রামের নাম অহিংস-সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন এমন কখনই মনে করা যায় না। তবে তিনি আশা করতেন ভারতের স্বাধীনতা হয়তো ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেও, বিনা সংগ্রামে পাওয়া যেতে পারে, তারা স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হতে পারে নানা রকম অবস্থার চাপে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন, পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা করা, মনুষ্যসভ্যতার যাত্রাপথে একটা নতুন মোড় সৃষ্টি করা, এসবই তাঁর স্বপ্নের ভারতের সাধনা। এখানে বা এক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক নেতার চেয়েও অনেক বড়, তিনি প্রফেট। পলিটিশিয়ান বা স্টেটসম্যানকে সার্থক রাজনীতিক হতেই হবে কিন্তু একজন প্রফেটকে তাঁর নিজের সময়ে মৃত্যুবরণই করতে হয়, নতুবা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়। প্রফেটরা নিজ নিজ যুগে ফেল করবেনই। এই বিফলতা, এই ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের এমন একটা শাশ্বত মূল্য থেকে যায় যা ইতিহাস বা মানব সভ্যতার মেরুদণ্ড রচনায় সাহায্য করে, সর্বকালে, সর্বযুগে। একজন স্টেটসম্যান তাঁর সময়টুকুতে যা দেবার ছিল দিয়ে ফুরিয়ে যান। কিন্তু একজন প্রফেট, একজন সাধক, অনন্তকালের জন্য অফুরান সম্পদ দিয়েই যান। তাই প্রশ্ন করতে হয়ঃ কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো।

আগের কথায় ফিরে আসি। একটা ছোট পয়েন্ট উল্লেখ করা দরকার। সুভাষচন্দ্রের ক্ষমাহীন ও আপসবিরোধী সংগ্রামের চাপে পড়ে দক্ষিণপন্থী বা গান্ধী-অনুগত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকেও শেষ পর্যন্ত আইন অমান্যের কথা বলতে হয়। তার জন্য স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হতে থাকে, এমনকি ড্রিল পর্যন্ত শুরু হয়! কিন্তু সুভাষচন্দ্র জাতিকে হুঁশিয়ার করে দেন, কংগ্রেসের তরফ থেকে সংগ্রামী তোড়জোড় দেখেই যেন কেউ নিশ্চিন্ত না থাকেন। আবার একটা চৌরীচৌরা, হরিজন উদ্ধার বা গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের মত অজুহাতে যেন গান্ধীজী বা তাঁর অনুগামীরা সহসা সংগ্রাম বন্ধ করে দিতে না পারেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এমনকি শেষকালে জয়প্রকাশ নারায়ণও সুভাষচন্দ্রের কাছে তাঁর শেষ পত্রে এ সম্ভাবনা আছে বলে স্বীকার করেন যে, সংগ্রাম চালু করে দিয়েঃ দক্ষিণপন্থীরা ভিতরে ভিতরে সমঝোতার প্রয়াসও চালিয়ে যেতে পারে, সে সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে।

রাজকোট প্রজা আন্দোলন ও সে উপলক্ষে গান্ধীজীর অনশন ইত্যাদি ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অনশন পছন্দ করেননি। রাজকোটের ব্যাপারে বারবার অনশন, বড়লাটের হস্তক্ষেপ কামনা, ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গাওয়ারের মধ্যস্থতা স্বীকার সুভাষচন্দ্রের ভালো লাগেনি। রাজকোটের ব্যাপারে শেষপর্যন্ত গান্ধীজী বোকাই বনে গিয়েছিলেন বলা যায়।

নিজের ভুল সংশোধন করতেও অবশেষে তাঁকে একবার অনশন করতে হয়। সুভাষচন্দ্রের প্রধান আপত্তি এই যে গান্ধীজী দেশের মধ্যে হিংসার বাতাবরণের যুক্তিতে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করছেন না, দেশের মধ্যে তখন ছয় শতাধিক রাজারাজড়া ছিলেন, তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের নিয়ে সামগ্রিক প্রজা আন্দোলন বন্ধ রেখেছেন, অথচ রাজকোটের রাজা ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে লড়াই করতে লেগে গেলেন, সমগ্র দেশের তুলনায় ও সমস্ত প্রজা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যার একটা মাছির সমানও মূল্য হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর এক চিঠিতে তিনি এ ব্যাপারে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটি উত্থাপন করেছিলেন তা হল রাজকোটের প্রজাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনে তাদের বিরত রেখে গান্ধীজী একা কেন তাদের হয়ে লড়তে বা অনশন করে মরতে যাবেন? দেশের সর্বসাধারণের তাদের নিজেদের বোঝা নিজেরা যদি বহন করতে, নিজেদের স্বাধীনতা নিজেরা অর্জন করতে অগ্রসর না হয় তবে ব্যক্তিবিশেষ বা গান্ধীজীর একার সংগ্রামে তাদের কখনও সত্যিকার মুক্তি হতে পারে কি? সুভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন যে দেশের আপামর জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে লিপ্ত করতে হবে, তাদের সংগ্রাম প্রধানত তাদেরই করতে হবে, তাদের হয়ে তাদের স্বরাজ গান্ধীজী বা কয়েকজন নেতা এনে দিতে পারেন না, তা করতে গেলে জনসাধারণকে জাগানোই হবে না, তাদের স্বার্থত্যাগ করতে ও শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করবে না। তাতে দেশের ক্ষতিই হবে।

আপামর জনসাধারণকে সংগ্রামে লিপ্ত করতে গান্ধীজী কিছু করেননি একথা কিন্তু ঠিক নয়, বস্তুত ভারতকে গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মূল্য বোধহয় এইখানেই যে তিনি সর্বসাধারণকে এমনকি গ্রামের মেয়েদেরও সংগ্রামে টেনে এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই সংগ্রামের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোথায় কতটা ভুল করেছিলেন সে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু তিনি দেশের লোককে সংগ্রামের বোঝা নিতে উদ্বুদ্ধ করেননি, এমন অভিযোগ করাই চলে না।

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহসা সবাইকে বাদ দিয়ে একাই তিনি মরণপণ অনশন করতে লেগেছেন। গোটা দেশ তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু অপর কাউকে তিনি তাঁর অনশনের সমর্থনে ডাকেননি, দেশকে নীরব দর্শক হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। বস্তুত কখনও কখনও দেখা গিয়েছে যে অতি সামান্য কারণেও হয়তো কোনো কারাসঙ্গীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ঘোষণা করে বসেছেন, এবং নিজেই আবার বলেছেন যে তাঁর কাছে কোন্ সংগ্রামটার প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার বেশি, কোনটা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়, এসব বিচার-টিচারের জ্ঞান তাঁর সবসময় থাকে না। 'ইনার ভয়েস'-এর আদেশ তাঁর কাছে কখন কীভাবে উপস্থিত হবে তা যেন তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। তাঁর চলাফেরা মতিগতি তাই অনেকের কাছেই আনপ্রেডিক্‌টেবল হয়েছিল, হয়তো নিজের কাছেও।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে লিখেছিলেন পন্থ প্রস্তাবের মূল্য যদি স্বীকার করতে হয় তবে এবারে আপনার উচিত প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের চার আনা সদস্য হয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব পুরোপুরি হাতে নেওয়া। গান্ধীজী কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন;

কংগ্রেসের তিনি কেউ নন, তথাপি কংগ্রেসকে তার মতানুযায়ী চলতে হবে এমনকি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কে কে হবেন তাও তাঁরই মতামত নিয়ে করতে হবে। তাই যদি হয় তবে গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্য হয়ে তার পুরো দায়িত্ব হাতে নিন। কিন্তু গান্ধীজী তা নেবেন না, কংগ্রেসের দায়িত্ব ও রীতিনীতি পরিচালনা করার অধিকারও তিনি চান বা দাবি করেন না। অথচ কংগ্রেস সর্বদা তাঁরই মুখ চেয়ে বসে থাকবে। এ এক অসম্ভব পরিস্থিতি।

শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের বাইরে বসেই কংগ্রেস ও দেশের উপর তিনি যেন এক একটা আন্দোলন ও সংগ্রামের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতেন। কখনও তিনি অনশন করে বসবেন তা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বা সভাপতিরও সবসময় আগে জানার উপায় থাকত না, এ ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করতেন না। আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়াও যেন একমাত্র তিনি নিজেই নিজের খুশিমত করে দিতে পারতেন।

তাঁর অনশনের প্রকৃতি নানারকমের এবং আনপ্রেডিক্‌টেবল, যা আগে থেকে বোঝার উপায় নেই। সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে অনশনের তিনি বিরোধী নন, ব্যক্তিগত অনশনেরও নন, কিন্তু সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্ব ও সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি যে কারণেই হোক সমগ্র জাতির প্রতিভূ, জাতির পিতা। জাতির পিতার পক্ষে যখন তখন যা তা করা বা ঘোষণা করে দেওয়ার অধিকার কি এতই স্বাধীনভাবে খাটানো যায়? সমগ্র জাতির বোঝা তাঁকে একা বহন করারও অভিমান রাখা উচিত নয়। ব্যক্তিগত অনশনও যথার্থ বলে মেনে নেওয়া চলে যেখানে তা গণজাগরণ ও গণসংগ্রামের জন্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধী জাতির এমন একটা সম্পদ যাঁকে সহজে হারানো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই নিজের জীবন নিয়ে অমন ঘন ঘন ঝুঁকি নেবার অধিকারও তাঁর হয়তো নেই। মহাত্মা কেন তাঁর এই জাতীয় দায়িত্বের কথা ভুলে যান যেখানে তাঁর জীবন সমস্ত দেশের মানুষের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? দেশের সকল শ্রেণীর কংগ্রেসের ভিতরকার সব দল-উপদলেরই আস্থা আছে একমাত্র গান্ধীজীর উপর। একমাত্র তিনিই দেশকে একত্রিত রাখতে পারেন। তাই তাঁর পক্ষে কোনরকম ঝোঁক বা পক্ষপাতিত্ব নেওয়া উচিত নয়। 'If for any reason that confidence is shaken which God forbid and you are regarded as a partisan, then God help us and the Congress.'

গান্ধীজীর জীবনের মূল্য অথবা রাজনৈতিক দলাদলির ক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে বিপন্ন করার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র যেসব কথা গান্ধীজীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তার তাৎপর্য গান্ধীজী বুঝতেন না তা নয়। তবে তিনি বলেছেন, My prestige does not count. It has an independent value of its own. When my motive is suspected or my policy or programme rejected by the country, the prestige must go. India will rise and fall by the quality of the sum total of her many millions. Individuals, however high they may be, are of no account except

in so far as they represent the many millions, therefore let us rule it out of consideration.

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র-দুজনের মধ্যে কোথাও খুব গভীর একটা টান ছিল গান্ধীজী তাঁকে প্রত্যেক পত্রে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর এবং তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজীর যত পার্থক্যই থাকুক, যত মতান্তরই থাকুক, কোন অবস্থাতেই তা মনান্তরে পরিণত হবে না। প্রত্যেক চিঠিতেই বাপুর ভালবাসা, রুগ্ন সুভাষচন্দ্রকে নিজের হাতে সেবাযত্ন করার ইচ্ছা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। সুভাষচন্দ্রও তাঁকে প্রত্যেক পত্রে ব্যক্তিগতভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে ভুল করেননি।

এতৎসত্ত্বেও দুজনের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য কিছুতেই দূর করা গেল না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা উদ্যমে দুই বিরোধী মত-পথের মিল কোথায় হতে পারে গান্ধীজী তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন, যদি আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন গান্ধীজী, তাহলে তিনি সব ভুলে মহাত্মার অনুগত একজন সৈনিক হিসাবে সব কিছু এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। তাঁর সহকর্মীরাও তখন গান্ধীজীর পথে অগ্রসর হতে দ্বিধা করবেন না। সুভাষচন্দ্রের এই আত্মসমর্পণের সেদিন একটিই মাত্র শর্ত ছিল, তা হল অবিলম্বে চরমপত্র দিয়ে দেশব্যাপী সংগ্রামের প্রস্তুতিতে লাগা এবং সব রকম আপোসপন্থী বা আপোসের মোহ পরিত্যাগ করা। কিন্তু গান্ধীজী দেখাচ্ছেন দেশে প্রচ্ছন্ন হিংসার বাতাবরণ রয়েছে, শুধু সংগ্রামের কৌশলের ব্যাপারে নয় ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনা নিয়েও পার্থক্য রয়েছে। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীনই তাঁর নেতৃত্বে ভারতের প্ল্যানিং কমিটি তৈরী হয়। শিল্পায়নের পথেই ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। পণ্ডিত নেহেরুকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী ও কট্টর গান্ধীবাদীরা মনে করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কুটীরশিল্প খাদি ও গ্রামস্বরাজের পরিপন্থী চিন্তা। অতএব রাজনৈতিক সংগ্রামেব কলাকৌশলের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দুস্তর ব্যবধান আছে বলে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেছিলেন। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশন প্রায় স্ট্যাটুটারি মর্যাদা পেয়ে এসেছে। পাশ্চাত্য ও সোবিয়েত ধাঁচের শিল্পায়নের পথে ভারতের এক ধরণের 'বিকাশ' ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ধরণের বিকাশ ভারতের সত্যিই ভাল করেছে কিনা, ভারতকে অর্থনৈতিক ও (শেষ পর্যন্ত) রাজনৈতিক দিক থেকেও পরনির্ভর করেছে কিনা সে প্রশ্ন আজ উঠেছে, বিকল্প পথের অনুসন্ধানও চলেছে, গান্ধীবাদী পথও গ্রাহ্য হচ্ছে না। সে অনেক কথা, অনেক বিতর্ক, কিন্তু তার মূল ঐদিনই সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত হয়েছিল। একথা বলা যায় মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক স্বপ্ন যেমন ব্যর্থ হয়েছে বা ব্যর্থ করা হয়েছে তেমনি সুভাষচন্দ্রও আজ থাকলে প্ল্যানিং কমিশনের কীর্তিকলাপ

কোন্ চক্ষে দেখতেন কে জানে? আমরা বলতে পারি ঘটনা স্রোতে এই দুই মহানায়কই ঠিক কাজ করেছিলেন, আবার ভুল কাজও করেছিলেন।

৯। তবু ক্ষেত্রবিশেষেও কি দুজনে স্বেচ্ছায় মিলিত হতে পারতেন না? গান্ধীজী মনে করতেন যে তা পারা যায় না, কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনে করতেন নিশ্চয়ই পারা যায় ও যেত। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রই ঠিক ছিলেন, গান্ধীজীরই ভুল ছিল। এই যে ১৯৩৯, ১৯৪০-৪১ সালে আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে এত সব নীতিগত শর্ত পালনের উপর জোর দিয়েছিলেন গান্ধীজী, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তাঁর কোন্ শর্তটা প্রতিপালিত হয়েছিল? তখন তিনি কোন্ যুক্তিতে leave us to god and Anarchy বলে, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" বলে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ দিয়েছিলেন? তখন কোথায় ছিল তাঁর দেশের মধ্যে অবিমিশ্র অহিংসার বাতাবরণ বা কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি অবসানের শর্ত? ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তিন বছরে ভারতের সামগ্রিক অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছিল? সুভাষবিহীন ভারতবর্ষ গান্ধীজীর সর্বাত্মক বিপ্লব ঘোষণার পক্ষে কতটুকু তৈরি হয়েছিল? বরং বলা যায় গান্ধীজীর পক্ষে ও কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটা তখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, কিছু না করলেই যেন নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করেছে, এদিকে জাপান থেকে নতুন আগ্রাসনের বিপদ দেখা দিয়েছে, দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ছায়া, ভারতকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, ইংরেজ। মুসলিম লীগের দাবিদাওয়া আরও বেশি জোরদার হচ্ছে, যুদ্ধে ব্রিটিশদের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে এবং পরাজিত ইংল্যান্ডের পক্ষে ভারতকে কিছু দেবার ক্ষমতা থাকাও সম্ভব নয়, চতুর্দিকের এহেন উপায়ান্তরহীন পরিস্থিতিতেই গান্ধীজী তখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন। তবে ডাক দিয়েও গান্ধীজী তক্ষুনি লড়াই ঘোষণা করেননি, বড়লাটের সঙ্গে শেষ কথা বলার অবসর খুঁজেছিলেন। কিন্তু বড়লাটই সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিদ্রোহভাবাপন্ন ভারতের উপর।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র যখন ভারত সরকারকে চরমপত্র দিয়ে কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে সংগ্রামী পথে অগ্রসর হতে বলেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেদের সুবিধামত পরিস্থিতিতে নিজেদের শর্ত অনুযায়ী পরিকল্পিত ও সংগঠিত উপায়ে লড়তে পারতেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে না ছিল সেই সংগঠন, না ছিল সেই প্রস্তুতি, না ছিল সুস্পষ্ট দৃঢ় নেতৃত্ব অথচ ইংরেজ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ তখন অনেক বেশি সংগঠিত। সুভাষচন্দ্র তাঁর এক পত্রে একথাও বলেছিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে সময় ও সুবিধার বিচারও করতে হবে, নিজেদের সুবিধামত আমরা সংগ্রাম ঘোষণা করব, না শত্রুপক্ষ আমাদের উপরে একটা সংগ্রাম চাপিয়ে দেবে, এ প্রশ্ন প্রত্যেক স্ট্র্যাটেজিস্টকে প্রত্যেক জেনারেলকে বিচার করে দেখতেই হবে। ১৯৪২ সালে সর্বাত্মক সংগ্রামের ডাকটা সময়োচিত হয়েছিল, না ঠিক মুহূর্তটা আগেই পার হয়ে গিয়েছিল, তার বিচার করার এখন সময় হয়েছে। মনে রাখা দরকার ১৯৪২ সালের সংগ্রাম ব্যর্থ ও পরাজিত হয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ ও নৌ-বিদ্রোহ দিয়েই

সম্ভব হয়েছিল ভারতের সংগ্রামী চেতনার পুনরুদ্ধার, যার পরিণামে মিলে ছিল ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা, যার স্বাদ মহাত্মা গান্ধী ও অসংখ্য নিরপরাধ জীবন্মৃত নরনারীর কাছে অত্যন্ত তিক্ত হয়েছিল, যে-তিক্ততা আজও দূর হয়নি।

১০। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের শান্তিতে থাকতে দেননি। শেষবারের মত গান্ধীজীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি ১৯৪০ সালের ২৩ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিতে। অথচ সে সময় তিনি জেলখানায় অনশন করার পর এলগিন রোডের বাড়িতে এসেছেন এবং দেশ থেকে পালাবার আয়োজন করছেন। জবাবে মহাত্মা প্রথমেই তাঁকে একটা কমপ্লিমেণ্ট দেন এই বলে 'you are irrespressible whether ill or well.' বস্তুত সুভাষচন্দ্র বসু একজন অদ্বিতীয় অদম্য নেতাই শুধু ছিলেন না, গান্ধীজীর কাছে এই একটিই মাত্র ব্যক্তি সেদিন ভারতে ছিলেন যিনি তাঁর প্রকৃত বিরোধিতা করার সাহস ও শক্তি রাখতেন। আর সবাই ছিলেন গান্ধীজীর ছায়া মাত্র। বাংলা কংগ্রেস এবং তাঁর ও শরৎচন্দ্র বসুর উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার জন্য সুভাষচন্দ্র মহাত্মাকে লিখেছিলেন চিঠি। ২৯ ডিসেম্বর তার জবাবেই গান্ধীজী ঐ কথা দিয়ে শুরু করে জানান 'I have not been in consultation with Moulana Sahib' (অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও বাংলা কংগ্রেসের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা জারি করার আগে তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ বা তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর মতামত নেননি। এই খবরটা পাওয়া গেল এবং গান্ধীজীর সঙ্গে মৌলানা কতটা পরামর্শ করে চলতেন তাও বোঝা গেল। নেতারা তখন এক একটা ঘটনা ঘটিয়ে 'গান্ধীজীকি জয়' বলে সব শুদ্ধ করে নিতেন।) তারপরই গান্ধী লিখছেন 'But when I read in the paper about the decision I could not help approving of it. I am surprised that you won't distinguish between discipline and indiscipline.'

হায়, কংগ্রেসের মধ্যে শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন রক্ষার উদ্বেগ। এই কংগ্রেসেরই ভিতরকার দুর্নীতি ও বোগাস মেম্বারশিপের অজুহাতে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের ডাকে সত্যাগ্রহ জাতীয় আন্দোলন শুরু করতে নারাজ ছিলেন। আবার ১৯৪৮ সালে মৃত্যুর অল্পদিন আগে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসকে একদম ভেঙ্গে দিতে বলেছিলেন, যা বলা যায় তাঁর লাস্ট টেস্টামেণ্ট। কংগ্রেসকে তিনি অরাজনৈতিক লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত করতে বলেছিলেন নিজের সঙ্গীসাথীদের। সুভাষচন্দ্র যখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করতে বাধ্য হন, তখনও তিনি কংগ্রেসের একজন মহাভক্ত, তখনও তিনি কংগ্রেসে আরও লক্ষ লক্ষ লোক টানতে হবে বলে নির্দেশ দিচ্ছিলেন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের এবং কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি করতেই তিনি রাজি হননি। ডিসিপ্লিন ভাঙ্গতে তিনিও তো রাজি ছিলেন না। কিন্তু হায় গান্ধীজী, হায় সুভাষচন্দ্র, উভয়কেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে একটা দুর্গন্ধযুক্ত প্রতিষ্ঠান মনে করে তাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতে হয় দেশবাসীকে। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস।

গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে সেই চিঠিতে লিখছেন, But I quite agree with you,

either of you is more than a match for the Moulana Sahib as far as popularity is concerned. But a man has to put conscience before popularity. I know that in Bengal it is difficult to function effectively without you two I know too that you can carry on even without congress. But the Congress has to manage somehow under the severe handicap.

......As for your Bloc joining C. D. (civil disobedience) I think with fundamental differences between you and me, it is not possible. Till one of us is concerted to the other's view, we must sail in different boats though their destination may appear to be the same.

Meanwhile let us love one another remaining members of the same family that we are. Yours, Bapu

এইটাই সুভাষচন্দ্রের কাছে গান্ধীজীর লেখা শেষ পত্র। জীবনে আর তাঁরা মিলতে পারেননি। কিন্তু দুজনেরই শোচনীয় মৃত্যুর পরে একটা মিলনভূমি দেখতে পাই, যদিও তা এক বৃহৎ ও মহতী সর্বনাশের পরে। ১৯৩৯ সালে বা ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি হাত মেলাতে পারেননি। কিন্তু ১৯৪২ সালে তো কেউ অচ্ছুৎ ছিলেন না। Man proposes but god disposses এর মত এই দুই ব্যক্তি যা ভাবতেন যা চাইতেন, তা সব মুছে দিয়ে ইতিহাস সবাইকেই তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে ঘাড় ধরে ঠেলে নিয়ে যায়। যার জন্য বলা হয় সাবজেকটিভ ফোর্সের চেয়ে অবজেকটিভ ফোর্সের শক্তি কয়েক গুণ বেশি। তবে একথা ইতিহাস মনে রাখবে যে সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর দিকে হাত প্রসারিত করে রাখার চেষ্টা কখনই ক্লান্ত হয়নি, এমনকি টোকিওতে পেঁছে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে যুদ্ধে নামার পরেও। সেদিক থেকে সুভাষচন্দ্রের দূরদৃষ্টি মহাত্মার চেয়ে কম ছিলনা বলেই মনে হয়।

১১। জনৈক জৈন মুনি গান্ধীজী সম্পর্কে বলেছিলেন যে কোনও পরিস্থিতিতে সত্য ও অহিংসার মধ্যে যদি একটা বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে গান্ধীজী সত্যের খাতিরে অহিংসাকেও ত্যাগ করতে পারেন। যদি কখনও কোন পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে গান্ধীজীর হাতে, যে অহিংসার অস্ত্র আছে তার দ্বারা সত্যের মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন সত্যকে বড় বলে মেনে নিয়ে অহিংসার ক্ষেত্রে অতো rigidity (রিজিডিটি) পরিত্যাগ করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের real politic-এর বিরোধ ১৯৩৯ সালে প্রকটভাবে একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ এবং তা থেকে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগ এবং পরে দেশত্যাগ করে প্রথমে জার্মানী এবং পরে জাপানে গিয়ে আজাদহিন্দ বাহিনী নিয়ে ভারতকে মুক্ত করার অভিযানের নীতিগত তাৎপর্য বিচারের একটা মস্তবড় ক্ষেত্র

আছে।

গান্ধীচরিত্র ও কার্যকলাপের জটিলতার অন্ত নেই। কোথায় যে ব্যক্তিটির আরম্ভ কোথায় যে তার শেষ, তাঁর দৃষ্টিতে কোথায় যে সংগঠনের দায় আর কোথায় যে ব্যক্তির দায়দায়িত্বের ভূমিকা, সে-সব সাধারণ নিয়মে বোঝা বা রীতিনীতিবন্ধ নিয়মাবলীতে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তাঁকে দেখে বা তাঁর অনুসরণ করে অপর কোনো ব্যক্তি বা নেতা যদি চলতে চান তবে তা অসম্ভব, যদিনা মহাত্মা গান্ধীর মতই তিনিও আর এক অসাধারণ ব্যক্তি হন। এই অনন্য ব্যক্তিটিকে কী করে সাধারণ মাপের লোকের মধ্যে খাপ খাওয়ানো যাবে? তাঁর অনুকরণ করতে গেলে তাই তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি তা বিপরীত ফলপ্রসূও হয়ে যেতে পারে। গান্ধীজী সত্যিকার অর্থে এমন সব আগুন নিয়ে খেলা করতে চেষ্টা করেছেন যে আগুন, বিশেষ করে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর খাতে প্রবাহিত সেই লাভাকে হয়তো হাওয়া না দেওয়াই উচিত ছিল, অনেকে বলবেন। সত্যকে নিয়ে তাঁর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার (এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ) ফলাফল চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়নি। অহিংসার ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে সবলের অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ তিনি দেখিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর ফিলসফিকাল অ্যানার্কিজম-এ, সংগঠনের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বহু জটিলতার সমাধান-সূত্র তিনি বের করতে পারেননি। নিজে চার আনা দামের সদস্য না থেকেও দেশের ও পৃথিবীর একটি অন্যতম বিশাল সংগঠনের দায়দায়িত্ব বহন করার যুক্তিটা তাঁর কী ছিল, তা পরিষ্কার হয়নি। তথাপি তিনি বলে গেছেন অহিংসা ও অন্যান্য সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি ফেল করলেও একথা প্রমাণ হয় না যে অহিংসার ও সত্যের পরাজয় হল। বলেছেন তিনি নিজে দুর্বল ও অক্ষম বলে পরাস্ত হয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অহিংসা ও সত্যের পরাজয় হয়নি, হতে পারে না। তাঁর চেয়ে শক্তিমান মানুষেরা একদিন এসে সেইসব শাশ্বত মূল্যবোধের অধিকতর সার্থকতা দেখাবেন। এ সম্পর্কে সন্দেহ করা মানেই তাঁর সত্য-ভগবানকে অস্বীকার করা।

কিন্তু শেষ কথাটি তবে কী দাঁড়াল? গান্ধী না সুভাষ কে বেশি সত্যের কাছাকাছি? হিংসারই জয় হল না অহিংসার? বলা যায় হিংসারও জয় হয়নি, অহিংসারও নয়। কোনোটারই সত্যাসত্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হল না। কেবল বোধ হয় এটুকুই বলা যায়, হিংসা অহিংসা সত্যাসত্য এসবই আপেক্ষিক তাৎপর্যপূর্ণ। এরা পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হলেও মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে তত বিরুদ্ধধর্মী নয়। হিংসা যাঁর প্রকাশ অহিংসাও তাঁরই প্রকাশ। Monism ছেড়ে Pluralism বিশ্ব-দর্শনের বিচারে টেঁকে না। সেখানে মৃত্যুও জীবনেরই বাহন, 'মরণ বলে আমি তোমার জীবন তরী বাই'। শেষ তাহলে কোথায়? ঋষি কবির গানের কলিটা দিয়েই শেষ করি 'শেষ নাহি যার, শেষ কথা কে বলবে?'

হরিজন-আদিবাসী-মজুর ইত্যাদি

গঠনমূলক কাজের একটা প্রধান অঙ্গ হলো হরিজন আন্দোলন। হিন্দু সমাজ থেকে অচ্ছুতপ্রথা দূর করার জন্য গান্ধীজীর কার্যকলাপ যে কত ছিল সে সম্বন্ধে কোন কথা বলারই দরকার করে না। আমরা কেবল এই আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত সমালোচনা প্রগতিপন্থীদের কাছ থেকে শোনা যায়, সে সম্বন্ধে বিচার করবো। আমরা জানি মহাত্মা গান্ধী হিন্দু সমাজে অচ্ছ্যুত প্রথাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, এবং বলেছেন যদি হিন্দুসমাজ এ প্রথাকে রদ না করে তবে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব থাকার কোন প্রয়োজন নেই। হিন্দুধর্ম মুছে যাওয়া উচিত। মন্দিরে যতদিন হরিজনদের প্রবেশাধিকার না হবে তিনি ততদিন মন্দিরে যাবেন না, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং কোনদিন যানও নি, যদিও তিনি পরমভক্ত সাধক ছিলেন এবং মন্দিরের প্রয়োজন সর্বদাই স্বীকার করে গেছেন। কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের স্ত্রী একদিন গান্ধীজীকে না জানিয়েই পুরীর মন্দিরে গিয়েছিলেন বলে তিনি অনশন করার মতলব করেন। অতিকষ্টে তাঁকে সেবার এই পণ থেকে বিরত করা যায়। যেখানে হরিজনদের স্থান নেই, সেখানে তাঁরও স্থান থাকতে পারেনা, এই ছিল তাঁর নীতি। ১৯২১ সালে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে লিখেছেন, "I would rather be torn to pieces than disown my brothers of the suppresed classes. I don't want to be reborn, but if I have to be reborn, I should be untouchable so that I may share their sorrows, sufferings and affronts levelled at them in order that I may endeavour to free them from their miserable condition." (Romain Rolland, Mahatma Gandhi page 36)

"বরং আমাকে ছিন্নভিন্ন করতে দিতে আমি রাজি আছি, কিন্তু আমার নির্যাতিত ভাইদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আমি রাজি নই। আমি আবার জন্ম নিতে চাই না, কিন্তু যদি আবার আমাকে জন্ম নিতেই হয়, তবে যেন আমি এই অচ্ছ্যুৎদের ঘরে জন্ম নিই, যাতে আমি তাদের দুঃখ দুর্দশা ও অপমানের অংশ নিতে পারি এবং তাদের এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির কাজে লাগতে পারি।"

কেবলমাত্র রাজনীতির খাতিরে তিনি অচ্ছ্যুৎদের দাবিকে গ্রহণ করেন নি। অতি শৈশব থেকেই মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও তিনি অচ্ছ্যুৎদের সাথে মিশতেন। গান্ধীজী অত্যন্ত মাতৃপিতৃ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু অচ্ছ্যুৎদের ব্যাপারে তিনি মা-বাপের আদেশ লঙ্ঘন করতে কোন প্রকারের দ্বিধা করতেন না। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম বিদ্রোহ একটি অচ্ছ্যুৎ বালককে ছুঁয়ে, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ; তিনি সেদিন থেকেই বিদ্রোহ শুরু করেন, বলতে পারা যায়। অনেকে

ভাবে যে হরিজনদের হাত করার জন্যই তিনি এই প্রকার রাজনৈতিক পথ নিয়েছিলেন, 'পুনাপ্যাক্টের' সময়ে অনেকের এই ভ্রান্তি হয়েছিল, অন্ততঃ মুসলীমলীগ ও আম্বেদকরের দল প্রচার করতো যে অচ্ছুৎদের হাতে রাখার রাজনৈতিক চালের জন্যই তিনি হরিজন আন্দোলন করেন। একথা যে কত বাজে, সেটা গান্ধীজীর সমগ্র জীবন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাঁর জীবনের একটা প্রধান মিশন বা উদ্দেশ্য হলো এই হরিজন আন্দোলন। এরমধ্যে কোন রাজনৈতিক চাল ছিল না। আম্বেদকরের হাত থেকে হরিজনদের হাত করে নেবার কোন কৌশল তাতে ছিল না। অবশ্য পরোক্ষভাবে সমগ্র হরিজনদের সমস্ত দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ দেশের পক্ষে আছে বই কি, নাহলে হরিজনরা খ্রিশ্টান হোক বা মুসলমান হোক বা জিন্নার সাথে তাল মিলিয়ে একটা হরিজনস্থান দাবি করে বসুক, এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পথ থেকেও সাম্রাজ্যবাদী divide and rule নীতির অপকৌশল থেকে তাদের বাঁচাবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। কারণ একে তো মুসলমানেরা আস্তে আস্তে পাকিস্তানের দাবিতে ভারতীয় আন্দোলন থেকে সরে গেলেন, তার উপর যদি অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ও কোনো আম্বেদকরের প্ররোচনায় পড়ে জাতীয় সংগ্রাম থেকে সরে যায়, তবে তার মতো রাজনৈতিক অপঘাত আর কি হতে পারে? সে হিসেবে হরিজন আন্দোলনের একটা রাজনৈতিক মূল্যও আছে। তাছাড়া হরিজনদের নিজেদের মুক্তির জন্যও হরিজন আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। হিন্দুসমাজের উন্নতিরও জন্যও তার নিজস্ব মূল্য আছে, আর আছে সবার উপরে যে চিরন্তন মূল্য সেটি, যথা, মানুষের উপর এমন নির্মম অত্যাচার ও অপমান যে অচ্ছুৎপ্রথায় বর্তমান রয়েছে, সেই প্রথাকে ধ্বংস করার মূল্য। ভারতে মানুষের মুক্তির সংগ্রাম হরিজনদের বেলায়ই প্রধান ও প্রথম, নাহলে স্বাধীনতা, সভ্যতা ইত্যাদি কথার কোন মানেই হয় না। গান্ধীজী পরিষ্কার বলেছেন, ইংরেজরা ভারতবাসীকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত করেছে তারচেয়ে বেশী ক্ষতি ও অপমান করেছে বর্ণহিন্দুসমাজ হরিজনদের শত শত বছর ধরে। কাজেই হরিজন আন্দোলনটা তাঁর কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় আন্দোলন মনে হয় নি। কাজেই যারা মনে করতো যে হরিজন আন্দোলন করে গান্ধীজী প্রধান রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন, তিনি তাদের সঙ্গে একমত নন।

বামপন্থীদের তরফ থেকে আন্দোলনের প্রতি বিরূপতা কম ছিল না। তারা তাদের মতবাদের স্বর্ণশিখরে বা আইভরি টাওয়ারে বসে হরিজন বলে কোন সমস্যা ছিল, একথা মনে করতেন না। কেননা তাদের কাছে সমস্ত জিনিষই ছিল একটা সরল কথাতে পর্যবসিত। তারা মনে করতেন মন্দির ও ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারে হরিজনদের অধিকার নিয়ে মাতামাতি করার কোন অর্থই নেই, যেহেতু তারা ধর্মকে মানেন না এবং মন্দিরের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না। তাই হরিজনরা মন্দিরে যাবে কেন? বরং কেউ যাতে মন্দিরে না যায় সেটাই হলো সমস্যার সমাধান। ধর্মকে উঠিয়ে দিলে সব আপদ চলে যায়। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও থাকে না, হরিজন সমস্যাও থাকে না। অতএব তারা বরং ধর্মকে ভারত থেকে দূর করে দেবার পক্ষপাতী, কিন্তু

হরিজনদের মন্দিরে ঢোকানো বা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটানো, ধর্মের গণ্ডী বজায় রেখে, এসব আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলতাই দেখতে পেতেন। এতে তাঁরা মনে করতেন হরিজনরা, যাঁরা প্রায় ধর্মশূন্য হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ফের ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনার মধ্যে একটা অপকৌশল রয়েছে। অতএব হরিজন আন্দোলনে কোন প্রকারের সহায়তা করা চলে না। এই বলে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। ধর্মকেই উঠিয়ে দাও, এই হলো তাঁদের দাবি, তাহলে হরিজন-হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান জাতিভেদ ইত্যাদি কোন সমস্যাই রইলো না, এই হলো ওঁদের পেটেণ্ট দাওয়াই। এই পেটেণ্ট দাওয়াইতে যে কি গলদ সেকথা আমরা যখন রামচন্দ্র রাও-এর সাথে গান্ধীজীর বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি, তখন কিছুটা বলেছি। পুনরুক্তি করেও একটা কথা বলে দেওয়া দরকার যে এই জাতীয় সরল-যুক্তি বাস্তবও নয়, সুন্দরও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। একটা সরল স্বপ্নবিলাসী হঠকারিতা মাত্র। ধর্মকে অতো সহজে কেউ উঠিয়ে দিতে পারে না. এবং সে চেষ্টা করতে গেলে উল্টো ফল হবে। তাছাড়া এই হরিজন আন্দোলন বা হিন্দু-মুসলমান মিলনের আন্দোলনটা কেবলমাত্র ধর্মীয় সংস্কার নয়, এর ভিতর নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত শ্রেণী-সমূহের গণতান্ত্রিক দাবি ও অধিকারের সংগ্রাম রয়েছে এবং সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের মুক্তি সংগ্রামে যে সমান অধিকার, সাম্য ও ঐক্যের বাণী রয়েছে, তার কার্যকরী রূপ এইসব গণতান্ত্রিক দাবির মধ্যেই ফুটে বেরোয়। এইসব আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বামপন্থীদের যে কি ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁদের অতিবিপ্লবী, অতিবাম চটকদার কথা তাঁদের জনতা থেকে বহুদূরে ঠেলে দিয়েছে, ছিন্নমূল অদ্ভুত জীব হিসেবে তাঁরা সমাজ থেকে বহুদূরে ভাবজগতের গভীর অরণ্যে রোদন করে বেড়াচ্ছেন।

বামপন্থীদের আরো একটি অতিবাম সরলতার নমুনা হলো এই যে, তাঁরা একটি দাওয়াইতে যাবতীয় রোগ একেবারেই নির্মূল করে দিতে চান। তাঁরা হরিজন আন্দোলন বলে কোন আন্দোলনের প্রয়োজন দেখেন না, প্রোলেটেরিয়ান বা শ্রমিকশ্রেণী (ওয়ার্কিং ক্লাস)-আন্দোলন যদি সার্থক হয় ও প্রোলেটেরিয়ান ডিকটেটরশিপ যদি স্থাপন করা যায়, তাহলে সব সমস্যাই দূর হয়ে যায়, এই হলো তাঁদের যুক্তি। কেন না সমাজতন্ত্র এসে গেলেই হয়, এইসব জাতিভেদ, অচ্ছ্যুৎপ্রথা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাজতন্ত্রেই সমাধান করা যায়। অতএব এসব খণ্ড সংগ্রাম না করে সোজা সমাজতন্ত্রের লড়াই ওঠালেই সব চুকে গেলো। কিন্তু কোনো দেশে এতো সোজা করে এক ধাপে, এক সংগ্রামে কেউ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেতে পারে নি। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও চেতনা, প্রতিদিনকার ছোট-বড় নানা বাধা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ হয়। একটি মন্ত্র দিয়ে বিপ্লব করার স্বপ্ন ইউটোপিয়ান, অবাস্তব ও মূর্খতাপূর্ণ, একথা আজ সকলেই স্বীকার করতে শিখেছেন। তারই জন্য আজ প্রগতিশীল সকল প্রকার গণতান্ত্রিক, সমাজনৈতিক নানা ছোট-বড় আন্দোলনে তাদের যোগ দেবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু সেদিন গান্ধীজীর নানাপ্রকারের শাখা-আন্দোলন ও গঠনমূলক কার্যকলাপকে তাঁরা চোখ বুঁজে

একবাক্যে অস্বীকার করেছেন, বিপ্লবের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে। ফলে তাঁরা কোনই জোরদার বা কার্যকরী শক্তি হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাতে পারেন নি। বৃহত্তম জনতার সাথে তাঁদের কোন নাড়ীর যোগ ঘটে নি, ফলে তাঁরা গান্ধীজীর উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকতেন এবং শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর সহায়তা ভিন্ন কোন বৃহৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি। হরিজন আন্দোলনের মধ্যে যে একটা শ্রেণীসংগ্রাম আছে, তার তাৎপর্যটাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা মনে করতেন হরিজন আন্দোলন করা মানে শ্রেণীসংগ্রাম করা নয়, এটা শ্রেণীসংগ্রাম এড়াবার অপকৌশল মাত্র। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের একটি মাত্র চিত্রই জেনে রেখেছিলেন, একটা যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল অর্থ—মজুর ও মালিক, চাষী ও জমিদার, এদের মধ্যেকার সংগ্রাম ছাড়া আর শ্রেণী সংগ্রাম নেই, এমনি ধরণের অপব্যাখ্যা করেছিলেন মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামকে। ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ফল, মার্কস্ যখন একথা বলেছেন, তখন তিনি কোনো বিশেষ এক ধরণের শ্রেণীসংগ্রামকে বোঝান নি। ইতিহাসের অন্তর্গত সকল প্রকার সংগ্রামে, এমন কি ধর্মের অন্তর্গত সংগ্রামগুলিও শেষপর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রাম, এই ব্যাপক অর্থেই মার্ক্সের শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব প্রযোজ্য। তিনি দেখিয়েছেন মার্টিন লুথারের আন্দোলনও শ্রেণীসংগ্রাম। কিন্তু এসব বিষয়ের সত্যিকার দার্শনিক তাৎপর্য না ধরতে পারার দরুণ যেখানে সত্যিকারের শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে, সেখানেও তাঁরা অন্ধ থেকে গেছেন। তাঁরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনটাও যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামেরই একটা বৃহত্তম দিক, সেটাও ধরতে পারেন নি। ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী নেতৃত্বে, জাতীয় আন্দোলনেও কোন শ্রেণীসংগ্রাম আছে বলে স্বীকার করেন নি, এবং এই জাতীয় আন্দোলনেও তাই মন খুলে যোগ দিতে অক্ষম হয়েছেন। প্রোলেটারিয়ান নেতৃত্ব ছাড়া কোন শ্রেণীসংগ্রাম নেই, এই ধরণের অতি সরল যুক্তিই হলো এদের, যেন প্রোলেটারিয়েট ছাড়া আর কেউ কোন শ্রেণীসংগ্রাম ইতিহাসে কোন কালেই করে নি। ভারতের ইতিহাসে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আবর্জনা জড় হয়েছে সেগুলির দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণী ও নির্য্যাতিত মানুষেরা যে সংগ্রাম চালায়, তাতেও প্রচুর শ্রেণীসংগ্রাম আছে, একথা তাঁরা কেউ ধরতেই পারেন নি। হিন্দু-মুসলমান মিলনের ঐক্য সম্বন্ধে তাঁদের অনেক ছেলেমানুষী ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে যদি শ্রমিকশ্রেণীর (ওয়ার্কিং ক্লাস) আন্দোলনটা সামনে এনে ফেলা যায়, তবে আর হিন্দু-মুসলমান ঝাগড়া থাকবে না, এই হলো আর এক যুক্তি। অথচ হিন্দু-মুসলমানে যদি মিল না থাকে তবে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলন সৃষ্টি হতেই পারে না। এই সাধারণ কথাটাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এই হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে সংস্কৃতি ও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারেও, যে ঐক্য সাধনের প্রয়োজন আছে, এবং প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিদ্বেষ ও হিংসার বিরুদ্ধে বহু মেহনত ও বহু কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন আছে, সেকথা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম নামক একটা গুপ্তমন্ত্রের সাহায্যেই সব কাজ, কতকগুলি বুলি আউড়েই শেষ করতে চান। এই রাজনৈতিক সহজিয়ারা তাই ভারতের সকল প্রকার জটিল সমস্যাসমূহকে এড়াতে চেয়েছেন, এতে

সত্যিকারের কোন বৈপ্লবিক যুক্তি নেই, আছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী মোহ, কাজ না করার ফিকির। ফলে তাঁরা ইতিহাসের অনেকগুলি স্তরকে হঠাৎ এক লাফে পেরিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। নিজেরা নিজেদের আদর্শের স্বর্ণশিখরে বসে জনতার অজ্ঞতা ও মোহ ইত্যাদির নিন্দা ও গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়াশীলতার নিন্দা করা ছাড়া আর কোন কাজ করেননি।

১৯৩২ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে একবার ও ১৯৩৩ সালের মে মাসে তিনি বিখ্যাত একুশ দিনের অনশন করেন, এই হরিজন-উন্নয়ন নিয়ে, যারফলে পুনা-প্যাক্ট হয়। দেশ তখন আইন অমান্য আন্দোলনে লিপ্ত। নেতারা ও অসংখ্য লোক তখন জেলে। এই সময়ে জাতীয় সংগ্রাম থেকে দেশকে এইহরিজন সমস্যায় টেনে আনা একটা বিচ্যুত ও ডাইভারসান করা হচ্ছে বলে অনেকে গান্ধীজীকে দোষারোপ করেন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চলেছে, এমতাবস্থায় হরিজন নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? এতে দেশকে লক্ষ্য থেকে অন্যদিকে বিভ্রান্ত করা হলো না? স্বয়ং পণ্ডিত নেহেরু পর্যন্ত এ ধরণের সংশয়ে পড়েছিলেন এবং গান্ধীজীর এই কাজকে পছন্দ করতে পারেন নি। তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন—"News of Harijan movement and of Gandhiji's activities from prison came to us, and I was not very happy over it. There was no doubt that a tremendous push had been given to the movement to end untouchability and raise the unhappy depressed classes, not so much for the pact as by the crusading enthusiasm created all over the country. That was to be welcomed. But it was equally obvious that civil disobedience had suffered. The countries attention had been diverted to other issues, and many congress workers had turned to the Harijan work."—Autobiography page 372. তিনি আবার বলেছেন, "Again I watched the emotional upheavel of the country during the fast, and I wondered more if this was the right method in politics. It seemed to be sheer revivalism, and clear thinking had not a ghost of a chance against it—page 373—এখানেও আমরা দেখছি যে নেহেরু পর্যন্ত হরিজন আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে আসবার একটা রাস্তা হিসেবে দেখেছেন। নেহেরুর এই ভুল অবশ্য পরে তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন ও তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক বামপন্থীর ভুল এই ব্যাপারে আজও নিরসন হয় নি। তাঁরা আজও মনে করেন যে সেই অনশন রাজনীতির দিক থেকে ডাইভারশান বা অপসরণ। অতিবাম যাঁরা, তাঁরা একে বিশ্বাসঘাতকতা বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু তাঁদের জানা দরকার, সেদিন 'ম্যাকডোনাল্ড-এওয়ার্ড' ভারতের বুকে কি কঠিন ফাটল ধরাবার তালে ছিল। তাঁদের বোঝা উচিত ভারতের কোটি কোটি হরিজনদের, মুসলমানদের মত ভারতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কি বিপদ ছিল। আরও তাঁদের জানা দরকার যে গান্ধীজী যখন অনশন

করেন তখন আইন অমান্য আন্দোলন এমনিতেই ক্লান্ত ও ঝিমিয়ে এসেছিল। জেলে বসে থাকা ও মাঝে মাঝে দু-চারটি জেলগমনকারী জনতা সৃষ্টি করা ছাড়া আন্দোলনের আর বিশেষ কোনও জোর ছিল না। সে সময়ে সংগ্রামে বিরতি দিয়ে ফের নতুন করে জনতাকে সংগঠিত করা ও প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করে বৃহত্তম সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য সে বিরতিকে ব্যবহার করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়েছিল। আর হরিজন আন্দোলনের মধ্যে যে সমান অধিকারের বজ্রগম্ভীর বাণী আছে, তাকে ব্যবহার করলে কি গণতান্ত্রিক, কি সমাজতান্ত্রিক, কোন প্রকার বিপ্লবী আবহাওয়া ও গণচেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়? কাজেই সেদিনের হরিজন আন্দোলনটাকে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনের অতি-আবশ্যকীয় পরিপূরক হিসেবেই ধরতে হবে। আর হরিজন আন্দোলন সৃষ্টি করতে পুনরভ্যুত্থান বা রিভাইভেলিজম হচ্ছে বলে জওহরলাল যে দোষারোপ করতে চেয়েছেন এবং যুক্তিবাদের বদলে রহস্যবাদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে বলে শংকিত হয়েছেন, তা সম্পূর্ণই ভুল। একথা পরবর্তী ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং জওহরলালও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বেই পুনরভ্যুত্থানের দেষারোপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কাজেই ও নিয়ে আর কোন পুনরুক্তি করতে চাই না। হরিজন আন্দোলনে রিভাইভেলিজম্ তো কিছু হয়নিই, বরং এতে বিরাট গণতান্ত্রিক কাজ অনেকটা পূর্ণ হয়েছে, আইনের চক্ষুতে আজ হরিজনদের সামাজিক মর্যাদা সকলের সমান বলে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে দারিদ্রের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সমান অধিকার বাস্তব ক্ষেত্রে কায়েম হতে এখনও বাকি আছে। তাছাড়া হিন্দুসমাজের বিরাট গোঁড়ামীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে বলতে হবে।

হরিজন আন্দোলনে যদি অচ্ছ্যুৎপ্রথা দূর হয় তবে হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার বৈষম্য ও অন্যায়ও অনেকটা দূর হতে বাধ্য। হরিজনদের সমান অধিকার ও সম্মান যদি স্থাপিত হয় তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে যে সম্মানের ইতরবিশেষ আছে, তাও দূর হতে বাধ্য। কেন না মূলতঃ এই আন্দোলন ইকুয়েলিটি বা সাম্যের আন্দোলনের অংশ। অংশ কেন, বরং বলা যায় হিন্দুসমাজের অসাম্যের গোড়াকার গলদেই এই আঘাত পড়েছে। অতএব হরিজন আন্দোলনের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুসমাজের পুরোনো গোঁড়ামির উপরেই আঘাত হেনেছে, ফলে হিন্দুসমাজে সত্যিকার গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হবার পথ এতে হতে পারে। গান্ধীজী বলেছেন বর্ণাশ্রম ধর্মের গলদ শুরু হয়েছে উচ্চনীচ বিভেদ থেকে। নাহলে শ্রমবিভাগ হিসেবে যদি বর্ণধর্ম থাকে এবং প্রত্যেক বর্ণেরই সমান ইজ্জত থাকে, তবে বর্ণধর্ম ইত্যাদি নিয়ে তত কিছু অন্যায় হয় না। একথা সত্যি যে গান্ধীজী বর্ণ প্রথাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না, বরং তিনি মনে করেছিলেন সমাজের সংগঠন ও ব্যবস্থা হিসেবে এর কার্যকারিতা আছে। অর্থাৎ প্লেটো বা সক্রেটিস যেভাবে সমাজে বিভিন্ন প্রকার ভাগ করতে চেয়েছিলেন, গুণ ও কর্মের ভাগ হিসেবে, এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তিনি কতকটা সে যুক্তি যেন মানতেন। তবে প্লেটোর সমাজের বিভক্তকরণ, জন্মগত ভিত্তির উপর তৈরী হয় নি, গুণগত বিচারের দ্বারা

প্রত্যেক প্রজন্মের বা জেনারেশনের নতুন করে বিচার ও তারপর প্রত্যেকের গুণগত প্রকৃতি দেখে বর্ণ বিচার করার কল্পনা তাতে রয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী সেরকম ভাবে বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ প্রত্যেক নবজাত শিশু বা বালকের চরিত্র বিচার করে আলাদা আলাদা বর্ণে বার বার বিভক্ত করে তোলা কার্যক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে তিনি যে হিসেবে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানতেন, সে হিসেবে সকল বর্ণের লোকেরই সমান অধিকার ও সমান ইজ্জত স্বীকার করতে হবে। কেউ উঁচু বা নীচু বলে পরিচিত হতে পারবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মান একজন হরিজন বা ব্যবসায়ীর থেকে কম বা বেশী হতে পারবে না, জাতির হিসেব থেকে। ব্যক্তি অবশ্যি অনেক ক্ষেত্রে নিজ গুণে কমবেশী ইজ্জতের অধিকারী হবেই, সে আলাদা কথা, কিন্তু জাত হিসেবে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দাবি করতে পারবে না। বর্ণহীন সমাজব্যবস্থায়ও, যেমন ইউরোপে যেখানে বর্ণপ্রথা নেই সেখানে গুণ ও কর্মের যোগ্যতা হিসেবে নানা বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং মান-ইজ্জতের নানা ধরণের ভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। গান্ধীজীর ধারণা ছিল এই যে, ক্লাস বা শ্রেণী-বৈষম্য ও তার ভিতর উচ্চনীচের ভেদ প্রভৃতি ভ্রষ্টাচার ও অত্যাচার হচ্ছে বলেই বর্ণভেদ প্রথা এতো কুৎসিত হয়েছে। বর্ণপ্রথাহীন সমাজব্যবস্থায় জাতের পার্থক্য কেবলমাত্র গুণগত, কর্মগত বিভাগ মাত্র, প্রত্যেক গুণ ও কর্মেরই যদি সমান প্রয়োজন আছে বলে ধরা হয়, তবে তাদের সম্মানও সমান, এই জাতীয় ধারণা গান্ধীজীর ছিল। আমরা পূর্বে বলেছি, গান্ধীজীর পুরোনো শব্দ ও পুরোনো নামের উপর একটা শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল, কিন্তু প্রয়োজন মতো একটা নতুন অর্থ ও নতুন সংজ্ঞা তিনি দিয়ে দিতেন। অর্থাৎ পুরোনো বোতলেই যদি নতুন ঔষধ দেওয়া যায়, তবে তিনি বোতলটা ফেলতে রাজি হতেন না। বর্ণাশ্রমধর্মের তিনি এমন এক ব্যাখ্যা করতে চাইলেন যাতে ব্যবহারিক জগতে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তা নয়, এটা তার আদর্শগত বা আদর্শ রূপান্তর। পুরোনো ও নবীনের মধ্যে তিনি এমনি করে একটা যোগসূত্র বজায় রাখতে চাইতেন। রাজনৈতিক জগতেও তাঁর এমনি ধরণের চিন্তা দেখতে পাই। তিনি রামরাজত্বের মধ্যেই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সারবস্তু আছে বলে মনে করতেন এবং রামরাজত্ব সম্বন্ধে, অতীতে রামচন্দ্রের রাজ্যে কি ছিল তা তলিয়ে দেখেন নি বা ইতিহাস ঘাঁটতে যান নি। কেননা তাঁর রামও যে বাল্মীকির রাম বা রামায়ণের নায়ক নয়, তাঁর রাম কোন ব্যক্তি নয়, তাঁর রাম হলো ভগবান, যিনি আল্লাহ ও গডও বটেন। আবার নির্গুণ ব্রহ্মও বটেন। তার অর্থ, তিনি রাম কথাটির একটা আধুনিক অর্থ করে নিলেন। তিনি এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভক্ত ছিলেন, তিনি মনে করতেন এই সাম্রাজ্যভুক্ত নানা জাতি তাদের মুক্তি ও মঙ্গল সাম্রাজ্যের মধ্যেই কায়েম করতে পারবে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে বা কন্সটিটিউশনে সে সম্ভাবনা আছে। তখন যে তিনি শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনকে মানতেন তা নয়, তিনি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটা আদর্শ ব্যবহারিক প্রয়োগ বা আইডিয়েল এপ্লিকেশন হতে পারে, এমন বিশ্বাস রাখতেন এবং সেই আদর্শের সাহায্যে সাম্রাজ্যভুক্ত সকল জাতিরই সমান উন্নতি ঘটতে পারে, এমন বিশ্বাস করতেন। এবং নিজেকে ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের অধিবাসী মনে করে গর্ব অনুভব করতেন। অর্থাৎ এখানে পুরোনো কথার মধ্যেই

তিনি নতুন অর্থ ও সম্ভাবনা খুঁজতেন। এই ভুল তাঁর ধীরে ধীরে ভেঙে যায় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন অর্থ ও সম্ভাবনা সম্ভব নয় দেখে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী হন। শিক্ষার্থী অবস্থায় ইংলণ্ডে থাকার দরুণই হয়তো তাঁর এই ইংরেজদের মতো দৃষ্টিভঙ্গী হয়। কারণ ইংরেজরাও পুরোনো বোতলেই নতুন মদ ভরে নিতে ওস্তাদ। তাদের দেশের রাজতন্ত্র বজায় রেখেও ভিতরকার সমাজব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন তারা করে নিয়েছে। পুরোনো নাম, পুরোনো পোষাক, পুরোনো পার্লামেণ্টের বাড়ী, আরও পুরোনো রাজতন্ত্র-সামন্ততান্ত্রিক বহিরাবণের অন্তরালে সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্য ও নতুন অর্থ তারা সৃষ্টি করে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে। এটা হলো ইংলিশ ট্র্যাডিশন। এই ইংলিশ ঐতিহ্যের প্রভাব গান্ধীজীর উপর বেশ পড়েছিল বলে মানতে হবে। গান্ধীজী প্রথমে জাতপাত প্রথার বিরোধিতা করেন নি, এই প্রথার এক নতুন অর্থ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বর্ণপ্রথার নতুন অর্থ কার্যকরী হবে না বলে তাঁর প্রতীতি ধীরে ধীরে জন্মাতে থাকে এবং শেষ জীবনে তিনি বর্ণপ্রথা বা জাতপাত প্রথা মানতেন না। তাঁর নিজের ছেলে দেবদাসকেই ব্রাহ্মণ রাজাগোপালাচারীর কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহপ্রথাও সমর্থন করেছিলেন: প্যারেলালজী লিখছেন, "Gandhiji's reply showed how far he had travelled from his earlier position on the question. Although he had not always held that view, he replied, he had long come to conclusion that an inter-religious marraige was an welcome event wherever it took place. Marraige in his estimation was a sacred institution. Hence there must be mutual friendship, either party having equal respect for the religion of the other. There was no room in it for conversion. Hence the marriage ceremony could be performed by the priests belonging to either faith. But this can come about only when the communities have shed mutual enmity and cultivated equal regard for all religions of the world.– Prayer speech, feb. 21, 1947. (Mahatma : Last Phase. Vol. I, page 558) তারপর জওহরলালজী তো জাতপাত প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং কংগ্রেসও সংগঠন হিসেবে এই প্রথাকে বর্জন করবার জন্য সকলকে বলে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, হরিজন আন্দোলন থেকেই এইসব সাম্যের দাবি হিন্দুসমাজকে চারদিক থেকেই আঘাত শুরু করে দেয়। তবে গান্ধীজীর পুরোনো মত যা ছিল তা এই কথা কয়টি থেকে পরিষ্কার হয়ঃ "Untouchability is the product, therefore, not of the Caste-system, but of the distinction of high and low that has crept into Hinduism and is corroding it. The attack on untouchability is thus an attack upon 'high and low'ness. The moment untouchability goes, the caste system itself will be purified, that is to say, according to my

dream, it will resolve itself into the true Varnadharma, the four divisions of the society each complementary of the other and none superior or inferior to the other, each as necessary for the whole body of Hinduism as any other (India of my dreams. page 68)

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কথা এসে পড়লো। কেননা যদি হরিজনদের বর্তমান দুর্দশা ও অপমান এই বর্ণপ্রথা থেকে না এসে থাকে, যদি তা উচ্চ ও নীচের, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের, অথবা শোষক ও শোষিতের প্রভেদ থেকে এসে থাকে, তাহলে সেটা শ্রেণীসংগ্রামের অন্তর্গত সমস্যা, বর্ণভেদ বা জাতপাত প্রথার নয়। অতএব হরিজন সমস্যাটা তাহলে প্রধানতঃ শ্রেণী-সংগ্রামেরই সমস্যা। এ হিসেবে হরিজন আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামেরই একটা অংশ। শ্রেণীহীন সমাজের পথেই তার সম্পূর্ণ মুক্তি। তাই বলে শ্রেণীহীন সমাজের জন্য সংগ্রামটা কেবলই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামেই আবদ্ধ নয়। তার একটা সামাজিক অধিকার নিয়ে সংগ্রামের দিকও আছে। মন্দিরে প্রবেশ তার একটা দিক মাত্র। গান্ধীজী কেবলমাত্র মন্দিরে ঢোকবার আন্দোলনই করেন নি। হরিজনদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অধিকার কায়েম করবার অঙ্গ হিসেবেই তা দেখতেন। বস্তুত হরিজন কারা? হরিজনরা হচ্ছে আমাদের দেশে সবচেয়ে শোষিত ও অত্যাচারিত ও নিপীড়িত শ্রেণী। হরিজনদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক আছে, শহরের মজুর আছে, আর আছে সকল প্রকার খেটে খাওয়া লোকের দল। যদিও হরিজন আন্দোলনটাকে আধুনিক ভাষায় প্রোলেটেরিয়ান আন্দোলন বলা যায় না, কিন্তু প্রোলেটারিয়ান আন্দোলনের অনেক সমস্যাই তাতে জড়িয়ে আছে। মনে রাখতে হবে আমাদের জনবহুল দেশে কারখানার শ্রমিক সংখ্যা হিসেবে, জনসাধারণের তুলনায় অতি নগণ্য, কিন্তু নিপীড়িত সম্পত্তিহীন জনমজুর, ক্ষেতমজুর, মুচি, মেথর, প্রভৃতি হরিজনশ্রেণীর লোক অনেক অনেক বেশী। ভারতের বিপ্লবের নেতা যেই হোক, সেই বিপ্লবের বৃহত্তম শক্তি এই নিপীড়িত হরিজন, চাষী, ক্ষেতমজুরদের মধ্যেই বর্তমান। অতএব ভারতের বিশেষ অবস্থায় এই নন-প্রোলেটেরিয়ান মাসেস্-এর একটা বিশেষ ভূমিকা ও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। যথার্থ শ্রমিকশ্রেণী বলতে যাদের বোঝায়, ভারতে একমাত্র তাদেরই মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আবদ্ধ থাকতে পারে না। লেনিন এক-স্থানে বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণী বলতে কেবলমাত্র শ্রমিকদের কথাই বোঝায় না। তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলির আশা, আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে জড়িত আছে এবং অনেকক্ষেত্রে সমগ্র দেশের দায়িত্বজাত দায়ও আছে। লেনিন বলেছেন, "Only the "economists" of sad memory believed that "worker's party slogan" are advanced *only* for the workers. These slogans are advanced for the whole working population, for the whole people. (A cericature of Marxism, page 251, Lenin Vol. XIX)

ভারতেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে, প্রোলেটেরিয়ান শ্লোগানগুলির এই প্রকার কার্যক্ষম জনতা, এমন কি সকল লোককেই বোঝায়। হরিজন বলতে যাদের বোঝায়,

তারা এই ওয়ার্কিং পপ্যুলেশনের অন্তর্গত নিশ্চয়ই। কাজেই তাদের দাবিদাওয়া নিশ্চয়ই শ্রমিকদলের দাবিদাওয়ার অন্তর্গত। অতএব কমিউনিস্টদের হরিজন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ বর্তমান। অথচ তাঁরা তা নেননি। তাঁরা মনে করতেন, একমাত্র শ্রমিক আন্দোলনই যথেষ্ট। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন দেশ জোড়া শ্রমজীবীদের আন্দোলনে সামগ্রিকতা অর্জন করতে না পারলে তার রাজনৈতিক রূপটাই প্রকাশ করতে পারে না, এবং আজও পারে নি। ভারতীয় শ্রমিকদের তাই কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে দেখা যায় না। গান্ধীজী বরং সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণকে অনেকটা স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনে টানতে পেরেছেন। তা positively না হোক্, negatively তো বটেই। কেননা যদি হরিজনেরা তপশিলী ক্লাস বা শ্রেণীর ফেডারেশন, মুসলীম লীগ ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে জাতীয় সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যেতো, অথবা প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের মতো বাধা দিতো, তবে দেশের পক্ষে বড় শোচনীয় ঘটনা হতো; এবং মার্কস্‌বাদীদেরও খুব ভালো হতো না, যেমন ভালো হয় নি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে।

যখন শ্রেণীসংগ্রামের কথা এসে গেলো, তখন গান্ধীজীর শ্রেণীটাও নির্ণয় করা যাক্। অর্থাৎ গান্ধীজী কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন? এতকাল কমিউনিস্টরা এবং আরও অনেকে গান্ধীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধি বলে এসেছেন। কেউ কেউ তাঁকে সাম্রাজ্যবাদের স্টুজও (stooge) বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন তিনি ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতা। এই জাতীয় লোকেদের বিচারের বিচার করতে যাওয়াও লজ্জার বিষয়। আসলে এই জাতীয় বিচারকেরা গান্ধীজীকে কখনও বুঝতেই চেষ্টা করেন নি। আমরা এ পর্যন্ত যা লিখেছি এবং আরোও যা লিখবো, তাতেই প্রমাণিত হবে যে গান্ধীজী কখনও ধনিকশ্রেণীর বা কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধি ছিলেন না। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাও বিড়ম্বনা এবং তাঁরা নিজেরাও হয়তো আজকাল তাঁদের কথার জন্য লজ্জিত এবং আরও লজ্জিত হতে বাধ্য হবেন। যাঁরা গান্ধীজীকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও দেশীয় পুঁজিপতিদের ও কায়েমীস্বার্থের রক্ষাকর্তা বলেন, তাঁরাও সম্পূর্ণ অন্ধ ও নির্বোধ। তাঁরা ভারতের বর্তমান ইতিহাস কখনও মনোযোগ দিয়ে পড়েন নি। তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যও এই বই লেখার একটা প্রধান উদ্দেশ্য।

যাই হোক, যাঁরা বিচক্ষণতা সহকারে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতামত নিয়েই আলোচনা করা যাক। কেউ বলেছেন, ভারতে সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন গান্ধী। কেউ বলেছেন, তিনি চাষীদের প্রতিনিধি ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে অবাস্তব সমাজতন্ত্রীদের (ইউটোপিয়ান সোশিয়েলিস্টদের) দলে ফেলেছেন। সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি করেছিলেন, একথা সত্যি, কিন্তু কোন্ বিশেষ শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধি ছিলেন? আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের নেতা কখনও দেশীয় কায়েমী স্বার্থের মধ্য থেকে আসতে পারেন না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব জনগণের নেতা থেকেই আসতে পারে। তাছাড়া

লেনিন ও ষ্ট্যালিন অনেকবার বলেছেন যে, **National question is essentially a peasant question** । সে হিসেবে ভারতের মত বিরাট দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে চাষীদের স্থান বিরাট। সে হিসেবে গান্ধীজীকে অনেকেই, বিশেষকরে চাষীদের প্রতিনিধি বলেছেন। তাছাড়া তাঁর গ্রামের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা যেমন প্রবল ছিল এবং কুটিরশিল্পের উপর তাঁর যেমন ঝোঁক ছিল, তাতে তাঁকে কৃষক হিসেবে ধরে নেওয়াটা স্বাভাবিকই মনে হয়। পণ্ডিত নেহরু তো তাঁকে 'গ্রেট পেজেণ্ট' বা ''মহান কৃষক' হিসেবেই নামকরণ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন, **"Whether Gandhiji is a democrat or not, he does represent the peasant masses of India, he is the quintessence of the conscious and subconscious will of those millions. It is perhaps more than representation ; for he is the idealised personification of those vast millions. Of course, he is not the average peasant. A man of the keenest intellect, of fine feeling and good taste, wide vision very human, and yet essentially the ascetic who has supressed his passions and emotions, sublimated them and directed them in spiritual channels, a tremendous personality, drawing people to himself like a magnet, and calling out fierce loyalties and attachments—all this so utterly unlike and beyond a peasant. And yet with that he is the great peasant, with a peasant's outlook on affairs, and with a peasant's blindess to some aspects of life. But India is peasant India, and so he knows his India well and reacts to her lightest tremors, and gauges a situation accurately and almost instinctively, and has a knack of acting at the psychological moment. (Autobiography, page-253)**

"গান্ধীজী গণতন্ত্রী হোন আর নাই হোন, ভারতের বিশাল কৃষক সমাজের তিনিই প্রতিনিধি। কোটি কোটি নরনারীর চেতন ও অচেতন আশা আকাঙ্ক্ষার তিনিই ঘনীভূত মূর্তি। তাঁকে শুধু প্রতিনিধি বললেই ঠিক বলা হয় না, বিশাল জনতার দৃষ্টিতে তিনি মূর্ত আদর্শ। অবশ্য তিনি একজন তথাকথিত সাধারণ বা এভারেজ কৃষক নন। তিনি তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ, সুরুচিসম্পন্ন ও দূরদর্শী। একদিকে মানবতাসুলভ সহৃদয়তাপূর্ণ, অপরদিকে তিনি কঠোর তপস্বী। ইন্দ্রিয়পরতা ও ভাবাবেগগুলিকে তিনি সংযত করে উন্নততর অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত করেছেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত লোককে আকর্ষণ করে ও তাঁর প্রতি গভীর আনুগত্য ও অনুরক্তি সৃষ্টি করে। এই সব গুণ ও শক্তি অবশ্যই কৃষকের মতো নয়, বরং সম্পূর্ণ উল্টো। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি একজন মহান কৃষক, ঘটনা প্রবাহের উপর যাঁর বিচারভঙ্গী কৃষকের মতো এবং জীবনের কোন কোন বিষয়ে কৃষকেরই মতো অন্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষক প্রধান দেশ, কাজেই তিনি তাঁর ভারতকে খুব ভালো করেই চেনেন, তাদের সূক্ষ্মতম কম্পনটিও তিনি ধরতে পারেন। অবস্থাকে তিনি নির্ভুল বিচার করতে পারেন

এবং এটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শক্তি। তাছাড়া জনমানসে অনুকূল ও উপযুক্ত পরিস্থিতি ঘটামাত্র আঘাত হানবার দক্ষতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ।"

পণ্ডিত জওহরলালের গান্ধী সম্বন্ধে শ্রেণীবিচার প্রামাণ্য বা শেষ কথা বলে ধরে নেবার কোন কারণ নেই। কেন না পণ্ডিতজী নিজেই বলেছেন গান্ধীজীকে আদর্শচাষী বা চাষীর আদর্শ বলে ধরে নিলেও তাঁকে চাষীধর্মে ফেলা যায় না। অনেকে তাঁকে এই বলে বুর্জোয়া প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে তাঁর জন্ম বণিক সম্প্রদায়ে, অথচ আমরা জানি যে গান্ধীজীর তিন পুরুষেও কেউ ব্যবসাবাণিজ্য করতেন না, চাকুরী করতেন। পেশা দিয়ে যদি দেখি তবে তাঁকে বলা যায় বিলেত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। সেই পেশাও তিনি কিছুদিন পরে ছেড়ে দেন। তারপর তাঁর দীর্ঘ একটানা রাজনৈতিক জীবন। তাঁকে চাষী বলে ভ্রম হয় এইজন্য যে তিনি গ্রামসভ্যতার কথা, কুটিরশিল্পের কথা বরাবর বলে এসেছেন। অথচ তিনি গীতার আদর্শ অনুযায়ী অপরিগ্রহনীতি গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের রাখেন নি। তিনি নিজে সাধক মানুষ, জনসেবা লোকরাজনীতি মারফৎ দরিদ্র নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পেতে চেয়েছেন। চাষীর মতো জমির ক্ষুধা তাঁর ছিল না। তিনি সমস্ত জমিকে গোপালের সম্পত্তি মনে করতে শিখিয়েছিলেন। যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে তাদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা বস্তুতঃ সম্পত্তির মালিক নন, ট্রাষ্টি বা অছিমাত্র। সর্বোপরি তিনি নিজেকে নিঃশেষে শূন্য করে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, ব্রহ্মবাদের দার্শনিক তত্ত্ব অনুযায়ী নিজেকে শূন্য করতে না পারলে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না, এই ছিল তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস। তদুপরি আমরা পরে দেখাবো কেমন করে তিনি বাস্তবক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট ও সোশিয়েলিদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজের জীবনেই কমিউনিজম্ ও সোশিয়েলি-জমের বাস্তব আদর্শ কায়েম করেছিলেন। অর্থাৎ কমিউনিজম্ না এলে কমিউনিষ্টরা কমিউনিষ্ট-জীবনযাপন করতে অগ্রসর হয় না, কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা ছিল যে, সেই ভবিষ্যৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও নিজের জীবনে তার অনেক কিছু কার্যে প্রয়োগ করা যায়। সে হিসেবে তিনি বলতেন যে, তিনি কমিউনিষ্টদের চেয়ে ঢের বেশী কমিউনিষ্ট। এতসব ব্যাপারের পরেও গান্ধীজী কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন, এই বিচার করতে এতো কষ্ট হয় কেন! তার কারণ বোধহয় মার্কসের মতবাদ অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন শ্রেণীর লোক বলে লেখাতেই হবে। শ্রেণী হিসেবে লোক কোন না কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত নিশ্চয়ই, তা নির্ণয় হবে তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, চিন্তাধারা ও কর্মাবলী দিয়ে। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে কোনো ব্যক্তি কি তার আপন শ্রেণীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে যেতে পারে না? যদি না পারে তবে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে কমিউনিষ্ট হয়ে প্রোলেটারিয়েট-ধর্ম নেয় কেমন করে? সে-হিসেবে কি বলা যায় না যে আজও কেউ কেউ নিজের কর্ম ও চিন্তার শক্তিতে এবং ত্যাগ ও সংগ্রামের বলে শ্রেণীহীন জাতের লোকে পরিণত হতে পারে না? আমার মতে গান্ধীজী শুধুমাত্র শোষিত শ্রেণীগুলির, মজুর, চাষী, হরিজন ইত্যাদির জাতই গ্রহণ করেন নি, তিনি তাদের পেরিয়ে একেবারে শ্রেণীহীন মানুষের

দলে চলে গিয়েছিলেন। কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোক তিনি নন, মধ্যস্থ মাত্র, এমন ধরণের সুবিধাবাদী শ্রেণীহীনতা নয়, সত্যি সত্যি শ্রেণীহীন মানুষের যে চেহারা ও স্বভাব হওয়া উচিত, গান্ধীজী মতবাদ এবং বাস্তব জীবন, উভয় দিক থেকেই সে-জাতীয় লোক হতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেকে প্রথম জীবনে চাষী বলেছেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বলেছেন, "ম্যায় ভাঙ্গী হুঁ"—"আমি একজন ভাঙ্গী বা মেথর"।

আমরা জানি এ ধরণের শ্রেণী বিচার শুনে অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী ঠাট্টা তামাসা করবেন। কিন্তু এটা তাঁদের চিন্তার জড়তা মাত্র। শ্রেণীহীন মানুষ, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে দেখা দিতে পারে না—এমনি ধরণের সুবিধাবাদী যুক্তি তাঁরা দেবেন। তবে তো বলা যায় কমিউনিষ্ট সমাজ তৈরী না হলে কেউ কমিউনিষ্ট বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারবে না। তাঁদের যুক্তি প্রথম ধাক্কায়ই পণ্ড হয়ে যায়। তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি হতে পারে এই, শ্রেণীহীন সমাজের মানুষের চেহারা গান্ধীজীর মতো নয়, কারণ গান্ধীজী মার্কসবাদ মানেন না, গান্ধীজী চরকা কাটেন, গান্ধীজী বল-ড্যান্স পছন্দ করেন না, গান্ধীজী মদ পছন্দ করেন না, গান্ধীজী রাম নাম জপ করেন ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মার্কসবাদ, লেনিনবাদের দাবিও এই নয় যে শ্রেণীহীন সমাজে সবাইকে মার্কসবাদী হতেই হবে, সবাইকে নিরীশ্বরবাদী হতেই হবে, সবাইকে বলড্যান্সে যেতে হবে বা মদ খেতে হবে। এই রকম নির্বোধ দাবি তাঁরা করে যাননি। কমিউনিষ্ট ভায়ারা যেন ভেবে দেখেন, এই সামান্য কথাটা যে বর্তমান রাশিয়ায়, যেখানে কুড়ি কোটি লোকের বাস, সেখানে মাত্র বিশ লক্ষ লোক হলো নাম-লেখা কমিউনিষ্ট। অর্থাৎ মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সবটা মেনে চলার লোক তাঁরা। তাই বলে বাকি সবাই কি সেখানে সোশিয়ালিষ্ট সমাজের লোক নন, বা তাঁরা সোশিয়েলিজম্ গ্রহণ করেন নি? অতএব গান্ধীজী কমিউনিষ্ট না হতে পারেন, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের যোগ্য বাসিন্দা হতে নিশ্চয়ই পারেন। অন্ততঃ কোনো কমিউনিষ্টই হয়তো বলবেন না যে শ্রেণীহীন সমাজে গান্ধীজীকে জেলে আটকে রাখতে হতো! তাছাড়া সোশিয়েলিজম্ ও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি, সেকথাও আমরা যখন তাঁর ব্যক্তি জীবন নিয়ে আলোচনা করবো, তখন বিশদভাবে বিচার করবো। সর্বোদয়ী শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য তিনিই বলেছেন। তিনি নিজেকে একজন প্রথম শ্রেণীর সোশিয়েলিষ্ট কমিউনিষ্ট বলে দাবি করেছেন। যদিও তার ভিন্ন অর্থ আছে। অর্থাৎ তাঁর সোশিয়েলিজম্ সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা ছিল। সেকথাও তখন হবে, এখন তা থাক্।

রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক সমালোচক অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে পারেন যে গান্ধীজী অনেক সময় মালিক শ্রেণীর, দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থও রক্ষা করার কথা বলেছেন এবং মালিক ও মজুরের সম্পর্কে আপোষহীন সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন, অর্থাৎ যাকে বলে শ্রেণী-সহযোগিতা বা class collaboration তাই করেছেন। একথা সত্যি। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে গান্ধীজীর উপরে কখন এবং কোন্ রাজনৈতিক সংগ্রামের দায়িত্ব পড়েছিল। তা হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ভারতের দিক থেকে যে বা যত শ্রেণীকে তিনি নিযুক্ত করতে পারেন, তত তিনি শক্তিমান হবেন। তাছাড়া যারা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে না, অন্ততঃ যদি তারা নিরপেক্ষও থাকেন, সেটা লক্ষ্য করাও তাঁর কাজ হবে। অর্থাৎ যতদূরে সম্ভব একটা বিরাট সম্মিলিত ফ্রন্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতেই হবে। সংগ্রামের এই স্তরে দেশীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সাময়িক সাহায্য তাঁর পাওয়া উচিত এবং সেটাকে অবহেলা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তা যদি না হয়, তবে মাও-সে-তুঙের নয়াগণতন্ত্রকেও স্বীকার করা সম্ভব নয়। চীনদেশে সংগ্রামের পরে আজ আর এ বিতর্ক ওঠাও উচিত নয়। কেননা সেখানে দেশভক্ত বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সহযোগিতাও মাও-সে-তুঙ অকাতরে ও বিনাদ্বিধায় কামনা করেছিলেন। ধনতন্ত্রী শ্রেণীকেও চাই বললেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না; কেন চাই, কিসের জন্য চাই, কোন অবস্থায় চাই, কার নেতৃত্বে চাই, সম্মিলিত ফ্রন্ট ও ক্যাপিটালিষ্টদের জোর বেশী না জনতার জোর বেশী, ইত্যাদি অনেক সমস্যার বিচার করে তবে কোন বিশেষ রাজনৈতিক নীতির ভালো-মন্দ বিচার করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা নানা ছুৎমার্গে ভুগছি এবং রাজনৈতিক জীবনেও তাই সহসা এই স্পর্শকাতরতা ত্যাগ করতে সমর্থ না হয়ে আমরা অনেক ভুগেছি। মাও-সে-তুঙের আবির্ভাব ও শিক্ষাদীক্ষার আগে আমাদের মার্কস্‌বাদী ধারণা খুবই একপেশে ও গোঁড়ামীপূর্ণ ছিল এবং একমাত্র রাশিয়ার বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকেই সর্বকালের, সর্বদেশের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেওয়া হতো। অনেক ক্ষতির পর আজ চোখ খুলতে শুরু করেছে।

আর একটা দিক থেকেও আক্রমণ হতে পারে। তা হলো এই যে গান্ধীজী হরিজন আন্দোলন, চাষী আন্দোলন ইত্যাদি যত আন্দোলন করেছেন, শ্রমিক নিয়ে তত আন্দোলন করেন নি। কেন তা করেন নি? এই নালিশ চলতে পারে। কিন্তু একেবারেই করেন নি, একথা বলা যায় না। আমেদাবাদে তিনি নিজে ধর্মঘট চালান এবং সেটাই তাঁর ভারতে পদার্পণের পর প্রথম আন্দোলন। সে সংগ্রামে তিনি জয়ী হন এবং যে ইউনিয়ন তিনি স্থাপন করে গেছেন তা আজও তেমনি শক্তিশালী ও কর্মক্ষম। তাছাড়া তাঁর সেই শ্রমিক ইউনিয়নকে আদর্শ করেই ভারতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস চলছে বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আই-এন-টি-ইউ-সি-ওয়ালারাও সত্যি সত্যি সেই ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শ নিয়ে কতটা চলেন এবং কতটা সত্যিই বড়াই করেন, সে বিষয়ে বিচারের ও সমালোচনার অবকাশ আছে। এই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নে কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবশ্যি অনেক দুর্নাম আছে। কিন্তু যতটা দুর্নাম নেহাৎ দলাদলি থেকেই উৎপন্ন হয়, ততটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্যি না-ও হতে পারে এবং নয় বলেই আজ ভারতীয় ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাথে মিলিতভাবে কাজ করতে বার বার আহ্বান জানায়। যাই হোক এটি একটি জটিল প্রশ্ন এবং অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই প্রশ্ন নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। আই-এন্-টি-ইউ-সির সমস্ত কার্যকলাপের জন্য গান্ধীজীকে অবশ্যই দায়ী করা যায় না। এবং গান্ধীজী শেষের দিকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না।

কিন্তু ভারতে শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষভাবে যে দল সবার অগ্রণী, তা হলো কমিউনিষ্ট দল ও সেই জাতীয় বামপন্থীদলগুলি। গান্ধীজী তাঁদের শ্রমিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে খুশী বা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা যেভাবে শ্রমিকদের চালাতেন, সেটা তিনি ভালো মনে করেন নি। তিনি দেখেছেন, কমিউনিষ্টরা শ্রমিকদের একান্তভাবে শ্রমিক স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট। তাঁরা জাতীয় দায়িত্ব পালনে, শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে উৎসাহী করে তোলেন না। শ্রেণী-সংগ্রাম অর্থাৎ তাদের মালিকশ্রেণীর সাথে সংগ্রাম করা ছাড়া অন্য কোন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করা, বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়াকে বুর্জোয়া স্বার্থসিদ্ধি বলে প্রচার করে থাকেন। তাঁরা সোশিয়েলিজম ও কমিউনিজমের নামে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে বোধ করেন নি। মোট কথা, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক ইতিহাসটা বিচার করলেই তাঁদের পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের রীতিনীতি বোঝা যায়। এবং আজ একথা সর্ববাদীসম্মত, এমন কি দায়িত্বশীল কমিউনিষ্টদেরও বুঝতে বাকি নেই যে কমিউনিষ্ট পার্টি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের রাজনীতিতে অনেক ভুল করে এসেছে। তার ফল স্বরূপ ভারতের মজুরশ্রেণী তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়েছে এবং আজও ভারতের মজুরেরা রাজনৈতিক দিক থেকে প্রায় অচেতন ও অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া, এমন কি অরাজনৈতিক বা নন-পলিটিক্যালও বলা যায়। আপোষহীন শ্রেণী সংগ্রামের যদি এই পরিণাম ও দান হয়ে থাকে, তবে আপোষকামী গান্ধীর অপরাধ তার তুলনায় কতটুকু? বরং তাঁরই আন্দোলন ভারতের জনতার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আনয়নে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে।

গান্ধীজী শ্রমিকদের তাচ্ছিল্য করতেন, একথা একেবারেই সত্যি নয়। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে এক জনসভায় শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে জবাব দেন, প্যারেলালজী তা নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন: "Gandhiji's reply was that class struggle there had been always. It could be ended if the capitalists voluntarily renounce their rule and become labours. The other was to realise that labour was real capital, in fact, the maker of capital. What the two hands of the labourer could achieve, the capitalists would never get with all his gold and silver ! Could any one live on gold ! But labour had to be made conscious of its strength. It had to have in one hand truth and in the other non-violence, and it would be invincible"

ভারতের শ্রমিকেরা গান্ধীজীকে কম শ্রদ্ধা করতেন না, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের ডাকে তাঁরা হরতাল ও দীর্ঘ ধর্মঘট করেছেন, গান্ধীজীরই আহ্বানে। গান্ধীজী এ-ও মনে করতেন যে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠনের গুণে ও নিজশক্তি বলেই ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কমিউনিষ্ট সভ্য শাপুরজী শকলতওয়ালার নিকট গান্ধীজী লিখেছিলেন: "It is

a most dangerous thing to make political use of labour until labourers understand the political condition of the country and are prepared for the common good. Labour, in my opinion, must not become a pawn in the hands of the politicians on the political chess-board. It must by its sheer strength, dominate the chess-board." (N. K. Bose, page—177)

এই উক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান কথা আছে ঃ এক, মজুরশ্রেণীকে রাজনীতি বুঝতে হবে, এবং তা না বোঝা পর্যন্ত তাকে অন্যশ্রেণীর লোকেরা যেন নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার না করে নেয় এবং তারা সজ্ঞানে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রামে না টেনে নিতে যায়। দুই, মজুরশ্রেণীকে জাতীয় দায়িত্ব ও সাধারণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য কি এবং অন্যান্য সহযাত্রী শ্রেণীদের প্রতি তার কর্তব্য কোথায় বুঝতে হবে, অথচ ভারতীয় কমিউনিস্টরা তা করতে দেন নি এই অজুহাতে যে তাহলে মজুরেরা জাতীয়তাবাদের মোহে পড়ে বুর্জোয়াদের জালে আটকে পড়বে। তারা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব নেবে, নিজেদের দায়িত্ব নেবে, কিন্তু দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না; এমন ধরণের অদ্ভুত শিক্ষায় তাদের মানুষ করবার চেষ্টা হয়েছিল। তিন, মজুরেরা নিজের শক্তির বলেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রধান অংশ নিতে পারবে, যদি তারা উপরোক্ত দুটি কাজ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়।

তারা তৈরী না হতে, তাদের ব্যবহার করতে চেষ্টা করো না, গান্ধীজীর এই যে আদেশ,—তার মানে কি? যেন অন্য কেউ তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে না খায়, এই হলো তার অর্থ। তাদের তবে তৈরী করার উপায় কি? কোন্ অবস্থায় শ্রমিকেরা ও সাধারণ জনতা সংগ্রামে প্রস্তুত হতে পারে? এখানে কর্মীদের কর্তব্য কি? তারা কিভাবে কাজ করবে, ইত্যাদি বলতে গিয়ে ১৯২৪ সালে গান্ধীজী বলেছেন, এটি অবশ্য তিনি বলেছিলেন কংগ্রেসকর্মীদের উপলক্ষ্য করেঃ "The Congress must progressively represent the masses. They are yet untouched by politics. They have no political consciousness of the type our politicians desire. Their politics are confined to bread and salt, I dare not say butter, for millions do not know the taste of ghee or even oil. Their politics are confined to communal adjustment. It is right however to say that we politicians do represent the masses in opposition to the Government. But if we begin to use them before they are ready, we shall cease to represent them. We must first come in living touch with them by working for them and in their midst, we must share their sorrows, understand their difficulties and anticipate their wants. With the pariahs we must be pariahs and see how we feel to clean the closets of the upper classes and have the remains of their table thrown to us. We must

see how we like being in the boxes, miscalled houses, of the labourers of Bombay. We must identify ourselves with the villagers, who toil under the hot sun beating on their bent backs and see how we would like to drink water from the pool in which the villagers bathe, wash their clothes and pots and in which cattle drink and roll. Then and not till then shall we truly represent the masses and they will, as surely as I am writing this, respond to every call.

We can not do all this, and if we are to do this, Good bye to Swaraj for thousand years and more, some will say, I shall sympathise with the objection. But I do this claim that some of us atleast will have to go through the agony and out of it only will a nation fully vigorous and free, be born. (Young India—11.9.24—N. K. B , page—243-44) এই রকম কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে গণসংগঠন করার কথা গান্ধীজী দাবি করেছেন আমাদের কাছ থেকে। এবং এই জাতীয় কর্মই মজুরশ্রেণী, চাষী ও অন্যান্য জনতাকে সংঘবদ্ধ ও রাজনৈতিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করতে পারে। নাহলে কারণে অকারণে তাদের ব্যবহার করে নেবার চেষ্টা সাধুও নয়, শেষপর্যন্ত সার্থকও হয় না। এখানে কেবল আন্তরিকতার উপরই জোর দেওয়া হয় নি। যে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা শ্রমিকদের দরকার, তা দিতে হলে এতটা ধৈর্য ও মেহনত স্বীকারের ও আন্তরিকতার আবশ্যকতা আছে। নাহলে উপর-চালাকি আর লোক-খেপানো বক্তৃতায় যতটা হয়েছে তার বেশী কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এবং যা হয়েছে, যতটুকু রাজনৈতিক চেতনা শ্রমিকদের হয়েছে, তা অত্যন্ত শোচনীয়।

ট্রাষ্টিশিপ বা অছিপ্রথা

ট্রাষ্টিপ্রথা বা অছিপ্রথার কথা গান্ধীজী বলেছেন। এই অছিবাদ কথাটি নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছিল এক কালে, আজ আর ঝাঁজ তার বড় একটা কিছু নেই। অর্থাৎ অছিবাদে বড় একটা কেউ আস্থা রাখেন না। ধনপতিরা বা জমিদারেরা তাদের সম্পত্তি রাখতে পারেন, কিন্তু তা তাদের নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে নয়, দেশের বা শ্রমজীবী জনতার ট্রাষ্টি হিসেবে, কেবল রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করার মেহনত স্বরূপ যতটুকু দরকার তার বেশী তাঁরা সেই সম্পত্তি থেকে নেবেন না। এই ছিল গান্ধীজীর গোড়াকার কথা বা অছিবাদ। গান্ধীজী নিজেও শেষপর্যন্ত এই অছিবাদের উপর তেমন ভরসা করতে পারেন নি এবং নানাভাবে তাকে বিশেষিত করতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন মতবাদের আক্রমণে তাঁকে অনেক কিছু বদলাতে হয়েছিল। পণ্ডিত নেহেরুও এই অছিবাদে বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। কমিউনিষ্ট-সোশিয়ালিষ্টরা তো এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে গান্ধীজী অছিবাদের মধ্য দিয়েই ধনতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান এবং জমিদারদেরও রাখতে চান। যাই হোক, অছিবাদ আজ আর দেশে কেউ বিশ্বাস করেন না। কংগ্রেসও প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় করণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। পণ্ডিত নেহেরুর সরকার অছিবাদ মানে না, বলা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধনপতিরা আছেন বটে, কিন্তু তা অছিবাদ স্বীকার করার ফলে নেই, আছেন অন্যান্য কারণে। তাদের অস্তিত্বের জন্য অনেক যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু তা অছিবাদের অন্তর্গত কোন যুক্তি নয়। অপর পক্ষে যাঁরা বিশিষ্ট গান্ধীবাদী তাঁরাও আর অছিবাদ নিয়ে পড়ে নেই। বিনোবা ভাবেতো সম্পূর্ণ রূপে সকল সমষ্টিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য ভূদান, গ্রামদান ইত্যাদি আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন। প্রজা-সোশিয়েলিষ্ট পার্টিতে যে সব গান্ধীবাদী আছেন, তাঁরাও অছিবাদ ত্যাগ করেছেন এবং ক্রমশঃ সোশিয়েলিজমুই গ্রহণ করেছেন বলা যায়।

প্রথম জীবনে গান্ধীজী অনেক পুরোনো প্রথা ও ধর্মের ঐতিহ্য থেকে নানা জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করতেন। পূর্বেই বলেছি, পুরোনো জিনিষের উপর তাঁর একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল, তা যখন বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, তখন তা ত্যাগ করতেন বটে, তবে সম্ভব হলে পুরোনো বোতলেই নতুন ঔষধ দেবার ঝোঁকটা তাঁর কমতো না। তাঁর কল্পিত রামরাজত্বে আদর্শ রাজারা যেমন ছিলেন বলে কথিত, তিনি সে রকম রাজা আজও দেখতে চাইতেন। ফলে রাজর্ষি জনকের মতো লোক কেন আজও হবে না তা তিনি বুঝতে রাজি হতেন না। মানুষের প্রতি অত্যন্ত গভীর বিশ্বাস থেকেই তাঁর ট্রাষ্টিশিপ আইডিয়াটা এসেছে। সকল মানুষই ভালো হতে পারে, যে যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা থেকেই সকল মানুষের জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমনি ধরণের একটা আবেগ তাঁকে মাঝে মাঝেই পেয়ে বসতো। ফলে অনেক

সময় সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন দরকার, এমন কথাটাও তাঁর ভুল হয়ে যেতো ; অর্থাৎ সমাজ যেমনই থাকুক, মানুষ যদি ভালো হয় তবে সব সমাজ দিয়েই চলতে পারে। মানুষ ভালো হলেই সমাজ ভালো হবে, এমনি ধরণের একপেশে চিন্তা তাঁর গোড়াকার জীবনে বিশেষভাবে ছিল। ফলে তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনেও ভারত থাকলে দোষ নেই বলে মনে করতেন এককালে। যদি ইংরেজরা ও ভারতীয়রা মানুষের মতো চলে ও ব্যবহার করে, এই তিনি মনে করতেন। এমনি ধরণের ব্যবসায়ী, জমিদার,—এরাও থাকলে দোষ নেই, যদি তারা নিজেদের জাতীয় সম্পত্তির ট্রাষ্টি বলে মনে করে। কিন্তু এই জাতীয় মোহ বাস্তব সংগ্রামের প্রচণ্ড চাপে গান্ধীজীর ভেঙ্গে যায়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে বাধ্য হন এবং আস্তে আস্তে সমাজতন্ত্রকেও গ্রহণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। না হলে পণ্ডিত নেহেরুকে একজন সমাজতান্ত্রিক জেনেও তাঁকে তাঁর আসন দিয়ে যান কি করে ?

এ আলোচনা এখানেই শেষ করলে চলে, কিন্তু অছিবাদের পরিপূর্ণ বিচার করা দরকার। কেন না তা হলে গান্ধী চরিত্র সম্বন্ধে একটা গোঁজামিল ও অস্পষ্ট ধারণা থেকে যাবে এবং হয়তো মনে হবে গান্ধীজী বুঝি বা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার অস্ত্র হিসেবেই অছিবাদ এনেছিলেন। কিন্তু ধনতন্ত্র বজায় রাখা বা ধনীদের শোষণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কোন দুর্বলতা পোষণ করতেন না। ধনিকস্বার্থ সম্বন্ধে তাঁর মত অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ১৯৩০ সালে ব্যক্ত করেছেন লবণ আইন সত্যাগ্রহ শুরু করার সময়—"The greatest obstacle in the path of the non-violence is the presence in our midst of the indegenious interests that have sprung up from British rule, the interests of the monied men, speculators, scrip-holders, land-holders, factory owners and the like. All these do not always realise that they are living on the blood of the masses, and when they do, they become as callous as the British principals whose tools and agents they are." (N. K. B. Young India, 6.2.30).

এখানে দেশীয় ধনিক কায়েমী স্বার্থের স্বরূপ বর্ণনায় তিনি কোনো বামপন্থীর চেয়ে কম গেলেন না। কিন্তু অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর টান এতো বেশী যে সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য ধরার কথা বললেন—"But non-violence has to be patient with these as with the British principal The aim of the non-violent worker must even be to convert." (Young India, 6.2.30).

অর্থাৎ ধনিকদের চিরকালই বজায় রাখতে হবে না। তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সেই পরিবর্তনের পথে তাদের ট্রাষ্টি বা অছি হবার জন্য সুযোগ দিতে হবে। শংকর রাও দেও তাঁকে সোজা প্রশ্ন করেছিলেন যে ধনীরা ধন সংগ্রহ করতেই থাকবে এবং তারপর ত্যাগী ও অছি হয়ে চলবে, এমন প্রথা রাখার দরকার কি ? তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছেন, "But I accept lhe proposition that

it is better not to derive wealth than to acquire it and become trustee. I gave up my wealth long ago, which should be proof enough of what I would like others to do. But what am I to advise those who are already wealthy or who would not shed the desire for wealth ? I can only say to them that they should use their wealth for service of others. Personally I do not believe in inherited riches. The well-to-do should educate and bring up their children so that they learn how to be independent. The tragedy is that they do not do so. Their children do get some education, they even recite verses in praise of poverty, but they have no compunction about helping themselves to parental wealth. They being so, I exercise my common sense and advise what is practicable." (Harijan, 1.3 32).

দেখা যাচ্ছে গান্ধীজীরও অছিবাদে আস্থা কমে আসছে, যারা ধনী আছে তাদের স্বভাব চরিত্র নিয়েই তিনি সংশয়ে পড়েছেন, অর্থাৎ তারা বদলাতে চাইছে না, তাঁর উপদেশ অনুযায়ী নিজেদের সময় থাকতেও শোধরাতে প্রস্তুত নয়। ধীরে ধীরে গান্ধীজীর ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ত'ার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তিনি দেশে কোন্ কোন্ ধনীকে ট্রাষ্টি বলতে পারেন, পার্শি টাটাদের, ওয়াড়িয়াদের, বিড়লাদের অথবা যমুনালাল বাজাজ, এদের দেখে কি ট্রাষ্টি বলা যায় ? না মহানুভব (benevolent philanthropist) দাতা বলে যাদের নাম হয়েছে তাদের ট্রাষ্টি বলা যায় ? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "If the trusteeship idea catches, philanthrophy, as we know it, will disappear. Of those you have named only Jamnalalji came near, but only near to it. A trustee has no heir but the nation. In a state built on the basis of non-violence, the commission of trustees will be regulated." (Harijan, 12.4.42, page 116).

ধীরে ধীরে ত'ার স্বর স্পষ্ট, আরও গম্ভীর হয়ে আসছে। তিনি বলছেন, "I would be very happy indeed if the people concerned behaved as trustees, but if they fail, I believe we shall have to deprive them of their possessions through the state with the minimum exercise of violence. That is why I said at the Round Table Conference that every vested interest must be subject to scrutiny and confiscation ordered where necessary—with or without compensation as the case demanded. (N K. B., Studies in Gandhism, Page, 107).

কিন্তু গান্ধীজীর ভয় এই হিংসার সাহায্যে ধনতন্ত্র উৎখাত করতে গেলে সমাজ থেকে হিংসার বীজ ঘুরে ফিরে থেকেই যাবে, it will be caught in the coils

of violence itself. ......Violence-কে এড়াতে গিয়েই তিনি নানা-রকম চেষ্টা করে গেছেন। কেন না তাঁর মতে রোগের চেয়ে ঔষধের উৎপাতটা যেন বেশী না হয়। যা হোক, ধনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ নেই। তিনি বলছেন, "I am not ashamed to own that many capitalists are friendly towards me and do not fear me. They know that I desire to end capitalism, almost, if not quite, as much as the most advanced socialist, or even communist. But our methods differ, our language differ. My theory of 'Trusteeship' is makeshift, certainly no cammouflage." (Harijan, 16.12.39.,).

আমরা পূর্বেই দেখিয়ে গিয়েছি 'অহিংসার' অধ্যায়ে যে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের অস্ত্র দেশীয় ধনীদের বিরুদ্ধেও একদিন লাগাতে হতে পারে, এই আভাস দিয়ে গেছেন। "If, however, in spite of the utmost effort, the rich do not become guardians of the poor in the true sense of the term and the latter are more and more crushed and die of hunger, what is to be done? In trying to find out the solution of this riddle, I have lighted on non-violent non-co-operation and civil disobedience as the right and infallible means. The rich cannot accumulate wealth without the co-operation of the poor in society. If this knowledge were to penetrate and spread amongst the poor, they would be strong and would learn how to free themselves by means of non-violence from the crushing inequalities which have brought them to the verge of starvation." (Harijan, 25.8.40).

ধন ও লাভ সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও উত্তর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ ধনতন্ত্রকে তিনি কি চোখে দেখতেন এবং ধনতন্ত্রে কোথা থেকে লাভ আসে, সেকথাও তাতে রয়েছে।

Question: Is the accumulation of capital possible except through violence whether open or tacit?

Answer: Such accumulation by private persons was impossible except through violent means but accumulation by the state in a non-violent society was possible, it was desirable and inevitable, (N. K. B, page, 116, 117).

(এই সঙ্গে স্মরণ করুন গান্ধীজী অন্যত্র বলেছেন, exploitation is the very basis of violence)

Q. Whether a man accumulates material or moral wealth he does so only through the help or co-operation of other members of

the society. Has he then the moral right to use any of it mainly for personal advantage ?

A. No, he has no moral right.

Q. How would the successor of a trustee be determined ? Will he only have the right of proposing a name, the finalization being vested in the state ?

A. Choice will be given to the original owner who become the first trustee, but the choice must be finalized by the state. Such arrangement puts a check on the state as well as the individual. (Hindu, 16.2.47, 25, N. K. B. 116-17).

Violence-এর প্রশ্ন নিয়েই তিনি প্রধানতঃ সোশিয়েলিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একমত নন। ধনতন্ত্রের অবসান করা সম্বন্ধে তাঁর কোন দ্বিমত নেই একথা তাঁর অনেক লেখাতে পাওয়া যায়। তিনি একমাত্র বুঝিয়েই সবাইকে অর্থাৎ সব ধনীকে ধনসম্পত্তি ত্যাগ করাতে পারবেন না, একথা তিনি বুঝেছিলেন, যেমন বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে সরাতেও বহু চাপ ও বহুসংগ্রাম করতে হবে। বিলেতে কয়েক জন যুবক কমিউনিষ্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কেবল যুক্তির সাহায্যেই ধনীদের ধন ত্যাগ করাতে পারবেন ? উত্তরে তিনি বলেন,............"Not merely by verbal persuasion. I will concentrate on any means. (non-violence etc.) Some have called me the greatest revolutionary of my time It may be false, but I believe myself to be a revolutionary, a non-violent revolutionary. My means are non-cooperation. No person can amass wealth without the cooperation, willing or forced of the people concerned." (Young India, 26.11.31) N. K. B. 92.

কোন এক পত্রলেখকের উত্তরে গান্ধীজী লিখেছেন,···——, "The correspondent seems to imagine that a non-violent person has no feeling and that he is a silent witness to the 'slow sucking blood going on every day in the world.' Non-violence is not passive force nor so helpless as the correspondent will make it out to be. Barring truth, if truth is considered apart from non-violence, the latter is the activest force in the world. It never fails. Violence only seemingiy succeeds, and nobody has ever claimed uniform success for violence. Non-violence never promises immediate and tangible results. It is not a mango trick. Its failures are, therefore, all seeming. A believer in violence will kill the murderer and boast of his act. But he never killed murder. By murdering the murderer he added to it and probably invited more. The law of retaliation

is the law of multiplying evil. Those who seek to destroy men rather than murder, adopt the latter and became worse than those whom they destroy under the mistaken belief that the murders will die with men. They do not know the root of evil. (Young India, 17.3.27.—N. K. B., 95.)

সোশিয়েলিস্টদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "My fundamental difference with Socialists is well known. I believe in the conversion of human nature and in striving for it. They do not believe in this. But let me tell you that we are coming nearer to one another. (Harijan, 25.5.39-N. K. B.—88) Either they are being drawn to me or I am being drawn to them. As for Jawharlal we know that neither of us can do without the other, for there is a heart union between us which no intellectual differences can break." (Mahatma, Vol.—V. page. 114)

অর্থাৎ গান্ধীজী ও সোশিয়েলিজম্ ক্রমশই পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে। এইটাই হলো আসল ঐতিহাসিক চাপ। গান্ধীজী সমাজতন্ত্র গ্রহণ করছেন এবং সমাজতন্ত্র গান্ধীজীকে গ্রহণ করছে। এখন, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মতামত পর পর পাঠকের জন্য রেখে দিই, যাতে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারেন, গান্ধীজী সম্পর্কে।

বলশেভিক রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি কি ভাব রাখতেন ? "I must confess that I have not yet been able fully to understand the meaning of Bolshevism. All that I know is that it aims at the abolition of the institution of private property. This is only an application of the ethical of non-possession in the realm of economics and if the people adopted this ideal of their own accord or could be made to accept it by means of peaceful persuation there would be nothing like it. But from what I know of Bolshevism it not only does not preclude the use of force but freely sanctions it for the expropriation of private property and maintaining the collective state ownership of the same. And if that is so I have no hesitation in saying that the Bolshevik regime in its present form can not last for long. For it is my firm conviction that no enduring good can be built on violence. But be that as it may, there is no questioning the fact that the Bolshevik ideal has behind it the purest sacrifices of countless men and women who have given up their all for its sake, an ideal that is sanctified by the sacrifices of such master spirits as

Lenin cannot go in vain : the noble example of their renunciation will be emblazoned for ever, and quicken and purify the ideal as time passes." (Young India, 15.11.21) N. K. B.-92.

এখানে আবার মনে করিয়ে দিই যে, ideal of non-possession ১৯৩১ সালে বিলেতে Mand Roydan church-এ "স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দারিদ্র" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে non-possession বা অপরিগ্রহের প্রকৃত প্রেরণা তাঁর কোথা থেকে এসেছিল সে সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন "When I found myself drawn into the political whirl, I asked myself what was necessary for me in order to remain absolutely untouched by immorality, by untruth, by what is known as political gain...I came definitely to the conclusion that, if I had to serve the people in whose midst my lot was cast and whose difficulties I witness from day to day, I must discard all wealth, all possession. A time came when it hecame a matter of positive joy to give up those things. And then I said to myself : Possession seems to me a crime. I can only posses certain things when I know that others, who also want to possess similar things, are able to do so. But...the only thing that can be possessed by all is non possession."

অপরিগ্রহ কথাটি তিনি গীতা থেকে নিয়েছেন, 'অপরিগ্রহবাদ' ও 'শ্রম না করে খাওয়া চুরি', এই দুটি কথা দিয়েই গান্ধীজী তাঁর সমাজতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারতেন। পুরোনো শব্দের নতুন অর্থ (কালানুযায়ী) করে নিতে তাঁর মতো ওস্তাদ বড় কেউ ছিল না। তিনি একবার বলেছেন, "As I have contended, socialism, even communism, is explicit in the first verse of Ishoponisad. What is that when some reformers lost faith in the method of conversion, the technique of what is called as socialism was born. I am engaged in solving the same problem that faces scientific socialists. It is true, however, that my approach is always and only through non-violence. It may fail. If it dies, it will be because of my ignorance of the technique of non-violence."

(India of my dreams, R. K. Prabhu)

গান্ধীজী এইভাবে গীতা, উপনিষদ থেকেও সোশিয়েলিজমের প্রেরণা সংগ্রহ করতেন, অহিংসার সহযোগিতা ও শক্তি সংগ্রহের জন্য। ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে এতদিনে সমাজতন্ত্রের পটভূমিকা তৈরী হবার যে দীর্ঘ ইতিহাস, তা তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন নি, তাঁর দুর্বলতা এইখানে। তাঁর নৈতিক আবেগ ইতিহাসবোধকে মাঝে মাঝেই হারিয়ে ভুলিয়ে দিত, অথচ কার্যকালে ও সংঘাত ঘটাবার সময় ঐতিহাসিক বিবেচনা তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই সঠিকভাবে ভেসে উঠতো (ইনস্টিং-

কুটিভাল)। গান্ধীজীর মধ্যেকার এই দ্বৈতভাবটা আমরা ভালো করে বিবেচনা করবো। এখন গান্ধীজীর সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ধারণা কি ছিল, সে বিষয়ে ফিরে যাই ঃ

"Violence is no monopoly of any one party. I know congressmen who are neither socialists nor communists, but who are frankly devotees of the cult of violence. Contrawise, I know socialists and communists who will not hurt a fly, but who believe in universal ownership of the instruments of production. I rank myself as one among them." (Harijan, 10.12.38 ; N. N. B. 92)

"Communism of the Russian type, that is communism which is imposed on a people, would be repugnant to India. If communism came without violence, it would be welcome. For then no property will be held by anybody except on behalf of the people and for the people. A millionaire may have his millions, but he will hold them for the people. The state could take charge of them for the people, whenever they would need them for the common cause.

What does communism mean in the last analysis ? It means classless society, an ideal that is worth striving for. Only I part with it when force is called in aid for achieving it. We are all born equal, but we have all these centuries resisted the will of God. The idea of inequality, of 'high and low' is an evil, but I don't believe in eradicating evil from the human breast at the point of the bayonet. The human breast does not lend itself to that means." (India of my dreams, RK. Prabhu, page 98)

উপরোক্ত লেখা থেকে গান্ধীজী কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ও নিজের চিন্তাধারা সম্বন্ধে অনেক গোলমেলে ধারণা দেখা যায়, তবু গান্ধীজীর স্পিরিট সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, সেখানে ধনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন মোহ নেই, একথা বোধহয় সকলেই মানবেন। জমিদার ও জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটা শুনুন।

গান্ধীজী যতক্ষণ পারেন যত রকমে পারেন, কাউকে বোঝাতে কসুর করেন না। যত রকম সুযুক্তি আছে, সহৃদয়তা, ন্যায়পরায়ণতা আছে, সব কিছু তিনি জাগাতে চেষ্টা করেন। প্রতিপক্ষকে, নিজেকে সংশোধন করে নেবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেন। কিন্তু যখন তা হয় না, তখন তিনি কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা নেন ও কঠোর আদেশ করেন, তা আমরা জাতীয় আন্দোলনে সরকারের সাথে সংগ্রামে, বারে বারে দেখেছি। তখন তাঁর বজ্রগম্ভীর বাণীর মধ্যে দুরন্ত ভূমিকম্পের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সময়কার বজ্রনির্ঘোষ আদেশ কে না শুনেছে। সেই ১৯৪২ সালের জুনমাসে, লুই ফিসারের সঙ্গে আলাপনে জমিদারদের সম্বন্ধে আভাস

দিয়েছিলেন। জমিদারশ্রেণীকে বিনা ক্ষতিপূরণেই জমিদারী ছাড়তে হবে এবং দরকার হলে তার জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করতেও তিনি প্রস্তুত এবং সে সংগ্রামে যদি দিন কয়েকের জন্য পরিপূর্ণ অরাজকতা আসে এবং জমিদারকুল জমি ছেড়ে পালায়, তাতেও তিনি প্রস্তুত। কেননা তিনি স্পষ্টই বলেন যে দিন পনেরোর একটা অরাজকতার টাল ভারত নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারবে। আমরা লুই ফিসারের সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ আলোচনার কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

"What would happen to free India ?"

I (Louis Fischer—A week with India,) asked, "What is your programme for improvement of the lot of peasantry ?" "Th peasants would take the land," he replied, "We would not have to tell them to take it. They would take it."

"Should the landlords be compensated ?" I asked.

"No," he said, "that would be fiscally impossible."

"You see," he smiled, "our gratitude to our millionaire friends does not prevent us from saying such things. The village would become a self governing unit living its own life."

Another interview given two days later runs thus :

"Well," I asked, "how do you expect your impending civil disobedience movement ? What shape will it take ?"

"In the village," explained Gandhiji, "the peasant will stop paying taxes. They will make salt despite official prohibition··· Their next step wlll be to sieze land."

"With violence ?" I asked.

"There may be violence, but then again the landlord may co-operate."

"You are an optimist," I said.

"They might co-operate by fleeing," Gandhi replied.

"Or," I said, "they might organise resistance ?"

"There may be fifteen days of chaos," Gandhi speculated, "but I think we could soon bring that under control."

"You feel then that it must be confiscation without compensation ?" I asked.

"of course," Gandhi agreed, "It would be financially impossible for anybody to compensate the landlords."

(Quoted by H. D. Malavia, in Land Reform in India, page 71-72)

বস্তুতঃ সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর বৈপ্লবিক দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর বাণী কত স্পষ্ট করে তিনি হরিজন কাগজে পয়লা ফেব্রুয়ারীতে লিখেছেন, "But I have visions that the end of this war will mean also the end of the rule of capital. I see coming the day of the rule of the poor, whether that rule be through force of arms or non-violence." (Harijan 1.2.42) N. K. B.-104

অন্যত্রও গান্ধীজী ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে বলেছেন, "Land will be owned by the state. I presume the reins of the Government will be in the hands of those who have faith in this ideal. A majorty of Zaminders will give up their land willingly. Those who do not do so will have to be so under legislation," (Harijan, 29.11 51)

তিনি আবার এক জায়গায় বলেছেন, "Real socialism has been handed down to us by our ancestors who taught 'All land belongs to Gopal,' where then is the boundary line ! Man is the maker of that line and he can therefore unmake it. Gopal literally means shepherd, it also means God. In modern language it means the state, i e, the people. That the land does not belong to the people, is too true" (Harijan, 2.1.37)

চাষীদের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা গান্ধীজীর প্রথম থেকেই ছিল, ধনী ও বুদ্ধিজীবীদের উপর বিশ্বাস তাঁর প্রথম থেকেই কম। ১৯১৬ সালেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি বললেন, "Our solution can come through farmer Neither the lawyer, nor the doctors, nor the rich landlords are going to secure it." February, 1916

যে-কথা থেকে এই সব কথা এলো, সে হলো অছিবাদ। অছিবাদের পিছনে যে ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার মতলব ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্যই এতো কথা লিখতে হলো। অর্থাৎ গান্ধীজীর দূরভিসন্ধি সম্বন্ধে যারা সর্বদাই সন্দেহক্লিষ্ট, তাদের ভুলটা দেখিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও অছিবাদ বর্জিত হয়েছে কেন? তার কারণ হলো, অছিবাদের মধ্যে অবাস্তবতা আছে বলে। সমাজব্যবস্থা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে হবে, সমাজব্যবস্থা না বদলে কেবল মানুষের শুভবুদ্ধির উপর নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় শুভসমাজ স্থাপন করা যায় না, কেবল মানুষ ভালো হলেই হলো, এ যুক্তি অবাস্তব। পারিপার্শ্বিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (এনভায়রনমেণ্ট ও ইণ্ডিভিজুয়েল), এই দুয়েরই প্রাধান্য আছে। পারিপার্শ্বিককে রক্ষা করে, সমাজব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখে, মানুষের ব্যাপক হৃদয় পরিবর্তন করা অসম্ভব। যদি তা অসম্ভব না হতো, তবে গান্ধীজীকেই বা পূর্ণস্বরাজ চাইতে হলো কেন? কেন তিনি ব্রিটিশসাম্রাজ্য রক্ষা করেই ভারতকে সুখী করতে পারলেন না? গান্ধীজী নিজেও একথা বুঝেছিলেন যে সমাজব্যবস্থা পালটাতেই হবে। সমাজব্যবস্থা না বদলে

ধনীদের অছি করে রাখা সম্ভব নয় এবং এই ট্রাস্টিশিপ ঠিকমতো চলছে কিনা তা-ও দেখবে কোন রাষ্ট্র? বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্র নিজেও ধনীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হতে থাকবে, যদি ধনীদের জীইয়ে রাখা যায়। কাজে কাজেই অছিগিরি বজায় রাখার অর্থ রাষ্ট্রকেও কার্যতঃ কলুষিত করে রাখা। মানুষের পরিবর্তন যেমন সমাজের পরিবর্তন সাপেক্ষ, তেমনি সমাজের পরিবর্তনও মানুষর পরিবর্তন সাপেক্ষ। তাছাড়াও মানুষের পরিবর্তন, সমাজের পরিবর্তনের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, স্থায়িত্ব পায় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কেও গান্ধীজীর ধারণাও কিছু অল্প ছিল না, দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "It is because the rulers, if they are bad, are so, not necessarily or wholly by birth, *but largely because of environment*, that I have hopes of altering their course. It is perfectly true that the rulers cannot alter their course by themselves. If they are dominated by their environment, they do not deserve surely to be killed, *but should be changed by a change of environment*. But the environment are all - the people who make the rulers what they are. They are thus an exggerated edition of what we are in the aggrate."

(Harijan, 29.9.34, N. K. B. 94)

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যত ভাববাদী দোষেই অতিরঞ্জিত হোক না কেন, অবস্থা বা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তিনি মার্কসবাদীদের মতোই প্রায় সজাগ ছিলেন। কাজে কাজেই সমাজব্যবস্থা না পালটে অছিবাদের সাহায্যে পুরোনো সমাজ দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। অর্থাৎ নতুন ঔষধ ও নতুন বোতল দুয়েরই প্রয়োজনবোধ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হতে লাগলো।

অবাস্তব বলে অছিবাদ ত্যাগ করা হলেও একটা কথা এখানে বলে যাওয়া ভালো। গান্ধীজী এই অদ্ভুত মত পোষণ করেছিলেন কোন্ চিন্তা থেকে, এটা কি তাঁর সম্পূর্ণ মনগড়া একটা প্রণালী মাত্র, না এই জাতীয় মনোবৃত্তি সমাজদেহে বর্তমান আছে? আমরা পূর্বে দেখেছি তিনি অহিংসাকে জাগ্রত বা ডিসকভার করেছিলেন নতুন করে, যাকে বলে আবিষ্কার বা ইনভেনশন, তা করেন নি। ব্যক্তি জীবনে ও ঘরে ঘরে সংসারী লোকেরা ও সাধুসন্ন্যাসীরা অহিংসার ব্যবহার করেন, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে। সেই শক্তিটাকে তিনি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এমনি করে অছি মনোভাবও কি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোথাও চালু নেই? গান্ধীজী সবাইকে খুঁটিয়ে দেখতে বলেন এবং যাতে তাঁর এই কথা আজগুবি বলে উড়িয়ে দেবার পূর্বে সবাই একবার বিশ্লেষণ করে দেখে সে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, এই অছিবাদ বা এই জাতীয় ট্রাস্টির মনোভাব মানব জীবনে কিছু না কিছু সবাইকেই ব্যবহার করতে হয়, অথবা পোষণ করতে হয়। পিতা নিজেকে তার সন্তানদের অছি মনে করেই সম্পত্তি উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে যায় না, নিজের সম্ভোগের জন্য। অভিভাবকেরা তাদের অধীনস্থদের অছি হিসেবে নিজেদের

শক্তি ও অধিকার ব্যবহার করে থাকে। নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য অছি নিযুক্ত হয় আদালত থেকে। তাছাড়া জাতীয় সম্পত্তি, দেশের সম্পত্তি যাতে অযথা অপচয় না হয়, চুরি না হয়, এমনি ধরণের অছিবোধ প্রত্যেক দায়িত্বশীল অফিসারকে পোষণ করতে হয়। যদি অবশ্য তিনি সৎ কর্মচারী হন। এ হিসেবে যদি দেখি তবে স্বদেশপ্রেমী কর্মীরই অছিবোধটা সজাগ থাকা চাই। সৎলোক মানে সেই, যে নিজের মোটামুটি প্রয়োজনের উপরে নিজের পিছনে একটি পয়সাও খরচ করতে চায় না। এজাতীয় মনোভাব যদি সৃষ্টি না হয়, তবে সত্যিকার স্বদেশপ্রেম, মানবতাবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতিও চালু করা সম্ভব নয়। সমাজব্যবস্থা হিসেবে অছিবাদ অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব প্রমাণিত হলেও মনোভাব হিসেবে এর প্রসার সকলের মধ্যেই থাকা উচিত। এবং সমাজতন্ত্র কায়েম হবার পর এই অছিবোধের দায়িত্ব কমবে না, বরং বাড়বে, তাকে যে নামেই ব্যবহার করি না কেন। সমাজতন্ত্রে মানুষকে আইনের ও নিয়মের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে পারা যাবে, যাতে কেউ অলস হয়ে থাকবে না, অন্যকে ঠকাতে পারবে না, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হতে পারবেই না, এমন ধরণের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। বরং আইনের চৌহদ্দি ও ভয় থাকা সত্বেও মানুষকে প্রতি পদে পদে আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না—এতটা সমাজ-সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও অছিবোধ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হবে, এই আশা করা যায়। নাহলে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, এই আশা করা উচিত নয়।

এখানে প্যারেলালজীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা দরকার। গান্ধীজীর সঙ্গে শংকর রাও দেও-এর কথোপকথন ঃ

Is trusteeship then a substitute for the abolition of individual ownership ? 'No,' said Gandhiji. It is the means fcr the attainment of that goal. More, it anticipates the goal.'

In the reverse, is trusteeship a mere stop-gap arrangement that would cease to have any further use when individual ownership has been abolished ? 'No,' again the answer, for after the existing inequalities of wealth have been removed, *the problem of recurring inequalities resulting from varying capacity and talent of different individuals will remain.* Unless outstanding talent is fostered and held in trust in the interest, it will give rise to a privileged class, no matter under what name and garb. As the only answer to the problem of recurriug inequalities arising from "residuary Ownership", the doctrine of trusteeship has a perennial value and use.

(Mahatma : Last Phase, Vol. II, page, 625)

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে গান্ধীজী স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিকেই মাত্র সমাজীকরণ (সোশিয়েলাইজেশন) করে ক্ষান্ত হতে রাজি নন। তিনি প্রত্যেকের বিশেষ গুণপনা ও প্রতিভাকেও সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে

বলেছেন। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে যে স্বাভাবিক ভাবেই মগজের শক্তিতে শক্তিমান দেখা যায় এ তার নিজস্ব কৃতিত্ব নয়, এটি প্রকৃতি বা ভগবানের দেওয়া, সেই শক্তি তাই সমাজের পক্ষে, তার নিজের বলে দাবি করা চলবে না। প্রতিভা তাই সামাজিক সম্পত্তি। প্রতিভা কেন, ব্যক্তি ও তার সব কিছুই সামাজিক সম্পত্তি। (ব্যক্তিবাদের মূল উচ্ছেদ হলো এতে।) এই নীতির সূত্র ধরেই গান্ধীজী সকল প্রকার শ্রমের জন্য সমান পারিশ্রমিকে বিশ্বাস করতেন। কায়িকশ্রমই হোক আর বুদ্ধিজাত শ্রমই হোক, দক্ষই হোক আর অদক্ষই হোক, সকলের সাধারণ জৈবিক প্রয়োজন সমান। তাই থেকেই তাঁর Unto the last······এর moral economics তৈরী হয়েছে। কমিউনিষ্টদের মতেও কমিউনিজমের স্তরে To each according to his needs and from each according to his abilities এই বন্টন প্রথার কথা আছে, কিন্তু সোশিয়েলিষ্ট স্তরে সমাজ থাকা কালে ততটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন না। গান্ধীজী এখনই, প্রথম থেকেই সে পথে অগ্রসর হতে উৎসাহ দেন। বিনোবাজীও তাই বলছেন। এই জাতীয় বিচার ও চিন্তা যাদের, তাদের কমিউনিষ্টরা কী করে বুর্জোয়া আখ্যা দেন, তা বোঝা মুশকিল।

আরও একটা কথা এই অছিবাদ সম্পর্কে বলে যাওয়া দরকার। গান্ধীজী অছিপ্রথাটাকে প্রথম জীবনেও কোন স্থায়ী সমাজব্যবস্থা বলে দাবি করেন নি। তিনিও মনে করতেন, এটা একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। অর্থাৎ ধনীদের সম্পত্তি হিংসার বা বলপ্রয়োগের সাহায্যে হস্তান্তরের পক্ষপাতি ছিলেন না তিনি। সেইজন্য তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন করানো সম্ভব। উপযুক্ত অহিংসা পদ্ধতির সাহায্যে তাদেরকে তাদের সম্পত্তি প্রথমে অছি-সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করানো, এবং পরে জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে তা পরিণত করা সম্ভবপর হবে। অহিংসার অর্থ যে কেবল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাজ উদ্ধার করা-তা নয়। তিনি অহিংস সংগ্রামের উপায়ও দেখিয়ে গেছেন, যথা—অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি। অর্থাৎ তাতেও চাপেরও স্থান আছে। অর্থাৎ যাকে বলে কম্পেল বা বাধ্য করা। প্রতিপক্ষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করা, ন্যায়বোধকে জাগ্রত করা, জনমত সৃষ্টি করাও একটা অবস্থার চাপ তৈরী করা, এতখানি গান্ধীজী তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামকালে সর্বত্রই করে গেছেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, দেশীয় রাজন্যবর্গের সনাতন গোঁড়ামীর বিরোধিতায়, চাষীমজুরের আন্দোলনে আমরা এসব দেখেছি। প্রতিপক্ষের সুবুদ্ধির উদয় কবে হবে, এই বলে ধন্না দিয়ে থাকতে তাঁকে দেখা যায় নি। মরণ পণ করে লড়তেও নেমেছেন, যাকে বলে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আজ যদি দেশের-রাষ্ট্রের উপর জনতার হাত বর্তায়, অর্থাৎ তারা যদি দেশের লোকসভা ও আইনসভার মারফৎ ধনীদের ও জমিদারদের সম্পত্তি, জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য বাজেয়াপ্ত করে, তবে তা কি হিংসা বলে পরিগণিত হবে? হিংসার এমন অর্থ গান্ধীজী দাবি করেন নি। তিনি সংখ্যালঘুদের দাবি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে জমিদার, মহাজন, ধনপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংখ্যাগুরুরা হাত গুটিয়ে থাকবে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়

সঙ্গত জেনেও এমন কথা কখনও বলতে পারেন না। কাজেই যদি কেউ বলেন, জমিদারদের সম্পত্তি ভূদানের মধ্য দিয়ে হস্তান্তরিত হলেই খাঁটি অহিংসা হলো এবং সেভাবে দেওয়া জমি হস্তান্তর করার অর্থ জমিদারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জুলুম হবে না, কাজেই অহিংসা হবে। তাহলে তা গান্ধীবাদ হবে না। ভূদান, সম্পত্তিদান করার মতো উদার আবহাওয়া যদি সৃষ্টি হয়, তবে তা আদর্শ বলে গণ্য হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনের বলে ন্যায়সঙ্গত অধিকার জনসাধারণ আয়ত্ত করে নিলে তা হিংসা হলো, এমন অর্থ করার মানে গান্ধীজীর অপবাদ করা। তার অর্থ অবশ্য এ-ও নয় যে উদার আহ্বানের দ্বারা যতটা সম্ভব রাজনৈতিক শিক্ষার দ্বারা যতখানি উদার মনোভাব সৃষ্টি করা যায়, তা করতে হবেনা, কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে চলতে হবে। আইন করে সমাজীকরণ করা ও ভূদানের সাহায্যে সমাজীকরণ করা, এ দুটো পরস্পর বিরোধী কথা নয়। আইনের চাপ, জনমতের চাপ ছাড়াও সোজা আবেদন করা ও তাদের হৃদয় পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা সম্ভব ও উচিত। কেননা ধনিক-শ্রেণী কোন অবস্থাতেই নিজেদের জেদ ও লোভ ত্যাগ করতে পারে না, এমন অনিবার্য কোন নিয়ম নেই। বর্তমান চীনদেশে যেভাবে ধনীরা, কারখানার মালিকেরা নিজেদের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে এবং যেভাবে নিজেদের মত, পথ ও ধারণাগুলিকে পরিবর্তন করে স্বেচ্ছায় জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক জীবনে নিজেদের জীবন ও ভাগ্য মিলিয়ে নিচ্ছে, এ এক অপূর্ব চিত্র। সমস্ত চীনে আবার নতুন করে একটা বিপ্লব চালু হয়েছে, যে বিপ্লব হলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মালিকশ্রেণীর নিজেদের ইচ্ছাতেই সমাজতন্ত্র গ্রহণ করার বিপ্লব। অতএব এখন আর একথা কেউ বলতে পারে না যে ধনীরা কিছুতেই নিজেদের পরিবর্তন করতে পারে না। গান্ধীজীর স্বপ্ন ও বিশ্বাস চীনদেশেও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হলো না, যদিও তার qualified বা conditioned বিকাশ দেখা গেলো। অর্থাৎ অবস্থার চাপ এবং উপযুক্ত শিক্ষা সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারলে এমন জিনিষ ঘটা সম্ভব। চীনদেশে মাও সে তুং আজ নিশ্চয়ই আইনের বলেই সমস্ত মালিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বাস্তব অবস্থার হিসেবনিকেশ করেও এবং মানুষের হৃদয়ের ও বিচারের উপর বিশ্বাস থাকার জন্য তিনি তা করেছিলেন। ফলে যুক্তিপূর্ণ আবেদন ও জন-মতের আকর্ষণ দিয়ে ধনিকশ্রেণীকে নিজের মতে টেনে নিতে পেরেছেন, তাদের তিনি মিলিত করে নিশ্চিহ্ন করছেন না, তিনি তাদের পরিবর্তিত করে ফেলছেন, তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছায়। এ-ও কি একটা শিক্ষা নয়। গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ স্বপ্নবিলাসী বলে উড়িয়ে দিতে চান যাঁরা, তাঁরা কি বর্তমান চীনের উদাহরণ থেকে নিজেদের ধারণাটাকে একটু বদলাতে প্রস্তুত হবেন না? তাছাড়া বিনোবা ভাবের ভূদানের সার্থকতা যতটুকু দেখতে পাই, সেটাও নতুন করে চিন্তা করার জন্য উৎসাহ দেয় না কি? আর অবস্থার চাপ ও জনমতের চাপ, তা কি চীনের চেয়ে আমরা কিছু কম দিতে পারি? আমাদের লোকসভা ও আইনসভাগুলির অধিকারও তো কম নয়। তা থেকে ও গণআন্দোলনের চাপ থেকে কি যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়? তদুপরি মাও সে তুঙের মতোই সহজ ও সুযুক্তিপূর্ণ আবেদন, আকর্ষণ ও উৎসাহ কি

দেওয়া যেতে পারে না মালিকদের, যাতে তারাও স্বেচ্ছায় এক-পা, এক-পা করে অগ্রসর হয় সমাজতন্ত্রকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে ? তাছাড়া মার্কস্‌বাদের গোড়াকার কথাটাও একবার স্মরণ করা যাক। ধনীর হাতে ধনের ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়ীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ-এর ফলে যে সামাজিক চিত্র ও ঘটনাটা আমরা দেখি, তা থেকে কি বুঝতে হবে যে ধনীরা লোভী ও জঘন্য বলেই তাদের হাতে ধনসঞ্চয় হতে থাকে ? ধনীরা লোভী ও কাঞ্চনে আসক্ত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে হিসেবে আমরা সাধারণ লোকেরাও কম কাঞ্চন-বিলাসী নই। কিন্তু কোথায়, আমাদের হাতে তো কাঞ্চন জমতে থাকে না ! ধনতন্ত্র চালু রাখতে হলে ধনের কেন্দ্রীকরণ হতেই হবে, তাকে একদিকে ক্রমবর্ধমান থাকতেই হবে, লাভ করে যেতেই হবে। অন্যদিকে ধনসম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হতে থাকতে হবেই—এই সমগ্র পরিস্থিতিরই বাহ্যিক ও মানসিক প্রকাশ হলো ধনীদের। অর্থাৎ যাদের হাতে অর্থের এই যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ঘটে, তাই হলো ধনীদের ধনাসক্তি ও তাই থেকে অতিরিক্ত ধনলোভ। ধনলোভটা একটা বিশেষ অর্থনৈতিক প্রথারই প্রয়োজনে একটা মানসিক অবস্থা মাত্র। এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্বস্তুক মানসিকতা নয়, তা নিজের জোরে নিজে বহুকাল বেঁচে থাকতে পারে না। অর্থাৎ ধনতন্ত্র যদি চালু থাকে, ধনতন্ত্র যদি সমাজের ব্যবস্থাতে থেকে থাকে, তবে ধনীদের লোভ ও ধনাসক্তি অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিসঙ্গত। বৈরাগীর হাতে কখনও ধনতন্ত্র চালু থাকতে পারে না। কিন্তু যদি সমাজে সমাজতন্ত্র চালু হয়ে যায়, এবং ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের শক্তিটাই বাড়তে থাকে এবং ধনতন্ত্রের বিলয়টা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন ধনশক্তিটাও তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং ধনীরা ধনাসক্তিতে কোনো মানসম্মান পায় না, ফলে ভিতরকার অন্তর্নিহিত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। চীনদেশে বর্তমানে তাই হচ্ছে, কারণ সেখানে সমাজতন্ত্রই সমগ্র চীনের জীবনের ভার গ্রহণ করতে চলেছে, ধনতন্ত্রের প্রয়োজন কমে আসছে বলে তারা বুঝতে পারছে। ফলে ধনসাক্তিটাও আর তাদের তেমন করে উৎসাহ দেয় না। কাজেই জনগণের সমাজতান্ত্রিক জীবনই তাদের আকৃষ্ট করছে এবং মাও সে তুঙের আবেদন ও আহ্বানে তারা সাড়া দিচ্ছেন। মোট-কথা, প্রত্যেক মানসিকতারই একটা উপযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, সেটা স্বয়ম্ভূ নয়। তাই আজকের পৃথিবীতে, সমাজতান্ত্রিক যুগে অপরিগ্রহ (Non-possession) সার্বজনীন হওয়া অসম্ভব কথা নয়। Immutable nature of man নয়, এই ধনলোভটা।

নারীজাতির উন্নয়ন

নারীজাতির উন্নয়ন ও নরনারীর সম্পর্কে গান্ধীজীর দান ও তাঁর মতামত সম্বন্ধে আলোচনা না করলে গান্ধী—গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ তাঁর এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট দান আছে এবং তাঁর মতামতেরও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই জানা দরকার গান্ধীজীর আন্দোলনের ফলে ভারতের নারীসমাজেও এক অপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে ভারতের মেয়েরা একটা মস্ত বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজী তো নিজেই মনে করতেন যে তাঁর অহিংস আন্দোলনে নারীরা পুরুষের চেয়ে স্বভাব গুণেই বেশী অধিকারী। মেয়েদের যেটা আমরা দুর্বলতা বলে মনে করি, তিনি সেই তথাকথিত দুর্বলতাগুলিকেই একটু-আধটু সংশোধন করে সংগ্রামের সবচেয়ে উপযুক্ত গুণ বলে প্রতীয়মান করান। মেয়েদের চরিত্রের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা, সেবাপরায়ণতা, দয়ামায়া ইত্যাদি গুণগুলিকেই তিনি অহিংসার পক্ষে বেশী উপযোগী বলে মনে করেন, এবং মেয়েদের মন থেকে হীনমন্যতার বোধটিকে দূর করে দেন। যে দেশে ভারতের ছেলেরাই ব্যাপকভাবে ইংরেজের সাথে সংঘর্ষে আসতে ভয় পেতো, সেদেশে হঠাৎ কি করে দলে দলে মেয়েরা পিকেটিং করতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, পুলিশের লাঠি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলো, পুরুষেরা যখন জেলে তখন তাদের স্থান পূরণ করতে লাগলো, তা অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। পণ্ডিত নেহেরু সেদিনকার একটা চিত্র দিচ্ছেন ঃ

"Most of us menfolk were in prison. And then a remarkable thing happened Our women came to the front and took charge of the struggle. Women have always been there of course, but now there was an avalanche of them, which took not only the British Government but their own menfolk by surprise. Here were these women, women of the upper or middle classes, leading sheltered lives in their homes, peasant women, workingclass women, rich women, poor women, pouring out in their tens of thousands in defiance of government order and police lathi. It was not only that display of courage and daring, but what was even more surprising was organisational power they showed.

Never can I forget the thrill that came to us in Naini prison when news of this reached us, the enormous pride in the women of India that filled us. We could hardly talk about all this among ourselves for our hearts were full and our eyes were dim with fears." (Discovery of India-page-23)

এ কেবল এলাহাবাদ বা লক্ষ্ণৌ-এরই চিত্র নয়। ভারতের প্রত্যেক নগরে নগরে এই দৃশ্য দেখা যায়। গ্রামের মেয়েরাও এগিয়ে আসে। সেই নারী জাগরণের সুফল শুধু গান্ধীবাদী কংগ্রেসই ওঠায় নি, তার সুফল তারপর সকল প্রকার রাজনীতিই পেয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে, চাষী আন্দোলনে, কমিউনিষ্ট আন্দোলনে, বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দলে মেয়েরা যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনকি বোমা, পিস্তলধারী সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামেও বহু বীরাঙ্গনাকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই Original momentum বা মূল জাগরণটা গান্ধীজীর কাছ থেকেই আসে। তিনিই প্রথম ভারতীয় ললনাদের ঘরের বাইরে বের হয়ে আসার সাহস জুগিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঘরের বাইরে এসেও অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করে চলবার মতো মর্যাদাবোধ, শালীনতাবোধ ও সনম্র সাহস ও শক্তি জুগিয়ে দেন। আজ ভারতবর্ষে রাজনীতিতে মেয়েদের একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনার ব্যাপারেও মেয়েরা শীর্ষ স্থানেও কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত আছেন, যা অন্য দেশেও তেমন নেই, যদিও ভারতে মেয়েদের স্থান শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কত পিছনে রয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে ভারতে মেয়েদের স্থান সাধারণভাবে এখনও বহু পিছনে, তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার খুবই অভাব। কিন্তু আজ যে, সাধারণ মেয়েরা আমাদের দেশে এত পিছনে পড়ে আছে, তার কারণ প্রধানতঃ দারিদ্র ও শোষণপ্রথা। আইনের দিক থেকে সমাজের নানা বিষয়কর্মে মেয়েদের সমান অধিকার আজ রয়েছে, পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের ভোটাধিকার আজ সমান, যা এমন কি ইউরোপের অনেক দেশেও নেই। যেমন, ফ্রান্সে আজও মেয়েদের ভোটাধিকার নেই। বিবাহ রদ, বিধবা বিবাহ, সম্পত্তি ইত্যাদি ব্যাপারেও আজ ভারতের মেয়েদের অধিকার কোন দেশের চেয়ে কম নয়। সাধারণভাবে পুরুষেরাও যে কারণে পশ্চাদপদ, মেয়েরাও সেই কারণেই পিছিয়ে আছে, অর্থাৎ দারিদ্রের কারণে। এই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি জয়ী হয় এবং যা হবেও, তখন মেয়েদের ভারতবর্ষে কোন আইনগতভাবে ও বাস্তবতায়ও দুর্বল-রূপে দেখা দেবে না। এই পিছিয়ে পড়া ভারতে মেয়েদের এই যে অধিকার এসে গেলো, এটা কম বড় কথা নয়। অনেক ইউরোপীয় মহিলারাও ভারতীয় মেয়েদের এ বিষয়ে ঈর্ষা করতে পারেন। এতখানি মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার মূলে রয়েছে গান্ধী-আন্দোলনের দান। গান্ধীজী মেয়েদের যে মর্যাদা দিয়ে গেছেন এবং হাতে কলমে তাকে কার্যকরী করার জন্য যে উদাহরণ দেখিয়ে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হয়তো এদেশের লোক এখনও উপলব্ধি করে ওঠতে পারেনি। ব্যক্তি হিসেবে আরও একজনের দানও কম নয়, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি কেন রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় দানই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হয়ে যেতো, কেন তা গণআন্দোলনের বিরাট শক্তি থেকে প্রাণসঞ্চয় করতে পারতো না। গান্ধীজীর নারীআন্দোলনেও অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে আন্দোলন নিম্নগামী, অর্থাৎ জনতার দিকেই ক্রমশঃ নেমে আসতো বলে আপামর শিক্ষিত-অশিক্ষিত -অর্ধশিক্ষিত, সকলেরই জীবন সংগ্রামের সাথে মিশে যেতে বাধ্য হতো।

অথচ গান্ধীজীর নারী আন্দোলন তথাকথিত মডার্নিজমের বা আধুনিকতার

পক্ষপাতি নয়। বরং অনেক তথাকথিত আধুনিক মহিলাকেও তিনি পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যারা জনসেবায় আত্মবিলীন করে দেন। একথা ঠিক যে ইংরেজী শিক্ষিত, বিলেতে শিক্ষিত মহিলা আন্দোলন, গান্ধীজীর পূর্বেও ভারতের উপরতলাকার মহিলাদের সংক্রামিত করেছিল। তার ফলে অনেক "স্বাধীনচিন্তা" তাদের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু সে মহিলা আন্দোলনের পরগাছা স্বভাব ও উচ্ছৃংখলতার যে একটা বিষময় ফল আছে তা সকলেরই বোঝা উচিত। উপরতলাকার বিলাসিনী মহিলাদের যে সত্যিকার স্বাধীনতা বোধ নেই তা জানা উচিত। সেজাতীয় মহিলাসমাজ আজও ভারতের উপরতলায় আছে। তারা সমাজের শক্তি জোগায় না, তারা সাধারণ নারী-জাতির মুক্তির বাহন নয় তারা, এমন কি তাদের শত্রুও বলা যায়। তারা বরং সাধারণ নারীদের মধ্যে বিকৃত মূল্যবোধের সৃষ্টি করে, তারা সাধারণ লোকের কাছ থেকে কোন শ্রদ্ধা পায় না। তারা ভারতের জনসাধারণকে ঘৃণা করে, এরা ইউরোপীয় সভ্যতার খারাপ দিকটাকে ভারতে বেশী করে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। গান্ধীজীর আন্দোলন, এই জাতীয় মহিলা আন্দোলন নয়। তাঁর আন্দোলনকে নারী আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায়। অথচ ভারতের সাধারণ নারীদের তিনি পুরুষের থেকে আলাদা করে জাগাতে চেষ্টা করেননি, এটা ফেমিনিস্ট আন্দোলন নয়, স্যাফ্রিজিস্ট আন্দোলনের ঢঙও নয়। নরনারী নির্বিশেষে সাধারণ জনগণের জাগরণে ভারতের নারীদের পুরুষের সাথে একই সংগ্রামে তিনি নামিয়েছেন। তিনি মেয়েদেরই শুধু সাহসী করেননি, ছেলেদেরও মেয়েদের সম্মান করতে শেখান, গৌরবের অধিকার সংগ্রামের মধ্যে পুরুষের সাথে মেয়েদেরও সমান, এ তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যান। তিনি জানতেন উপরতলাকার গুটি কয়েক ভদ্রমহিলাই নারীজাতির সমস্যা নয়, আসল নারীসমাজ হলো অগণিত নিম্নমধ্যবিত্ত, চাষী-মজুর, হরিজন নারীর দল। প্রত্যেক আন্দোলনকে তিনি গণস্বার্থের দিক থেকেই বিচার করতেন। তিনি তথাকথিত আধুনিকাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি আধুনিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, অথচ নারীদের যে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তা ইউরোপের নারীরাও পায়নি।

আমরা জানি কোনও দেশের সভ্যতার মান বুঝতে হলে সেই দেশের নারীদের কতখানি মর্যাদা ও অধিকার কায়েম হয়েছে তাই দিয়েও পরিমাপ করা যায়। এটা একটা বিশিষ্ট মানদণ্ড। কুজেলম্যানকে (Kugelman-কে) লেখা কার্ল মার্কস্-এর বিখ্যাত একটি উক্তি এইরূপ: "Anybody who knows anything about history knows that great social changes are impossible without the feminine ferment. Social progress can be measured excatly by the social position of the fair sex (the ugly ones included)". (The correspondence of Mark & Engles. pg 255). এইজন্য আমরা দেখি যে আজ রাশিয়াতে মেয়েদের স্থান পুরুষের সমান। চীন বিপ্লবকে তো অনেকে মনে করেন যে সেটা প্রধানত মেয়েদের বিপ্লব। অর্থাৎ সে দেশে যারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে চাষী ও মজুরদের চেয়েও বেশী, তারা হলেন মেয়েরা। কেননা, সামন্ততান্ত্রিক চীনে ও চিয়াং কাইশেকের চীনে মেয়েদের অবস্থা ক্রীতদাসীর চেয়ে উন্নত কিছু ছিল

না। অতি নির্যাতিত ও হেয় জীবন তাদের যাপন করতে হতো। আজ চীনদেশের নারীরা যে শুধু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন, তাই নয়, চীনে মেয়েদের উৎসাহ-উদ্যমটাই সবার আগে নজরে পড়ে। এর সঙ্গে তুলনা করুন গান্ধীজী কি বলেছেন, "A society cannot rise above the level of its womenfolk. It has been rightly said that if you educate a man, you educate an individual, but if you educate an woman, you educate a whole family. (Quoted by B. Kumarappa—page 175)

আমরা দেখি পুরুষেরা যতই এগোতে চাক, তাদের ঘরের মেয়েরা ও মায়েরা যদি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা এগোতে পারে না। এক পায়ে যেমন কেউ বেশী দূর যেতে পারে না, তেমনি একমাত্র পুরুষের ক্ষমতায় কোনও দেশ বেশী অগ্রসর হতে পারে না। ভারতের নারীরা কঠিন দুর্দশা, ভয়, কূপমণ্ডূকতা ও অশিক্ষায় ডুবে ছিল। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, নারীজাতিকে জাগাতে না পারলে দেশ এগোবে না। নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসুক, পুরুষেরা বাইরের সংগ্রামের ভার নিক্—তিনি প্রথম থেকেই এই দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, মেয়েদের সমান অধিকার দিতে হবে। তারা পুরুষের মতো নানা গুণে, মস্তিষ্কের পরিচালনায়ও সমান শক্তিশালী। "Women is the companion of man, gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in every minute detail in the activities of man and she has an equal right of freedom and liberty with him. She is entitled to a supreme place in her own sphere of activity as man in his. This ought to be the natural condition of things and not as a result of only of learning to read and write. By sheer force of a vicious custom, even the most ignorant and worthless men have been enjoying a superiority over women, which they do not deserve and ought not to have. Many of our movements stop halfway because of the condititions of our women. Much of our work done does not yeild appropriate results ; our lot is like that of the penny-wise and pound-foolish trader, who does not employ enough capital in his business" (India of my dream—ed. by Prabhu)

পুরুষের মন জোগানো বা দেহের ক্ষুধা মেটানোতেই মেয়েদের মূল্য নিরূপিত হবে না। সাহিত্যিক ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউসের' সোসাইটি-গার্লদের মহিলাদের মতো মেয়েদের আত্ম বিক্রয় করতে দেখে তিনি বেদনায় কাতর হয়ে পড়তেন। মেয়েদের মধ্যে আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি, এবং তা একমাত্র পুরুষের জীবন সংগ্রামের ভার বহনে সমান অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়ে এগিয়ে আসাতেই লাভ হতে পারে। মেয়েরা কিছু বুঝে না, বুঝবে না। তারা কেবল আদরের পুতুল হয়ে

থাকুক, এমন জীবনকে তিনি ঘৃণা করতেন। রূপের ব্যবসায় করে, দেহের গঠন-গরিমা দিয়ে অথবা লালসা চরিতার্থ করবার ক্ষমতা দিয়ে যে নারী আপনার মর্যাদা লাভ করতে চায়, তাকে তিনি হতভাগিনী ও মূর্খ বলেই মনে করতেন। নারীর হাতে সত্যিকার এমন ক্ষমতা আছে, যার জন্য কারো কাছে তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দরকার করে না। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের মূল্য ভুলে গিয়েছিল। অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় ও প্রলোভনে পড়ে ভুল মূল্যবোধ তাদের পেয়ে বসেছিল। তাই বার্নার্ডশ বলতে পেরেছেন যে, Marriage has become a legalised prostitution. এমন কঠিন করে না বললেও গান্ধীজী মডার্ণ মেয়েদের মোহবোধ যে কত বড় দুর্বলতা ও অসহায়তা দিয়ে তৈরী, তা বুঝতে পেরেছিলেন। 'ডলস্ হাউস' থেকে গান্ধীজী ভারতের মেয়েদের রক্ষা করতে চেয়েছেন, যেমন চেয়েছিলেন দেহের উপজীবিকা থেকে রক্ষা করতে।

অথচ পুরুষের অনুকরণ করাকে নারীর আদর্শ বলে তিনি মনে করতেন না। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বটে, কিন্তু একই ধরণের কাজ ও রুচি দুজনের নয় ও দুজনের হতে পারে না, একজন আরেক জনের পরিপূরক। এ বিষয়ে তিনি ও টলস্টয় একমতাবলম্বী। শেখবের বিখ্যাত গল্প 'ডার্লিঙের' সমালোচনায় টলস্টয় গভীর যে মন্তব্য করেছিলেন, সেকথা স্মরণ করুন। শেখব নারীজাতিকে ঠাট্টা করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে তাদের স্বকীয়তা নেই তারা পুরুষের ছায়ামাত্র, স্বামী বদলের সাথে সাথে সেই মেয়েটির রুচিতেও যে কি ভীষণ পরিবর্তন দেখা দিত, সেই উপহাস টলস্টয় মানতেন না, তিনি দেখাতে চেষ্টা করলেন যে মেয়েদের মহিমা কোথায় এবং মেয়েদের সমান অধিকার হলেও, একই কাজ তাদের নয়। গান্ধীজীও তাই মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, মেয়েরা ঘরের দাসী নয়, সেখানে তারা মহারাণী, যেমন বাইরের সংগ্রামে প্রাধান্য হলো পুরুষের। তাই বলে কেউ কারো এলাকায় হাত দেবেই না, ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেণ্টে আবদ্ধ থাকবে, তা-ও নয়। হিটলার যেমন মেয়েদের রান্নাঘরেই থাকতে বলেছিলেন, তা-ও নয়। গুরুতর রাষ্ট্র সংকটের সময় মেয়েরাও পথে বেরিয়ে এসে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে, এই ছিল গান্ধীজীর শিক্ষা। রাশিয়ার মেয়েরা দেশরক্ষা করতে বন্দুক হাতেও নিয়েছিল। গান্ধীজী কাউকে বন্দুক হাতে নিতে বলেননি, মেয়েদেরও নয়। কিন্তু অহিংস সংগ্রামে মেয়েরা পুরুষের চেয়েও বেশী সক্ষম, এ দাবি তিনি করে গেছেন, তাছাড়া অহিংসার যোগ্যতা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, তিনি এমনি একটি অস্ত্র দিতে চান যা দুর্বলতম, দরিদ্রতম ব্যক্তিই শুধু নয়, এমনকি মেয়েরা ও শিশুরাও তা গ্রহণ করতে পারবে। তাই সত্যাগ্রহকে তিনি খুব সহজগ্রাহ্য অস্ত্র, most easily avnilable weapon বলে গেছেন। মদ্য বর্জন ও বিলিতী কাপড়ের দোকানে দোকানে পিকেটিং করাটাকে তিনি কেবলমাত্র মেয়েদের দিয়েই করাতে চেয়েছিলেন এবং করিয়েছেনও। মদ্যবর্জন আন্দোলনে মেয়েরা সবচেয়ে বেশী উৎসাহী হয়। কেন না, মদের অত্যাচার ঘরে ঘরে মেয়েদের যেমন ভুগতে হয়, এমন আর কারো নয়। ঘর-সংসার উচ্ছন্ন করার পথে মাতাল স্বামী, পিতা ও ভাইদের যত দায়িত্ব, এমন আর

কিছুতেই নেই, কি অসম্ভব অত্যাচার ও উৎপীড়ন মাতালের হাতে পেতে হয় মেয়েদের সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। মদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা তাই মেয়েদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, পুরুষের অনুকরণ করা অথবা পুরুষালী করে বেড়ানোর অর্থ কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা নয়, সেটা স্ত্রীস্বাধীনতার বিকার মাত্র। তাছাড়া আদর্শের দিক দিয়ে পুরুষেরাই বা কি আদর্শ দেখাচ্ছেন যে তাদের অনুসরণ করতে হবে? গান্ধীজী বলেছেন, "I believe in the proper education of women. But I do believe that women will not make their contribuition to the world by mimicking or running a race with men. Woman can run the race, but she will not rise to the great heights she is capable of by mimicking man. She has to be the complement of man." (Prabhu, page, 60)

আরো বলেছেন, "Man and woman are of equal in rank but they are peerless pair being supplementary to one another; each helps the other, so that without the one the existence of the other cannot be conceived, and, therefore, it follows as necessary corollary from these facts that anything that will impair the status of the either of them will involve the equal ruin of both. In framing any scheme of women's education this cardinal truth must be constantly kept in mind. Man is supreme in the outward activities of a married pair and, therefore, it is in the fitness of this that he should have a greater knowledge there of. On the other hand, home life is entirely the sphere of woman and, therefore, in domestic affairs, in upbringing and education of children, women ought to have more knowledge. Not that knowledge should be divided into watertight compartments,or that some branches of knowledge should be closed to anyone; but unless courses of instructions are based on a discriminating appreciation of these basic principles, the fullest life of man and woman cannot be developed."

(India of my dreams, Prabhu)

শ্রমজীবী মেয়েদের ও চাষী, ক্ষেতমজুর মেয়েদের তো ক্ষেতে, কারখানায়, বাইরে কাজ করতেই হয়, পুরুষের সঙ্গে সমানে। তাছাড়া আজকাল ভদ্রঘরের মধ্যবিত্ত মেয়েদেরও কাজ করতে হয় বাইরে। বাইরে কাজ করেন যেসব মেয়েরা, তাদেরও ঘরের কাজ আছে এবং সংসার করতে হয় তাদেরও। কাজেই গান্ধীজীর উপরোক্ত কথাটার স্পিরিট তাতে নষ্ট হয় না। যে কঠিন অর্থনৈতিক সংকটে আজ মেয়েদের ঘরের বাইরেই বেশীটা সময় কাটাতে হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একটু ভালো হলেই এই অবস্থার একটু পরিবর্তন হবে, এবং মেয়েদের স্বার্থে তাদের স্বস্থানে নিজেদের বিকাশ স্বাভাবিক হবে।

বর্তমানে বেশীরভাগ মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চলন নেই বলে মেয়েদের অধিকার কিছু খর্ব করে রাখতে হবে, গান্ধীজী এমন কথা স্বীকার করতেন না। অক্ষর পরিচয়টাকে গান্ধীজী কোনোও কালেই অতিরিক্ত মূল্য দেন নি। তিনি মনে করতেন, লেখাপড়া না জানা থাকলেও মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব ও জাগরণ বা আত্মচেতনার সৃষ্টি করা এবং এসবকে উন্নত করা সম্ভব। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকার লেখাপড়া দিয়ে সৃষ্টি হবে না, হবে নতুন মূল্যবোধ ও স্বাভাবিক অধিকার দিয়ে। তিনি বলেছেন, "Their first attempt should be diverted towards awakening in the minds of as many women as possible a proper sense of their present condition. I am not among those who believe that such an effort can be made through literary education only To work on that basis would be to postpone indefinitely accomplishment of our aim ; I have experienced at every step that it is not at all necessary to wait so long. We can bring home to our women the sad realities of their present condition without, in the first instance, giving them any literary education." কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলেছেন,—But, although such good and useful work can be done without a knowledge of reading and writing, yet it is my firm belief that you can not always do without a knowledge thereof. It develops and sharpens one's intellect and stimulates our power of doing good. I have never placed an unnecessarily high value of the knowledge of reading and writing. I am only attempttng to assign its proper place to it. I have pointed out from time to time that there is no justification for men to deprive women or to deny them equal rights on the ground of their illiteracy ; but education is essential for enabling women to uphold these natural rights, to improve them and to spread them ; again, the true knowledge of self is unattainable by the millions who are without such education." (India of My Dreams, Prabhu)

তিনি ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলাদা পাঠ্যসূচী দরকার বলে মনে করতেন, কিন্তু সেখানে পার্থক্য রাখার প্রয়োজন (সেগ্রিগেশন রাখার প্রয়োজন) আছে বলে মনে করতেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর 'টলস্টয় ফার্মে'ও' ছেলেমেয়েদের তিনি একত্র সহশিক্ষা বা কো-এডুকেশনের মধ্য দিয়ে তৈরী করতেন। ১৫।১৬ বছরের মেয়েদের সহশিক্ষা সম্পর্কে মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅভিনাশলিঙ্গমের বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হতে পেরে গান্ধীজী বলেছিলেন,

"If you keep co-education in your schools and not in your training schools, the children will think there is something wrong

somewhere. I should allow my children to run the risk. We shall have to rid ourselves oneday of this sex-mentality. We should not seek examples from the west, Even in training schools, if the teachers are intelligent, pure and filled with the spirit of Nai-Talim, there is no danger. Supposing if some accident takes place, we should not be frightened by them. They would take place anywhere. Although I speak this boldly I am not unaware of the attendant risk." (Harijan, 9. 11. 47)

ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম থেকেই সহজ ও সুন্দর ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠুক, একথা তিনি প্রচার করেছেন, মডার্ন-গার্লদের তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছেন, "But I have fear that the modern girl loves to be Juliet to half a dozen Romeos. She loves adventure. The modern girl dresses not to protect herself from wind, rain and sun but to attract attention. She improves upon nature by painting herself and looking extraordinary. The non-violent way is lost for such girls I have often remarked in these columns definite rules to govern the development of non-violent spirit in us. It is a strenuous effort. It makes a revolution in the way of thinking and living."

(Harijan, 23. 12.38)

কিভাবে মেয়েরা রাস্তাঘাটে বদমায়েশ ছেলেদের উৎপাতে পড়ে এবং তা থেকে কি করে তাদের রক্ষা করা যায়, কি করে ছাত্রজীবনে সংযম ও শালীনতা রক্ষা করা যায়, কিভাবে মেয়েদের আত্মরক্ষার উপায় বের করা যায়, তা নিয়ে তিনি জীবনভর ভেবেছেন উপায় বাৎলেছেন, সাহস যুগিয়েছেন মেয়েদের, আবার তাদের শাসনও করেছেন। শাসন করতে গিয়েই মডার্নগার্লদের উপরোক্ত দোষগুলো দেখিয়েছেন। তারাও ছেলেদের লুব্ধ করার চেষ্টা করে, একথাও গান্ধীজীর মতো তীক্ষ্ণধী লোকের চোখ এড়ায় নি। অতএব তিনি মেয়েদের অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে বলার সময় এ-ও দেখিয়েছেন যে এসব কেবল বিশেষ ঘটনার সম্মুখে বিশেষ ব্যবহার করা নয়, সমস্ত জীবনভঙ্গীতে রদবদল আনা দরকার। নিজেদের রুচিবোধ, আত্মবোধ, শালীনতাবোধ ও সংযম মানা দরকার। পোষাকে-আসাকে চলাফেরায় দীপ্তিমান সংযম আনা দরকার।

এখান থেকেই গান্ধীজীর জীবনের আর একটা প্রধান দিক ধরা পড়ে। সে হলো ব্রহ্মচর্য। তিনি মনে করেন, ব্রহ্মচর্য কমবেশী পালন করার আদর্শ যদি সমাজে চালু না থাকে, তবে নারী কখনও তার পূর্ণ মূল্য পাবে না। এবং কি ছেলে কি মেয়ে কেউ কারো সত্যিকার মর্যাদা দিতে পারবে না। এমন কি সত্যিকার প্রেম যাকে বলে, তা-ও কি জিনিষ, তা বুঝতে পারবে না। এসব কথা অবশ্য সবাই স্বীকার করবেন না, এবং এসব বিষয়ে গান্ধীজীর মতটা অত্যন্ত বেশী ধর্মপ্রবণতাপূর্ণ, যেজন্য তাঁকে

অনেকেই প্রাচীনপন্থী গোঁড়া বলে মনে করে। কিন্তু অত গোঁড়ামী স্বীকার না করলেও যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ স্বীকার করবেন যে নরনারীর সম্পর্ক যদি সত্যিই স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, তবে কতকটা সংযম থাকা চাই। এবং সংযম না থাকলে নারীর সত্যিকার গুণও মহিমাও কেউ ভোগ করতে পারে না, নারীরাও না, পুরুষেরাও নয়। যৌবনটা যদি একটা বল্গাহীন দেহবিকারে পরিণত হয়, তবে সেটা একটা ব্যাধিমাত্র, একটা দেহের যন্ত্রনা মাত্র। তাতে কোনই আনন্দ বা পূর্ণতা নেই। গান্ধীজী এসব বিষয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। অর্থাৎ জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই যাতে তাঁর সজাগ, সতর্ক ও চিন্তাশীল দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের জীবনকে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লক্ষ্য করেছেন, আশেপাশের নরনারীর জীবনও তিনি তেমনি বিচার বিশ্লেষণ করতেন। তিনি ৩৫ বছর বয়সে ব্রহ্মচর্য শুরু করেন, তার পূর্বে তিনি সাধারণ লোকেরই মতো জীবনযাপন করেছেন। এবং নিজের আকাঙ্ক্ষাপীড়িত জীবনের বিড়ম্বনা লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন যেদিন থেকে তিনি ব্রহ্মচর্য শুরু করলেন, সেদিন থেকে তিনি তাঁর দেহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর স্ত্রীর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা কী, তা প্রথম বুঝতে পারলেন। লোকে জানে গান্ধীজী ও কস্তুরবা গান্ধীর মধ্যে কি গভীর প্রীতি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কস্তুরবার মৃত্যুর পর কস্তুরবার স্মৃতিতে গান্ধীজী যা লিখেছেন, তাকে ভালোবাসার মহাকাব্য বলা যায়। তিনি বলেছেন, একটা বয়সের পর সবাইকেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, ভাই-বোনের মতো করে নেওয়া উচিত। তিনি প্রচার করতেন যে, একমাত্র সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন ছাড়া স্বামী-স্ত্রীতে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তিনি বলেছেন কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সমাজে অনাচার এমনভাবে বাড়িয়ে দেবে যে, যার বিষময় ফল নরনারীর সম্পর্কই নষ্ট করে দেবে, কৃত্রিমভাবে জন্ম নিরোধের বদলে সংযমের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ হাজারো গুণ ভালো, একথা তিনি বলেছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়তো বন্ধ হবে না, এটাই হয়তো চালু নিয়ম হবে। কিন্তু গান্ধীজীর শিক্ষার ফলে যদি নরনারীর জীবনে কিছুটা আত্মসংযমের প্রভাব পড়ে তবে সেটা কম কথা নয়, অর্থাৎ তারও ফল হবে। তিনি বলেছেন, মেয়েদের বিয়ের বয়স (এজ অব কনসেন্ট) ১৮ বছর রাখলে চলবে না, অন্তত ২১ বছর করা চাই।

শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষমাহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি তীব্রভাবে বলে গেছেন, "The man who marries a young girl does not do so out of any altruistic motives but through sheer lust. Who is to rescue these girls? A proper answer to this question will also be a solution of women's problem. The answer is albeit difficult, but it is only one. There is, of course, none to champion her cause but her husband. It is useless to expect a child-wife to be able to bring round the man who has married her. The difficult work must, therefore, for the present atleast be left to man. If I could,

I would take a census of child-wives and would find the friends ; and through moral and polite exhortation I would attempt to bring home to them the enormity of their crime in linking their fortunes with child-wives ; and I would warn them that there is no expiation for that sin unless and until they have by education made their wives fit, not only to bear children and but also bring them properly and unless in the meantime they live a life of absolute celibacy." (India of my dreams—Prabhu—pg. 65)

যারা দেশের কাজ করতে চায়, যারা রাজনীতি করতে চায়, তাদের জীবনে যদি সংযমের কোন বাঁধন না থাকে, অথবা তাদের যদি এই সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা বা আদর্শ না থাকে, তবে তাদের নিজেদের জীবনই জটিল হয়ে পড়ে। যার থেকে নিজেকে উদ্ধার করাই কঠিন হয়ে যায়, দেশের উদ্ধার তো তখন মাথায় ওঠে। গান্ধীজীর মতো কঠোর আদর্শ বা ষ্ট্রীক্‌ট্‌ প্রিন্সিপল না থাকলেও তাকে একটা স্থির নিয়ম বা ষ্ট্রীক্‌ট্‌ পলিসি মানতেই হবে, যদি দেশের কাজ করতে হয়। তা না হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একত্র সংগঠন করাও সম্ভব নয়, এবং নিজেদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সহজ সুন্দর পরিবেশ রক্ষা করাও সম্ভব নয়। গান্ধীজীর আশ্রমেও যে নানা জটিলতা আসতো না তা নয়। কিন্তু জটিলতা এড়াবার জন্য তাঁর আশ্রম কখনো নারীবর্জিত করতেন না তিনি, বরং ছেলে ও মেয়েতে আশ্রম ভরে রাখতেন, অথচ তারই মধ্যে দিয়ে সবাইকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যে তিনি তাতে হেরে যান নি, তা নয়। কিন্তু সাধারণভাবে সার্থকই হয়েছেন বলে বলা যায়। তথাপি তিনি বলেছেন, "Without continence a man or woman is undone. To have no control over the senses is like sailing in a rudderless ship bound to break into pieces on coming in contact with the first rock.

No worker who has not overcome lust can hope to render any genuine service to the cause of Harijans, communal unity, Khadi, cow protection or village reconstruction. Great causes like these can not be served by intellectual equipment alone, they call for spiritual effort or soul-force." (Harijan—2 11.36)

উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা অবশ্য তিনি গৃহস্থদের জন্য দেন নি। যারা দেশের কর্মী হতে চান, তাদের কঠিন ব্রত কি করে পালন করতে হবে, তাদের জন্যই তিনি একথা বলেছেন। অথচ কর্মীরা বিয়ে করবে না—এমন ধরণের মত তাঁর ছিল না। কর্মীরা বিয়ে করবে প্রয়োজন মতো। কিন্তু তবু তারা ব্রহ্মচর্য পালন করবে। বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য পালন করা যায়, একথা তিনি বলেছেন এবং তাতে বিবাহিত জীবন পণ্ড হয় না, সুন্দর হয়, সত্যিকার প্রেমসুন্দর হয়, এ দাবি তিনি করেছেন। এবং তিনি বার বার বলেছেন, সত্যিকার ভালোবাসার পথ ভিন্ন। ভালোবাসা কখনও

সুখে অন্ধ নয়। বরং তা দুঃখবরণ করেই আরোও মহান হয়। তিনি বলেছেন, undefiled love between husband and wife takes one nearer to God than anyother love." (Gandhi—To the students, page—305)

এসব কথা মানতে বলা হচ্ছে না, গান্ধীজী এসব বিশ্বাস করতেন ও জীবনে চর্চা করতেন, এ জানানোর জন্যই এসব বলা হচ্ছে। একথা জেনে রাখা ভালো যে গান্ধীজীকে মেয়েরা এতো ভালোবাসতো, যার তুলনা হয় না। তিনি সর্বদাই মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন বলা যায়। এ নিয়ে তাঁকে অনেক ঠাট্টা, নিন্দাও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তা কখনও ভ্রূক্ষেপ করেন নি। মেয়েরা তাঁর কাছে কোন লজ্জা অনুভব করতো না। অনেক মেয়ে তাদের জীবনের গভীরতম সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর কাছে অবাধে উপদেশ নিতো। পুরুষেরাও নিয়ে থাকতো। নির্মলবাবু তাঁর 'লাষ্ট ডেজ উইথ গান্ধী' বইতে গান্ধীজীর এইসব গবেষণার অনেক তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গান্ধীজীর চরিত্রের একটা দিক ঠিক মেয়েদের মতো এবং তিনি সজ্ঞানে সাধনার দ্বারা তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাতনী শ্রীমতী মানু গান্ধী তো একখানা বইও লিখেছেন "Bapu my mother" 'বাপু, মাই মাদার' বলে।

'This was Bapu' নামক বইতে শ্রীপ্রভু তাঁর womanliness সম্বন্ধে লিখেছেন, Many who came in intimate contact with Gandhiji noticed that he was more womanly than most woman they came across. Tribute to this unique trait in him has been borne by both Mr. and Mrs. H. S. L. Polak

Mr. Polak has remarked, "Gandhi has proved beyond dispute the theory that the best man and best woman combine in them the best qualities of each other. No woman could excel him in patience and endurance, none could be more long-suffering."

Mrs Polak has said, "Mahatma Gandhi has been given the love of many women for his womanliness. I often see in imagination Mahatmaji as I frequently saw him in South Africa walking up and down a room with a young child in his arms, soothing it in the almost unconscious way a woman does, and at the same time, discussing with the utmost clearness, pressing political questions" (This was Bapu—Prabhu, page—30)

বলা বাহুল্য এই শ্রী ও শ্রীমতী পোলাক গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সাধনার সহযোগী, যাঁরা দীর্ঘকাল গান্ধীজীর সাথে একত্রে থেকেছেন, একত্রে কাজ করেছেন।

এ থেকেই বোঝা যায় এই বিচিত্র লোকটির দৃষ্টিভঙ্গী কত অদ্ভুত ছিল। তিনি আবেগচালিত (পেসনেটলি) হয়ে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে গবেষণা করে গেছেন। কেননা, তিনি জানতেন যে ব্রহ্মচর্য পালন করা কত কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

কাজেই তিনি জানতেন যে যদি তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করার জন্য অপেক্ষাকৃত কোন সহজ উপায় না দিয়ে যেতে পারেন, তবে তাঁর ব্রহ্মচর্য পালনের কথা কেউ শুনবে না। তাই ভিতরে ভিতরে তিনি এই নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন এবং তার উপায় বের করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেওছেন, "Some of my experiments (in Brahamacharya—Pl. D. G.) have not reached a stage when they might be placed before the public with advantage. I hope to do so someday if they succeed to my satisfaction. Success might make the attainment of brahamacharya comparatively easier."

(Key to health—page—45)

দুঃখের বিষয় গান্ধীজীর এ সম্বন্ধে কোনোও শেষ কথা বলে যাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের স্পিরিটটাও যদি দেশ বুঝে থাকে তাতেও দেশের পক্ষে অনেকটা সংযম রক্ষা হবে, মত্ততা ও উশৃংখলতার রাজ্য কায়েম হবে না এবং নারী-জাতির মূল্য, নিজ মূল্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ধারণার পক্ষপাতী লোক আজকাল পাওয়া সম্ভব নয়, বলা যায়। তাঁর এ সম্পর্কে যে কঠোর মত, তা কেউ মানতে পারবে না, পারা কঠিন। তাছাড়া মানুষের জীবনে যৌনপ্রবৃত্তিকে আজ মনোবিজ্ঞানীর একদল এতো বড় করে স্থান দিয়েছেন যে এই জাতীয় কথা কেউ আলোচনা করতেও রাজী নয়। অনেকে তো মনোবিজ্ঞানটাকেই যৌনবিজ্ঞানে পরিণত করতে প্রস্তুত! অর্থাৎ সবকিছু এই প্রবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে চায়। ফ্রয়েডবাদীরা বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারের একটা যৌনমূলক ব্যাখ্যা করতে চান। এটাও একটা একপেশে ঝোঁক। মজাটা হচ্ছে এই, এই পৃথিবীতে যখন কেউ কিছু একটা আবিষ্কার করেন তখন তাঁর সেই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই সমস্ত জাগতিক ঘটনা বুঝতে চায়।

একটা জিনিষ এখানে বলে রাখা দরকার যে গান্ধীজীর এই জাতীয় মনোভাব থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে গান্ধীজী অত্যন্ত নিরস ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বুঝি মানুষের জীবন নিরানন্দ ও প্রাণহীন ধর্মচর্চা দিয়ে ভরে রাখতে চেষ্টা করতেন। মানুষ গান্ধীটি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিলেন। তিনি প্রফুল্লতার ও অনাবিল রসিকতার মস্তবড় আর্টিষ্ট বা শিল্পী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরুর কথাই তুলে দিচ্ছি। কারণ তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন তাঁদের সাক্ষ্যটাই প্রধান কথা। আত্মজীবনীতে লিখেছেন নেহেরু, "Gandhiji once told an interviewer that if he had not the of humour he might have committed suicide, or something to this effect" (Autobiography, page—207)

"People who do not know Gandhiji personally and have only read his writings, are apt to think that he is priestly type, extremely puritanical, long-faced, calvinistic, and a kill joy, something like the "Priests in black gowns walking their rounds." But his writing do

him injustice ; he is far greater than what he writes, and it is not quite fair to quote what he has written and criticise it. He is the very opposite of the calvinistic priestly type. His smile is delightful, his laughter infectious, and he radiates light-heartedness. There is something childlike about him which is full of charm. When he enters a room he brings a breath of fresh air with him which lightens the atmosphere. He is an extraordinary paradox." (Ibid, page, 515)

তাঁর জীবনের অন্যান্য paradox সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করবো। উপস্থিত তাঁর চিত্তের যে পরিচয় তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্যের মুখ থেকে শোনা গেলো, এটাই তাঁর সত্যিকার পরিচয়। এই পরিচয় সবাই পেয়েছে কমবেশী যে বা যারাই তাঁর সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর সকল ধর্মের চেয়ে বড় ধর্ম। সেই ভালোসারই একটা বাস্তব রূপ হলো, তাঁর এই প্রাণখোলা শিশুর মত হাসি, বেদনাহত প্রাণে দুঃখক্লান্ত জীবনে শান্তি ও খুসীর আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষমতা। তাঁর চরিত্রের এই চার্ম বা আকর্ষণ, তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা প্রধান দিক। ব্রহ্মচারী বাবার মতো মুখ ভার করা, জগতের শিক্ষাগুরুর মতো গম্ভীরমুখো গুরুমশাই তিনি নন। ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়েও তাঁর হাসিতামাশা করার মতো শক্তি ছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধি ঝলমল করে উঠতো তাঁর কথাবার্তায়। গুমোট আবহাওয়া তাঁর স্পর্শে মুহূর্তে দূর হয়ে যেতো।

গান্ধীজী ও ব্যক্তি

জওহরলাল বলেছেন যে, "He (Gandhiji) is far greater than what he writes, এটাই হলো একটি পরম সত্য কথা, গান্ধীজী সম্পর্কে। গান্ধীজী কি লিখে গেছেন, কি বলেছেন, তাঁর সেই সব মতামত সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন অনেক আপত্তি অনেক দিক থেকেই উঠবে। এযাবৎ আমরা তাঁর লেখা তুলে তুলেই তাঁর বিচার করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে একটা বিরাট ত্রুটি থেকে গেছে, কেন না তাঁর জীবন তাঁর কথার চেয়েও ঢের বেশী মহীয়ান। জগতে এমন এমন লোক আসেন যাঁদের জীবন তাঁদের বাণীর চেয়েও ঢের বেশী আকর্ষণীয়। গান্ধীজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। তাঁর বহু কথা, বহু মতামতে অতীতে বহু লোকে বিস্তর বাধা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে, কিন্তু তিনি এমন একখানা জীবন তৈরী করেছিলেন, যার ব্যক্তিগত প্রভাব অতি বড় সমালোচক ও নিন্দুককেও চুপ করিয়ে দিতো। আজ এই যুগে তিনি যখন নেই, তখন তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির যে প্রভাব, তাও নেই। যাঁরা সে প্রভাব জীবনে প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছেন তাঁরাও একদিন আর থাকবেন না, তখন এই মানুষটির অপূর্ব ব্যক্তিত্বের সাক্ষী দিতেও কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁরা এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা পড়া ছাড়া পরবর্তী যুগের লোকেরা আর বেশী কিছু বুঝতে পারবে না।

কিন্তু এখানে তত্ত্ব বা theory হিসাবে যে গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, তারই আলোচনা আমরা কেবল (একমাত্র) করতে পারি। সে হলো ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা। তিনি মতবাদের চেয়েও জীবনযাপন প্রণালীটার ওপরই বেশী জোর দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তাঁর কথাগুলিকে তিনি সবচেয়ে বড় মূল্য দেন নি, তাঁর জীবনটাকেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণী হিসেবে বলতে চেয়েছেন। কথার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক রক্ষা করা, অর্থাৎ যে কথা সেই কাজ, শুধু এটুকুই নয়, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে নিজের ব্যক্তি-জীবনটা মানুষ কি ভাবে দেখলো, গড়লো, তারই সাধনায় যে ছবি সেটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণী, যেন সমস্ত জীবনটাকে দিয়েই জীবনের বাণীটি ফুটিয়ে তোলাই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

যাঁরা তাঁর বই পড়ে, লেখা পড়ে তাঁকে বুঝতে চেয়েছেন, তাঁদের তিনি বলেছেন, "You must watch my life, how I live, eat, sit, talk and in general. The sum total of all those in me is my religion. (Tandulkar, Mahatma Vol. VII. page 264)

অধ্যাপক নির্মল বসু বহুকাল থেকে গান্ধীবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা ও লেখালেখি করতে চাইলে গান্ধীজী বললেন যে, "না তা হবে না, তোমাকে আমার জীবনটা

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লক্ষ্য করতে হবে, তবেই তুমি আমার মতামত ও বাণী কি তা বুঝতে পারবে।" তাই তাঁকে নিয়ে তিনি নোয়াখালিতে গেলেন। তাঁর সমস্ত জীবনযাত্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে, কথা কয়টি থেকে নয়। সাধারণতঃ দেশনায়ক, ধর্মনায়কেরা ব্যক্তিগত জীবনটিকে আড়াল করে রাখেন জনতার দৃষ্টি থেকে, কিন্তু গান্ধীজীর সে ভয় নেই। তিনি সর্বদাই একটা হাটের মধ্যে বাস করতেন, সবাই দেখুক, সবাই বুঝুক তাঁকে, এই তাঁর ইচ্ছা, সবাই সমালোচনা করুক, ভালো বলুক, মন্দ বলুক, তাতে তাঁর কোন ভয় বা সংকোচ নেই, তিনি জানতেন মুখের কথার সঙ্গে বাস্তবজীবনের যে পার্থক্য, তারই ছিদ্র দিয়ে নানা দুর্বলতা আসে কর্মীর জীবনে। তাই তিনি তাঁর জীবনটাকে একটা খোলা পুস্তক হিসেবে সবার কাছে ধরে রাখতেন। তাঁর মুখের কথা লোকে লিখুক, এই তাঁর কথা নয়, তাঁর জীবন থেকে শিখুক, দেখুক জীবনটাকে কি করে এক ক্লান্তিহীন বিরামবিহীন সাধনায় ভরে তোলা যায়। জীবনে তাই তাঁর কোন গোপনীয়তার অবকাশ ছিল না। তাঁর যাবতীয় শিক্ষা, যাবতীয় মতবাদ, যাবতীয় বাণী প্রয়োগ করার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হলো তাঁর নিজের জীবন, সেই জীবনের ফলন থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু, দেশশুদ্ধ লোককে তৈরী করার আগে নিজেকে তৈরী করা হলো তাঁর ধর্ম, নিজের জীবনটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রচারের একটি অদম্য নীরব শক্তি। "World fellowship of all faiths" তাঁর কাছে একবার একটি বাণী চেয়ে পাঠায়। গান্ধীজী উত্তরে শুধু এইটুকুই লিখে পাঠান—"What message can I send through pen, if I am not sending any through the life I am living ?"……… এখানেও সেই একই কথা যে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী, এছাড়া তাঁর আর অন্য কোন বাণী নেই। বরং আমরা পরে দেখাবো কিভাবে তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে সাবধান করে গেছেন যেন তারা তাঁর মৃত্যুর পরে গান্ধীবাদী বলে কোন sect বা সম্প্রদায় না তৈরী করেন, তাঁর লেখা নিয়ে বিতণ্ডা না ওঠান। তিনি যা করেছেন এবং করতে চেষ্টা করেছেন, তারই মূল্যামূল্য বিচার চলবে হয়তো, তিনি এমন আশা করেন, কিন্তু তাঁর মতামত নিয়ে দল উপদল সৃষ্টি করতে তিনি বারণ করে গেছেন। সেকথা পরে হবে।

কোনো লোকের বিচার তিনি তাই তার কথা দিয়ে করতেন না, করতেন সেই ব্যক্তির কাজ ও তার জীবনটাকে দিয়ে। ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর এই যে এত জোর, এ হলো গান্ধীজীর একটা প্রধান বিষয়। ব্যক্তিজীবন, তাঁর মতে, এতো উৎকর্ষ লাভ করতে পারে যে, একজন ব্যক্তি, সে সমাজে ধনীই হোক, আর জমিদারই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, যদি সে সত্যি মানুষ হয়। যদি তা হয় তবে সে তার ধনটাকে নিজের ধন বলে কখনোই মনে করবে না, করবে ট্রাস্টি বা অছি হিসেবে মাত্র। তাঁর অছিবাদও এই ব্যক্তির আদর্শবাদ থেকে এসেছে। আমরা এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখানে কেবল এটুকুই খেয়াল করা দরকার যে ব্যক্তির জীবনের উপরে এইযে এত জোর, এরই জন্য তিনি সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এসব কথার উপর এতো জোর না দিয়ে ব্যক্তির আদর্শবোধ ও আদর্শজীবনের উপরে এতো জোর দিয়েছিলেন। ফলে অনেক-ক্ষেত্রে তিনি সমাজব্যবস্থার উপর ততটা নজর ও গুরুত্ব দেন নি, এর ফলে তাঁর মতবাদ

দুর্বল থেকে গেছে। ব্যক্তিরা যদি সবাই আদর্শ মানুষ হয়, তবে সমাজব্যবস্থা যাই থাকুক, কিছু আসে যায় না, এমন ধরণের একটা অর্থ তাঁর কথাবার্তা থেকে অনেক সময় বোঝা যেতো। এখানেই মার্কস্‌বাদীদের সাথে তাঁর প্রধান বিরোধ। মার্কস্‌বাদীরা বলবে, সমাজব্যবস্থা ভালো না হলে মানুষ তার আদর্শ রক্ষা করতে পারে না, মানুষকে ভালো করতে হলে সমাজব্যবস্থাকে আগে ভালো করতে হবে। আর গান্ধীবাদীরা বলবে, আগে মানুষ ভালো না হলে আদর্শ সমাজব্যবস্থা তৈরী হতে পারে না, কাজেই আগে আমাদের মানুষ হতে হবে, মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হবে। এখানে ঐতিহাসিক তর্ক এসে গেলো, কারণ এই তর্ক অনেকদিনের, আদর্শবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের তর্ক। কাজেই আমরা এই তর্কের মধ্যে যাওয়া দরকার বলে মনে করি না। কেননা এটা একটা প্রচলিত তর্ক, সবারই জানা।

আমাদের কাজ হলো গান্ধীজীকে বোঝবার চেষ্টা করা, তাঁর মতবাদ নিয়ে লড়াই করা নয়। গান্ধীজী নিজেও তার্কিক ছিলেন না, তর্ক তিনি এড়িয়ে যেতেন, তিনি পাণ্ডিত্য পছন্দ করতেন না। কোন তার্কিক উপস্থিত হলে তাকে ফিরিয়ে দিতেন বা এড়িয়ে যেতেন। তার পরিবর্তে তিনি তাঁর কাজ, নানা সংগ্রাম দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন। যদি তাঁর সমগ্র জীবন ও কার্যাবলীর বিচার করা যায়, তবে একথাও বুঝতে কঠিন হবে না যে তাঁর মতবাদ যাই থাকুক, তা যে ভাবেই যেখানে প্রকাশ পাক, তিনিও একথা বুঝতেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার, নইলে মানুষ বড় হতে পারে না, হিন্দুসমাজ থেকে অচ্ছুতপ্রথা দূর করা দরকার, শ্রেণীহীনসমাজ সৃষ্টি করা দরকার, অছিপ্রথা চিরকাল রাখবার জিনিষ নয়, একটা transitory ব্যবস্থা হিসেবেই সাময়িক প্রয়োগ আছে তার, ইংরেজকে এদেশ ত্যাগ করানো দরকার, অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দরকার। তার মানে এই, কার্যতঃ মহাত্মা গান্ধীও সমাজের পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যই জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। তবু তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে এটাই প্রধান ছিল যে, ব্যবস্থার চেয়ে মানুষের উপরে তাঁর নজর দিতে হবে। প্রথমজীবনে তিনি ব্রিটিশসাম্রাজ্যের উপরেও বিশ্বাস রাখতেন, অর্থাৎ মনে করতেন ব্রিটিশ সংবিধান যদি ঠিক ঠিক চলে, ইংরেজরা যদি দায়িত্বশীল হয়, ভারতীয়েরা যদি মানুষ হয়, তবে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেও ভারতের মুক্তি আছে, ইত্যাদি। অতএব এখানেও বুঝতে পারি তিনি কি করে জিনিষটাকে বুঝতে চাইতেন। এ হলো তাঁর প্রথম জীবনের কথা। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর এই চৈতন্য হলো যে, না, সমস্তটাই পালটানো দরকার, ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলে চলবে না ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, শ্রেণীহীন সমাজ চাই, একথা বুঝতেও তাঁর অসুবিধা হয় নি। নিজেকে সমাজতন্ত্রী, এমন কি সাম্যবাদী বলতেও কুণ্ঠা হয় নি। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা মনে রাখতে হবে, তাঁর সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেও ধারণা কিছুটা অদ্ভুত, অর্থাৎ তা-ও তাঁর ব্যক্তি দিয়ে শুরু। To start with individual-with himself or oneself first এই হলো তাঁর কাজের ও চিন্তার ধারা। সমাজতন্ত্রী হবে, সাম্যবাদী হবে, বেশ, নিজেকে দিয়ে শুরু করো, begin with yourself-এই হলো তাঁর মন্ত্র। ব্যক্তিগত জীবনে লুম্পেনের (lumpen) মতো থাকবে অথচ মতামতগুলি

তোমার হবে চমকপ্রদ এমনটি চলবে না। দেখি তোমার চেহারাটা, তোমার চলাফেরাটা, দেখি তোমার জীবনযাত্রা ইত্যাদি, এমনি হলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। কোনো মহান আদর্শ, কোনো মস্তকাজ শুরু করতে হলেই তিনি নিজেকে দিয়ে প্রথমে শুরু করবেন, "I will not wait till I have converted the whole society to my view, but will straight away makc a beginning with myself. It goes without saying that I can not hope to bring about the economic equality of my conception, if I am the owner of fifty motor cars or even ten bighas of land. For that I have to reduce myself to the level of the poorest of the poor. That is what I have been trying to do for the last fifty years or more, and so I claim to be a foremost communist, although I make use of cars and other facilities offered to me by the rich. They have no hold on me and I can shed them at a moment's notice, if the interests of the masses demand it." (Mahatma Vol VII pg. 54)

এই নিজেকে নিয়ে শুরু, নিজেকে দিয়ে বিচার, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি সমাজতন্ত্রকেও বিচার করেছেন। তাই তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণা মার্কসবাদী নয়, যদিও তা সমাজতন্ত্র। কেননা মার্কসবাদীর সমাজতন্ত্রের বিচার সমাজ দিয়েই শুরু, অর্থাৎ বিচার ভঙ্গীটা আলাদা, লক্ষ্যবস্তুটি এক হলেও। তিনি বলেছেন, "Socialism begins with the first convert, if there is one such, you can add zero to one and first zero will count for ten and every addition will count for ten times the previous number. If, however, the beginning is a zero, in other words, no one makes the beginning, multiplicity of zeros will also prove zero value. Time and paper occupied in writing zeros will be so much waste." (Harijan 6-7-'47)

গান্ধীজীর এই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা আসলে ব্যাখ্যা নয়, সমাজতন্ত্র কী এতে সেকথা নেই, কিন্তু সমাজতন্ত্র আনতে হলে কি ধরণের কাজ ও কি ধরণের কর্মী চাই, তারই ইঙ্গিত আছে এতে। ব্যবহারিক রাজনীতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা যদি আজকের মার্কসবাদীরাও গ্রহণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁদের উপকার হবে। কেন না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে কত শূন্যের পর শূন্যই না জমা হচ্ছে আমাদের খাতায়, কিন্তু তার মূল্য বাড়ছে না এতটুকু, সবটাই ফাঁকা আওয়াজ ও হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ? যে আন্তরিকতা দিয়ে করতে হবে শুরু, যে আন্তরিকতা দিয়ে কর্মীকে নিজের জীবনেই তা প্রকাশ করতে হবে, সেটার উপর নজর না দেবার দরুণ অজস্র জঞ্জালের স্তূপকে মনে করছি শক্তি, আসলে ও কার্যকালে তাতে সংগ্রাম-সমুদ্রে নামাও সম্ভব হচ্ছে না। মতবাদ হিসেবে অবস্থা আগে, না ব্যক্তি আগে, এই নিয়ে তর্ক আছে এবং

সে তর্কে মার্কসবাদীরই জয় হবে, কিন্তু সমাজবিপ্লবের যুগে ব্যক্তির স্থানটাকেও ছোট করে দেখবার ভুল অনেক বিপদ ডেকে আনে। অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য যে শক্তির দরকার, তা তো আনতে হবে বিপ্লবীদের চেষ্টা থেকেই, অতএব সেই ব্যক্তিগুলির ক্ষমতা, আন্তরিকতা, যোগ্যতা ইত্যাদি গুণ তো থাকা চাই-ই চাই! নিজেদের জীবনকে সংশোধন করার দরকার নেই, সমাজের সংশোধন করতে পারলেই নিজেদের জীবন সংশোধন হবে, এমনি ধরণের সুবিধাবাদ এতো বেশী আজ চালু রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মহলে, যার ফলে তারা এদেশে পাত্তা করে উঠতে পারছে না। তারা যদি আজ গান্ধীজীর এই ঝোঁকটা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেন, তবে ভালো বই মন্দ হবে না। তাতে তত্ত্ব হিসেবে গান্ধীবাদ গ্রহণ করাও হবে বলে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। গান্ধীবাদকে বর্জন করার নামে এই বিরাট কথাটাকে ত্যাগ করা আত্মঘাতী নীতি হবে মাত্র।

গান্ধীজী বলেছেন, "Socialism is a beautiful word and so far as I am aware, in socialism all the members of society are equal, none low, none high. In the individual body, the head is not high because it is the top of the body, nor are the soles of the feet low because they touch the earth Even as members of the individual body are equal; so are the members of the society. This is Socialism.

In order to reach this state we may not look on things philosophically and say that we need not make a move until all are converted to socialism. Without changing our life we may go on giving addresses, forming parties and hawk-like seize the game when it is in our way. This is no socialism. The more we treat it as a game to be seized, the farther it must recede from us."

(Harijan 13. 7, 47)

সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রথম অনুচ্ছেদে যা আছে, তাতে যত আপত্তিই থাকুক, দ্বিতীয় প্যারায় যা আছে, সে সম্বন্ধে সব বামপন্থীরা যদি একটু ভাবেন, তবে অনেক মঙ্গল হবার কথা। যে কোন রকমে হোক, কতগুলি লোক সংগ্রহ করে ক্ষমতা দখলের যে সোজা অভিযান, তা যে কেন বার বার ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ আছে এখানে। গান্ধীজী ঠিকই বলেছেন, এই সমাজতন্ত্রকে লুটে নেবার মতো বস্তু মনে করা ভুল, এর ভিতরে একটা সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, যা অর্জন করতে হলে কর্মীদের নিজেদের জীবনে সেই মহান আদর্শ কায়েম করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বহন করবার ক্ষমতা যাদের নেই তারা সমাজতন্ত্র আনবে বা ক্ষমতা দখল করবে, এ স্বপ্ন মাত্র, মরীচিকা মাত্র।

যাক্, গান্ধীজী নিজেকে দিয়েই শুরু করতেন। প্রত্যেক সংগ্রামে তিনি সবার

আগে যেতেন। প্রত্যেক কথা তিনি নিজের জীবনে আগে প্রয়োগ করতেন, পরে অন্যকে বলতেন অনুসরণ করতে। অনেকবার তিনি মৃত্যুর সঙ্গে একা লড়তে গেছেন, প্রাণঘাতী প্রয়োপবেশনের মধ্য দিয়ে। অন্যত্র সৈন্যরা আগে যায়, এখানে সেনাপতি এসেছেন সবার আগে রণক্ষেত্রে। সমস্ত সত্যাগ্রহ লড়াইটাই এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী বলেছেন, "It has been my practice ever since my childhood, to begin with myself and my immediate environment in however humble a way." (Harijan, 25. 8. 46)

তিনি অন্যত্র বলেছেন, "Propagation of truth and non-violence can be done less by books than by actual living on those principles. Life truly lived is more than books."

(Tandulkar, Mahatma Vol IV, page. 112)

মুখের বক্তৃতা, ভারি ভারি বই নয়, প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবন, এটাই হলো প্রচারেরও বৃহত্তম শক্তি। তিনি নিজেই বলেছেন, "Prophets speak not through the tongue but through their lives." ১৯১৮ সালে গান্ধীজী বোম্বাইয়ের 'ভগিনী সমাজে' বলেছেন—"when printing presses were non-existent and scope for speech-making was very limited, when one could hardly travel twenty four miles in the course of a day instead of a thousand miles as now, we had only one agency of propagating our ideas, and that was our acts, and acts have immense potency. We are now rushing to and fro with velocity of air, delivering speeches, writing newspaper articles, and yet we are far from our goal and a cry of despair fills the air. I, for one, am of opinion that as in old days, our acts will have a more powerful influence of the public than any number of speeches and writing. It is my earnest prayer to your Association that its members should give prominence to quiet and unobtrusive work in whatever they do."

(Gandhi, Bhagini Samaj. 1918)

ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর ও ব্যবহারের উপর গান্ধীজী যে এতো জোর দিয়েছেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। সমাজের পরিবর্তন ও সংশোধন কার্যে ব্যক্তিসমূহের চেষ্টার পিছনে যে চরিত্রবল দরকার, তার উপরই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনটা যাই হোক, তার কথাগুলি চটকদার হলেই হলো, এমন ধরণের হালকা হুজুগকে তিনি পছন্দ করতেন না। এবং যারাই কোন না কোন সত্যিকার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারাই জানেন কার্যক্ষেত্রে গান্ধীজীর এইযে ব্যক্তির কাছ থেকে তার ব্যবহারের শুদ্ধতা নিয়ে দাবি, তা কখনোই বাড়াবাড়ি নয়। বস্তুতঃ এ না হলে কোন সত্যিকার কাজ করাই সম্ভব হয় না।

কোন কোন সুবিধাবাদী লেখকেরা এমন ধরণের যুক্তির অবতারণা করতে চেয়েছেন

যে গান্ধীজী ছিলেন ব্যক্তিবাদী। গান্ধীজী ব্যক্তি-চরিত্রের উপর জোর দিয়েছেন, তার মানে কিন্তু তিনি কখনোই ব্যক্তিবাদ প্রচার করেন নি, এবং নিজেও কখনো ব্যক্তিবাদী ছিলেন না। অনেক বুর্জোয়া চিন্তানায়ক আছেন যারা বলতে চান সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্ব খর্ব হবে, এইজন্যই সমাজতন্ত্র গ্রহণ করা যায় না। তাঁরা হলেন ব্যক্তিবাদী। তারা সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকে বড় করে দেখেন, সমাজ আছে ব্যক্তির জন্য, এমনি হলো তাদেরই দাবি। কিন্তু গান্ধীজী প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যে সমালোচনা তা ব্যক্তিবাদ থেকে মোটেই আসে নি। তাঁর আপত্তি আছে সমাজতন্ত্র আনয়নের পদ্ধতি নিয়ে, যেখানে সমাজতান্ত্রিকরা হিংস্র পন্থায় বিপ্লব আনতে চায় সেখানে, আর যেখানে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির পরিণাম হিসেবে কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা আছে সেখানে। এই কেন্দ্রীকরণ ব্যক্তিবাদী আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে চরম মূর্তি নেয় নি কি? কেন্দ্রীকরণের ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে যৎসামান্যই আছে। সে যাই হোক, ব্যক্তিবাদের প্রেরণায় গান্ধীজী কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করেন নি। আসলে গান্ধীজী ব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতেন না।

কেন না, তাঁর জীবনের স্বপ্নটা কি সেটা একবার স্মরণ করুন। নিজেকে শূন্য করে দেওয়া, এই হলো তাঁর সাধনা। নিজেকে শূন্য করতে পারলেই তাঁর সত্য বা ভগবান প্রকাশিত হতে পারেন, এই হলো যাঁর ধারণা তাঁর পক্ষে কখনো ব্যক্তিবাদ প্রচার করা সম্ভব? ঠিক তার উল্টো, তিনি ব্যক্তির কোন স্থান দেন নাই, এই আপত্তিই বরং করা চলে। আমরা পুস্তকের প্রথম দিকেই দেখিয়েছি যে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে শূন্য করার সাধনা সম্বন্ধে কি লিখেছেন। ভগবানকে পাওয়া যাঁর জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য এবং নিজের ব্যক্তিগত মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পারলে সে নির্মল সত্যের অথবা ভগবানের বিকাশ সম্ভব নয়, impersonal truth of objective reality-কে পাওয়া যাঁর কাছে বড় কথা, তাঁর কাছে ব্যক্তিবাদ, অথবা ব্যক্তির সম্পত্তি, ব্যক্তির মান, ব্যক্তির মোহ, ব্যক্তির ভোগ, এসব কিছুরই অর্থ হয় না। তিনি মীরা বেনকে দিনরাত এই সাধনা করতে বলেছেন যে, তুমি চেষ্টা করো যে তোমার আমিটা শূন্য, আমিটা আমাদের ধোঁকা মাত্র। তিনি মীরাকে নোয়াখালি থেকে লিখছেন, Do not even worry how I am faring, or what I am doing here. If I succeed in empting myself utterly, God will possess me. Then I know that everything will come true, but it is a serious question when I shall have reduced myself to zero. Think of "I" and "O" in juxtaposition and you have the whole problem of life in two signs."

(Letters to a disciple, 4. 1. 47. Noakhali)

গীতার অপরিগ্রহবাদ থেকে, ধনসম্পত্তি থেকে মুক্তি হলো নিজেকে শূন্য করার একটা প্রাথমিক সোপান মাত্র। ধীরে ধীরে তাকে নিজের আমিত্বটাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। তখনই একমাত্র "সর্বধর্মানি পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ"—কথাটি আসে। নিরন্তর নিজেকে শূন্য করার এই সাধনা ভারতীয় ধর্মের একটা প্রধান

বৈশিষ্ট্য, গান্ধীজী তা সর্বপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব ব্যক্তিবাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই গান্ধীজীকে যারা individualism বা ব্যক্তিবাদের দলে টানতে চান, তারা অত্যন্ত ভুল করেন। এইভাবে গান্ধীজীকে বুর্জোয়া মতবাদের সাহায্যে লাগানোর চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু সেটা অপচেষ্টা মাত্র।

বিকেন্দ্রীকরণ ও কুটিরশিল্পে গান্ধীজীর যে বিশ্বাস ও আগ্রহ তার মূলেও ব্যক্তিবাদী প্রেরণা নেই। মানুষকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন রাখা দরকার, একথা গান্ধীজী বলেছেন বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য ব্যক্তিবাদ থেকে নয়, বা কোন প্রকার স্বার্থপরতার ও কূপমণ্ডূকতার আবরণ তৈরী করার উদ্দেশ্য থেকে নয়। সেই নিজেকে শূন্য করার সাধনাতেও এই ধরণের সমাজব্যবস্থাই সহায়ক হবে মনে করেই তিনি একথা বলেছেন। নিজেকে শূন্য করার অর্থ নিজেকে দাস করে ফেলা নয়, বা কোন সমাজব্যবস্থার অন্ধ যাঁতাকলে নিজের চেতনা, বিবেক ও বুদ্ধিকে খুইয়ে বসা নয়।

"Employing one's self আর to make one's self slave to all sorts of power and passion—দুটো আলাদা মনোভাব। তিনি বলেছেন—"Let us not also forget that it is man's social nature which distinguish him from the brute. *If it is his privilege to be independent, it is his duty to be interdependent.* Ony an arrogant man will claim to be independent of everybody else and be self-contained," (Mahatma Vol. II, page 476) তিনি বলেছেন, "Only a Robinson Crusoe can afford to be self-sufficient. Individual liberty and interdependance are both essential for life in society."

(Ibid. Vol. VII, page, 40)

এছাড়া আমরা পূর্বেও দেখিয়েছি যে তাঁর স্বদেশী ও স্বরাজ কথাটার মানে কি? তার অর্থ কূপমণ্ডূকতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা নয়, পৃথিবীর সমাজটার এমনিভাবে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত বিভাগ তিনি চেয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলেছেন, ব্যক্তি সমাজের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে। একটি গ্রাম সমগ্র এলাকার প্রয়োজনে আত্মত্যাগের জন্য তৈরী থাকবে, একটি প্রদেশ সমগ্র দেশের জন্য, একটি দেশ সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবলিদান করতে প্রস্তুত থাকবে। কাজেই এখানে ব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা, এমন কি দেশকেন্দ্রীকতারও ঠাঁই নেই। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যবহারেও তিনি সর্বদাই অন্যাকে সাহায্য করার জন্য ব্যগ্র এবং অন্যের সাহায্য নিতেও তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সেবার জন্য তাঁর আশেপাশে একগাদা লোক থাকায় তাঁর কোন আপত্তি ছিল না, কেন না তিনি আত্মকেন্দ্রীকতা শিক্ষা দিতেন না। সেবা করা ও সেবা গ্রহণ করা, এ দুটোই মানুষের সহজ স্বভাব হওয়া উচিত, এই মনে করতেন—অবশ্য তার মধ্যে জোর জবরদস্তি বা শোষণ থাকলে চলবে না।

পাছে Inner voice-এর মধ্যেও সেই সূক্ষ্ম আমিই নিজেকে ফাঁকি দিয়ে প্রকাশ

পায়, সে সম্বন্ধে তিনি হুঁসিয়ার হতে বলেছেন। কেন না মানুষের "আমিটা" সহজে মরে যাবার নয়, তার অহং ও অহংকার স্থূল রূপে প্রকাশ হতে না পারলে সূক্ষ্ম ভাবে ছলাকলা পরে মানুষকে নাচাতে পারে, এই খেয়াল গান্ধীজীর ছিল, অর্থাৎ তিনি এতটা সতর্ক ছিলেন, প্রার্থনার ফলে মানুষের মনে যে আত্মপ্রত্যয় আসে তা হয়তো তার অহংকার অথবা আত্মপ্রতারণা মাত্র। তিনি বলেছেন, "Man is a falliable being. He can never be sure of his steps. What may regard as answer to his prayer may be an echo of his pride."
(Young India.—25.9.1924. All about fact)

মানুষের এই সূক্ষ্ম 'আমি' আত্মপ্রতারণার কত জটিল কৌশলই না নিতে পারে। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়টাকে গান্ধীজী সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে সূক্ষ্ম আমি তার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত। তিনি বলেছেন—"There is always the fear of self-righteousness possessing us, the fear of arrogating to ourselves a superiority that we do not possess." (Tandulkar, Mahatma, Vol V, page 301) এই self-righteousness-টা যে কত বড় ব্যাধি, তা প্রত্যেক বিবেকী দর্শকই জানেন। আমাদের এই অহংকার, বোধ, ধনের অহংকার, বলের অহংকার, পদের অহংকার, স্থূল রূপ থেকে বিতাড়িত হয়েও সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয় না, তখন তা মহত্বের অহংকার, দেবত্বের অহংকার। ভালো করার অহমিকায়ও প্রকাশ পায়। সত্যিকার বিনয় ও সত্যিকার self-effacement সোজা কথা নয়, সে কেবল নিজেকে শূন্য করার নির্মল নিষ্ঠুর ও নিরন্তর সাধনার দ্বারাই হয়তো সম্ভব। এবং তাও সম্ভব কিনা জানি না, তবে গান্ধীজীর ছিল এই সাধনা, "I=O"-র সাধনা। অর্থাৎ গান্ধীজীর কাছে ব্যক্তিবাদের কোন ঠাঁই নেই। নিজেকেই পাওয়া যাদের সাধনা, নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করা যাদের কাজ, নিজের মান, নিজের ধন, নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠা করাই যাদের স্বপ্ন, তারাই হলো ব্যক্তিবাদী। গান্ধীজীর সঙ্গে এই ব্যক্তিবাদের সম্পর্ক, সাপের সঙ্গে নেউলের যেমন সম্পর্ক।

বরং একথা বলা যায় যে গান্ধীজী ব্যক্তির দাবিটা বড়ো বেশী উপেক্ষা করে গেছেন। ব্যক্তির যেটা প্রাপ্য, তা নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করেছেন, এ দোষও দেওয়া যায়। অপরিগ্রহ বা non-possession নীতিতে তিনি ব্যক্তিকে সম্পত্তি থেকে, বিষয়চিন্তা থেকে মুক্ত হতে বলেছেন, বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলে ব্যক্তির জীবনে কঠিন রাস টানতে চেয়েছেন, ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করে একমাত্র সেবার মনোবৃত্তি নিয়েই দেশসেবা করতে বলেছেন। তিনি 'অধিকার' কথাটা পছন্দ করতেন না, কর্তব্য কথাটাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। right নয় duties-ই হলো প্রধান কথা, এই duty বা দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে যতটা অধিকার আসে তার বেশী একচুল অধিকারও কারো নেই, তিনি একথাও বলেছেন। জন্মগত অধিকারে কেউ রাজা, বা কেউ অন্য কিছু, একথা তিনি মানতেন না, কারো কোন জন্মগত অধিকার নেই, অধিকার অর্জন করতে হবে, কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই। তাই তিনি

Trusteeship মানতেন, অথচ inheritance of property মানতেন না। বস্তুতঃ, গান্ধীজীর মতে, মানুষের একটিমাত্র অধিকার আছে, সে সেবার অধিকার বা right to serve the people। এইচ. জি. ওয়েলস্ প্রভৃতি পৃথিবীর জনকয়েক বিখ্যাত লোক একবার একটা charter for rights and duties of Man তৈরী করতে চান এবং গান্ধীজীর কাছে তাঁর এবিষয়ে মতামত চান, তিনি উত্তরে শুধু বলে পাঠান যে, তাঁর কাছে এ প্রশ্ন করা ঠিক হয় নি, কেননা তিনি শুধু duties-এর কথাই জানেন ও মানেন, rights-এর কথা ভালো বুঝেন না। গান্ধীজীর উত্তরের মধ্যে এই অপূর্ব কথা কয়টি ছিল: As a youngman I began my life by seeking to assert my rights, and soon I discovered that I had none not even over my wife ! so I began discovering and performing my duty by my wife, my children, friends, companions and society, and I find to-day that I have greater rights, perhaps, than any living man I know. If this is a tall claim, then I say, I do not know any man who possesses greater rights than I.

(Harijan. Oct 13, 1940, page—320)

(Quoted by Prof. J. N. Dhawan, in The Political Philosophy of Mahatma Gahdhi - page 304)

যুবাবয়সে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্যে আমার জীবন সুরু হ'য়েছিল। তবে অনতিবিলম্বে আমি উপলব্ধি ক'রলুম যে আমার কোন রকম অধিকারই নেই—কারুর ওপর, এমন কি আমার স্ত্রীর ওপরেও নেই! এভাবে আমি উপলব্ধি করলুম—আমার স্ত্রী, আমার ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী-সাথী আর সমাজের আমার প্রতি কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই আজ আমি এটা বুঝতে পাচ্ছি যে আমার অধিকারই অনেকের চেয়ে বেশী—আমার মনে হয় কোন মানুষের চাইতে আমার অধিকার কম নয়। যদিও কেউ এটা লম্বা-চওড়া দাবী ব'লে গণ্য করে, তবুও আমি ব'লব, আমার চাইতে বেশী অধিকার ভোগ ক'রছে এমন মানুষ কেউ আছে, কি-না, তা জানি না।

যাই হোক্, এই যাঁর মত, এই যাঁর ঝোঁক, এই যাঁর শিক্ষা, তিনি কখনোই ব্যক্তিবাদী হতে পারেন না। বরং বলা যায় যে তিনি ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেছেন। যদিও তিনি জীবনভর মানুষের rights বা অধিকার কায়েম করবার জন্যই লড়েছেন, কিন্তু কোন কর্মীকে নিজের rights-কে কায়েম করতে প্রশ্রয় দেন নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা তিনি যা ব্যবহার করেছেন তা অধিকার দিয়ে তৈরী হয় নি, হয়েছিল তাঁর সেবার সাহায্যে। তিনি কংগ্রেসের সভ্য না হয়েও কংগ্রেসের হর্তাকর্তা ছিলেন, সে তাঁর অধিকার দিয়ে নয়, servicc দিয়ে। তিনি এই দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন সকল রাজনৈতিক কর্মীর সামনে। এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও মিলবে না।

× × × × × × × × × ×

Cardinal Newman-এর সেই অমর সঙ্গীতটি গান্ধীজী খুব পছন্দ করতেন, সেই Lead me, Kindly light etc. তাতে—

I do not ask to see
The distant scene : one step enough for me.

"একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট, দূরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না"—গান্ধীজীর এই নীতিটির এখানে একটু আলোচনা করা দরকার। বেশীরভাগ কর্মীরা তাদের আদর্শটিকে একটি দূরের জিনিষ বা লক্ষ্য মনে করে চলতে থাকে। তারা পথটার উপর কোন গুরুত্ব দেয় না, লক্ষ্যের উপরই তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। পথের সততা বা অসততা নিয়ে তাই তারা মাথা ঘামায় না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি গান্ধীজীর কাছে পথ ও লক্ষ্য ভিন্ন নয়, বরং পথ ও লক্ষ্য একই, ফলে লক্ষ্যটা সুন্দর হলেই হলো না : পথ বা উপায়টাও সুন্দর হওয়া চাই। এর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, যখন অহিংসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন শুধু এতে জীবনদর্শনের যে একটা গুরুত্ব পূর্ণ দিক আছে, সেটুকুই উল্লেখ করবো। কোন এক দূর ভবিষ্যতে আমার জীবনস্বপ্ন কায়েম হবে এইভাবে চললে, মানুষ তার প্রতিদিনকার সংগ্রামটাকে উপভোগ করতে পারে না, কেন না বর্তমানটা তার কাছে একটা আপদ বা evil necessity হিসেবে উপস্থিত হয়, যেমন করে হোক এই বর্তমানটাকে উৎরে গিয়ে কবে আমি সেই মহান ভবিষ্যতে পৌঁছুতে পারবো, সেই নেশায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু যদি সে ভবিষ্যৎ একেবারেই দূরের জিনিষ হয়, যদি তা আমার জীবনে কায়েম হতে না চায়, তবে তো আমার গোটা জীবনটাই একটা সংগ্রাম ও নিরর্থক হানাহানি বলেই মনে হতে পারে। মানুষ কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নেই লড়াই করতে পারে না। মানুষের বর্তমান সংগ্রামটাকেও আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য জিনিস বলে প্রতীয়মান করানো চাই। To enjoy the struggle সংগ্রামটাকে যদি উপভোগ করতে না পারি, তবে ক্লান্তি আসতে পারে, সংগ্রামে বিরাগ জন্মাতে পারে, এমন কি সংগ্রাম বন্ধ রেখে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতেই আদর্শবাদ আছে বলে আত্মপ্রতারণা জাগতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে এ প্রশ্ন খুব সহজ। তিনি দূরের স্বপ্নে বিভোর নন, তিনি পথটাকে লক্ষ্য হিসেবে জেনেছেন বলে, প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ছোট বড় সংগ্রাম তাঁর কাছে পবিত্র, তিনি সংগ্রামটাকেই আদর্শের ক্ষেত্র বলে বুঝতে পেরেছেন, বর্তমানকেও ভবিষ্যতের মতো সম্মান দিতে, মূল্য দিতে পেরেছেন এবং বলতে পেরেছেন একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট, দূরের ভাবনায় আমি ভাবিত নই, যদি বর্তমানের দায়িত্বটুকু পালন করে যেতে পারি, তবেই ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালন করা হলো। তাই বর্তমানটাকে হেলাফেলা করে ভবিষ্যতের জন্য বিভোর থাকা তিনি অনুচিত মনে করতেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাই তিনি আদর্শকে প্রত্যক্ষ করতেন। এবং এতেই তাঁর জীবন ভরে উঠতো, প্রাণ খুশী থাকতো। কোথাও কোন দূর ভবিষ্যতে বা দূর রামরাজত্বে পৌঁছুতে তাঁর কোন অহেতুক তাড়া নেই, কোন ত্রাস নেই। তিনি প্রশান্ত মনে বর্তমানকে গ্রহণ করেছেন, বর্তমানের জটিল জাল উন্মোচন করেছেন, প্রত্যেক দিনের সংগ্রামকে মহান মূল্য

দিয়েছেন এবং তার পালনেই সার্থকতা অনুভব করেছেন। তিনি সংগ্রামের মধ্যেই সংগ্রামের মূল্য পেয়ে গেছেন, তাই তাঁর কোন অহেতুক ক্ষুধা নেই বা স্বপ্নভঙ্গের দুঃখবোধ নেই, এতে frustration-এর ক্ষেত্র কমে এলো। বস্তুতঃ গান্ধীজীর কাছে দূরের রামরাজত্ব ততো লোভনীয় ছিল না, হয়তো তিনি পৃথিবীতে কোনদিনই শোকদুঃখ থাকবে না, এমন কোন সমাজ ব্যবস্থায়ও বিশ্বাস করতেন না, বরং শোকদুঃখ, অন্যায় কিছু থাকবে বলেই মানুষ নিজেকে বড় করবার, মহান করবার একটা ক্ষেত্র পাবে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, নইলে মানুষের সামনে বড় হবার কোন প্রেরণাই থাকবে না। হয়তো এমনি ধরণের একটা ধারণাও তাঁর ছিল। ব্যক্তির জীবনে এই সংগ্রাম, তার পক্ষে অভিশাপ নয় বরং সুযোগ, এমনি ধরণের একটা বিশ্বাসও তাঁর যেন ছিল। তা না হলে তাঁর মঙ্গলময় ভগবানের এই অমঙ্গলময় বিশ্ববিধানের ব্যাখ্যা করা যায় না। যা হোক, One step is enough-এই নীতি তাঁকে জীবন সংগ্রামে সংগ্রামকে উপভোগ করার মতো শক্তি যোগাতো।

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্য তাঁর একটা নেশা ছিল বলা যায়। যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করেছে, সেখানেই তিনি ইতিহাসের সুন্দরতম সত্যকে উপলব্ধি করতেন। আত্মবলিদান বা martyrdom-এর প্রতি তাঁর একটা অদম্য টান ছিল। রোমের ভার্টিকানে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবির সামনে তিনি তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যীশু তাঁকে প্রবলভাবে টানতো—বিশেষ করে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। এই ছবিটা সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজেই বলেছেন, "What would I not have given to be able to bow my head before the living image at the Vatican "Christ Crucified"? It was with a wrench that I could tear myself away from the scene of living tragedy. I saw there at once that individuals could only be made through the agony of cross and in no other way. Joy comes not out of infliction of pain on others but out of pain voluntarily borne by oneself." (This was Bapu. Prabhu, page—28)

ভাটিকানে ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের জীবন্ত প্রতিমূর্তির সামনে মাথা নত না ক'রবার মত ক্ষমতাই বা আমার কোথায় ছিল?—একটা গভীর অন্তর্বেদনার জন্য ঐ জীবন্ত বিয়োগাত্মক দৃশ্য থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও অনুভব করলুম যে—ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মত বেদনার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বড় হ'য়ে উঠতে পারে—অন্য কোনভাবে ব্যক্তি তার জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না। অপরকে বেদনা বা ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না, নিজ জীবনে সঞ্চারিত বেদনার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ নিহিত রয়েছে।

শহীদকে তিনি ঈর্ষা করতেন বলা যায়। তিনি যীশুকে ঈর্ষা করতেন, অমনি করে ক্রুশবহন করবেন, এই ছিল তাঁর অন্তরতম কামনা। এই কামনা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু মনের মধ্যে এই কামনা তাঁর কত যে তীব্র ছিল তা আমরা আরো একটি

লেখা থেকে বুঝতে পারি। কানপুরের শহীদ গনেশ শংকর বিদ্যার্থী, যিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য নিজ সম্প্রদায়ের হাতেই নিহত হন, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একবার লিখেছেন, এবং সেই লেখার মধ্যে তাঁর সেই চিরন্তন কামনা ফুটে বেরোচ্ছে :

"I do not know if the sacrifice of Shri Ganesh Shankar Vidyrthi has gone in vain. His spirit always inspired me. I envy his sacrifice. Is it not shocking that this country has not produced another Ganesh Shankar ? None after him came to fill the gap. Ganesh Shankar's Ahimsa was perfect Ahimsa. My Ahimsa will also be perfect if I could die similarly peacefully with axe blows on my head. I have always been dreaming of such a death and I wish to treasure this dream. How noble that death will be, a dagger attack on me from one side ; an axe blow from another : a lathi wound administered from yet another direction and kicks and abuses from all sides and if in the midst of these I could rise to the occasion and remain non-violent and peaceful and could ask others to act and behave likewise, and finally I would die with cheer on my face and smile on my lips, and then and then alone my ahimsa will be perfect and true. I am hankering after such an opportunity and also with congressmen to remain in search of such an opportunity." (this was Bapu—Prabhu.)

কী গভীর আকাঙ্ক্ষা! এই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, এই শহীদের প্রেরণা তাঁর সমস্ত জীবনকে চিরকাল দোলা দিয়ে এসেছে। যে ভয়ংকর অথচ মহান মৃত্যুর কল্পনা তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করে গেছেন, সে মহান মৃত্যু তাঁর হয়েছে, যেন তিনি নিজেই জানতেন তাঁর ভবিষ্যৎ, এমনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। অর্থাৎ নিজেকে বলি দেবার চেয়ে নিজের অপর কোন মহান পরিণাম তিনি ভাবতে পারতেন না। এই জন্যই তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ শহীদদের এতো ঈর্ষা করতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের এমন কদর্থ যেন আবার না করা হয় যে গান্ধীজী যেন শহীদ নাম নেবার জন্য লুব্ধ ছিলেন, এবং সুযোগ খুঁজে বেড়াতেন বা সুযোগ পাওয়া মাত্র তা গ্রহণ করে ইতিহাসে অমরতা লাভ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন বা জীবনের সব ঝামেলা থেকে সহজে বিদায় নিয়ে বা পালিয়ে চলে যেতে চাইতেন। অন্যরা তাঁকে মারুক বা মেরে ফেলুক, এরূপ আশা পোষণ করার মধ্যে কল্পিত আততায়ীর উপর দোষারোপ করার হিংসা নিহিত আছে, কাজেই ঐ জাতীয় প্রেরণাও গান্ধীজী সমর্থন করতেন না এবং তিনি দীর্ঘ একশত পঁচিশ বছর বাঁচবেন বলেই আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর জন্যও তৈরী ছিলেন।

আরো একটা মজার কথা এই, তিনি যে কেবল বৃহৎ কাজের জন্যই নিজেকে বলি

দেবার জন্য তৈরী থাকতেন, তা নয়। তাঁর কাছে প্রত্যেক কাজই সৎকাজ এবং মহৎ; এবং এ জাতীয় যে কোন কাজের জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তথাকথিত মহান কাজের জন্যই তাঁর মহান প্রাণ বলির যোগ্য তা তিনি মনে করতেন না, কর্তব্য প্রত্যেকটিই মহান। এবং তা যত তুচ্ছ বলেই মনে হোক অপরের কাছে, তাঁর কাছে তা নয়, যেন জগতের প্রত্যেকটি কাজ তাঁর জীবনকে দাবি করতে পারে। এমনি ধরণের একটা উদাহরণও আছে। একবার আপ্পাসাহেব পটবর্ধন রত্নগিরি জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন, তাঁকে কেন মেথরের (ভাঙ্গির) কাজ দেওয়া হবে না, এই দাবি নিয়ে। গান্ধীজী এই খবর জেলে বসে পান, অন্য কোনও একটি জেলে তিনি তখন ছিলেন। তিনি ওমনি অনশন শুরু করে দিলেন এবং অনশন তিনি কঠিন পণ করেই করেন। এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি নিজে কেন অনশন করতে গেলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "Mine is a peculiar position. Though I have hardened my heart, there are things about which I am exceedingly sensitive. To me, there is no difference of degree in matters of moment, and as I am capable of giving life for a great cause, I am equally capable of laying my life for a comrade. (Mahatma, Volume III, page 230।

মনে তাঁর এমন কোন অহংকার ছিল না যে জগতের শ্রেষ্ঠ কাজের জন্যই তাঁর মতো জীবন বলিদান করা যায়। ঔচিত্য ও ন্যায্যতার কাছে তিনি সর্বদাই প্রাণ দান করতে প্রস্তুত। নিজেকে বলি দেবার এই প্রেরণাটা তাঁর জীবন-দৃষ্টিভঙ্গীর একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এ কথাটা বাদ দিলে গান্ধীচরিত্র বোঝা সম্ভব নয়, তাঁর মতবাদ বুঝাও সম্ভব নয়, অহিংসা বুঝাও সম্ভবপর নয়।

গান্ধীজী যেখানে ব্যক্তি-চরিত্রের উপরে জোর দিয়েছেন সেখানে জোরটা ব্যক্তির উপরে নয়, জোরটা চরিত্রের উপর। আর চরিত্র গঠনে তিনি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। যারা শাসক ও শোষণকারী তাদের মূল্যবোধ বা ধর্মবোধকে যদি আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, অথবা লোভ করি, তবে তাদের কোনকালেও হটানো যাবে না। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, এসব পরশ্রমজীবী অন্যায় প্রথা যেসব মূল্য দেয়, সেইসব মূল্যের মানদণ্ডে যদি আমরা আমাদের চরিত্র গঠন করতে চাই, তাহলে আমরা তাদেরই প্রথাকে শক্তিশালী করবো মাত্র। কিন্তু আমরা যদি এসবকে লোভনীয় বলে মনে না করি, যদি সেই লোভটাকে ঘৃণা করতে শিখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জন্য নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করি, তবেই শাসকশ্রেণী আপনা থেকেই দুর্বল হয়ে যায়। আমরা তাদের অনুকরণ করতে গিয়েই তাদের শক্তিমান করে তুলি। আমাদের চোখকে ওরা ধাঁধাগ্রস্ত করে দিতে পারে বলেই ওদের এতো ইজ্জত। তাই গান্ধীজী প্রচারের সাহায্যে ওরা যাকে 'ভালো,' যাকে 'চমৎকার,' যাকে 'বৈজ্ঞানিক', যাকে 'সুন্দর' বলেপ্রতিপন্ন করতে চায়, তাকে তিনি তাই গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। যেহেতু তিনি তাদের তৈরী মানদণ্ডকে গ্রহণ করেননি, সহজ বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটি জিনিষ বিচার করে সেই সব জিনিষের নূতন মানদণ্ড বা

standard দিতে চেয়েছেন জনসাধারণের জন্য, সেহেতু আমাদের কাছে তা হঠাৎ যেন কিরকম লাগে। "I have placed the simplest things before the people of India, simplest things calculated to bring about revolutionary changes, e g. khadi, prohibition, revival of handicrafts, basic education, etc. But unless you can get over the intoxication of existing regime you will not see the simple things." (Harijan, IX 28.10. 39)

এই যে intoxication of the regime···এটা একটা সাংঘাতিক হুজুগ। না বুঝে তালে তাল দেওয়ার একটা গড্ডালিকার মোহ আমাদের অনেকসময় পায়। শাসকশ্রেণীই এই standard ও intoxication সৃষ্টি করে, শাসিতরা তাই অনুকরণ করতে ভালোবাসে, ফলে যাতে তার অমঙ্গল বা যাতে সত্যিকার অপমান, তাকে নিয়েই নাচতে থাকে। এমন অবস্থায়ই শাসকশ্রেণী তাদের জুলুম চালাতে সুবিধা পায়। মনের দাসত্ব সৃষ্ট করতে না পারলে গায়ের জোরে কোন প্রকারের সামাজিক দাসত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। কাকে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই, কাকে আধুনিকতম আবিষ্কার বলে নাচা হচ্ছে, তার বিচার নেই, একটু জবরজঙ্গ হলেই তা হবে বিজ্ঞান। জটিল হলেই বুঝতে হবে জ্ঞান, আর ঝাঁঝালো হলেই মনে হবে চমৎকার! এই intoxication of the age থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে এবং তা করা যায় যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের দ্বারা, কোন প্রকার হুজুগে না মেতে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায়। এবং তা করার ও গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারীদের শাসন পপাত হতে থাকে। নতুন মূল্যের সাহায্যে এই যে রণকৌশল সৃষ্টি করা, এর তাৎপর্য ভালো করে খেয়াল করে দেখতে হবে। নইলে স্বদেশী কি, আত্মশক্তি কি, তার যথার্থ রাজনৈতিক মূল্য কি, সে সব বোঝা যায় না। রিচার্ড গ্রেগ তাঁর Power of non-violence গ্রন্থে সুন্দর বলেছেন, "When the old values and symbols which were the source and inner strength of the ruling class are altered and demolished, the power of the ruling class as such disappear."

প্রায় এই জাতীয় প্রশ্নই লুই মামফোর্ড'ও তুলেছেন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যে সব মূল্য সৃষ্টি করছে, সেই মূল্য দিয়েই তো সমাজতন্ত্রের ভিৎ তৈরী করা যায় না। ধনীরা যে সব মূল্যবোধ তৈরী করেছে, সেই মূল্যবোধ দিয়ে যদি সমাজতন্ত্র গড়তে যাই তাহলে নতুন কিছু হলো না, তাকে বিপ্লবী সভ্যতা বা নতুন সভ্যতা বলা যায় না। বস্তুতঃ তা করাও সম্ভব নয়। কেন না সেকথা মেনে নিলে ধনতন্ত্রের ভিতই শক্ত হয়। অথচ আজকে যারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে প্রচার করেন, অথবা শ্রমিকআন্দোলনের নেতৃত্ব করতে চান, তাদের মধ্যে কোন নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হয়নি, তারা আচারে-ব্যবহারে ধনীদের আদবকায়দাগুলি, ধনীদের মূল্যবোধগুলিকেই গ্রহণ করে চলেছেন। ফলে নতুন কোন মূল্য, নতুন কোন সাহিত্য, নতুন কোন শিল্প তারা গড়তে পারেন নি, মুখে যতই কেননা নতুন কথা বলুন। তাই মামফোর্ড বলেছেন, "In their

very act of contending against the present order, they have accepted the ends for which that order stands and have been content to demand that they be universalised. This perhaps accounts for the *essential uncreativeness of the labour movement.* By a revolution they do not mean transvaluation of values ; they mean a dilution and spreading out of established practices and institutions." (Mumford—Utopias, page 253)

Material comfort-টা সকলের জন্য ব্যাপক করা, বিজ্ঞানের অবদানের ভাগ সবারই পাওয়া, এর বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে না। কথা হলো, সেগুলিকে আমরা কেমন করে ভোগ করবো, এর সবগুলিই ভোগ করার মতো কিনা – অথবা অনেকগুলি বর্জন করার মতো আছে কিনা, সেসব বিচার করার আছে কিনা, সেকথার বিচার করে ভালোমন্দ জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেদের বিচার অনুযায়ী মানদণ্ড তৈরী করা, ধনীদের মানদণ্ড নিজেদের জন্য গ্রহণ করা নয়। যদি ধনীরা আজ আলস্যকে শ্রেয় বলে মনে করে, যে যত অলস সে ততো সম্মানিত, যে যতো মদ খাবে সে ততো উঁচুদরের লোক—এমনি ধরণের একটা মানদণ্ড সৃষ্টি করে থাকে, তাই বলে কি শ্রমিক সভ্যতা, আলস্য ও মদটাকে সকলের জন্য পাওয়া চাই, এমন ধরণের আওয়াজ তুলতে পারে ? ধনতান্ত্রিক সভ্যতা অনেক কলকব্জা, অনেক বিজ্ঞানের প্রসার করেছে বটে, কিন্তু অনেক পাপ, অনেক অনাচার, অনেক মেকী, ভুয়ো জিনিষও তৈরী করেছে, আর যারা বিজ্ঞানী, তাদেরতো আর জনতা দেখতে পায় না, কিন্তু ধনীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, কায়দাকানুন সর্বদাই দেখতে পায়, এবং সেগুলিকেই যদি বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলে বুঝে নেয় তবে তার মতো অভিশাপ আর কিছু নেই। ধনিকসমাজের সত্যিকার বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীগুণীদের জীবন আমরা অনুকরণ করি না, করি এই ধনীদের, এবং ধনীদের উচ্ছিষ্টকে আমরা মনে করি কালচার বা সংস্কৃতি। এই মোহের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সাবধান করে গেছেন। এবং এই মোহ সৃষ্টি হলে ধনীদের দালাল হওয়া সম্ভব, ধনীদের সত্যিকার বিরোধীতা করা সম্ভব হয় না। যারা লড়াই করবে, যারা নতুন সমাজের জন্য বিপ্লব করতে চায়, তাদেরকে সত্যিকার শক্তিমান করতে হলে তাদের চরিত্র নতুন মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে। এবং তাতেই লড়াই করা সহজ হবে। এই কথাই গান্ধী-শিষ্য বিনোবা অন্য ভাষায় বলেছেন, To turn the direction is the simplest way to outstrip others.

ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে গান্ধীজী একান্ত সাধনার দ্বারা নিজেকে কি সুন্দরই না করেছিলেন, asthetic sense-এর তিনি নতুন মূর্ত প্রতীক ছিলেন, তাঁর সংস্পর্শে এসে মানুষ কি শান্তি, কি সহজ সরলতা, কি সুন্দর ব্যবহারই পেতো ! এতবড় নেতার বোঝা জাতি, বা কংগ্রেস বা কেউ এতটুকু অনুভব করতো না, তিনি আলগোছে জাতির পাশে এসে জাতিকে কখন থেকে সাহায্য করে আসছেন যেন, তা কেউ টের পায় নি।

একথা বলা যায় যে চীনদেশের দার্শনিক কবি Lao Tse-র কল্পনা তিনি সার্থক করেছিলেন :

Therefore in order to be the chief
among the people,
One must speak like the inferiors,
In order to be foremost among the people,
One must walk behind them.

Thus it is that the sage stays alone
And the people do not feel his might ;
Walks in front,
And the people do not wish him harm.

Then the people of the world are glad
to uphold him for ever.
Because he does not contend.
No one in the world can contend against him.

অবশ্য তাঁর ক্ষতি কেউ করতে চায় না, এমন ধরণের ঋষি তিনি নন, তিনি যে মানুষের মুক্তিদাতা, তাই তাঁকে শহীদ হতেই হবে।

এই ব্যক্তিগত চরিত্র জাতির উপরে সহসা কি মহান সাড়া, কি মহান মুক্তি-কামনা এনে দিয়েছিল তার ছোট একটা চিত্র আমরা নেহেরুর লেখা থেকে তুলে দিই। তাছাড়া মহাত্মার আহবান যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তাঁর দাবির ঢংটাও কত অদ্ভুত। তাঁর আজ্ঞাতে কি গভীর শক্তি, অথচ নেই এতটুকু insolance-তাঁর বাণীতে কত আলো, অথচ নেই এতটুকু জ্বালা, নেহেরু লিখেছেন, "Gandhiji was like a powerful current of fresh air that made us strech ourselves and take breaths, like a beam of light that pierced the darkness and removed the seales from our eyes, like a whirlwind that upset many things but most of all the working people's minds. He did not descend from the top ; he seemed to emerge from the millions of India, speaking their language and incessantly drawing attention to them and their appalling condition, Get off the backs of peasants and workers, he told us, all of you who live by their exploltation ; get rid of the system that produces misery. Political freedom took new shape then and acquired a new content····The essence of his teaching was fearlessness and truth and action allied to these,

always keeping the welfare of masses in view. The greatest gift for an individual or a nation, so we have been told in our ancient books, was *abhaya*, fearlessness not merely bodily courage but absence of fear from the mind. Janaka and Yagnavalka had said, at the dawn of our history, that it was the function of the leaders of a people to make them fearless. But the dominent impulse in India under the British rule was that of fear, pervasive, oppressing, strangling fear of the army, the police, the widespread secret service, fear of the official class, fear of the laws meant to suppress and of prison, fear of the landlord's agents, fear of the money lenders, fear of unemployment and starvation, which were always on the threshold. It was against these all pervading fear that Gandhiji's quiet and determined voice was raised : Be not afraid." (Discovery of India page, 299)

এই মহাত্মা সম্বন্ধে তাই আইনষ্টাইন বলেছেন যে হাজার বছর পরে মানুষ অবাক হয়ে ভাববে যে এমন ধরণের একটা লোক পৃথিবীর ধূলিতে একদিন বিচরণ করেছিলেন…আশ্চর্য !

গান্ধী ও ইতিহাস

একথা এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে গান্ধীজীর জীবনের দুটি দিক আছে। এক, ভারতের ইতিহাসে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারতের মুক্তির ইতিহাসে তাঁর স্থান ও দান। দ্বিতীয়, গান্ধীজীর বিশেষ বক্তব্য, বিশেষ কথা, যাকে আমরা সাধারণভাবে গান্ধীবাদ বলতে পারি। ঐতিহাসিক প্রতিভাধর যাঁরা, তাঁরা ইতিহাসেরই সৃষ্টি এবং ইতিহাসের গতিপথকে নিষ্কণ্টক করে তোলা হচ্ছে তাঁদের কাজ। কিন্তু যদি তাঁরা বিশেষ প্রতিভাশালী হন, অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন, তবে ইতিহাসের উপরে তাঁদের কাজের ও মতের একটা ছাপ থেকে যায়, অর্থাৎ তাঁরা ইতিহাসকেও প্রভাবিত করে যান। সে হিসেবে গান্ধীজী শুধু ইতিহাসের বাহনই ছিলেন না। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন কতক পরিমাণে। কিন্তু আমরা এই অধ্যায়ে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্যটাই দেখতে চেষ্টা করবো। পরবর্তী অধ্যায়ে ইতিহাসের উপর তাঁর কি ছাপ রয়ে গেল সেকথার বিচার করা যাবে।

একদিন আমরা, বামপন্থীরা, গান্ধীজীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করিতাম না। আমরা তাঁকে ভারতের ইতিহাসে একটা উৎপাত হিসেবেই ধরে নিয়েছি বরং বলতে চেয়েছি যে গান্ধীজী ইতিহাসের প্রগতিতে বাধা বিশেষ, প্রতিক্রিয়ার প্রতিভা বিশেষ। এমন কি সাম্রাজ্যবাদেরই সহায় বিশেষ ইত্যাদি। কিন্তু আজ আমাদের ধারণা বদলাচ্ছে, পৃথিবীতে এমন কি রাশিয়াতেও তাঁর নতুন করে বিচার শুরু হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত তর্কাতর্কির অতীত যা তা হলো বাস্তব ঘটনা, ফল দিয়েই যদি গাছের পরিচয় নিতে হয়, তবে একথা আজ মানতেই হবে ভারতের ইতিহাসে গান্ধীজী এক বিরাট অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং স্বাধীনতা দিয়ে যদি বিচার করতে হয় তবে আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ভারতের জন্য এক যুগান্তকারী ব্যাপার, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার নেতা হিসেবেই তাঁর স্থান আজ অটল।

ঐতিহাসিক গান্ধীর তাৎপর্য নেহেরু বুঝতে পেরেছিলেন যা গান্ধীবাদী গান্ধীর চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ গান্ধীজীর অহিংসা, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ, গান্ধীজীর কুটিরশিল্প ইত্যাদির প্রতি বিশেষ বাণী ছাড়াও গান্ধীজী যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নেতা এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেহেরু নিম্নলিখিত ভাষায় লিখেছেন: "Gandhi's influence in these various directions has pervaded India and left its mark. But it is not because of his non-violence or economic theories that he has become the foremost and most outstanding of India's leaders. To the most majority of

India's people he is the symbol of India determined to be free, of militant nationalism of a refusal to submit to arrogant might, of never agreeing to anything involving national dishonour. Though many people in India may disagree with him on a hundred matters, though they may criticize him or even part company from him on some particular issue, at a time of action and struggle when India's freedom is at stake, they flock to him again and look up to him as their inevitable leader."

(Discovery of India, page, 375)

কিন্তু আমরা, সেদিনের মার্কসবাদীরা কেন তাঁকে সেদিন সেই আসন দিতে পারিনি ? দিতে পারিনি আমাদের তথাকথিত মার্কসবাদী যুক্তি ও শিক্ষা থেকে। আমরা যেভাবে মার্কসবাদ বুঝেছিলাম সেভাবে, গান্ধীকে এমনিভাবে বোঝা ছাড়া অন্যভাবে বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ একথাও ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হচ্ছে যে আসলে আমরা মার্কসবাদের মর্মকথাটিও ধরতে পারি নি। আমরা তার সত্যিকার spirit না ধরে letters গুলি নিয়েই মত্ত ছিলাম। শ্রমিকশ্রেণী বা proletariat কথাটি আমাদের মাথায় যেমন কঠিন হয়ে বসে গিয়েছিল যে তার থেকে মস্ত ভুল ধারণা আমাদের মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। একদিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকবাদিরা সমাজতন্ত্র প্রথমে যে সব দেশে শ্রমিকশ্রেণী বেশী গড়ে উঠেছে এবং ধনতন্ত্র যে দেশে বিকাশলাভ করেছে সেইসব ইউরোপীয় দেশেই আগে হবে, এজাতীয় ধারণা নিয়ে বসেছিল, তারা পিছিয়ে পড়া দেশে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী তেমন অগ্রসর হতে পারেনি, সে সব দেশে বিপ্লবের কোন নেতৃত্ব বা অগ্রগামী ভূমিকা দেখতে পায় নি। তারপর অবশ্য লেনিন এসে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিপ্লব কোথা থেকে শুরু হতে পারে এবং রাশিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া দেশেও কি করে বিপ্লব হতে পারে এবং এই বিপ্লবে চাষীদের স্থান কতো গুরুত্বপূর্ণ সেকথা তিনি দেখিয়ে দিলেন, বাস্তব রুশবিপ্লবের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা থেকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর দায় নয়, তাতে অসংখ্য চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনতার বিশেষ অংশ আছে, সেই তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে লেনিন পিছিয়ে পড়া দেশ ও উপনিবেশগুলির বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখালেন। রুশ বিপ্লব থেকে যতো বেশী শিক্ষা আমাদের নেওয়া উচিত ছিল, আসলে আমরা ততটা শিক্ষা নিই নি। রুশবিপ্লবটাকে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করি নি। রুশ-বিপ্লবটাকে একটা ব্যতিক্রম হিসেবেই যেন গ্রহণ করা হয় এবং রুশবিপ্লবের ফলে যে সমস্ত নতুন তথ্য মার্কসবাদে এসে গেল, তার তাৎপর্য ও তারও যে বিকাশ কতদূর হতে পারে তাও বুঝতে চেষ্টা করি নি। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া বিপ্লবের অন্য কোন রূপ বা বিকাশ স্বীকার করতে পারি নি, এবং যে বিপ্লবে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দেখা দিচ্ছে না, সেটিকে বিপ্লব বলেই স্বীকার করি নি। ফলে ভারতে এত দিন ধরে যে এতো বড় ও ব্যাপক রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল সেটাকে সত্যিকার রাজনৈতিক আন্দোলন বলেই

আমরা স্বীকার করি নি এবং গান্ধীজীকে ইতিহাসের বাহন মনে না করে ইতিহাসের বাধা ও উৎপাত বলেই মনে করেছি ও প্রচার করেছি। Colonial and semi-colonial দেশের মুক্তি-আন্দোলনটাকে একটা বুর্জোয়া আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছু মনে করি নি এবং বুর্জোয়া আন্দোলন শ্রমিক ও চাষীদের কোন উপকারে আসে না এবং কোন কালেই তা শ্রমিক-চাষীদের হাতে ক্ষমতায় পর্যবসিত হতে পারে না, এমনি ছিল আমাদের চিন্তা ও কর্মধারা। ফলে এইসব জাতীয় আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করা, ঠাট্টা করা, বাধা দেওয়াই ছিল প্রধান কাজ। লেনিনের শিক্ষার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ও রুশবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম না। এখন দেখা যাক স্বয়ং মার্কসের নিজের ধারণাটাই বা সত্যি সত্যি কি ছিল, আমরা মার্কস্‌কে বুঝতাম কিনা।

একথা সত্য যে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ এক সময়ে সমাজতন্ত্র প্রথমে ইংলণ্ডেই আসবে এরকম কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ যে-সব দেশে ধনতন্ত্র খুব বিকাশ লাভ করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী সকলশ্রেণীর তুলনায় জনবলে সবার চেয়ে শক্তিমান হয়েছে, সে সব দেশেই সমাজতন্ত্র আগে হবে এবং পরে সেই মুক্ত শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে, পরাধীন দেশগুলিকে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি দেবে। অর্থাৎ metropolitan দেশগুলির নেতৃত্বের ভূমিকা মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ তাঁদের কমিউনিস্ট-মেনিফেস্টোতে দিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মার্কসের ধারণা বদলাতে থাকে। ইংলণ্ডে বিপ্লব হচ্ছে না, তিনি দেখতে পাচ্ছেন, জার্মানীতেও বিপ্লব সার্থক হলো না, প্যারীবিপ্লব বিফল হলো, এসব দেখে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলসের ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। তখন তাঁরা এমনও ইঙ্গিত দেন যে বিপ্লব হয়তো উল্টো দিক থেকেও হতে পারে। রুশদেশেও হতে পারে, এমন আশা এঙ্গেলস্‌ও দেখেছেন। এঙ্গেলস্‌ Zasulich—কে এক পত্রে লিখেন, "To me the most important thing is that the impulse should be given in Russia, that the revolution should break out. Whether this fraction or that fraction gives the signal, whether it happens under this flag or that flag matters little to me."

(Engles to Zasulich, 15th June, 1885)

এর অনেক আগে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে মার্কস্‌ এঙ্গেলস্‌কে এক পত্রে জানান, "For a long time I believed that it would be possible to overthrow the Irish regime by English working class ascendency. I always expressed this point of view in the New York Tribune. Deeper study now convinced me of the opposite. The English working class will never accomplish anything before it has got rid of Ireland. The lever must be applied in Ireland. That is why the Irish question is so important for the social movement in general.

(Marx to Engles, p. 135, 9th Dec, 1869)

Meyer ও Vogt-কে লেখা মার্কসের চিঠিতেও এই থিসিসই আছে এবং এই থিসিস্‌কেই লেনিন উন্নত করে জাতীয় প্রশ্নে মার্কসবাদীদের নীতি নির্ধারণ করে দেন। এই চিঠিতে মার্কস্‌ লিখেছেন, "After occupying myself with the Irish question for many years I have come to the conclusion that the decisive blow against English ruling classes (and it will be decisive for the workers' movement all over the world) *cannot be in England but only in Ireland.*" তারপরে কেন এই পথ নিতে হবে তার কারণ দেখান। চিঠিখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক রাজনীতির ছাত্রকেই তা পড়া উচিত। কেন না ১৮৭০ সালে এই পত্রটি লেখা এবং কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো হলো ১৮৪৮ সালে রচিত। এই দীর্ঘ সময়ে মার্কসের ধারণা অনেক পালটে গেছে। ধনতন্ত্র তখনো সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় নি, কিন্তু প্রাক্‌-সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাক্‌-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের গতি কোন দিকে, তার আভাস মার্কস্‌ এই পত্রে দেন, 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারকিং মেনস এ্যাসোসিয়েশন'-এর জেনারেল কাউন্সিল গোপনীয় সারকুলারে সংগ্রামের এই নতুন সুপরিকল্পিত কৌশল সন্নিবিষ্ট করেন, যার অর্থ হলো, এই যে কলোনীর স্বাধীনতা সংগ্রাম দিয়েই ইংলণ্ডের বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে হবে। 'The lever must be applied in Ireland' এখানে আয়ারল্যাণ্ড-এর বদলে যদি কলোনী ও আধা-কলোনী বসাই তবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের রাজনৈতিক সুপরিকল্পিত সংগ্রাম কৌশলটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাছাড়া পরবর্তী যুগে লেনিন ও স্টালিন যে বলেছেন, "National question is essentially a peasant question"-সেই কথার ইঙ্গিত ও তাৎপর্যও এই পত্রেই আছে, যখন মার্কস্‌ লিখছেন, "The destruction of the English Landed aristocracy easier operation than in England itself, because the *land question* has hitherto been *exclusive* form of the social question in Ireland, bccause it is a question of existence, of life and death, for immense majority of the Irish people and because it is at the same time inseparable from the national question"

"Hence the task of the "International" is every where to put the conflict between England and Ireland in the foreground, and anywhere to side openly with Ireland. The special task of the central council in London is to awaken a consciousness in the workers that for them the national emancipation of Ireland is no question of abstract justice or human sympathy but *the first condi-tian of their own emancipation.*

এখানে মার্কস্‌ এতদূর এগিয়েছেন যে Metropolitan working classes-এর মুক্তির প্রথম সোপান হলো আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা, সেখানকার চাষীদের মুক্তি। এ হলো ১৮৭০ সালের কথা। কিন্তু তারও বহু পূর্বে ১৮৫৬ সালের এক পত্রে

জার্মান বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মার্কস্ এঙ্গেলস্‌কে জানান, "The whole thing in Germany will depend on the possibility of 'covering the rear of the proletarian revolution by a second edition of the Peasant's war. Then the affair will be splendid."

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই চাষীদের শ্রমিকবিপ্লবে কি বিরাট অংশ নিতে হবে সেকথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তাছাড়া প্যারিস কমিউন বিফল হবার প্রধান কারণও যে চাষীদের নিষ্ক্রিয়তা তা-ও আজ ইতিহাস স্বীকৃত তথ্য।

মোট কথা উপরোক্ত উধৃতি থেকে কয়েকটি সত্য পরিষ্কার হয়ে আসে যে, প্রথমতঃ শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী নয়, (যা কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে দেখানো হয়েছিল), দ্বিতীয়ত, মেট্রোপোলিটান ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রধান সোপান হলো ইংল্যণ্ডের কলোনিগুলির স্বাধীনতা। তৃতীয়ত, কলোনিগুলির আন্দোলন প্রধানতঃ চাষীদের মুক্তি-আন্দোলন, চতুর্থত, এই কলোনি ও পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রথম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, পঞ্চমত, শ্রমিক বিপ্লবে যদি চাষীদের সহায়তা না পাওয়া যায় তবে তা ব্যর্থ হয়। অতএব Lever must be applied in Ireland। অতএব যারা শ্রমিকবিপ্লব চায়, সমাজতন্ত্র চায়, বিশ্ববিপ্লব চায়, তাদের পক্ষে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে সবার চেয়ে আগ্রহী হয়ে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

আজ ভেবে দেখুন তো আমাদের সেদিনকার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা-কমিউনিষ্টরা কি এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলাম? এর ঐতিহাসিক ও পৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে পারি নি বলেই গান্ধী-আন্দোলনকে পরাজিত করার চেষ্টা করেছি।

এখন দেখা যাক্ পরাধীন দেশের এইসব আন্দোলন কী, বা কোন জাতীয় আন্দোলন। আমরা ধরে নিয়েছি, সেটা বুর্জোয়া বিপ্লবেরই আন্দোলন, বুর্জোয়া বিপ্লব মানে বুর্জোয়াদের রাজ কায়েম করা। অথচ এই বুর্জোয়া ভয় থেকেই আমরা তথাকথিত বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু লেনিন বুর্জোয়া আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখেন নি। ১৯০৩ সালে—এতো আগেই তিনি Two Tactics of Bourgeois Democratic Revolution-এ দুই ধরণের বুর্জোয়া বিপ্লব দেখিয়েছেন। Democratic Dictatorship of workers and Peasants-এর যে বুর্জোয়া বিপ্লব, তা আর সাবেকী আমলের বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, তা অপ্রতিহত ও অনিবার্য গতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে বাধ্য, একথাও তিনি দেখালেন। তার অনেক পরে প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন থেকে শুরু হোল, সেদিন অর্থাৎ সেই সাম্রাজ্যবাদী যুগের চরমে এসে ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে এসে, পরাধীন দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর পুরোনো বুর্জোয়া বিপ্লবের অনেক পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেলো। কেন না গোটা epoch (ইপক)-টাই বদলে গেলো। প্রোলেটারিয়ান ইপক ও সোশিয়েলিষ্ট ইপক এসে গেলো। তার পরেও যেদিন রুশবিপ্লব ঘটে গেলো, সেদিন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির

বুর্জোয়া বিপ্লব পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিকবিপ্লবের বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশ বিশেষে পরিণত হলো এবং সকল দেশের জাতীয় প্রশ্ন ও জাতীয় বিপ্লবসমূহ বিশ্ব-প্রোলেটারিয়ান সোশিয়েলিস্ট বিপ্লবের অংশ বিশেষ হয়ে দাঁড়ালো। এই কথা আমরা লেনিন, ষ্ট্যালিন ও মাও-সে-তুঙের লেখা থেকেই দেখিয়ে দিচ্ছি।

যুগোশ্লাভিয়ার Semich-এর লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে ষ্টালিন ১৯২৫ সালেই লেখেন যে, ষ্ট্যালিন ১৯১২ সালে জাতীয় প্রশ্নের যে তাৎপর্য দেখেছিলেন তা আজ আর খাটে না, অর্থাৎ রুশবিপ্লবের পর জাতীয় প্রশ্নসমূহের তাৎপর্য সম্পূর্ণ পালটে গেছে। ষ্ট্যালিন নিজেই লিখছেন, "But Stalin's pamphlet (The National question in the light of Marxism, 1912) was written before the imperialist war, when the National question was not yet regarded by the Marxists as a question of world significance, when the Marxist's fundamental demand for the right to self-determination was regarded not as part of the proletarian revolution, but as a part of the bourgeois-democratic revolution. It would be ridiculous not to see that since then the international situation has radically changed, that the war, on the one hand, and the October Revolution in Russia, on the other, transformed the National question from a part of the bourgeois democratic revolution into a part of proletarian—Socialist revolution. As far back as 1916, in his article, "The Discussion on self-determination summed up," Lenin said that the main point of the national question, the right to self-determination, had ceased to be a part of the general democratic movement, that it had already become a component part of the general proletarian, socialist revolution. I do not even mention subsequent works on the national question by Lenin and by other representatives of Russian Communism. After all this, what significance can Semich's reference to the passage in Stalin's pamphlet, written in the period of *bourgeois*-democratic revolution in Russia, have at the present time, when, as the consequence of the new historical situation, we have entered a new epoch, the epoch of *proletarian* revolution? It can only signify that Semich quotes outside of space and time, without reference to the living historical situation and thereby violate the most elementary requirments of dialectics, and ignores the fact that what is right for one historical situation may prove to be wrong in another historical situation.

(Stalin, Vol, 7, page. 226-27)

Character of the future Government in China, particularly of the Canton Government সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্ট্যালিন এই থিসিসেই আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "The point lies not only in the bourgeois-democratic character of the Canton-Government, which is the embryo of the future All-China revolutionary Government; the point is above all that this Government is, and cannot but be, an anti-imperialist government, that every advance it makes is a blow at world imperialism, and consequently, a blow which benefits the World revolutionary movement.

Lenin was right when he said that, where as formerly, before the advent of world revolution, the national liberation movement was part of the general democratic movement, now, after the victory of the revolution in Russia and the advent of the world revolution, the national-liberation movement is part of the world proletarian revolution.

I think that the future revolutionary government in China will in general resemble in character the government we used to talk about in our country in 1905, that is, something in the nature of a democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry, with the difference however, that it will be first and foremost an anti-imperialist government.

It will be a government transitional to a non-capitalist, or, more exactly, a socialist development of China."

(Stalin, Vol—8, page—382)

Zinoviev, Radek, Trotsky প্রভৃতি নেতারা National liberation (in world revolutionary epoch) যে সমাজতন্ত্রের দিকেই যেতে বাধ্য নয়, একথা প্রমাণ করার জন্য তুর্কীর কামাল পাশার দৃষ্টান্ত কথায় কথায় দেখাতেন। স্ট্যালিন খুব জোরের সঙ্গে তার বিরোধীতা করেছেন এবং চীনের মতো বিরাট দেশে 'কামালিস্ট বিদ্রোহ' টিকতে পারে না, এই কথাই বলেছেন, "Where as in Turkey the struggle against imperialism could end with a curtailed anti-imperialist revolution on the part of the Kamalists, in China the struggle against imperialism is bound to assume a profoundly and distinctly national character and is bound to deepen step by step, developing into desparate clashes with imperialism and shaking the very foundation of imperialism throughout the world.

One of the gravest errors of the opposition (Zinoviev, Radek,

Trotsky) is that it fails to perceive this profound difference between Turkey and China, confuses Kamalist revolution with an agrarian revolution, lumps everything indiscriminately into one heap."
(Stalin Vol—9, page—262-63)

এখন দেখা যাক মাও-সে তুঙ চীনবিপ্লব ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কি লিখেছেন। 'নতুন-গণতন্ত্র বা নিউ-ডেমোক্রেসিতে' তিনি দেখাচ্ছেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সমূহে স্বাধীনতা আন্দোলন নিছক বুর্জোয়া আন্দোলনের অঙ্গ নয়, নয়াগণতন্ত্র বা নতুন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গ ও বিশ্বসমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গ।

"After these events (Ist world war & Russian Revolution in 1917) the Chineese bourgeous-democratic revolution changes its character and belongs to the category of the new bourgeous-democratic revolution and, so far as the revolutionary front is concerned, forms part of the proletarian-socialist world revolution.

Why ? Because the first imperialist world war and first victorious socialist revolution, the October revolution, have changed the historical direction of the whole world and marked a new historical era of the whole world.

In an era when the world capitalist front has collapsed in one corner of the globe (a corner which forms one sixth of the world), while in other parts it has fully revealed its decadence ; when the remaining parts of capitalism cannot survive without more than ever on the colonies and semi-colonies ; when a socialist state has been established and has declared that it is willing to fight in support of the liberation movement of all colonies and semi-colonies ; when the proletariat of the capitalist countries is freeing itself day by day from social-imperialist influence of the social democratic parties, and has also declared itself in support of the liberation movement of the colonies and semi-colonies in such an era, any revolution that takes place in a colony or semi-colony against imperialism i.e., against international bourgeoise and international belongs no longer to the old category of bourgeois-democratic world revolution, but to a new category, part of a new world revolution, the proletarian socialist revolution. Such revolutionary colonies and semi-

colonies shonld no longer be regarded as allies of the counter-revolutionary front of the world capitalism ; they have become allies of the revolutionary front of world socialism.

Although in its social character the first stage of, or the first step taken in this revolution in a colonial or semi-colonial country is still fundamentally bourgeois-democratic, and although its objective demand is to clear the path for the development of capitalism, yet it no longer belongs to the old type of revolution led by the bourgeois with the aim of establishing a capitalist society and state under bourgeois dictatorship, but belongs to the new type of revolution which, led by the proletariat, aims at establishing a new-democratic society and a state under the joint dictatorship of all the revolutionary classes. This revolution exactly serves to clear a path even wider for the development of socialism. In the course of its progress, such a revolution further falls into several stages because of changes in the enemies' conditions and in the rank of its allies, but its fundamental character will remain unchanged.

Such a revolution deals unrelenting blows to imperialism and hence is disapproved and opposed by imperialism. But it meets the approval of socialism and is supported by the socialist state and socialist international proletariat."

(New Democracy, 1940)

মাও-সে-তুঙ আরও বলেছেন, "There are two kinds of world revolution, the first belonging to the bourgeois and capitalist category. The era of this kind of revolution is long past ; it came to an end as early as 1914 when the first imperialist world war broke out, and especially in 1917 when the Octobcr Socialist Revolution occurred in Russia. Since then, the second kind, namely, the proletarian-socialist world revolution, has started. Such a revolution, has the proletariat of the capitalist countries as its main force and the oppressed peoples of the colonies and semi-colonies as its allies."

মাও-সে-তুঙ এই যে সাধারণ (জেনারেল) ও দ্ব্যর্থহীন (কেটাগরিক্যাল) বিবৃতি দিলেন তা তো শুধু চীনের জন্যই বলেন নি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক হয়ে যে গণতন্ত্র আজ দেশে স্থাপিত

হলো তা-ও নিশ্চয়ই আর পুরোনো বুর্জোয়া-গণতন্ত্র নয়, তা-ও নয়া গণতন্ত্রের মতোই একটা দ্বিতীয় ধরণের বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্তর্গত কিছু। আমরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও-সে-তুঙের যে বিচার পদ্ধতি দিলাম তা থেকেই সোজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে ভারতেও যে স্বাধীনতা ও বিপ্লব হলো তা-ও আর ধনতান্ত্রিক পুরোনো গণতন্ত্রই নয়, তা-ও নয়াগণতন্ত্র, তা-ও সমাজতন্ত্রের দিকে অনিবার্য রূপে এগিয়ে যেতে বাধ্য, যেমন চীনের নয়াগণতন্ত্র মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে গেলো। এই এগিয়ে যাবার গতি ও ভঙ্গী হয়তো ঠিক একই তালে, একই নিয়মে নয়, দুই দেশের আন্দোলনের ও ইতিহাসের ধারায় হেরফের থাকার জন্য দুই দেশের গতি ও ভঙ্গী এক নয়। কিন্তু মৌলিকভাবে ভারতীয় বিপ্লব বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অঙ্গ (ফান্ডামেন্টাল ইন্ডিয়ান রিভোলিউশন, ওয়ালর্ড সোশিয়েলিষ্ট রিভোলিউশনেরই অঙ্গ)। মার্কসীয় এই ধারা থেকেই আমরা একথা মানতে বাধ্য। একথা উঠতে পারে যে চীনের নেতারা সজ্ঞানে জেনেশুনেই এই পদক্রম নিয়েছিলেন ও তার তাৎপর্য ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন আগে থেকেই। তা তাঁরা পেরেছিলেন, এবং পেরেছিলেন বলেই তাঁদের চলায় কোন রকমের দ্বিধা ছিল না, সেজন্য তাঁদের গতিতে কোন জড়তা ছিলনা। কিন্তু ভারতের বেলায় যদিও জড়তা অনেক, তবু বাস্তবিকপক্ষে (ফান্ডামেন্টাল) ভারতের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আর অন্য কোনও রকমভাবে ফেলবার উপায় নেই, এই প্রোলেটারিয়েট সোশিয়েলিষ্ট ইপকে (Proletariat Socialist epoch)। মাও-সে-তুঙ এই সঙ্গেই পরিষ্কার বলেছেন, "No matter what classes, parties or individuals in the oppresed nations join the revolution, and no matter whether or not they are conscious of the point mentioned above or subjectively understand it, so long as they oppose imperialism, their revolution becomes part of the proletarian-socialist world revolution and they themselves become its allies." (New Democracy)

কাজেই যদি আমরা একথাও বলি যে কংগ্রেস বা গান্ধী ইতিহাসে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা তাঁরা না জেনেই এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক মোর্চায় যুক্ত হয়ে গেলেও কিছু এসে যায় না। তাঁরা ঐতিহাসিক নিয়মেই সমাজতন্ত্রের গতিপথকে সহজ ও সুগম করেছিলেন। গান্ধীজী তা যদি না জেনে থাকেন, বা তা না বুঝে থাকেন যে আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার গুরুত্ব কতখানি, আজ তা করতে যাওয়া মানেই সমাজতন্ত্রের বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরী করা, তাতে কি এসে যায়? গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তাই এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গভীরভাবে বৈপ্লবিক। তিনি শুধু স্বাধীনতারই আন্দোলন করে যান নি, তিনি সমাজতান্ত্রিক পটভূমিকাও তৈরী করে গিয়েছেন, নিজের অজান্তেই, এই কথাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনিবার্য পরিণাম। অবশ্য চীন ও ভারত অবিকল এক নয়, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদী তাৎপর্য একই ধরণের ছিল এবং

সেই একই কারণে তাদের আজকের মুক্ত অবস্থায়ও একই জাতীয় সামাজিক সমস্যা উপস্থিত, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সমস্যা উপস্থিত। চীনদেশে যেমন সমাজতন্ত্র গঠনটাই একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির হয়েছে, ভারতেও যে সমাজতন্ত্র গঠনই লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কেন না পূর্ব বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভারতের এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়, হঠাৎও নয়, ধোঁকাবাজীও নয়, ঐতিহাসিক নিয়মেই সমাজতন্ত্রের কথা যে কারণে চীনে আজ সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, সেই জাতীয় কারণেই ভারতেও আজ সমাজতন্ত্রের দাবি এতো সমর্থিত হয়েছে।

মাও-সে-তুঙ দেখিয়েছেন যে তিন ধরণের গণতন্ত্র হতে পারে ঃ

(1) Republic under bourgeois dictatorship

(2) Republic under Proletarian dictatorship

(3) Republic under the joint dictatorship of several revolutionary classes.

Third kind is the transitional form of state to be adopted by revolutions in colonial and semi-colonial countries. To be sure, revolutions in different colonies or semi-colonial countries necessarily have certain different characteristics. But these constitute only minor differences with a general frame work of uniformity. So long as there are revolutions in colonies or semi-colonies, the state and political power will of necessity be basically the same in structure, i.e , a new democratic state under the joint dictatorship of several anti-imperialist classes." (New Democracy)

এক একটা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের এক এক রকমের চেহারা। অর্থাৎ কিছু না কিছু পার্থক্য তাদের মধ্যে আছে। সবারই ইতিহাস, গঠন, সমাজজীবন, ভাষা, সভ্যতা ইত্যাদির আলাদা আলাদা রূপ ও সমস্যা আছে। কিন্তু যে অর্থে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির পরিণামে এক প্রকার নয়াগণতন্ত্র সৃষ্টি হয়, সেই নয়াগণতন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। সেটা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া গণতন্ত্র নয়। সেটা হলো সেই দেশের সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের সম্মিলিত কর্তৃত্বের গণতন্ত্র। আবার কোনু শ্রেণী বিপ্লবী তারও কোনও চিরকালের সত্যতা বা স্থিরতা নেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশে বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়ারাও বিপ্লব বিরোধী। আবার পরাধীন দেশে পাতিবুর্জোয়া তো বটেই এমন কি অসন্তুষ্ট বুর্জোয়াশ্রেণীরও একটা বৈপ্লবিক দিক আছে, আবার তাদের একটা প্রতিক্রিয়াশীল দিকও আছে। যাই হোক, কোনও একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশে যে সমস্ত শ্রেণীকে বিপ্লবী বলে দেখা যায়, সেই সব উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে যে স্বাধীন নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তার একটি সাধারণ তত্ত্ব হলো, মাও-সে-তুঙের মতে—একটি সম্মিলিত বিপ্লবী নেতৃত্ব। চীনদেশে কার্যত তাইই হয়েছে। ভারতের বেলায় এই মিলিত বিপ্লবী নেতৃত্ব কোথায়? কংগ্রেস বলে এসেছে এতকাল

যে, কংগ্রেসই সেই মিলিত নেতৃত্ব, কোনও একটি শ্রেণী কংগ্রেসের মালিক নয়। কংগ্রেসের এই দাবি অতীতে অনেকেই মেনে নিতেন, আবার কেউ কেউ মেনে নেন নি। অনেকে মনে করেছিলেন যে কংগ্রেস হলো কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি। তাতে চাষী, মধ্যবিত্ত, মজুর আছে বটে, তারা আছে বুর্জোয়াদের ফেউ হিসেবে। তবে কংগ্রেসে আছে অনেক শ্রেণী, অনেক ধরণের লোক, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। আমরা এই বইতে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে গান্ধীজী কোনো বুর্জোয়া বা সামন্ত-তান্ত্রিক শ্রেণীর নেতা নন, আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে গান্ধীজী হরিজন বা ভাঙ্গী বলেই নিজেকে পরিচয় দিতেন, আমরা বলতে চেয়েছি যে গান্ধীজী হলেন শ্রেণীহীন সমাজের একজন উপাসক। পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন যে গান্ধীজী হলেন চাষী-ভারতের প্রতিনিধি—'The Great Peasant'। এসব আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি, তবে এখন আমরা আবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। কারণ গান্ধীজীর শ্রেণীবিচার করা ভারতীয় স্বাধীনতার শ্রেণীবিচার করার প্রয়োজনে অত্যন্ত জরুরী। যাই হোক, আমাদের দীর্ঘ আলোচনার ফলে যদি কিছু সত্য আবিষ্কার হয়ে থাকে, তবে বোধকরি জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, গান্ধীজী কি চরিত্রে, কি কাজে, কি কথায়, কি শিক্ষায়, ব্যবহারে, কোথাও ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন না কিংবা জমিদারশ্রেণীর নেতা ছিলেন না, তিনি সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিলেন, একথা আজ আর কেউ সাহস করে বলে না, একমাত্র পাগল ছাড়া। তথাপি কিন্তু তর্কটা শেষ হয় না। কেন না গান্ধীজী কেবল একটি ব্যক্তিই নন। তিনি ইতিহাসেরও বাহন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি সাধু লোক হতে পারেন, মহাপুরুষ হতে পারেন, সন্ন্যাসী হতে পারেন, এবং তিনি ছিলেনও তাই—তা সত্ত্বেও ইতিহাস তাঁকে দিয়ে কি করিয়ে নিয়েছে, সেই তর্ক থেকেই যায়। মাও-সে-তুঙের বিচার মতো বলা যায়, ইতিহাস তাঁকে দিয়ে ভারতের জন্য এক ধরণের নয়াগণতন্ত্রের কাজ করিয়ে নিয়েছে। এ বিচার যদি আমরা স্বীকার না-ও করি, অর্থাৎ যদি লেনিন, ষ্ট্যালিন ও মাও সে-তুঙের কথা আমরা না মানি, তবেই বলতে হবে যে ইতিহাস হয়তো তাঁকে দিয়ে সাধারণ বা পুরোনো গণতন্ত্র বা নিছক বুর্জোয়া তন্ত্র করিয়ে নিয়েছে। এই যুক্তি মানতে হলে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানলাম না, হয়তো এটা ট্রটস্কীবাদ হতে পারে।

এবার আর একটি কথায় আসছি। এই সম্মিলিত বিপ্লবী মোর্চার নেতা চীনদেশে হলো কমিউনিষ্ট পার্টি, যারা নিজেদের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কেবল যে শ্রমিকশ্রেণীরই পার্টি, একথা কার্যতঃ ঠিক নয়, চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্তই এর প্রধান শক্তি যুগিয়েছে, যদিও আদর্শ তার শ্রমিকশ্রেণীর- ঐতিহাসিক অর্থে। এই তর্কের মধ্যেও আমরা গভীরভাবে ঢুকতে চাই না। তবে এটুকু এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সম্মিলিত মোর্চার বিপ্লবী নেতৃত্ব, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতৃত্ব এ যুগে ধনিকশ্রেণী দিতে পারে না, সেই ধনিক-শ্রেণীর একটা বৈপ্লবিক দিক থাকলেও, সেই নেতৃত্ব দিতে হবে তাদের, যারা শ্রমিক-শ্রেণীর আদর্শ মেনে চলেন। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র যারা চায়, তাদের কাছ থেকেই এই সম্মিলিত মোর্চার নেতৃত্ব আসতে পারে। সে হিসেবে গান্ধীজী ও গান্ধীনেতৃত্ব

নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট আদর্শের নেতৃত্ব নয়। ফলে গান্ধীজীর শ্রেণীবিচার, অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি-চরিত্র এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমরা দেখিয়েছি, গান্ধীজী যদিও মার্কস্‌বাদী সোশিয়েলিস্ট বা কমিউনিস্ট নন, তথাপি তিনি ধনিক-বণিক-জমিদারদেরও কেউ নন। তিনি গরীবেরই প্রতিনিধি। সর্বোদয় সমাজ, শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শই তাঁর আদর্শ ও প্রতিদিনকার জীবনচর্যা। অতএব কমিউনিস্ট না হলেও ইতিহাসের নয়াগণতান্ত্রিক যুগের বাহন হিসেবে যে গুণটি থাকা দরকার, সেটি তাঁর ছিল। অর্থাৎ এই সম্মিলিত মোর্চার নেতৃত্ব নিতে বুর্জোয়ারা পারে না, একথা গান্ধীজী জানতেন এবং জনগণই যে এই নেতৃত্ব দিতে পারে, নতুন শোষণহীন সমাজের আদর্শ হাতে নিয়ে, সেই হিসেবে গান্ধীজীর ইতিহাসের বাহন হবার যোগ্যতা ছিল, সদর্থকভাবে (পোজিটিভলি) ছিল, তার চেয়ে নঙর্থকভাবে (নিগেটিভলি) ছিল বেশী। অর্থাৎ মার্কসীয় প্রয়োজন মতো তিনি ধনতন্ত্রের নেতা ছিলেন না, বরং তিনি ধনতন্ত্র-বিরোধী (anti-capitalism) না হোক অন্তত non-capitalist, leader of the masses ছিলেন। আরও একটা কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে New democracy বা নয়াগণতন্ত্র anti-capitalism—এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ধনতন্ত্রের পথ Imperialist-fundamental জোট থেকে বিমুক্ত করার প্রয়োজন নয়াগণতন্ত্র স্বীকার করে নিয়েছে, যার জন্য তাকেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই বলা হয়েছে। তাকে সোশিয়েলিস্ট বা প্রোলেটারিয়ান বা শ্রমিক বিপ্লব বলা হয় নি। এই জন্যই মনে রাখতে হবে, মাও-সে-তুঙ জাতীয় বুর্জোয়াদের তাঁর বিপ্লবী সম্মিলিত মোর্চার মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন এবং আজও দিয়ে থাকেন। অতএব গান্ধীজী যদি সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী মোর্চাতে জাতীয় বুর্জোয়া ও একশ্রেণীর স্বদেশভক্ত জমিদারদেরও স্থান দিয়ে থাকেন, তাতে তিনি মাও-সে-তুঙের দৃষ্টিতে অপরাধ করেন নি। কেন গান্ধীজী ধনীদের উচ্ছেদ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম করেন নি, কেন তিনি তাদের সহ্য করতেন, এই দাবি আজ আর মাও-সে-তুঙের দৃষ্টান্তের পর কারো করা উচিত নয়। এবং যেহেতু তিনি ধনীদের সহ্য করতেন, অতএব তিনি বুর্জোয়া, একথা যদি বলতে হয়, তবে মাও-সে-তুঙকেও বুর্জোয়া বলা চলতো। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অসন্তুষ্ট ও বিপ্লবী শ্রেণীগুলিকে সম্মিলিত-ভাবে দাঁড় করাবার যে রণগত কৌশল ও স্ট্র্যাটেজি, তাকে অস্বীকার করে সোজা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্ভর করে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের দাবিতে সকলের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করার চেষ্টা-মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়, এটা ট্রটস্কীবাদ হতে পারে। ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সম্মিলিত শক্তিসমূহের নেতৃত্ব করে গেছেন, তার ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেশে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয়ত, সে গণতন্ত্র নিছক পুরোনো বুর্জোয়া গণতন্ত্র নয়, তা জনগণতন্ত্র বা নয়াগণতন্ত্রেরই মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাপার (pregnant with greater changes towards socialist democracy)। চতুর্থত, তার মধ্যে যেমন বুর্জোয়াতন্ত্রও আছে, আবার বুর্জোয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধী শক্তিও

আছে, যার অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণাম হলো সমাজতন্ত্র। এতোগুলো ঐতিহাসিক শক্তি ধাপের পর ধাপ এবং কোথাও কোথাও একত্রে জড়িয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সক্রিয়ভাবে দেখা দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে—যার নেতৃত্ব করেছেন মহাত্মা গান্ধী।

নেতৃত্বের কৃতিত্বটাই সমগ্রভাবে গান্ধীজীকে দেবার কোন আবশ্যকতা নেই এবং সে দাবি কারও করা উচিত নয়—গান্ধীজীও নিশ্চয়ই তা করতেন না। কংগ্রেসের মধ্যেও গান্ধীজী ছাড়া আরও শক্তিমান নেতা ছিলেন, তাঁরা সকলে হুবহু গান্ধীবাদী নন। অনেকে আবার গান্ধীবিরোধীও বটে। সুভাষচন্দ্র,* পণ্ডিত নেহরু, এঁদেরও হুবহু গান্ধীনেতৃত্বের অনুচর বলা যায় না। যদিও কমবেশী এঁরাও গান্ধীজীকে মেনে চলতেন এবং তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করতেন। কংগ্রেসের বাইরেও ছোট-বড় অনেক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতাদের সংগঠন ও শক্তি সক্রিয় ছিল, তাঁদের দান ও স্থানও আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এবং কোন কোন সংগঠন গান্ধীজীর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, গান্ধীজীর মত ও পথ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁরা চিরকাল লড়াই করে এসেছেন। তা সত্ত্বেও ফলাফল ও কার্যকারিতা দিয়ে যদি সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের হিসেবনিকেশ করা যায়, তবে গান্ধীজীর স্থান সবার চেয়ে উর্ধে। বড় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তাছাড়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম থেকে এইসব গান্ধী বিরোধীরা কখনোই আলাদা বা ছিন্ন হতে পারেন নি বরং প্রবল বাধা সত্ত্বেও জাতীয় সংগ্রামের সংগ্রাম ক্ষেত্রে বারে বারেই তাদের মিলিত হতে হয়েছে এবং সম্মিলিত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। যেখানে সেই সম্মিলিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে কোনও পার্টি যোগ দিতে পারে নি, সেখানে তারা ভারতের জনতার কাছে নিন্দিত হয়েছে, এমন কি বিশ্বাসঘাতক রূপেও নিন্দিত হয়েছে।

কংগ্রেসকেই যদি সম্মিলিত বিপ্লবীমোর্চা বলে স্বীকার করে না নেওয়া হয়, যদি কংগ্রেসের বাইরেও সংগ্রামশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন থেকে থাকে, তাতেও এই মৌলিক বা ফাণ্ডামেণ্টেল চিত্রটার কোন ইতর বিশেষ হয় না। একথা ঠিক যে কংগ্রেসের বাইরেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সক্রিয় ছিল, কিন্তু কংগ্রেস ও কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রধান আন্দোলনটাকে বাদ দিলে তাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। বরং বলা যায় গান্ধী-নেতৃত্বে যে প্রবল আন্দোলন হতো, তারই আভায় ও প্রভায় এরাও দীপ্তিলাভ করতো, অথবা এ-ও বলা যায় তার প্রভা ও আভা এতো বেশী ছিল যে এদের আলাদা করে, স্পষ্ট করে দৃষ্টিগোচর করা যেতো না। এই হলো Gandhi Epoch (গান্ধী-ইপকের)-এর সম্পূর্ণ ছবি। সহিংস-আন্দোলনের পক্ষপাতি দলও যে দেশে কম ছিল, তা নয়। তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন বটে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি গড়ে তোলবার চেষ্টাও কমিউনিস্টরা কম করেননি এবং তাদের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল বটে, কিন্তু তারা কেউই কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃত্ব উপেক্ষা করে নিজেদের জোরে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। ফলে

* গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য

তারা কংগ্রেসের মধ্যেই হোক আর কংগ্রেসের বাইরেই হোক, যেখানেই যাক. সেখানেও তারা সম্মিলিত গান্ধীনেতৃত্বের ছায়াকে ত্যাগ করতে পারেন নি।

তারপর বিচার করতে হবে যে কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজী হলেও কংগ্রেস গান্ধীবাদ দিয়ে তৈরী নয়। কংগ্রেস একটি বিরাট কিম্ভূতকিমাকার জটিল প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে নানা মত, নানা শক্তি অহরহ অন্তর্দ্বন্দ্ব করে চলেছিল; কিন্তু সবার উপরে প্রয়োজনের চাপে ও নেতৃত্বের গুণে গান্ধীজীকে স্থাপিত করা সম্ভব হয়েছিল। ধনিক, বণিক, চাষী, মজুর, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত কেরাণী, মধ্যবিত্ত - বহুলোক, বহুশ্রেণী, উপশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এসে একত্রিত হয়েছেন। সবাইকে একত্রিত করার সূত্রটি জুগিয়েছেন গান্ধীজী। তাদেরকে নিজের অসামান্য ক্ষমতা ও শক্তির বলেই ভেঙ্গেচুরে, ঠেলেঠুলে দুই যুগ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধী। কিন্তু কংগ্রেস এক মত দিয়ে তৈরী নয়, গান্ধীবাদ দিয়ে তৈরী নয় জেনেই গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্যও থাকা দরকার মনে করেন নি। একটা সাধারণ প্রোগ্রাম বা কমন প্রোগ্রাম, কমন-প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে তার সাহায্যে যতটা এগোনা যায়, এই বাস্তব বুদ্ধি ও প্রয়োজন বোধেই গান্ধীজীকে কংগ্রেসের আন-অফিসিয়েল নেতৃত্ব নিতে হয়েছে।

গান্ধীজীকে যদি মহান-কৃষক বা গ্রেট পিজেন্ট হিসেবেও ধরে নিই তাহলেও মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়াগণতান্ত্রিক তাৎপর্য গ্রহণ করতে বাধে না, অর্থাৎ তাঁকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হিসেবে না দেখতে পেলেও ইতিহাসের ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হয়ে যায় না। কেন? আমরা দেখেছি যে লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও-সে-তুঙের মতে National question is essentially a peasant question। স্বয়ং মার্কসের চিঠি Meyer and Vogt-এর নিকট লেখা, যার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাতেও মার্কস ইঙ্গিত করেছেন যে National liberation of Ireland-এ প্রশ্নটাও হলো তথাকার চাষীদের জীবনমরণের লড়াই ও তাদেরই মুক্তির কথা। সাম্রাজ্যবাদের যুগে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির প্রধান কাজটাই হলো (সেন্ট্রাল টাস্‌ক) চাষীদের মুক্তি—peasant question, এই হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধান্ত। তাই যদি হয় তবে গান্ধীজী যদি বিশেষ করে চাষীদেরই প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, তাতেও ওই সত্যই পুনরায় প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রবল শক্তি ও প্রধান আধার যে বিরাট চাষী-সমাজ, তারই প্রাধান্য যদি গান্ধীজী দিয়ে থাকেন, তবে তো ইতিহাস মার্কসীয় মতানুযায়ীও সত্যিকার যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গান্ধীজীকে বেছে নিয়েছিল। তাছাড়া অপরিগ্রহবাদী গান্ধী ধনী চাষীদের নেতাও ছিলেন না। তাঁর মধ্যে হরিজনটাই মূর্তিমান, তাঁর মধ্যে দরিদ্রতম লোকের ডাকটাই সবার আগে অগ্রগণ্য, তাঁর মধ্যে বিত্তহীন শ্রমিক-শ্রেণীর ডাক না শোনা বধিরতা প্রমাণ করে মাত্র। কুটিরশিল্প ও চাষ নির্ভর সভ্যতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র। নারীজাগরণ, হরিজন, তাঁর মধ্যে unto the last-এর কথাটাই প্রবল। সে-হিসেবে তিনি চরমতম কমিউনিস্টদের চেয়েও বেশী কমিউনিস্ট। অর্থাৎ বিত্তহীনদের মধ্যেও যারা বিত্তহীন, কপর্দকহীন, তাদেরই

কথাটাই তাঁর সারাজীবনের বারো আনা কথা। যাক্, অতদূর না যেতে চাইলেও আমাদের স্বভাবের কার্পণ্য যদি মহৎকে মহৎ বলে স্বীকার করতে রাজি না-ও হয়, যদি তাঁকে ইতিহাসের দিক থেকে চাষীদেরই প্রতিনিধি বলে ধরা হয়, তবু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্বে কোন কলঙ্ক লাগে না। তা বিশুদ্ধ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত ব্যাপার হয়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মিলিত মোর্চার নেতা ও নয়াগণতন্ত্রেরই একজন বাহক হিসেবে গান্ধীজীকে নির্দিষ্ট করলে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হতে হয় না। এবং গান্ধীজী যদি অজ্ঞানতাবশতঃও এত সব কাণ্ড করে থাকেন, তবুও তাতে ক্ষতি হয় না। কারণ মাও-সে-তুঙ যে নিজেই বলেছেন, No matter what classes, parties or individuals in the oppressed nations join the revolution, and no matter whether or not they are conscious of the point mentioned above or subjectively understand it, so long as they oppose imperialism, their revolution becomes part of the proletarian-socialist world revolution and they themselves become its allies. (New Democracy)

যাই হোক, National question বা জাতীয়তার প্রশ্নটা আসলে প্রধানতঃ কৃষকদেরই সমস্যা, একথা সম্বন্ধে মাও-সে-তুঙ কি বলেছেন তা আরো তলিয়ে দেখুন, তিনি তার কতটা তাৎপর্য দিয়েছেন চীনের দৃষ্টান্ত থেকে – "The national question is virtually a peasant question" Stalin has said. That is, to-day the Chinese revolution is virtually the peasant's revolution, and the resistance to Japan was going on is virtually the peasant's resistance to Japan. New-democratic policy is virtually the granting of power to the peasants. The new or genuine Three Peoples' Principles are virtually the principles of the peasants revolution. The problem of mass culture is virtually the raising of peasant's culture. The Anti-Japanese war is virtually a peasants war. Now is the time for following, "the principles of going into the mountains," we hold meetings, write books and put on theoretical performances—all are done on the mountain tops and virtually for the sake of peasants. And all that goes into the resistance to Japan and our own livelihood is virtually provided by the peasants. "By virtually", we mean essentially, not ignoring other factors, as Stalin himself has explained. It is common knowledge to every school boy that 80% of China's population are peasants. So the peasants' problem has become the main problem of the Chinese revolution, and strength of the peasants constitutes the principal force of the Chinese Revolution." (New Democracy)

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মাও-সে-তুঙ একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে চাষীদের পরে দ্বিতীয় শক্তি হলো, চীনের শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকেরা সংখ্যার দিক থেকে চাষীদের তুলনায় নগণ্য হলেও শ্রমিকদের আদর্শ নিয়ে গঠিত যে কমিউনিস্ট পার্টি, তারই নেতৃত্বে চীনের চাষীরা এই বিরাট সংগ্রাম করে চলেছে। নেতৃত্বটা আসলে সংখ্যায় নয়, তা হলো আদর্শের। অর্থাৎ চাষী, বুর্জোয়া আদর্শে ধনতন্ত্র স্থাপন করতে এগোচ্ছে না, মজুর নেতৃত্বের আদর্শে নয়া গণতন্ত্র স্থাপন করতে এগিয়ে এসেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও তার শ্রেণীগত সংখ্যা দিয়ে শ্রমিক পার্টি বলে দাবি করতে পারে না। সেই হিসেবে সেটি চাষী-পার্টি। বড় জোর জনগণের পার্টি, কিন্তু মজুর পার্টি নয়। তবে ঐতিহাসিক আদর্শের ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে তাকে মার্কসীয় অর্থে মজুর পার্টি বলা যায়।

ভারতের ন্যাশনাল-কুয়েশ্চন বা জাতিগত প্রশ্ন বিচার করতে গেলেও কৃষকপ্রধান ভারতের বৈপ্লবিক সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যুগে কৃষকসমস্যা বা চাষী সমস্যাই বলা যায়। তবে ভারতের অবস্থা হুবহু চীনের মতো ছিল না। এখানে ধনতন্ত্র অনেক বেশী প্রসারিত হয়েছিল এবং ধনতন্ত্র তার ঐতিহাসিক ক্ষমতা ফুরিয়ে ফেলছিল। ভারতের সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন অন্যান্য দিক থেকেও ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হয়ে আসছিল। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাটাও ভারতে খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতারা ক্রমশই সমাজতন্ত্রের দাবিটাকে মুখর করে তুলেছিলেন।

এখানে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্কটা বুঝতে চেষ্টা করা দরকার। নাহলে গান্ধীনেতৃত্বটাও পরিষ্কার বোঝা যাবে না। পণ্ডিত নেহেরু ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র, বৈজ্ঞানিকতা, যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদির অক্লান্ত প্রচারক। গান্ধীজীর গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর পদে পদে বিরোধ রয়েছে। এবং এই বিরোধিতা ঐতিহাসিক। পণ্ডিত নেহেরুর আত্মজীবনী গান্ধীবাদেরই সূক্ষ্ম সমালোচনা। অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে, ধর্মীয় পুনরুত্থানের প্রশ্ন নিয়ে, শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে, সমাজতন্ত্র নিয়ে, শিল্পায়ণ (ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশন) নিয়ে, সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে, আধুনিক আদর্শ নিয়ে, প্রত্যেক বিষয়ে গান্ধীজীকে যেমন বুঝবার আছে, তেমনি ধরণের সমালোচনা করবার এমন সুন্দর বই খুব কমই আছে। একদিকে দেখতে গেলে নেহেরু ওই পুস্তকের মাধ্যমে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি গান্ধীজীকে বুঝাতে চেয়েছেন। অপর দিকে দেখতে গেলে গান্ধীজীর অতিপ্রয়োজনীয় বক্তব্যসমূহকে (এসেনসিয়াল ম্যাসেজ) আধুনিক যুগের কাছে তিনি উপস্থাপিত করতে চাইছেন। যেন প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের নিকট নিবেদন করেছেন এবং পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এই পুস্তক গান্ধীজীর উপর কি প্রভাব ফেলেছিল আমরা জানি না। গান্ধীজী এই ধরণের কোন আত্মজীবনী লিখে যান নি। তাছাড়া গান্ধীজী জনতাকে নিয়ে প্রকাশ্যে চিন্তা করতেন বটে, কিন্তু এমন অনেক নিগূঢ় বিষয় আছে, যা তিনি একা একা সঙ্গোপনেই ভাবতেন। তেমন ধরণের এক নিগূঢ় চিন্তা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে জওহরলালের সম্পর্কটা কী হবে, তার নির্ণয়। নেহেরুর সঙ্গে গান্ধীজীর অন্তরের মিল প্রগাঢ় ও

অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে গঠিত। কিন্তু নেহেরুবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের বিরোধ ছিল, যা কখনও গুরুতর সংকটের রূপ গ্রহণ না করলেও, সংকট সৃষ্টি করতো, বিশেষ করে নেহেরুর মনে। নেহেরু ধর্ম সম্বন্ধে কঠিন সমালোচক, ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন ও অজ্ঞতাবাদী বা (এগনসটিক) নেহেরু গ্রাম্যসভ্যতার বিরোধী, শহরকেন্দ্রিক আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার তিনি পক্ষপাতী, নেহেরু বিজ্ঞানভক্ত, জীবনকে ভোগ করবার পক্ষপাতী, তিনি ত্যাগধর্মী নন। নেহেরু ইতিহাসের দিক থেকে অনেকটা মার্কসবাদী, নেহেরু পরিষ্কারভাবে সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি। দেশে যদি গান্ধীজীর মতো এমন অদ্ভুত জটিল প্রতিভার সৃষ্টি না হতো, তবে নেহেরু সম্পূর্ণরূপে কমিউনিস্ট দলে ঢুকে যেতেন হয়তো। কিন্তু নেহেরু বুঝেছিলেন ভারতের জনগণের সত্যিকার নেতা ও সত্যিকার আপনার লোক হলেন গান্ধী। তাই গান্ধীকে বাদ দিয়ে তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশতে পারেন নি। গান্ধীর মতো অতো বড় জননেতা সৃষ্টি না হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও অনেক বড় কিছু কাজ করতে পারতো, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গান্ধীজী জনগণের কাছে সূর্যের মতো তেজে দীপ্যমান থাকার দরুণ অপরাপর চন্দ্র ও নক্ষত্ররা তেমন দৃষ্টিগোচর হতেই পারলো না। তাছাড়া, তারা নিজেদের ভুলে নিজেরাই ম্লান থেকে গেলেন।

কিন্তু কে এই নেহেরু? আমরা আধুনিক-ইউরোপ বলতে যা বুঝি, নেহেরু তারই প্রতিনিধি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে প্রাচীন ভারতের সাথে বুঝি আধুনিক সভ্যতার একটা যে বিরোধ, গান্ধীজীর সঙ্গে বুঝি নেহেরুর বিরোধও তাই। এই সংকট গান্ধীর সঙ্গে কমিউনিজমের সংকটও বলা যায়। গান্ধীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধটাও কখনো মিটলো না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে নেহেরুর সঙ্গে তাদের মিটে গেলো। গান্ধীজীকে নেহরু শেষপর্যন্ত মেনে নিলেন এবং গান্ধীজী নেহেরুকেই তাঁর উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন। তবে কি বুঝতে হবে যে নেহেরু পশ্চিমী সভ্যতাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে গান্ধীর কাছে হার স্বীকার করলেন। ব্যাপারটা অতো সহজ-সরল নয়। আসলে গান্ধীজীর মধ্যে গান্ধীবাদ ছাড়াও একটা বিরাট শক্তি কাজ করে এসেছে, সে হলো ইতিহাস। ঐতিহাসিক গান্ধীর সঙ্গে ঐতিহাসিক ধারার পরবর্তী অধ্যায়ে আরো একটি ঐতিহাসিক শক্তি, অর্থাৎ পণ্ডিত নেহেরুর হাতে ভারতের নেতৃত্ব অর্পণ করে গেলেন। নেহরু যখন আত্মজীবনী লিখেছেন, সেই-নেহেরু, সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নন, সেই নেহেরু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক। যে ঐতিহাসিক-নেহেরুর হাতে গন্ধীজী নানা সংশয়ের পরে ভারতের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন, সেই নেহেরু তখন আরও পূর্ণতা লাভ করেছেন, অর্থাৎ ইতিহাস জ্ঞান তখন তাঁর অনেকটা পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাসকেও নেহেরু তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে, উপলব্ধি করতে শিখেছেন। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'আত্মজীবনীর' নেহেরু ও 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়ার' নেহেরু, ঠিক এক নন। ভারতীয় কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদীর গলদটা ছিল বা আজও আছে, কোথায়? এটাও ইতিহাসের একপেশে জ্ঞানসুলভ। তারা ইউরোপের ইতিহাসকেই ইতিহাস বলে জানেন। ভারতের ইতিহাস, ভারতের শিক্ষাদীক্ষাকে কখনো তারা শ্রদ্ধা করতে

শেখেন নি। তারা আন্তর্জাতিকতা জিনিসটাকে এমন এক abstract (এবস্ট্রাক্ট) পর্যায়ে নিয়ে বুঝেছিলেন যে আন্তর্জাতিকতার জাতীয়-রূপ ও ঐতিহ্যের ধার ও তার অবদানটা তারা বুঝতেই পারেন নি। ফলে তাদের আধুনিকতাবাদ বা মডার্নিজম্ অনৈতিহাসিক এবং একদেশদৃষ্ট এবং জাতীয়তাবিরোধী। প্রথম জীবনে নেহেরুও অনেকটা এই রকমই ইউরোপীয়ান ছিলেন। গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে অবধি তাঁর জ্ঞান পূর্ণতর হতে থাকে এবং যখন 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' লেখা শেষ করেন, তখন তিনি সত্যি সত্যি ভারতের স্পিরিটটা বা শক্তিটাকে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। তাঁর বিশ্ব ইতিহাস জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এই প্রকার নেহেরুর হাতে ভারতের ভাগ্য অর্পণ করে যেতে গান্ধীজীর পক্ষে তাই সম্ভবপর হয়েছিল। এই হলো খুব সংক্ষেপে নেহেরুর উপর গান্ধীজীর প্রভাবের মোদ্দা কথা।

আর গান্ধীজীর উপর নেহেরুর প্রভাবটাও কম নয়। কেন না বর্তমানের দাবিটা, বর্তমান সভ্যতার দাবিটা এসেছে নেহেরুর কাছ থেকে। নেহেরু একটা ব্যক্তিমাত্র নন, নেহেরু পশ্চিমের প্রতিনিধি, সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধি, যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি। নেহেরু কোনও এককশক্তি নন। ভারতের সঙ্গে বিংশশতাব্দীতে পৃথিবীর কি সম্পর্ক হবে, নতুন ভারত বর্তমান পৃথিবী থেকে কী কী নেবে এবং ভারত পৃথিবীকে কী দেবে, এসব বিরাট প্রশ্নও এই নেহেরু—গান্ধীর সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্নিহিত। গান্ধীজী নেহেরুকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতে কমিউনিজমের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। গান্ধীজী যদি পণ্ডিত নেহেরুকে গ্রহণ না করতে পারতেন, তবে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রগতির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো। এবং কমিউনিষ্টরাই এ দেশে সর্বেসর্বা হতে পারতো। সমাজতন্ত্র ও বিজ্ঞানের মৌলিক, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে গান্ধীজী নেহেরুকে গ্রহণ করতে পারলেন। একটা যেন বোঝাপড়া হয়ে গেলো দুটি বিরাট শক্তির। কাজেই চরমপন্থার বা এক্সট্রিমিজমের স্থান হলো না। এবং ধর্মান্ধতা বা ডগম্যাটিজম্ দু-পক্ষ থেকেই অনেকটা ত্যক্ত হলো। যদি গান্ধীজীর পক্ষে এই ধর্মান্ধতা পরিত্যাগ করা সম্ভব না হতো, তবে ভারতের নেতৃত্ব হয়তো রাজাগোপালাচারী বা প্যাটেলের হাতে যেতো, এবং নেহেরু কমিউনিষ্টদের হাতে চলে যেতেন। তাতে ফল কি হতো সে কেবল অনুমানসাপেক্ষ মাত্র। কিন্তু আসলে গান্ধীজী কখনই ধর্মান্ধ বা ডগ্‌ম্যাটিক্ নন। সত্যই যাঁর কাছে ভগবান, তাঁর পক্ষে ডগম্যাটিক বা অন্ধভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সত্যের উপাসক কখনোই বৈজ্ঞানিক না হয়ে পারেন না। বৈজ্ঞানিক গান্ধী, ঐতিহাসিক গান্ধী ভারতের ইতিহাসকে সামনে এগিয়ে দেবার জন্য নেহেরুকেই উত্তরাধিকার দিয়ে যান।

এর অর্থ এই নয় যে, গান্ধীজী তাঁর গোঁড়া ভক্তদের ত্যাগ করলেন, বা গান্ধীজী পরাজয় মেনে নিলেন। নেহেরুর হাতে নেতৃত্ব দেওয়াতে তাঁর পরাজয় নেই। অথচ নেহেরুকে কেন্দ্র করে ভারতের শ্রমিক ও চাষীরা সমাজতন্ত্র গঠনে লেগে যাবেই এমন কোন স্থির শক্তির যোজনাও ভারতে নেই, অর্থাৎ তা স্থিত নিশ্চয় নয়। ট্রেণ্ড বা গতি-ভঙ্গীটা সেদিকে, তারদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভারতের ধনতন্ত্রবাদীরা ও ভারত-শাসনের আমলাতান্ত্রিক অফিসারেরা মিলে নেহেরুকে সামনে রেখে যে একটা

ব্যুরোক্রেটিক শাসন জারি করতে পারে না, বা সেই চেষ্টা করবে না, এমন কথা বলা যায় না। অতএব নেহেরুকে সাদা চেক লিখে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করাও বুদ্ধিমানের কাজ বলা চলে না। এবং তা না হবার পক্ষে অনেক শক্তি কাজও করছে। প্রথমতঃ কমিউনিষ্ট-সোশিয়েলিষ্ট বাম শক্তিগুলিতো আছেই, তারপরে গান্ধীবাদী অনেক নেতা, যথা বিনোবা ভাবে প্রভৃতি শক্তিমান ধারাগুলিও আছে, প্রজাসোশিয়েলিষ্টদের মধ্যে গান্ধীবাদী ধারা বর্তমান। তার উপর ভারতীয় রাজনীতিতে জনতা ঘেঁষা রাজনীতির ঐতিহ্যও গান্ধীজী সৃষ্টি করে গেছেন। সে ঐতিহ্য সহসা নষ্ট হবার নয়। পৃথিবীব্যাপী সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিও অনেক বলবান হয়েছে, ঘরের পাশে চীনের বিপ্লব ভারতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে, রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ ভারতকে সমাজতন্ত্রের পথে যেতে সাহায্য করবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বান্দুং শক্তিসমূহের যে সম্মিলিত মোর্চা তা-ও ভারতকে ঠিক পথে থাকতে সাহায্য করছে। তারপর মৌলিক দিক থেকে দেখতে গেলে একটা মস্ত সত্যকে অবহেলা করলে চলবে না, তা হলো আজকের সাম্রাজ্যবাদী সমাজ থেকে মুক্ত হতে হলে চাষীদের যেমন মজুর নেতৃত্ব স্বীকার করতে হবে, তেমনি চাষীপ্রধান উপনিবেশ ও অর্ধউপনিবেশগুলিকে যদি মুক্ত থাকতে হয়, তবে তাদের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বনেতৃত্বের সাথে সহযোগিতা করতেই হবে।

মোট কথা দেশে ও বিদেশে ভারতকে সমাজতন্ত্রের পথে এগোবার পক্ষে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং সাহায্য বর্তমান। নেহেরু সেখানে একজন ব্যক্তিমাত্র নন, যার খেয়ালে ভারত সমাজতন্ত্রের পথে যাবে কি যাবে না। অতএব আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব নেহরুর খেয়াল নয়, এই প্রস্তাব ভারতীয় ইতিহাসের গর্ভ থেকে অনিবার্য কারণেই জন্ম নিয়েছে এবং বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতিতে তা আরও দ্রুতগামী হতে বাধ্য হবে এবং সাহায্য পাবে।

আমরা পূর্বে বলেছি মাও-সে-তুঙের তিন নম্বর রিপাব্লিকের একটা সর্ত ভারতের ক্ষেত্রে এখনো পূর্ণ দেখছি না। তিনি সেখানে বলেছেন, Republic under the joint dictatorship of several revolutionary classes— যার নাম দিয়েছেন নয়া গণতন্ত্র, এবং যে অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সদ্য স্বাধীন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে সম্মিলিত বিপ্লবী নেতৃত্বের কথা আছে। কিন্তু আজকের ভারতে সেই সম্মিলিত নেতৃত্ব কোথায়? আজকের কংগ্রেস প্রাক্ স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসের মতো ব্যাপক সম্মিলিত মোর্চা নয়। আজকের কংগ্রেস একটা পার্টিরই মতো চেষ্টা ও ছবি। কংগ্রেস থেকে সোশিয়েলিষ্ট ও প্রজাসমাজতান্ত্রিক আরো বিশিষ্ট নেতা সরে গেছেন। ওদিকে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, সোশিয়েলিষ্ট, প্রজাসোশিয়েলিষ্ট আরও কত কি পার্টি মাথা ঠোকাঠুকি করে মরছেন। কাজেই এখানে, এই অধ্যায়ে মাও-সে-তুঙের সম্মিলিত বিপ্লবী শক্তিগুলির একনায়কত্বের সর্তটা পূর্ণ হয় নি এবং হয় নি বলেই ভারত দৃঢ় পদে এবং দ্রুত পদে এগিয়ে যেতে পারছে না। ভারতীয় জনতার পুনর্জাগরণ দেখা দিচ্ছে না। আজ মার্কস্, লেনিন,

মাও-সে-তুঙের ধারা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এ দেশে সম্মিলিত বিপ্লবী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সম্মিলিত সরকার হওয়া দরকার এবং কমনপ্রোগ্রাম নিয়ে সমগ্র জনতার কাছে সম্মুখীন হওয়া ও তাদের সমবেত উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা দরকার, দেশে সমাজতন্ত্র গঠন করার জন্য। যদি এটা সম্ভব হয়, তবে ভারতে সমাজতন্ত্র গঠন চীনদেশের চেয়ে কম দ্রুত গতিতে হবার কথা নয়। বরং সারা বিশ্বের অন্যান্য সুবিধা ভারত যতটা সহজে কাজে লাগাতে পারবে, অন্য কেউ তা পারবে না। কারণ ভারতের শান্তিপূর্ণ অহিংস বিপ্লব পৃথিবীতে ভারতকে এক মহান সম্মান দিয়েছে। যে সম্মান অন্য কেউ পাবে না। শান্তির ভারত পৃথিবীকে শান্তির দিক থেকে নতুন কিছু দিতে পারে। পৃথিবী আজ শান্তিই চায় এবং এই শান্তির বাণী, সহ-অস্তিত্বের বাণীই ভারত এতকাল ধরে সৃষ্টি করেছে।

পাদটিকা

* বিশেষ দ্রষ্টব্য :

জেলে বসে যখন আমি এই লেখাটা তৈরী করি তারপর আজ ত্রিশ বছর কেটে গেছে। আজ যখন এটা ছাপাবার জন্য প্রেসে পাঠাচ্ছি, তখন কিছু কিছু অংশ সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই উপস্থিত। তবে আলোচ্য বিষয়ের মূল কথাগুলির তেমন কোন পরিবর্তন না করলেও চলে। কিন্তু "গান্ধী ও ইতিহাস" অধ্যায়টিতে যা আমি সেদিন লিখেছিলাম, তার অনেক কিছুই, এই ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার, পরিবর্তন করা দরকার। "ইতিহাস" যেখানে আসে, সেখানে বহমান ইতিহাসের গতিপথে সেদিন যা বুঝেছি ও দেখেছি, আজকে তার অনেক কিছুর তাৎপর্য পালটে গেছে। তবু এই অধ্যায়টি যেমন লিখেছিলাম, তেমনিই ছাপতে দিচ্ছি, কেননা আমারি সেদিনকার ধারণাগুলি যা ছিল তা আজও বেশীর ভাগ বামপন্থী রাজনৈতিকদের ধারণা। তৎকালীন level of understanding of the controversies দুঃখের বিষয়, আজও সেই স্তরেই আছে। অথচ দেশ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এই ত্রিশ বছরে কতই না বদলে গেছে!

এই ত্রিশ বছরের ব্যবধানে, আমার নিজের ধারণার বিস্তার অনেক ঘটেছে এবং আমার বর্তমান ধ্যান-ধারণার ও বিচার অনুযায়ী যদি এই অধ্যায়টি আবার লিখতে হয়, তবে তা-ও একখানা বইয়ের আকার হবে হয়তো। সে চেষ্টা যদি করি, তবে আবার করবো, কিন্তু এখন আমি যা লিখেছিলাম, যা ভেবেছিলাম, তাই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে রেখে দিলাম। তবে কোন্ কোন্ বিষয়ে এই অধ্যায়ের বক্তব্যগুলিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা দরকার, সে সম্বন্ধে কয়েকটা ইঙ্গিত করতে চাই।

১। দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে মার্কসবাদী দলগুলি (বিশেষকরে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি। গান্ধিজীর ভূমিকা ভুল করে বোঝার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারতো, তা তারা পারেন নি। মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও-সে-তুংদের চিন্তা ও কর্মধারা ভারতীয় কমিউনিষ্টরা এদেশে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা বোঝেন নি।

২। কমিউনিষ্টরা ভুল বুঝে ভুল পথ নিলেও, ভারতের ইতিহাস বন্ধ হয়ে থাকে নি, দেশ স্বাধীনও হয়, যদিও দেশ বিভক্তও হয়ে যায়। প্রধানত গান্ধী-নেতৃত্বেই যা ঘটার ঘটেছে, এবং যা ঘটেছে তাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কিছু বিরুদ্ধতা প্রমাণিত হয় নি। মার্কস্, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুংরা ইতিহাসের গতিপথের যে দিশারী দিয়েছিলেন ও দেখেছিলেন হুবহু সেভাবে না ঘটলেও, মোটামুটি সেভাবেই ঘটনা ঘটেছে—ভারতীয় কমিউনিষ্টদের বাধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও।

৩। বিশ্ববিপ্লবের বিস্ফোরণকেন্দ্র বা এপিসেন্টার কেমন করে শিল্পপ্রধান মেট্রোপোলিটান দেশগুলি থেকে সরে গিয়ে তা রাশিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া দেশে, এশিয়ার চীন দেশে, ভারতবর্ষে—চাষীপ্রধান দেশগুলিতে চলে এলো, তার মার্কসীয় যুক্তি এই অধ্যায়ে দেখান হয়েছে। তাহলে কি বুঝতে হবে যে কমিউনিস্টরা যদি বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন তবে বিপ্লব হবেই না? দেখা গেলো বিপ্লব হলো,

হয়তো অসম্পূর্ণ বিপ্লবই হলো, অন্যদের নেতৃত্বে। তবে কি কমিউনিস্টপার্টি—ভারতের বৈপ্লবিক বিকাশে অবান্তর বা irrelevant হয়ে গেলো? আর গান্ধীজীই কি কমিউনিস্টদের কাজটা করে ফেললেন? এখানে প্রচুর গবেষণার ক্ষেত্র আছে। বলাবাহুল্য গান্ধী নিশ্চয়ই মার্কসবাদী হয়ে গেলেন না—ইতিহাসের মার্কসবাদী বিচারধারায়। তবে কি হলো? কিছু হলো আবার কিছু হলো না।

৪। এদিকে স্বাধীন ভারত যে বিশ্বপরিস্থিতিতে এসে পড়লো, তার পরিপ্রেক্ষিতটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। পৃথিবীর সব দেশগুলিই এখন পরস্পরের কেবল কাছাকাছি এসে গেছে শুধু তাই নয়, দেশ ও সমাজগুলি যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা যেমন একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোনো দেশ আর তার আলাদা অস্তিত্ব,পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি অবশ্য মার্কসের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু আজকের যে পরিণত চিত্রটা দেখি তাতে জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি খণ্ডচেতনার ক্ষেত্র ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ দেশগুলি.. সে উন্নতই হোক আর উন্নয়নশীলই হোক বা অনুন্নতই হোক—সবাই মিলে যে এক হতে পারছে তা-ও নয়, এদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব নানাভাবে নানা ছোটবড় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে। যদিও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে না—প্রচলিত অর্থে, কিন্তু সারা পৃথিবী ব্যাপী যেন একটা অন্তহীন সংকট, অশান্তি ও ছোট বড় যুদ্ধ লেগেই আছে। ফলে সব দেশ আজ হয়তো 'স্বাধীন' কিন্তু সব দেশেরই স্বাধীনতাও যেন বিপন্ন। ফলে আমরা যেন একটা চিরন্তন, যুদ্ধ যুগে এসে পড়েছি। এই যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে মার্কসবাদী বিশ্ববিপ্লবী কার্যক্রম যেন আর অগ্রসর হতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের ভবিষ্যৎ কোনো ভূমিকা আছে কিনা সে প্রশ্ন আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। না, উভয়েই অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বা irrelevant হয়ে গেলো? তবে আর পথ রইলো কোথায়? মানুষ এখন কোন্ পথে অগ্রসর হবে?

৫। তবে সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? ভারত বা পৃথিবীর মানুষের কি কোনই ভবিষ্যৎ নেই? কবির ভাষায়, "ভাঙ্গা বিশ্বে পড়ে আছে নানা বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপ"—এ রকম মনে হলে মানুষকে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না, মানুষের উপর বিশ্বাস হারালে চলবে না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি যেসব মতবাদ ও ভাবাদর্শ মানুষকে গত তিনশত বছর ধরে উদ্দীপ্ত করেছে, সেই সব ভাবধারাই সীমা কার্যক্ষেত্রে পদে পদে অনুভূত হচ্ছে—এসব ভাবধারারই পরিবর্ধন দরকার। What is dead and what is living in these great ideologies-এর বিচারের সময় এসেছে। সভ্যতার মডেল সম্বন্ধেও পুনর্বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। একে অস্বীকার করা মানে সত্য ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা। গোঁ ধরে কোন ডগমাকে ধরে থাকলে চলছে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহায্যে যেসব দেশে 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাদের ভিতরেও গত ত্রিশবছরে কত রকমের অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা দেখছি, এবং মনে হচ্ছে যেন মার্কসবাদ আর কোন আলো দেখাতে পারছে না—no more a guide to action হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেন। ফলে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও-সে-তুং-এর চিন্তা ও গান্ধীবাদ সব কিছুরই পুনর্বিচারের দরকার হয়ে পড়েছে। অবরুদ্ধ প্রায় বিপ্লবের ধারা আবার কোন্ পথে মুক্ত হবে? মানুষের বুকে আবার বিশ্বাস কী করে সৃষ্টি হবে। অভ্রান্ত সত্য বলে যদি কিছুকেই মনে না হয় তবে 'সত্য' বলে কি কিছু নেই? যদি সত্যই না থাকে, তবে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কিসের উপর, চলবো কোন শক্তিতে ও বিশ্বাসে?

সদ্য স্বাধীন দেশগুলি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে বলে যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজ আর রাখা যাচ্ছে না। উন্নতি বা উন্নয়নের জন্য যে ভোগবাদী মডেল আজ তারা দাঁড় করিয়েছে তাতে আজ তাদের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিপরীতগামীই করে ছাড়ছে। ইওরোপ, আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী আজ আর বিপ্লবের দিকে যাচ্ছে না। বরং নয়া সাম্রাজ্যবাদের সাথে এরকম সুসম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নিয়ে সন্তুষ্ট আছে। বহুজাতিক বা মাল্টি-ন্যাশনাল রাক্ষুসে অর্থনৈতিক সংস্থা-গুলির সঙ্গে পিছিয়ে পড়া দেশগুলি বাধ্য হয়ে যেন গাটছড়া বাঁধতে ব্যস্ত। ভারতেও গান্ধীর পথ আজ আর কেউ অনুসরণ করতে নেই। তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়? কিছু না বুঝেসুঝে অন্ধের মতো কেবল চললে, এমন কি দৌড়ালেও কি চলবে? আমাদের কি আজ কোনো গন্তব্যস্থান আছে, গন্তব্য স্থান নেই অথচ চলতেই হবে—এ কেমন করে চলা যাবে?

যদি আমাকে বা কাউকে "গান্ধী ও ইতিহাস" সম্বন্ধে অধ্যায়টি পুনর্লিখিত করতে হয়, এবং কাউকে না কাউকে তা করতেই হবে—তবে মার্কসবাদকেও যেমন, তেমনি গান্ধীবাদকেও পুনর্মূল্যায়ণ

করতে হবে। গত তিনশত বছর ধরে মানুষ যেসব চিন্তাধারা বা ভাবাদর্শ নিয়ে লড়ছে তাদের কাছ থেকেই যদি সব কিছু উত্তর না পাওয়া যায়, তবে ইতিহাসের গোড়া থেকে যে সব যুগপুরুষদের বাণী এখনও শোনা যায়, সেদিকে কর্ণপাত করতে হবে হয়তো। হাজার হাজার বছরের ওপার থেকে মানুষের যাত্রা-পথের যেসব ক্ষীণপদধ্বনি আমরা শুনতে পাই এবং যা আজ আমাদের racial memory-তে অন্তর্লীন হয়ে আছে। সেসব কথারও বিচার করতে হবে। আমরা, যারা প্রগতিবাদী, তারা যদি তা উপেক্ষা করি, অথচ আমাদের 'আধুনিক' সব মতবাদ দিয়েও ক্রমবর্ধমান প্রশ্নগুলির কোন জবাব না দিতে পারি, তবে নানা ধরণের সনাতনী বা fundamentalism এসে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া বা প্রতি বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতেই আমরা সাহায্য করবো। একটা সামগ্রিক সিংহাবলোকনের বা total assessment করার দিন এসেছে। যদি সে-ভাবে মোহমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হই তবে প্রবীণ ও নবীন সকল চিন্তানায়ক ও পথিকৃতদের আমরা এখনও অনেক কাজে লাগাতে পারবো, এবং বর্তমান নৈরাশ্যবাদী বাতাবরণ দূর হবে। নেই নেই, কিছু নেই-সব গেলো-সবই বৃথা—এমন ধরণের মনোভাব থেকে মুক্তি পাবো। কিন্তু তার জন্য চাই সাহস, নৈতিক সাহস এবং অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হবার প্রতিজ্ঞা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি অংশ দিয়েই এই প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করি......

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
    চঞ্চলতার নীচে
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলই সে
    নেই নেই করে আছে।
ভিৎ ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল
তারা জানিল না অনন্তকাল
    অচিরকালেরই মেলা।
বিজয় তোরণ গাঁথে তারা যত
আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত
খেলা করে বালকের মত
    ল'য়ে তার ভাঙা ঢেলা।

গান্ধীবাদ

এখন আমরা শেষ অধ্যায়ে এসে পেঁছেছি। এখানে দেখতে চেষ্টা করবো গান্ধীবাদ বলে কোন জিনিষ আছে কিনা এবং থেকে থাকলে তা কি, এবং তার ভবিষ্যতই বা কি? ঐতিহাসিক গান্ধীকে তো আমরা দেখেছি। ইতিহাসের কোন্ কাজ তিনি করেছেন এবং কেমনভাবে করেছেন, তা আমরা দেখেছি এ-ও আমরা বলেছি যে গান্ধীজী ইতিহাসের সৃষ্টি হলেও তিনিও ইতিহাসের উপর দাগ রেখে গেছেন অর্থাৎ ইতিহাস সৃষ্টিও করে গেছেন। ইতিহাসে যদি কিছু নতুন ও বিশেষ কোন নয়া জিনিস দিয়ে থাকেন, তবেই বলবো গান্ধীবাদ বলে একটা জিনিষ আছে।

গান্ধীজী নিজে অবশ্য গান্ধীবাদ বলে কিছু আছে তা স্বীকার করেন নি। এবং যারা গান্ধীবাদ বলে তাঁর মতামতগুলিকে তাঁর জীবিত কালেই একটা সাম্প্রদায়িক গোঁড়া দল বা সেক্‌ট হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, গান্ধীজী তাদের সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে গান্ধীবাদ বলে কোন মতবাদ হয় না, তিনি নতুন কোন কথা বলেন নি, তাঁর সত্য ও অহিংসার কথা তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস থেকেই নিয়েছেন, যে সত্য ও অহিংসা এতকাল ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা তিনি জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন মাত্র। গান্ধীসেবাসঙ্ঘ থেকে গান্ধী নামটা তিনি কেটে দিতে বলেছেন এবং যাতে কোন নতুন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তাঁকে একটা সম্প্রদায়ে বা সেক্‌টে আবদ্ধ করে না ফেলে সেই ভয় তাঁর ভয়ানক ছিল। গান্ধীসেবাসঙ্ঘ ভেঙ্গে দেবার সময় তিনি বলেছেন, "There is no such thing as Gandhism and I donot want to leave any sect after me. I donot claim to have originated any new principle or doctrine. I have my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems. The opinions I have formed and the conclusions I have arrived at are not final. I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. All I have done is to try the experiment in both on as vast a scale as I can do. In doing so I have sometimes erred and learnt by my errors ; life and its problems have thus become to me so many experiments in the practice of truth and non-violence. By instinct I have been truthful but not non-violent. As a Jain *muni* once rightly said, 'I was not so much a votary of *ahimsa* as Truth and I put the latter in the first place and the former in the second. For, I was capable of

sacrificing non-violence for the sake of truth. In fact it was in the course of my pursuit of truth that I discovered non-violence."

(Harijan—1936, 28th, quoted from "Mind of Mahatma Gandhi-Ed. Prabu+Rao, page 51)

সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পেয়েছে গান্ধীজীর লেখাতে। কোথাও সেক্টেরিয়ানিজম্ বা ডগমাটিজম্-এর (sctarianism or dogmatism) ঠাঁই নেই তাতে। এবং তিনি নিজে যা আবিষ্কার করেছেন, প্রত্যয় করেছেন, তাকে অবিনশ্বর ও শেষ সত্য বলে জাহির করতে তিনি কোন চাপ সৃষ্টি করেন নি এবং যা কিছু করেছেন তিনি, তার সঙ্গে নিজের নামটা জুড়ে দিয়ে নিজেকে বড় করার কোন লোভ ও চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। সেক্টেরিয়ানিজম্ ও ডগ্মা যাতে তাঁর নাম ঘিরে তৈরী না হয়, সেজন্য তিনি বারে বারে হুঁশিয়ারি করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "There is the danger of your Sangh (Gandhi Seva Sangh) deteriorating into a sect. Whenever there is any difficulty you will turn to my writings in Young India and Harijan, and swear by them. As a matter of fact, my writings should be cremated with my body. What I have done will endure, not what I said and written.''

(Harijan—5.1.37.—Mahatma Gandhi, Vol. IV, page—186)

জগতে প্রত্যেক প্রতিভাকেই এ ভাবে তাঁদের নামের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে তাঁদের শিষ্যরা যে একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে যায়, সে ইতিহাস গান্ধীজীর জানা ছিল এবং তিনি দেখেছেন এই নামকীর্তন শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধবিগ্রহের পর্যন্ত কারণ হয়েছে বারে বারে এবং নেতা যা বলেছেন, এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন নিজের জীবনে এবং নিজের কালে, তাকে সর্বকালের সত্য, সর্বকালের জ্ঞান হিসেবে তাঁদের অনুচরেরা কত না হল্লাই করে থাকেন। গান্ধীজী তাই গান্ধীবাদ সম্বন্ধে এমনি ভয় পেতেন। তিনি বলেছেন, "If Gandhism is another name for sectarianism, it deserved to be destroyed. If I were to know, after my death, that what I stood for had degenarated into sectarianism—I should be deeply pained.. Let no one say that he is a follower of Gandhi—but fellow students, fellow pilgrims, fellow seekers."

· (Harijan, 3. 2. 40)

এ কেবল গান্ধীজীর বিনয় নয়। অনেকে মনে করতে পারেন যে গান্ধীজী স্বভাবসুলভ বিনয়ের খাতিরেই এভাবে বলেছেন যে গান্ধীবাদী বলে যেন কোন সম্প্রদায় না হয়। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে কি করে এক কালের সত্যের অপব্যবহার পরবর্তীকালে হয়ে থাকে এবং কি করে আবিষ্কর্তার নাম করেই তাঁর শিষ্যরা লজ্জাকর কাণ্ড করে থাকেন। এবং তা থেকে ইতিহাসের ও মানুষের কত ক্ষতি হয়েছে। গান্ধীজী এই সম্প্রদায়

দৃষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর নিজের কর্মজীবনেও কম ভোগেন নি। সকল ধর্ম ও সকল মতবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যটুকু তাদের সম্প্রদায় ও মতবাদের (সেক্‌ট ও ডগমার) অচলায়তন থেকে বের করতে তাঁকে কতনা বেগ পেতে হয়েছে। এই সম্প্রদায় ও অন্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে জগতকে, বিশেষকরে ভারতকে হুঁসিয়ার করে দেওয়া গান্ধীজীর একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ।

ভিক্ষু নির্মলানন্দের বড় সখ ছিল যে তাঁর আশ্রমে তিনি একটা কৃষ্ণমন্দির স্থাপন করবেন ও গান্ধীজীর নামে তা উৎসর্গ করবেন। গান্ধীজী প্রস্তাব শুনে তা হেসে উড়িয়ে দেন ও এই অন্ধ মতবাদ (ডগমা) ও সম্প্রদায় (সেক্‌টের)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ভিক্ষু নির্মলানন্দ এই কাহিনী নিজেই লিখে গেছেন এইভাবে, "It was my desire to dedicate a temple of Krishna to Gandhiji. But when I broached the subject to Gandhiji in May 1941, he burst out laughing and then assuming a serious tone, said, 'Yes, the suggestion is good, You wish to do this with all good intentions. You see I have been fighting all life against all kind of superstitions which have corrupted our society and religion and pulled it down to the present level. Your building a temple in the Ashram and dedicating it to me will in due course of time accrue round it new kinds of superstitions against which you will not be able to fight. So instead of creating unity among the different castes and creeds you will, even without your meaning it, create a **Gandhi caste**. I do not want any such thing to be done. But if you believe in what I lived for, I could suggest to you this. Allot a place for prayer in your Ashram and plant round it flower trees. Invite everyone irrespective of caste or religions to visit your place aud pray there. The showers of flowers from the trees on the prayer ground and their refreshing and pleasant odour when you assemble there will create a proper atmosphere for devotion"

(This is Bapu...page 34)

গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী এমনি সজাগ ও সতর্ক ছিল। আজ তাঁর নাম ধরে তাঁর কথাকেই শেষ কথা বলে চালাতে গান্ধীবাদীর অভাব নেই। কিন্তু গান্ধীজী কখনো তাঁর কথাকে চূড়ান্ত বলেন নি। জীবনভর সত্য সন্ধানের পথে তিনি সত্য থেকে সত্যাতে পোঁছাতেন, কোন এককালের কথা আঁকড়ে পড়ে থাকতেন না। কোন একদিন তিনি কোনও কথা বলেছেন বলেই তিনি তাই জীবনভর প্রমাণ করতে বলে যান নি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মতো তাঁর মন ছিল সদাই জিজ্ঞাসু, সদাই সতর্ক এবং নতুনকে গ্রহণ করবার মত সাহস, পুরাতনকে বর্জন করবার মত সাহসিকতা, যদি তা তাঁর কাছে কালে অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি বলেছেন, "People say that

I have changed my view, that I say today something different from what I said years ago. The fact of the matter is that the conditions have changed, I am the same, My words and deeds are dictated by prevailing conditions. There has been a gradual evolution in my environment and I react to it as Satyagrahi." (Mahatma, Vol V, pg., 31)

স্থির সত্য, সনাতন সত্য বলে কিছুকে আঁকড়ে থাকতেন না। সময়ের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করতেন এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতেন। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবনসংগ্রামে এই কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। এই সত্য তাঁর ভিতর ছিল বলেই তিনি ইতিহাসের ডাক বুঝতে পারতেন এবং ইতিহাসের যোগ্য বাহন হতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিলেন, এবং তাঁর সম্প্রসারণ (গ্রোথ) তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্তও অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সেও শেষ বা বন্ধ হয়ে যায়নি। তিনি বলেছেন, "But I am never too old to learn. One is ever young in the felt presence of the God of truth or truth which is God" (Mahatma, Vol V, page 86)

সত্য যাঁর ভগবান, তাঁর কাছে সত্যকে ছাড়া বড় কিছুই নেই। তাই কোন বয়সেই তিনি নিত্যনতুন সত্যকে গ্রহণ করতে অক্ষম হন নি। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর চিন্তা ও প্রতিভার বিকাশ সমানে কার্যকরী ছিল। তিনি বেঁচে থাকলে আরোও অনেক দূর অগ্রসর হতে পারতেন। তিনি বলেছেন, "For as I examine myself, I am growing and evolving. No one is too old to grow, certainly not I." (Mahatma, Vol. V, page 116)

তিনি বলেছেন যে তাঁকে অনেকবার মত বদলাতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য এটা কিন্তু বোঝায় না যে তিনি অব্যবস্থিত ও অস্থিরচিত্তের লোক ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে, "That does not mean that I am unsettled or unbalanced ; that means that those are living organisations and must ever grow, even as a tree is ever growing, I want you also to *grow with me.* I should not care what happens after I am gone, but I wish that your organisation may never be a stagnant pool, but an ever growing tree. Forget me therefore ; my name is unnecessary adjunct to the name of Sangh (Gandhi Seva Sangh)...Measure everyone of your activities by that standard (principle of growth) and face fearlessly every problem that arises" (Mahatma, Vol. IV, page 189)

শিষ্য ও অনুচরদের সম্বন্ধে তাই তিনি বরাবরই হুঁসিয়ার ছিলেন, পাছে তারা গান্ধীবাদ বলে এমন একটা জিনিস চালাতে চায় যার মধ্যে বিকাশ (Growth) নেই, যা একটা বন্ধ অচলায়তন। ১৯৩১ সালেই তিনি বোধহয় চটে গিয়ে লিখেছিলেন,

"I have said before in these pages that I claim no followers. It is enough for me to be my follower. It is by itself a sufficiently taxing performance. But I know that many may claim to be my follower." (Young India, 7.5.31)

চিরকাল শিষ্যমণ্ডলীর হাতে গুরুদেবের কি দশা হয় তা আমরা জানি ও দেখেছি। গান্ধীজীকে নিয়ে এই চেষ্টা তাঁর জীবিতকালেই ঘটেছে। তিনি নিজে তা লক্ষ্য করেছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর একজন প্রধান শিষ্য, তিনি নিজেই আত্মজীবনীতে এক জায়গায় গান্ধীবাদের উল্লেখ করে লিখেছেন, "The No-changers were supposed to be the ardent followers of the Mahatma, but like most disciples of the great, they prized the letter of the teaching more than the spirit." (Nehru-Autobiography, page 104)

কিন্তু চিরকালের No-changer-রা প্রত্যেক মতবাদকে একটা dogma করে ছেড়েছে। তারা সৃষ্টিশীল উন্নয়ন (ক্রিয়েটিভ ডেভোলাপমেণ্ট) না করতে পেরে মহা অনিষ্টের কারণ করে ছেড়েছে। আজও এই দুর্বলতা থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে নি। মানুষের এটা চিরকালের দুর্বলতা। এখানেই সংস্কারাচ্ছন্নতার (কনসারভেটিজমের) উৎস (রুট)। তারা অটল ও শব্দের অনড় অর্থের উপর জোর দিয়ে এককালের সত্যকে চিরকালের সত্য বলে চালাতে চান। একদিক থেকে দেখাকে সবদিক থেকে দেখা বলে প্রতিপন্ন করতে চান। গান্ধীজী নিজে তাই বলেছেন, "I have never made a fetish of consistency. I am a votary of truth and I must say what I feel and think at a given moment on the question without regard to what I may have said before on it ...As my visions get clearer my viewsmust grow clearer with daily practice." (Harijan. 28. 9. 34)

তাই বলে গান্ধীজীকে চঞ্চলমতি Fickle minded লোক বলা যায় না। একথা অতি স্পষ্ট, তাঁর জীবনভর সাধনার মধ্যে একটা সূত্র রয়েছে, সেগুলি বিক্ষিপ্ত চেষ্টামাত্র নয়। সত্যকে আবিষ্কার করা যদিও তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম, তথাপি তা সর্বদা অহিংসার মধ্য দিয়েই সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর মতে সত্যকে আবিষ্কার করা অহিংস পথেই সহজ ও সম্ভব। তাই তাঁর শত চেষ্টার মধ্যেও একটা মোটামুটি ঐক্য আছে। তিনি বলেছেন, "There is, I fancy, a method in my inconsistencies. In my opinion there is a consistency running through my seeming inconsistencies, as in Nature there is unity running through seemlng diversity." (Young India, 12.2 30)

"Inconsistency is apparent. It appears so to many friends because of my responsivness to varying circumstences Seeming consistency may really be sheer obstinacy." (Young India, 16.4 31)

গবেষক হিসেবে জীবন সংগ্রামে নানা ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সকল সত্যান্বেষীর

মতো গান্ধীজীও অগ্রসর হয়েছেন। কেননা এ ছাড়া সত্যকে পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। গান্ধীজীর এই স্পিরিটটা নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, "Evolution is always experimental. All progress is gained through mistakes and their rectification. No good comes fully fashioned out of God's hand, but has to be carved ont through repeated failures by ourselves. This is the law of individual growth. The same law controls social and political evolution also."—(Speeches & Writings of Gandhi, 1918)

কোনও একটি বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠিত করা গান্ধীজীর ব্রত ছিল না, তাঁর ব্রত ছিল সত্যকে আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যের পথে নরনারায়ণকে সেবা করা। মানুষকে তিনি মতবাদের চেয়ে ঢের বেশী উঁচুতে স্থান দিতেন, ফলে তাঁর মধ্যে ডগমা বা অন্ধবিশ্বাস স্থান পেতো না। যখনই তিনি দেখতেন কোনও মত, কোনও ধারণা মানুষের কল্যাণের বা মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি তখনই তা বর্জন করতে পারতেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর যে জনতার উপর আজ এতো প্রভাব, তা কি তাঁর মতবাদের উপর তাদের আনুগত্য থেকে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছেন, কোন cause বা মতবাদ মানুষকে বাদ দিয়ে হয় না, মানুষের জন্যই মতবাদ, মতবাদের জন্য মানুষ নয়, এবং মূলতঃ মানুষের প্রতি আনুগত্যই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

"Seeing the influence you weild over the people," he was next asked, "may we inquire whether it is the love of the cause or the love of the people that moves you?"

"Love of the people" was Gandhiji's unhesitating reply. "Cause without the peopl͏ə is a dead thing. Love of the people brought the problem of untouchability early into my life. My mother said, "You must not touch this boy, he is untouchable." "Why not, "I questioned back and from that day my revolt began" (Pyarelal, Non-Violence in peace and war, page 233-34)

সমস্যা এই যে, প্রত্যেক মতবাদই মূলতঃ মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়। কিন্তু কালে কালে তা মানুষকে বাদ দিয়ে ক্রমশঃই একটি অন্ধ বিশ্বাস বা ডগমাতে পরিণত হয়। গান্ধীজী তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নেই'। অন্যান্য সামাজিক সত্য মানুষকে কতটা উপকৃত করেছে, তাই দিয়ে তার মূল্য নির্ধারিত হবে।

সমস্ত সত্য তিনি একাই পেয়েছেন, সত্যের সমস্তটা তিনি দেখেছেন, এমন দাবি মহাত্মা কখনও করেন নি। তিনি বলেছেন, তিনি সত্যের চরিত্রদর্শন কখনও কখনও পেয়েছেন। সমগ্র সত্যকে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং একটি মানুষের

দৃষ্টি আপেক্ষিক হতে বাধ্য, এবং আপেক্ষিক সত্য relative truth নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এককালের সত্য অপরকালে অন্যরূপ গ্রহণ করে। তাই তিনি সর্বদাই অন্যের মতামত, অন্যের আবিষ্কারকে এতো শ্রদ্ধা সহকারে বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং নিজের মতটাকেই একমাত্র সত্য বলে জাহির করেন নি। "Truth reveals itself in different people, and none can claim that he has the whole truth on his own side. The basic truth, which rests above all, is that men are all brothers and belong to but one single human family. It would, therefore be our purpose, to see the truth in other men's point of view, and also to see ourselves as others see us. In other words, this habit of respect towards the life and civilization of other peoples forms the very foundation of democracy." (Quoted by Prof. N. K. Bose, in vigil, 24 9 55)

এখানেও আমরা গান্ধীজীর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাই, সেখানে অন্ধ-বিশ্বাসের কোন ঠাঁই নেই। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতা যেখানে সংযুক্ত হতে চলেছে, সেখানে এই জাতীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ আধুনিক করে তুলেছে। অর্থাৎ গান্ধীজীকে অনুসরণ করলে কূপমণ্ডুকতার কোন স্থান হয় না। কিন্তু যারা গান্ধীবাদকে একটা অন্ধবিশ্বাসে বা ডগমাতে পরিণত করতে চান, তারা গান্ধীবিরোধী কূপমণ্ডুকতা প্রচার করেন মাত্র।

কিন্তু গান্ধীজীর পুরাতন জিনিষের প্রতি একটা স্বাভাবিক টানও ছিল। যদিও কোন জিনিষ পুরাতন বলেই কিন্তু তাঁর কাছে গ্রাহ্য বা মূল্যবান নয়, তা সত্যিকার বিচারে প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান হওয়া চাই, সাধারণভাবে এই নীতি মানতেন। কিন্তু পুরাতনের প্রতি তাঁর মনের টান অস্বীকার করার উপায় নেই, যার জন্য তাঁর মধ্যে একটা সনাতনী বা কনজারবেটিভ মনও ছিল। তাঁর সনাতনী মনের টানটাকে তিনি কঠিনভাবে বিচার করতেন এবং অনেকক্ষেত্রে তাঁর শ্রদ্ধা সেদিকে ছিল। এই জিনিষ কি করে ব্যাখ্যা করা যায়? সম্পূর্ণরূপে তাঁকে সনাতনী রোগ থেকে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করতে পারা যায় না, তার কারণ হলো তাঁর চরিত্রের মৌলিক ধর্মপ্রবণতা। ভুললে চলবে না যে যত আধুনিক, আর যত অগ্রগামীই তিনি থাকুন না কেন, তাঁর মৌলিক চরিত্রটাই হলো ধর্মপ্রাণতা। এই ধর্মপ্রাণতার ভিত্তির উপর যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, তার চেষ্টা তিনি করে গেছেন।

এই তর্কবিতর্কের এতো গভীরে না গিয়েও সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে আমরা জানি, কতক জিনিসের মূল্য সাময়িক, আবার কতগুলি জিনিষের মূল্য দীর্ঘকালীন। যুদ্ধের যেমন কতগুলি কৌশল ও পন্থা থাকে, সে হিসেবে মানুষের কতক কাজকর্ম অত্যন্ত সমসাময়িক, আর কতক ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যাকে প্রচলিত অর্থে চিরকালীন মূল্য আছে বা ইটারন্যাল ভ্যেলু আছে বলে বলা যায়। আমাদের স্বভাব চরিত্রের অনেকগুলি দিক মানুষ হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় অর্জন করেছে, সেগুলি চিরকালীন মূল্য দাবি করে। মানুষের মধ্যে যাকে আমরা

নীতিজ্ঞান বলি, অহিংসা বলি, এগ্র্লি কিন্তু দ্ব-এক উত্তরাধিকারে তৈরী হয় নি, তারজন্য মান্বষকে বন্যান্তর থেকে উঠে আসতে অনেক মেহনত, অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, তথাপি বারে বারেই পরাজিত হয়েছে। যে অহিংসার কথা গান্ধীজী আজ বলছেন, সেই অহিংসার কথাও ভারতকে হাজার হাজার বছরের চেষ্টার দ্বারা স্মৃষ্টি করার প্রয়াস থেকে হয়েছে। অতএব এই চেষ্টা শাশ্বত। সমস্ত পৃথিবীতে একদিন অহিংসা স্থাপিত হবে, কিন্তু যে কোন এক যুগের কোন একটি মাত্র রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলেই তা ঘটবে, তা নয়। হয়তো সেই শেষ বিপ্লব চরম সার্থকতা এনে দিতে পারে। কিন্তু এই মহান চেষ্টা মান্বষকে হাজার হাজার বছর ধরে করতে হয়েছে। এই প্রচেষ্টা এই আদর্শ যে মহৎ তা-ও মান্বষ স্বীকার করেছে একদিনে নয়, হাজার হাজার বছরের সাধনায়, কামনায় ও ধ্যান দিয়ে এইসব আদর্শ মান্বষ স্মৃষ্টি করে এসেছে। অতএব এগ্র্লির শাশ্বত ম্ল্য আছে, এবং আজকের কোন সাধক আবার এই ধ্যান ও ধারণাকে যখন সার্থক করে কায়েম করতে চান, তখন সেই ইতিহাসে কে কোথায় এই সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা ও তার নজীর ও ঐতিহ্য সব কিছ্ব তাকে একত্রিত করে সঞ্চিত করতে হবে। তাছাড়া যে জিনিষের ম্ল্য আছে, অর্থাৎ ধ্রুব ম্ল্য, তাকে অবশ্যই অতীতেও খ্বজতে হবে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও। কেননা তা তো ক্ষণকাল বা একটি কালের সীমাবদ্ধ জিনিষ নয়। অতএব প্ররাতন ইতিহাসে প্রর্বগামীরা যেখানে যা যা করে গিয়েছেন তার শক্তি স্বক্ষমভাবে হলেও আমাদের উপর আছেই, কেননা আমাদের চরিত্রের মধ্যে আদর্শাদি যেখানে যতটুকু সুপ্ত আছে, তা আছে সেই ইতিহাস থেকেই, আমাদের মন্বষ্যত্ববোধ, আমাদের মহত্ত্ববোধ, আমাদের গৌরবজ্ঞান, আমাদের দেবত্ববোধ, আমাদের আদর্শবাদিতা, এসব এক-দ্বই শত বছরের তৈরী জিনিষ নয়, তার পশ্চাতে আছে হাজার হাজার বছরের সাধনা। সেই শাশ্বত সংগ্রামকে খোঁজ করা, সংহত করার মানে রক্ষণশীলতা নয়। অতএব যারাই যীশ্বর কথা বলবেন, ব্বদ্ধের কথা বলবেন তারাই রক্ষণশীল, এমন ধরণের কথা বলাও যা, আর যারাই Monti Corlo-র (মণ্টি কার্লো) 'উচ্ছৃঙ্খল' জীবন বা নাইটক্লাবের কথা বলবেন তারাই আধ্বনিক বা বিপ্লবী একথা বলাও তাই। অতএব কোনটা রক্ষণশীলতা আর কোনটা গোঁড়ামী আমরা তাঁর চরিত্রের এই ম্লগত বিরোধটা দেখিয়েছি, যখন তিনি ভগবান ও সত্য, এই দ্বই দেবতার প্জো একই সাথে করতে শ্বর্ব করেন। এই দ্বই দেবতা পরস্পর বিরোধী বলেই আধ্বনিক জগৎ জানে। কিন্তু তিনি এই দ্বই দেবতাকে এক দেবতা করার চেষ্টা করে গেছেন এবং সত্যই যে ভগবান, এই কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই দ্বই দেবতার একটা সাধারণ জিনিষ হলো, তার eternity বা অবিনশ্বরতা। কোন জিনিষের দেবত্বের পরিমাণ, অনেক ক্ষেত্রে তার অসীমতার ম্ল্য দিয়ে স্বীকৃত হয়। যে জিনিষের স্থায়ীত্ব বেশী, সে জিনিষের ম্ল্য অধিক, এটাই হলো প্রচলিত রীতি বা ধারণা। ক্ষণকালীন বা ক্ষণস্থায়ী জিনিষের ম্ল্যও ক্ষণস্থায়ী।

Absolute truth ও eternity এগ্র্লো হলো abstract conception. Absolute truth জিনিষটি মান্বষের বোধগম্য হয় না, তেমনি পরমসত্য (এবসলিউট

ট্রুথ) ও অবিনশ্বরতা, এগুলি হলো তত্ত্বগত ধারণা (এব্‌স্ট্রেক্‌ট কনসেপশন)। পরম সত্য ব্যাপারটিই মানুষের বোধগম্য হয় না, তেমনি অসীম বা অবিনশ্বরতাকেও আমরা বুঝে উঠতে পারি না। অথচ এ দুটি ধারণাই যে নেহাৎই কাল্পনিক, একথাও কেউ বলবে না। Sum total of all relative truth is absolute truth—এমন ধরণের কথা বলেছেন লেনিন, আর অসীম বলতে কি সমগ্র কালের যোগফলকেই বোঝায়? Total of all time বোঝায়? রবীন্দ্রনাথ বলবেন, চিরকাল ক্ষণকালের মধ্যে ধরা দেয় বা উঁকি দেয়, জানান দেয়, অসীম সসীমে ধরা দেয় ইত্যাদি। দার্শনিক সত্য হিসেবে এখানে নানা জটিল তর্ক আসে। সে তর্কের মধ্যে না গিয়েও একথা সাধারণভাবে মানতে হয় যে মানুষের মনে অবিনশ্বর সত্যের উপরে একটা টান আছেই আছে। অসীমের জন্য এই আকুতি মানুষ দীর্ঘকালীন সত্বা দিয়ে মিটাতে চায়। অর্থাৎ মানুষ যতদূর সম্ভব দীর্ঘতম অস্তিত্বের সাধনা করে থাকে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইটাও তার এই প্রেরণা থেকেই, শুধু জীবনের মৃত্যু নয় idea-র (আইডিয়া), ভাব বা ধারণার মৃত্যুও। সেই দিক থেকে মানুষ মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের অস্তিত্বে সুখী হয় না। তবে অসীম-অবিনশ্বরতা আর সংরক্ষণশীলতা এক জিনিষ হয়তো নয়। কোনও জিনিষ অসীম ও অবিনশ্বর হতে পারে কিন্তু তার প্রকাশ সংরক্ষণশীল হতে হবে একথা মানা চলে না। অসীমতাকে চিরগতিশীল ও প্রগতিশীল করা সম্ভব হয় না কি? চিরগতিশীল অবিনশ্বরতা (dynamic eternity) একথা দুটি হয়তো পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ Democratic centralism—ordered freedom বা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এসবও স্বতঃ বিরুদ্ধ কথা, তাহলে আমরা তাদের মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি করি কেন?

তর্কবিতর্কের এতো গভীরে না গিয়েও সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে আমরা জানি আমাদের শাশ্বত ঐশ্বর্য ও সাধনা, তার মধ্যে পার্থক্য বোঝা চাই, এ-ও বোঝা চাই যে যা কিছু নতুন তাইই নবীন নয়, যা কিছু আধুনিক তাই বৈপ্লবিক নয়। এ বিচার থেকে যদি আমরা গান্ধীজীর প্রাচীন ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাটাকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখা যাবে যে শাশ্বত ঐশ্বর্যের ও সাধনার প্রতি টানটাই বেশী এবং অবশ্য একথাও ঠিক, অনেক সময় তাঁর এই শাশ্বত ধারণার সঙ্গে রক্ষণশীলতা জড়িয়ে গিয়েছে। যে নেহেরু তাঁর 'আত্মজীবনীতে' গান্ধীজীর অতীত-প্রীতিতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, যাকে পুনর্জাগরণ বা রিভাইভেলিজম্‌ হচ্ছে বলে ভীত হয়ে পড়েছিলেন, সেই নেহেরুই তাঁর 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' বইতে লিখেছেন, "India must break with much of her past and not allow it to dominate the present. Our lives are encumbered with the dead wood of the past; all that is dead and has served its purpose has to go. But that does not mean a break with, or a forgetting of, the vital and life giving in the past. We can never forget the ideals that have moved our race, the dreams of the Indian people through the ages, the wisdom of the ancients, the buoyant energy and love of life and nature of

our forefathers, their spirit of curiosity and mental adventure, the daring of thought, their splendid achievements in literature, art and culture, their love for truth and beauty and freedom, the basic values they set up, their understanding of life's mysterious ways, their toleration of other ways than theirs. Their capacity to absorb other peoples and their cultural accomplishments, synthesise them and develop a varied and mixed culture ; nor can we forget the myriad experiences which have built up our ancient race and lie embeded in our subconscious minds. We will never forget them or cease to take pride in that noble heritage of ours. If India forgets them she will no longer remain India and much that has made her joy and pride will cease to be "

(Discovery of India, page—431)

তিনি আরও বলেছেন ওখানেই, "We have to receive the passion for truth and beauty and freedom which gives meaning of life, and develop afresh that dynamic outlook and spirit of adventure which distinguished those of our race who, in ages past built our house on these strong and enduring foundations Old as we are, with memories stretching back to the early dawns of human history and endeavour, we have to grow young again, in tune with our present time, with the irrepressible spirit and joy of youth in the present and its faith in future." (Ibid, page—431)

এই spirit, এই passion for truth-ই গান্ধীজী ভারতের ইতিহাসে খুঁজে পেতেন, তাই তাঁর ভারতের উপর এতো শ্রদ্ধা ও এতো বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বার বার বলেছেন, I believe absolutely that India has a mission for all the world.

গান্ধীজী বলেছেন, "My ambition is much higher than Independence Through the deliverance of India, I seek to deliver the so called weaker races of the earth from the crushing heels of western exploitation.

I venture to suggest, in all humility that if India reaches her destiny through truth and non-violence, she will have made no small contribution to the world peace for which all the nations of the earth are thirsting and she would also have, in that case, made some slight return for the help that those nations have been freely giving to her." (India of my dreams-ed. Prabhu)

পণ্ডিত নেহেরুর truth সম্বন্ধে ধারণাও শেষপর্যন্ত গান্ধী-প্রভাবিত। Discovery of India-তে আছে, Truth-এর সংগে eternity-র সম্পর্ক তিনি কিভাবে দেখছেন,

"Truth as ultimate reality, if such there is, must be eternal, imperishable, unchanging. But that infinite, eternal and unchanging truth cannot be apprehended in its fullness by the finite mind of man which can only grasp, at most, some small aspect of it limited by time and space, and by the state of development of that mind and the prevailing ideology of the period. As the mind develops and enlarges its scope, as ideologies change and new symbols are used to express that truth, new aspects of it come to light, though the core of it may yet be the same. And so, truth has ever to be sought and renewed, reshaped and developed, so that, as understood by man, it might keep in line with the growth of his thought and the development of human life. Only then does it become a living truth for humanity, supplying the essential need for which it craves, offering guidance in the present and for the future."

(Discovery of India—page—431)

গান্ধীবাদ ব'লে যে কিছু আছে, সেকথা গান্ধীজী স্বীকার করেন নি। কিন্তু গান্ধীজী যতকিছু কাজ করেছেন, যত কিছু চেষ্টা করেছেন, যেভাবে জীবনের সাধনা করেছেন, সেগুলি সামান্য জিনিষ নয়, এর চেয়ে অনেক কিছু কম করেও অনেক 'বাদ' সৃষ্টি হয়েছে। অনেক রামা শ্যামাও তাদের নামের পিছনে 'বাদ' সৃষ্টি করেছেন যখন, তখন গান্ধীজীর মতো অদ্ভুত প্রতিভা এবং এমন অনন্যসাধারণ লোকের পিছনে কেন একটা 'বাদ' জুড়ে দেওয়া যাবে না? সে হিসেবে দেখতে গেলে গান্ধীবাদের দাবি আছে বৈকি! কিন্তু যে হিসেবে গান্ধীজী গান্ধীবাদকে অস্বীকার করেছেন, তা হলো এই যে, তিনি যা কিছু করেছেন এবং বলেছেন, তাই নিয়ে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ বা Self sufficient (সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট) জীবনদর্শন, সমাজদর্শন তৈরী করে একটি তথাকথিত কট্টর সম্প্রদায় (ক্লোসড্ ডোর সেক্ট্) তৈরী করা মানে গান্ধীজীর শিক্ষা, রুচি ও জ্ঞানের বিরোধীতা করা। আমরা যদি সেইভাবে তাঁকে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে গণ্য করি তাহলে তাঁকে অপমান করা হয়। তিনি একজন সত্যসাধক, তিনি মহানপথিক, তিনি একজন মহাননেতা, তাঁর অনেক চেষ্টা, অনেক কাজ, অনেক ভাবনা, অনেক দূরদৃষ্টি ও সাধারণ জ্ঞান আমরা দেখেছি; তাঁর থেকে শিক্ষা নেবো, শক্তি নেবো, নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানানুরাগ নেবো, নেবো তাঁর জীবনের প্রীতি; মানুষের প্রতি ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার শক্তি, আর অহিংসার বাণী, যে অহিংসা হলো সভ্যতার পরমসুন্দর মূর্তি। অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী, অসাধারণ সাহসের কাহিনী, নিজেকে তুচ্ছ করার কাহিনী—এসব দিক থেকে তাঁর জীবন একখানা আধুনিক মহাভারত। যে বিশ্বসভ্যতা ও সাম্যবাদ পৃথিবীতে স্থাপিত করতে চাই,

তার পথে ও সেখানে তিনি যে জাতীয় অহিংসা ও সহনশীলতা ও বিশ্বপ্রেমের মনোবৃত্তি রচনা করতে চেয়েছেন, তা আগামী সভ্যতার জনজীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। অর্থনীতির দিক থেকে, রাষ্ট্রতন্ত্রের দিক থেকে মার্কসবাদ ওই সভ্যতার বুনিয়াদ গঠনে মহান দান দিয়েছে, নৈতিক ও জনজীবনের দিক থেকে গান্ধীজীর দানটাও সেই বুনিয়াদকে শুধু ভূষিতই করবে না, সুন্দর ও সহজ করবে। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বুনিয়াদটা স্পষ্ট ও বাস্তব, কিন্তু নৈতিক সম্পদটা অনেকটা বিভ্রান্তিকর, কখনও আছে আবার কখনও নেই, অনেক সময় বোঝাই শক্ত হয়। তাই গান্ধীজী যে নৈতিক আদর্শের নমুনা তাঁর নিজের জীবনে ও মরণে দেখিয়ে গেছেন, যা তাঁর দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের মধ্যেও সমস্ত জাতির প্রাণেও একদিন প্রেরণা জাগিয়েছিলো, তা হয়তো আজ নেই, অথবা কোথাও আছে তা-ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা আবার প্রতিদিনের তুচ্ছতা ও লাভলোকসান নিয়ে মত্ত, অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, আজ যেন গান্ধীজীকে শোষণ করছি, অনুসরণ করছি না, কেননা তাকে অনুসরণ করার অর্থ দুঃখ ও ত্যাগকে বরণ করে নেবার পথ, ভোগ করার নেশা চরিতার্থ করাতে নয়, এবং সেই মহান বিশ্বসভ্যতা গঠনের পথে আজও যে অনেক সাধনা ও অনেক দুঃখবরণ করার প্রয়োজন আছে, সে কথা কে অস্বীকার করতে পারে? যদি না পারে, যদি আজও সত্যাগ্রহ ও দুঃখ বরণ করার প্রয়োজন থাকে তবে আমরা গান্ধীজীকে ভুলি কি করে? অনেক সময় মনে হয় গান্ধীজী যেন এক মহান ব্যর্থতা। তিনি নিজেই আবার লিখেছিলেন, "But it may be that the only fitting epitaph after my death will be, '*He tried but signally failed*'." (Harijan—13. 4. 1940) কখনো কখনো সে ভ্রম আজ ভারতবাসীরও হয় বটে। কিন্তু তা নয়—মহান আদর্শ ও মহান স্বপ্ন যে কেমন করে বেঁচে থাকে তা আশ্চর্য! এদের মৃত্যু নেই, বরং যা কিছু বাস্তবতার জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছে, যা কিছু ক্ষমতার উপদ্রব আজ পৃথিবীকে তাদের অস্তিত্বের পদভরে কম্পিত করে তুলেছে, তাদের কালের পদতলে ধূলি হয়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগে না; অতীতেও এমন হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে কণামাত্র সত্য পর্বতপ্রমাণ মিথ্যার ও অাঁধির অহমিকার চেয়েও শক্তিমান। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষণকালের দৃষ্টিতে যা সম্ভাবনা মাত্র, মহাকালের কালস্রোতে তাই-ই বাস্তব। একথাও একদিন স্থায়ী সত্য রূপে গ্রাহ্য হবে যে অহিংসা বলৈষণার চেয়ে শক্তিমান। সেই দৃষ্টি থেকে দেখতে গেলে, সেই চিরন্তন শহীদের বাণীই মনে পড়ে যে এমন মহান ব্যাপার আছে, যার ব্যর্থতাও মহান অথচ বৃথা নয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দুইজাতীয় প্রতিভার সাক্ষাৎ আমরা পাই, একদল হলেন ধর্মপ্রচারক, অপরদলটি হলেন, পথপ্রদর্শক বা নেতা। এযুগ ধর্মস্রষ্টাদের নয়, এযুগ হলো নেতাদের, যেমন এই যুগে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয় না। আসল কথা হলো, গুরু বা প্রোফেট দেখা না দেওয়া পর্যন্ত বোধকরি গুরুর প্রয়োজন কেউ স্বীকার করেন না। আর নেতৃস্থানীয় হলেন তাঁরাই, যাঁরা যুগের নেতৃত্ব করতে পারেন, ইতিহাসের, সাময়িক কালের ইতিহাসের বাহন হতে পারেন তাঁরা, যাঁরা আদর্শের

সঙ্গে বাস্তবের মিলন ঘটাতে পারেন। কিন্তু গুরু বা ধর্মপ্রবক্তা হলেন তাঁরা, যাঁরা ইতিহাসের দীর্ঘকালপ্রবাহকে গ্রহণ করে তার মধ্যে একটা শাশ্বতমূল্য স্থাপন করতে চান। যাঁরা হয়তো সমকালীন বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী হন না, যাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় প্রায়শই ব্যর্থ হন, অথচ দীর্ঘ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহান সার্থকতা লাভ করেন। গান্ধীজীর মধ্যে আমরা নেতা ও প্রবক্তা, এই দুয়েরই সংমিশ্রণ দেখতে পাই। সাময়িক দৃষ্টিতে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের নেতা ছিলেন এবং সেখানে কতকটা সার্থকও হন কিন্তু যেখানে তিনি প্রবক্তা, সেই অহিংসার ক্ষেত্রে, তিনি আরও প্রবক্তাদের মতোই বিফল। সুদূর ভবিষ্যতের কালপ্রবাহের ইতিহাসে হয়তো একদিন তাঁর নেতৃত্বের সার্থকতাটাই ম্লান হয়ে যাবে, অথচ তাঁর অহিংসার প্রবর্তনের প্রবক্তাসুলভ ব্যর্থতাটাই—prophetic failure in non-violence-টাই উজ্জ্বল ও চিরন্তন সার্থকতার দাবি করবে। গান্ধীজীর মধ্যে prophet ও statesman এই দুটি শক্তি অনবরত সক্রিয় ছিল এবং স্থানে স্থানে তা বিরোধ সৃষ্টি করতো।

গান্ধীজীর মনোজগতের কার্যকলাপের বিচার করতে গিয়ে নেহেরু তাঁর Discovery of India',—তে Liddel Hart-এর একটা উধৃতি গ্রহণ করেন। যাতে Liddel Hart, Leader and Prophet-এর পার্থক্য দেখাতে চান।

"History bears witness to the vital part that the 'Prophets' have played in human progress, which is evidence of the ultimate practical value of expressing unreservedly the truth as one sees it. Yet it also becomes clear that the acceptance and spreading of that vision has always depended on another class of men, 'leaders' who had to be philosophical strategists, striking a compromise between truth and men's receptivity to it. Their effort has often depended on their own limitations in perceiving the truth as on their practical wisdom in proclaiming it.

"The prophets must be stoned ; that is their lot, and the test of their self-fulfilment. But a leader who is stoned may merely prove that he has failed in his function through a defficiency of wisdom, or through confusing his function with that of a prophet. Time alone can tell whether the effect of such a sacrifice redeems the apparent failure as a leader that does honour to him as a man. At the least, he avoids the more common fault of leaders that of sacrificing the truth to expediency without ultimate advantage to the cause. For whoever habitually supresses the truth in the interests of fact will produce a deformity from the womb of his thought."

লিডেল হার্ট তারপর দেখান যে truth (ট্রুথ ও ট্যাক্‌ট) ও tact-এর বিরোধ এড়ানো হয়তো সম্ভব, সামরিক বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রেই তিনি এসব আলোচনা করেন। আমরা গান্ধী-জীবনে দেখেছি, সত্যের সঙ্গে তিনি বাস্তবের দাবি কিভাবে মিলিত করতেন, এই সমঝোতা করা সত্ত্বেও সত্যকে কুণ্ঠিত হতে দিতেন না। এভাবে তো নেতা হিসাবেও ভারতের রাজনীতিতে তিনি সার্থকতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সে সার্থকতাটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কথা নয়। কেন না অনেক দেশই স্বাধীন হয়, হয়েছে, হবে এবং তারও নেতা থাকবে। কিন্তু যারজন্য তাঁর জীবন, সেই সত্য ও অহিংসার সাধনা, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে সার্থকতা হয়েছে বলে বলা কঠিন। সেখানে তিনি প্রবক্তাদের মতোই নিহত হয়েছেন, যেখানে তাঁর বাণী পৃথিবীর বুকে গভীর দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে মাত্র। সেইখানে, মানুষের সেই গভীর মর্মবেদনার মাঝখানে তাঁর প্রবক্তাসুলভ সার্থকতা বা প্রফেটিক সাকসেস অংকুরিত হয়েছে বিরাট সম্ভাবনার বাণী নিয়ে।

গান্ধীজীর মতো বিরাট প্রতিভা যেখানে, যেক্ষেত্রে উদয় হয়, তার অস্তগমনের পর তাঁর সেই ধারা বহুধারায় বিভক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। যুগান্তকারী প্রতিভামাত্রেরই এই পরিণাম অনিবার্য। গান্ধীজীর নানা ভক্ত, শিষ্য ও অনুগামী নানা দিকে বিভক্ত হয়ে চলেছে। বহু ধারা ও উপধারা দেখা দেবে হয়তো। তারা গান্ধীবাদ সৃষ্টি করবেন ও করছেন। যারা তাঁর শক্তির কিছুটা অংশও পেয়েছেন, তারা সহজে গান্ধী-বাদকে অচলায়তনে পরিণত হতে দেবেন না। তারা সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটাতে কুণ্ঠিত হবেন না। গান্ধীর মতো লোক পৃথিবীতে ও ইতিহাসে অহরহ জন্মেন না, তাঁর স্থান একা কেউ অথবা অনেকে একত্রেও পূরণ করতে পারে না। সমগ্র মানবজাতিই তাঁর মতো লোকের সত্যিকার উত্তরাধিকার বহন করার ক্ষমতা রাখে।

উপসংহারে আমাদের সকলের জীবনের উপরেই গান্ধীর প্রভাব আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা যায় এটা শুধু গান্ধীর প্রভাব নয়, ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রভাব। আমরা বামপন্থীরা, মোহাবিষ্ট হয়ে ভারতের ইতিহাসকে ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিলাম। তাতে আমাদের যাত্রাপথের একটা মূল সূত্রই আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম ও ছিন্নমূল হয়ে হাকুপাকু করে ও পরের অনুকরণ করাতে মত্ত ছিলাম। গান্ধীজী আমাদের ঐতিহাসিক শক্তি যুগিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাদের নিজেদের শ্রদ্ধা করতে শিখিয়ে গেছেন এবং মূল্য দিয়েছেন। গান্ধীজীর প্রভাব সমস্ত ভারতের উপর সকল দল ও মতের উপর পড়েছে। যারা তাঁর বিরুদ্ধবাদী, তারাও তাঁর দ্বারা অনেকটা অজানিতেই প্রভাবিত হয়েছেন। যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাবে বামপন্থী ও এমন কি মার্কসবাদী দলগুলির রাজনীতিও তিনি প্রভাবিত করে দিয়ে গিয়েছেন। আজ সকল দলেই moral কথাটা জ্ঞানতই হোক, অজ্ঞানতই হোক, গৃহীত হয়েছে। গান্ধীজীর একটি বিশেষ দান হচ্ছে এই রাজনীতিতে এই নৈতিকতাকে আনা, উপায়ের উপর খেয়াল রাখা, সততার উপর শ্রদ্ধা আনা, এসবই গান্ধীজীর দান। দলাদলি রাজনীতিতে আছে, এতো কম নয়। তবু দলাদলিতে খুনোখুনি আসে নি গান্ধীজীর প্রভাবেই। বিরুদ্ধ দল বা বিদ্রোহী

নেতাকে গুম করে দেবার রাজনীতি ভারতে গান্ধীর অহিংসার পর আর আসা সহজ নয়, কেন না We all have developed a weakness for morals and non-violence. আমাদের public life এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এইকথা পণ্ডিত নেহেরু লিখেছেন এইভাবে,

"Very few persons in India accept in its entirety his doctrine of non-violence or his economic theories, yet very many have been influenced by them in some way or other. Usually speaking in terms of religion, he has emphasised the moral approach to political problems as well as those of every day life. The religious background has affected those chiefly who were inclined that way, but the moral approach has influenced others also. Many have been appreciably raised to higher levels of moral and ethical action and many more have been forced to think at least in those terms and that thought itself has some effect on action and behaviour. Politics ceased to be just expediency and opportunism, as it usually has been everywhere, and there is a continuous moral tussle proceeding thought and action. Expediency or what appears to be immediately possible and desirable, can never be ignored, but it is toned down by other considerations and longer view of more distant consequences."

(Discovery of India, page, 374-75)

31st July, 1955

পরিশিষ্ট

(কৈফিয়ৎ)

গান্ধীয়ান বা গান্ধীসাহিত্য আজ বিপুল কলেবর ধারণ করেছে। গান্ধী স্মারকনিধির গণনা মতে দেশী ও বিদেশী নানা ভাষায় গান্ধীজী সম্বন্ধে পুস্তকের সংখ্যা আজ কয়েক হাজার এবং দিন দিনই নতুন নতুন বই বের হয়ে চলেছে। তাছাড়া গান্ধীজীর নিজের লেখাও বিরাট। তাঁর সমগ্র লেখার সংকলনের ভার ভারতসরকার নিয়েছেন এবং মনে করেন যে তা ষাট খণ্ডে সম্পূর্ণ করতে পারবেন। বলাবাহুল্য, আমি এই বিরাট সাহিত্যের সামান্যই এই লেখায় ব্যবহার করতে পেরেছি। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে বইপত্রের সুবিধা অতি সামান্য ও অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বই আমি ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে লিখতে শুরু করি এবং জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করি। তারপরেও আমি গান্ধীজী সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি, অনেক মূল্যবান বই এরপরে বের হয়েছে। ফলে এই সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান অনেক বেড়েছে বলে বলতে হবে। আজ এই পরিশিষ্ট লেখার সময় আবার যখন লেখাটা পড়লাম, তখন মনে হয়েছে, এর কত উন্নতি করা যেতো, আমার বক্তব্যের আরও কত জোর দেওয়া যেতো। আরও কত সুন্দর সুন্দর উধৃতি দেওয়া যেতো। আবার নতুন করে বেশ কয়েক খণ্ড বই তৈরী করার ইচ্ছাও জাগে। কিন্তু ভেবে দেখলাম, বিরাট বিষয় এই গান্ধীজী, যাঁকে অধ্যাপক হীরেণ মুখার্জী বলেছেন, একটি জীবনী নয়, একটা phenomenon, তা লিখে শেষ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট হওয়া, তা এক খণ্ডেই হোক, আর কয়েক খণ্ডেই হোক, তা সম্ভব নয়। লিখে আশ মিটবে না। প্যারেলালজী দীর্ঘ আট বছর ধরে গান্ধীজীর শেষ জীবনীটুকু Last Phase দুই বিরাট খণ্ডে শেষ করেছেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন, লিখে শেষ করলাম বটে, কিন্তু যেন শেষ করতে ইচ্ছা করছে না। অর্থাৎ হয়তো তিনি জীবনভর লিখে গেলেও ক্লান্তি বা সমাপ্ত হলো বলে মনে করবেন না।

আমার পক্ষে এই বই লেখার অধিকার হয়তো কেউ স্বীকার করবেন না। সেকথা আমি জানি। কিন্তু গান্ধীজীর সম্পূর্ণ জীবন ও সকল কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সমস্ত বইখানিতে আমি প্রধানতঃ একটি মাত্র তত্ব বা থিসিস দেখাতে চেষ্টা করেছি। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যা লিখেছি, তার উন্নতি করা সম্ভব হলেও আমার যেটি বিশেষ বক্তব্য, তা আমি দেখাতে পেরেছি। গান্ধীজীকে বামপন্থীদের কাছে নতুন ভাবে দেখানো এবং তথাকথিত কট্টর গান্ধীবাদীদের নিকট ঐতিহাসিক গান্ধীজীকে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। জানি না এর ফল কী হবে। আমি শুধু গান্ধীজীকেই দেখতে চাই নি, অথবা গান্ধীজীতেই দৃষ্টি আবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করে রাখি নি। গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমগ্র ইতিহাসকে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছি। গান্ধী, মার্কস্, লেনিন,

প্রভৃতি যুগপুরুষদের আমি এক একটি শক্তিমান ও বিরাট দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ) ও অন্তরবীক্ষণ (ইম্ট্রোস্কোপ ?) যন্ত্র মনে করি। কাজেই ব্যক্তিকে পাঠ করাতেই সীমাবদ্ধ রাখলে তাতে 'ডগমা' বা অন্ধবিশ্বাসের সৃষ্টি হবেই। ফলে বিষয়বস্তুটা এতো বিরাট ও বর্ধমান হয়ে পড়ে যে আমি ঠিক করতে পারি না কোথা থেকে শুরু করবো এবং কোথায় শেষ করবো। কাজেই লেখাতে তাই আশ মেটে না। আরম্ভ করতে যেমন ভয় পাই, শেষ করতেও তেমনি কষ্ট হয়।

অনেক বই বাজারে বেরিয়েছে বটে কিন্তু যে বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি দেখেছি, তেমন দিক থেকে কাউকে লিখতে দেখিনি বা শুনি নি। কাজেই সাহস করে নিজের অযোগ্যতা ও অনধিকার সত্বেও লিখলাম, হয়তো একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। হয়তো সত্যসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো। নতুন করে লোকের উৎসাহ জাগবে গান্ধীজীকে বুঝবার জন্য। আজ গান্ধীজীকে নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। গান্ধীবাদ নিয়ে আজ নানা ধারার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকেই গান্ধীজীকে নিজের নিজের করে বুঝে নিতে চাইছেন এবং গান্ধী-বাদীদের মধ্যে নানা বিভাগ, এমন কি বিরোধও দেখা দিয়েছে। কে সত্যিকার গান্ধীবাদী ? বিনোবা, কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেহেরু, রাজাগোপালাচারী, জয়প্রকাশ, ইত্যাদি নেতার মধ্যে গান্ধীজীকে নিয়ে বিতর্ক আরো স্পষ্ট হতে বাধ্য। অনেক ঘটনা ও ভিতরকার কথা যা চাপা পড়েছিল, তা-ও ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে। প্যারেলালের 'লাস্টফেজ' এবং মৌলানা আজাদের আত্মজীবনী ও এই জাতীয় বইতে বিতর্কের প্রেরণা জোগাবে। ফলে সত্যসন্ধানী গবেষকদের দৃষ্টি পড়বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের পুনর্বিচারের জন্য। ছোটখাট ঝগড়া, মনোমালিন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাবে, অনেকে হয়তো তা পড়ে আশ্চর্য হবেন। দুঃখিত হবেন, আহত হবেন, কিন্তু তা হলো 'সেন্টিমেন্টাল রিএকশন' বা প্রতিক্রিয়া। এরমধ্য দিয়ে সত্যপ্রকাশের পথ পরিষ্কৃত হবে ও প্রশস্ত হবে, এবং সত্যিকারের যা সত্য তা প্রকাশ পাবে, তাতে গান্ধীজী সম্বন্ধে কোনও ভারতবাসীর লজ্জিত হবার কারণ থাকবে না। এই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া গান্ধীজী নিজেই বলেছেন, "After I am gone, no single person will be able to completely represent me. But a little bit of me will live in many of you. If each puts the cause first and himself last, the vaccum will to a large extent be filled."

(Mahatma Last Pase, Vol II, page-782)

এবং সত্যি সত্যি আজ উপরোক্ত কোন একজন নেতা একাই বা কোন একটি দল একাই গান্ধীজীকে প্রকাশ করতে পারছেন না, এবং আমার মতে পারবেনও না। যোগ্যতা ও ক্ষমতার অভাব ছাড়াও মনে রাখতে হবে ক্ষেত্র ও কালের পরিবর্তন হয়েছে, ভারতের ও পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, যুগধর্ম আজ আরো নতুন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত। গান্ধীজী থাকলেও তাঁকে আজ নিজেকে আরো এগিয়ে আনতে হতো, যদি এই নতুন পরিস্থিতিতেও তাঁকেই নেতৃত্ব করতে হতো। অতীতের

কথা ও কার্যকলাপ দিয়েই আজকের গান্ধীপন্থা কি হতো তা সম্পূর্ণ বোঝা মুশকিল, এরজন্য চাই সৃজনশীল মননশীলতা— creative thought and not dogma.

এই পরিশিষ্ট অধ্যায়ে দু-একটি বইয়ের একটু সামান্য সমালোচনা দিয়ে শেষ করবো, যতটা করলে আমার বক্তব্যটুকু বুঝতে সাহায্য করবে, তার বেশী নয়। কেননা সত্যিকারের সমালোচনা করতে গেলে তার আকার আবার একটি বইয়ের মতো হবে। এতো পড়বে কে ? এতো কাউকে পড়াতে পারবো কি ? আমি কেবল প্যারেলালের 'মহাত্মা লাস্টফেজ', অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী'র 'গান্ধীজী', নাম্বুদ্রিপাদের 'মহাত্মা এণ্ড দি ইজম্' এই তিনটি বইয়ের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে শেষ করবো।

'মহাত্মার 'লাস্ট ফেজ' তাঁর জীবনের মাত্র পোনে চারটি বছরের উপরে লেখা। যদিও লেখক তাঁর বক্তব্য এই কয়েকটি বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, গান্ধীজীর প্রধান প্রধান বিচার সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা তাতে করেছেন, অতীতের উক্তি ও কর্ম থেকে, তথাপি বইখানার ভিত্তি গান্ধীজীর শেষ জীবনই, সমগ্র জীবন নয়। গান্ধীজীর জীবনী লেখার অধিকার, দক্ষতা ও ক্ষমতা প্যারেলালজীর নিশ্চয়ই আছে, বহুকাল সকল কাজের মধ্যে যিনি গান্ধীজীকে সর্বদা দেখে এসেছেন, শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এবং সেবা করে এসেছেন, তাঁর দেখা একদিক থেকে খুবই বাস্তব দেখা। কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে নিকটতম ব্যক্তিই সব দেখতে সমর্থ হয়। গান্ধীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের অতো নৈকট্য তাঁর 'পরিবারস্থ' শিষ্যদের দৃষ্টিভঙ্গী এতো আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে যে পরিপূর্ণ বিচারের শক্তি তাঁদের না-ও থাকতে পারে। তাদের পক্ষে অভিভূত বা overwhelmed হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। তাদের পক্ষে হয়তো একাত্ম বা identified হয়ে যাওয়া সম্ভব, এবং identifi cation-এর ফলে intuitive understanding একদিক থেকে বেশী হতে পারে, কিন্তু বিচার করবার ক্ষমতা তেমনি প্রখর থাকা সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ যুক্তির পথ আর একাত্মিকরণের পথ এক নয়। Intuition ও reason এক নিয়মে চলে না। তাছাড়া যারা খুব নিকট থেকে দেখেন, তারা একরকম দেখেন বটে এবং যারা দূর থেকে, এমন কি যারা বিপরীত দিক থেকে দেখেন তাদের দেখাটাও তুচ্ছ নয়। এমন কি শত্রুর বিচারটাও কম দরকারী নয়। সত্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর যে নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সাধনা, সেই অনাসক্ত বিচার-ভঙ্গী গান্ধীজীর সম্বন্ধে সত্যের বিচারেও প্রযোজ্য। সত্যের চেয়েও আগ্রহটা যদি প্রধান হয় তাহলেও সত্যবিচারে ত্রুটি আসতে পারে। আবার সত্য সম্বন্ধে আগ্রহটা যদি কোন একটি খণ্ড সত্যের আসক্তিতে পরিণত হয়, তবে অন্ধবিশ্বাস বা ডগমা সৃষ্টি হবে। আসক্তি জিনিষটার সূক্ষ্ম প্রভাব সম্বন্ধে যতই কেন না আমরা হুঁসিয়ার হই, মানুষের দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী সুযোগ তা নেবেই নেবে। এই দোষ থেকে আমরা কোন কালেই সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবো না, কেউ না, কেউ না। কেবল আমরা জেনে থাকতে পারি, সতর্ক থাকতে পারি, মাঝে মাঝেই আত্মবিশ্লেষণ করবার প্রয়োজনটা যাতে মনে থাকে এবং মাত্রাজ্ঞান যাতে নষ্ট না হয়। একথা কেবল গান্ধী-পন্থীদের বেলায়ই সত্য নয়, সবপন্থীদের বেলায়ই সত্য।

প্রথম কথা আমি বলতে চাই, 'লাস্ট ফেজ' টাই গান্ধীজীর সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ

ফেজ Best Phase নয়। তাঁর চরিত্রের কোন একটি দিকের চরম বিকাশ হয়তো শেষ জীবনে ফুটে উঠেছিল, One Single act, তাঁর জীবনদানটি একটি পরম নিবেদন রূপে একটা সর্বনাশা দুর্যোগের অবসান ঘটিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটাকে আমি তাঁর সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় বলে মনে করি না। বলা যায় That was the best that could be done under the worst situation নিকৃষ্টতম ও গভীরতম সংকটের যথাসম্ভব উৎকৃষ্টতম ব্যবহার।

গান্ধীজী তখন নিজেই বার বার বলেছেন যে এতো অন্ধকার তিনি কখনো বোধ করেন নি I have never come across such a dead wall in my life. I do not any longer think of non-violence in terms of the masses ; but for myself. I must find my way in terms of non-violence. (নির্মল-কুমার বসু, গান্ধীচরিত, পৃষ্ঠা, ২০৩)। তিনি অসহায় বোধ করছেন, তিনি জাতিকে কোন প্রকারে সংগঠিত করতে পারছেন না, তাঁর কোন প্রভাব কার্যকরী হচ্ছে না, তাঁর শিক্ষা কেউ নেয় নি। কংগ্রেস তাঁর পথে চলতে সাহস করে না, তাঁকে একরকমে বর্জন করেই চলেছে, দেশ প্রতিক্রিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে, জাতীয়তাবাদীরা জাতীয়তা রক্ষা করতে পারছে না—প্রগতিবাদীরা উদারতা রক্ষা করতে পারছে না, সবাই সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ছে। বিপন্ন জনতা জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিবাদ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পাচ্ছে না। মুসলীম লীগের Direct Action (ডাইরেক্ট একশন) এর আঘাত থেকে। সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস অনড়, অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো (Congress stood paralysed before the onslaught of communalism)। কংগ্রেস ও গান্ধীজী জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যস্ত নয় তাঁরা আলোচনায় ব্যস্ত। এদিকে মুসলীম লীগ পরিকল্পিতভাবে ও রীতিমতভাবে উঠে পড়ে লেগেছে সাম্প্রদায়িক আঘাতের পর আঘাত করতে, ভারতের গণমানসটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিতে, টুকরো টুকরো করে দিতে। সেখানে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, গোপনাচারী ও প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। একদিন নয়, দু-দিন নয়, এটা বহুদিনের ষড়যন্ত্র, এবং ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়টা তারা নিঃসংকোচে তাদের কার্য ত্বরান্বিত করে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি করে, সাম্রাজ্য-বাদীদের সহায়তায়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসেই গান্ধীজী জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন। ভারতের বিপ্লবী শক্তি, নবজাগ্রত ভারতের স্বাধীনতাকামী ভারতের নবঅভ্যুত্থান যুদ্ধের পরে চারদিক থেকে ফেটে পড়ছিল। আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর (আই. এন. এ.) বন্দীদের বিচার নিয়ে জনজাগরণ, রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর বিদ্রোহের বলিষ্ঠ আহ্বান—নতুন করে আবার এক সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু মুসলমান লড়াইয়ের ময়দানে ও ব্যারিকেডে একত্র হয়েছিল—আলাপ আলোচনার Negotiation (নিগোশিয়েন) কূটরাজনীতিতে সে একতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

ইংরেজ বুঝলো এবার যেতে হবে, নাহলে ভারতকে দমন করতে হলে ভারতের বিরুদ্ধে কেবল ইংরেজ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী দিয়ে আবার এক

যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। অন্য কোন দেশ তাকে সাহায্য করবে না, রণক্লান্ত বৃটেনকে একাই লড়তে হবে, এমন কি নিজের দেশের জনগণও তা সমর্থন করবে কিনা সন্দেহ এদিকে ভারতও দীর্ঘকালের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে দৃঢ়বদ্ধ, সমর্থ ও শক্তিমান হয়েছে। এমন কি মুসলমান জনসাধারণকেও মুসলীমলীগ হাতে রাখতে পারবে না, যদি তাদের পাকিস্তানও একটি স্বাধীন দেশ বলে ঘোষিত না হয়। কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর উপায় নেই। এরই মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার খাতিরে এবং যাদের সাহায্যে দেশের দুর্বলতাকে তারা জিইয়ে রাখছিল এবং উসকানি দিয়ে মধ্যে মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই সাম্প্রদায়িকতার ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে ধীরে ধীরে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার পটভূমিকা তৈরী করলো। অর্থাৎ চট্ করে স্বাধীনতা দিল না, আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলো, স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক করেও বছরের পর বছর দিতে দেরী করতে লাগলো, জিন্নাহকে সময় দিল। কংগ্রেস বিপ্লব ও বিদ্রোহকে এড়াতে গিয়ে সময় ও আলাপ-আলোচনার খেলায় জড়িয়ে পড়লো। এই জড়িয়ে পড়ার অধ্যায়টাই 'লাস্ট ফেজ'। গান্ধীজী সংগ্রামের আর প্রয়োজন নেই বলে মনে করেছিলেন, তাই আলাপ আলোচনা, ক্যাবিনেট মিশন ইত্যাদির মধ্যেই স্বরাজ সম্পূর্ণ করতে গেলেন। প্যারেলালের বইতে দেখা যায় যে গান্ধীজী আবার এক সময়ে একটি শেষ সংগ্রামের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, এবং কোথায় কোথায় তার অনুকূল শক্তি আছে, তার খোঁজ নিচ্ছিলেন এবং শক্তির ওজন করছিলেন। তিনি বামপন্থী অগাস্ট-বিদ্রোহীদের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও অবনতি ঘটতে থাকে। কংগ্রেস সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে, নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে যায়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লী, একের পর এক প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এসে গান্ধীজী ও অন্যান্য বিপ্লবী ও প্রগতিবাদীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দেয়। ঠিক সময়ে ইতিহাসের বলগা ধরতে না পারলে, তার পদাঘাতেই সবাই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। বিশেষকরে ঐ যুগান্তরের কালে যখন বিরাট ঘটনা প্রবাহের দুর্দান্ত শক্তি সমস্ত ওলট পালট করে দিয়ে চলেছে। এখানে গান্ধীজী ইতিহাসের গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একক হয়ে গিয়েছিলেন। একলা চলার গান্ধীর যে মূর্তি, তাঁর সেনাপতির মূর্তি সে নয়। সেই একক গান্ধীজী তখন খুব বেশী 'গান্ধীবাদী'। কাজেই সেদিন গান্ধীজীর যেটা একান্ত নিজস্ব চিন্তা, যা সচরাচর গান্ধীবাদ বলে চালু, সেটাই তখন গান্ধীজীর একমাত্র শক্তি। তাঁর সঙ্গে তখন কেউ নেই। এই মহান পুরুষ, বলতে হবে, সেই সংকটময় দুর্দিনে নিজের একার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা করে গেছেন। তিনি হার স্বীকার করেননি। জীবন দিয়ে প্রতিক্রিয়ার একটা স্তব্ধতা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়াকে রুখতে পেরেছিলেন, He gave good account of himself at best individually, কিন্তু গণনায়ক নেতা, সেনাপতি, বিপ্লবী নেতা গান্ধীজীর সে-ছবি নয়।

কিন্তু প্যারেলালজী যেন সেই চরম সংকটের দিনে তাঁর যে আচরণ তাই দিয়েই তাঁর অতীতের যাবতীয় কার্যকলাপের চরম বিকাশ দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তা হয় না,

হতে পারে না। জীবন এমন স্কীম অনুযায়ী কেউ তৈরী করে রাখেনি, কারো জন্য যে last act is the best act হতেই হবে। চরম দুর্দিনে অন্ধকারে সেই একলা চলার পথে গান্ধীজীর যে spiritual assistance—অলৌকিক সহায়তার উপর যে ঝোঁক, সেটা যারা তাঁর খুব নিকটে ছিলেন, তারা দেখতে পাচ্ছিলেন। কাজেই ইতিহাসের গান্ধীর চেয়েও 'গান্ধীবাদী' গান্ধীজীর চিত্র অংকনেই তিনি একান্ত ভক্তের মতো নিমগ্ন দেখতে পাই। কাজেই মনে হয়, গান্ধীজী যা করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন যে তাঁর নামে যেন একটা সম্প্রদায় বা সেক্ট সৃষ্টি করা না হয়, একটা 'গান্ধীবাদ' সৃষ্টি করা না হয়, সেই নির্দেশ ভ্রূক্ষেপ না করে প্যারেলালজী তাই করতে চেষ্টা করেছেন হয়তো নিজের অজানিতে, অলক্ষিতেই বা। গান্ধীজীর থেকে অনেক উধৃতি প্যারেলালজী করেছেন, কিন্তু গান্ধীবাদ সৃষ্টি না করার জন্য যে সব উক্তি, আশ্চর্যের বিষয়, প্যারেলালজী তা একবারও উল্লেখ করেননি।

সেই যুগসন্ধিক্ষণে সর্বভারতে যে একটা বিরাট বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরী হয়ে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে না বললে সত্যের অপলাপ হবে। যারা গান্ধীবিরোধী বামপন্থী, তারাও, অর্থাৎ সোশিয়েলিস্ট, কমিউনিস্ট, ফরোয়ার্ডব্লক, আই. এন. এ. থেকে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলগণ ও নেতারা, চরমপন্থী অন্যান্য বামপন্থী দল—তারাও কিছু করেননি, সেই দুর্বার স্রোতে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েননি, কোন নেতৃত্ব দেননি, তারাও গান্ধীজীর কাছেই নেতৃত্ব ভিক্ষা করে ক্ষান্ত রয়েছেন। কাজেই তাদের কোন বিকল্প ছিল না। তারাও বিপ্লবের ঝুঁকি নেয়নি বা বিপ্লবের ডাক দেননি, একথা অস্বীকার করার কারো সাধ্য নেই। গান্ধীজীকে বিশ্বাসঘাতক বলা, অথবা গান্ধীজীর কর্তব্য বাৎলে দেওয়া ছাড়া আর যেন তাদের কোন দায়িত্ব ছিল না। অথচ গান্ধীজীর কাছে সশস্ত্র বিপ্লবের আশা করা কত বাতুলতা। এই জাতীয় ভ্রান্তি পোষণ করতে গান্ধীজী কখনও কাউকে উৎসাহিত করেননি। চৌরিচৌরার কথা কেনা জানে?

অনেক বামপন্থী একটা প্রচলিত fallacy (ফ্যালাসি), সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন। তা হলো দেশ প্রস্তুত, জনগণ বিপ্লবের জন্য তৈরী, কিন্তু নেতারা পিছুপা, নেতারা বিশ্বাসঘাতক। একথা হাস্যকর। দেশ ও জনগণ প্রস্তুত মানে কি? যদি তারা বিপ্লবের জন্য সত্যিই প্রস্তুত, তার মানে জনগণের নিজস্ব নেতৃত্ব, নিজস্ব নেতা, সংগঠন সবই প্রস্তুত এবং তারা নিজেরা নিজেদের নেতৃত্বে চলতে প্রস্তুত। তা যদি না হয়, কিছু বোমা, বন্দুক, পিস্তল, দাহ্য কিছু পেলেই বিপ্লব প্রস্তুত, একথা বলা হাস্যকর বিপ্লববিলাসিতা। চেতনা, সংগঠন, নেতৃত্ব, প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে হলো প্রস্তুতির ছবি। নেতৃত্ব থাকবে অহিংস গান্ধীর হাতে, আর জনতা হবে সশস্ত্র বিপ্লবী, এমন চমৎকার যোগাযোগের যারা স্বপ্ন দেখেন, তাদের কি বলা যায়? অথচ রজনী পাম দত্ত, হীরেণ মুখার্জী এবং নাম্বুদ্রিপাদ থেকে আরম্ভ করে অনেক অনেক বামপন্থী নেতাই এজাতীয় উক্তি অহরহ করছেন।

কিন্তু একটা ভাববার মতো যুক্তি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দেবার আছে। হ্যাঁ, দেশের কোন দলই তথাকথিত বিপ্লববাদীদলগুলিও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না,

বা সেই জাতীয় পরিকল্পিত চেষ্টা কেউ করেন নি, তারা ভুলেই হোক আর ভেবে-চিন্তেই হোক গান্ধীজীকে তাঁরই পথেই অহিংস বিপ্লবের জন্য সুযোগ বা অধিকার তারা দিয়েছিলেন বা দিয়ে বসেছিলেন এবং মোটামুটিভাবে তাঁরই আদেশ মানতে রাজি ছিলেন। অতএব গান্ধীজী কেন সেদিন আলাপ-আলোচনায় অমূল্য সময় নষ্ট করলেন, কেন তিনি তাঁরই পথে ১৯৪২ সালে যেমন 'ভারত ছাড়'-র মতো একটা বেপরোয়া ডাক দেন নি, কিঞ্চিৎ হিংসা হতে পারে জেনেও তো সেদিন তিনি পিছু-পা হন নি, তেমনি ধরণের একটা সংগ্রাম ঘোষণা ১৯৪৫-৪৬-৪৭ সালের কোন সময়ই কি দেওয়া সম্ভব ছিল না? দেশে সংগ্রামপ্রিয়তা ছিল না সেদিন? তিনি নিজেই কি বলেন নি যে সরকারী হিংসা ও বিপ্লবীদের প্রতিহিংসার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে যদি দেশকে বাঁচিয়ে নিয়ে সম্মুখের দিকে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সমস্ত শক্তি ও সাহস নিয়ে অহিংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তা বিপজ্জনক রাস্তা হলেও, সেই পথেই দেশকে বাঁচানো কি সম্ভব ছিল না? সেই গুমরে ওঠা বিদ্রোহী ভারতের পটভূমিকাকে কি এক সর্বব্যাপী শেষ অহিংস সংগ্রামের ও গণসংগ্রামের লড়াইতে পরিণত করা যেতো না? গান্ধীজীর সেদিন সেই বিচার ছিল কিনা, সংগঠন, চেতনা, কর্মপন্থা ইত্যাদির অভাব ছিল কিনা, অথবা সে অভাব পূরণ করা যেতো কিনা, এই সব আলোচনার ক্ষেত্র আছে বলে আমার মনে হয়। যদিও আজ তা একটা speculation (স্পেকুলেশন) বা কল্পনাবিলাস মাত্র। তথাপি কি করে ভারতকে যুক্ত এবং অখণ্ড রেখেও স্বাধীনতার বিপ্লব অহিংসার পথে পাওয়া যেতে পারতো সে বিষয়ে ভাববার চেষ্টাকে যদি ভাব-বিলাসিতা বলে মনে করি তবে অহিংসাকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করানো যাবে না। নইলে ভারত কেন বিভাগ হলো, কোন্ আলাপ-আলোচনার সময় কে কি কথা বলেছিলেন বা বলেন নি, এজাতীয় ছেঁদো কথার মধ্যে ভারতের ভাগ্যের বর্তমান অবস্থার কারণ খোঁজ করে লাভ নেই। চিন্তাশীল গান্ধীগবেষকদের কাছে আমি এই প্রশ্নটি উপস্থিত করছি, এরই জন্যে। এখানে a non-violent substitute for a revolution দিতে না পারার জন্য এবং বিপ্লববাদীদের পক্ষেও সহিংস বিপ্লবের দায়িত্ব না নেবার জন্য দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো, সাম্প্রদায়িক শক্তিরা সুযোগ পেয়ে গেল, সাম্রাজ্যবাদীচরেরা তার পূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করলো, দেশে প্রতিক্রিয়ার জোয়ারের সৃষ্টি হলো।

যখন গান্ধীজী ক্যাবিনেট মিশনের জটিল ও শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে আবার সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে তা খুব বেশী বিলম্ব হয়ে গেছে। তখন লড়াই করতে হলে শুধু ইংরেজের সাথেই নয়, মুসলীমলীগ চালিত প্রায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে, এমন কি ভারতীয় রাজা ও নবাবদের সঙ্গেও লড়াই করতে হতো, সে গৃহযুদ্ধে অহিংসা তখনকার মতো অচল। অহিংসার জন্যও ক্ষেত্র চাই, প্রস্তুতি চাই, সংগঠন চাই, জনমত চাই। কংগ্রেসই তাঁকে সাহায্য করতো না। প্যারেলালজী লিখছেন সেই কল্পিত সংগ্রামে কংগ্রেসের মত ছিল না, কংগ্রেস আর বিশৃংখলের মধ্যে যেতে রাজি নয়। তিনি হয়তো তখন আগস্ট বিপ্লবীজাতীয় বামপন্থীদেরই একমাত্র সাহায্য পেতেন। কিন্তু তাদেরই বা শক্তি

কতটুকু। প্যাটেল, আজাদ, নেহেরু, কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেউ তাঁকে সমর্থন করেন নি—একমাত্র আব্দুল গফ্ফুর খান ছাড়া। আর তাঁর বয়সও তখন এতো হয়েছে যে এদের সকলের বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও বাইরে মুসলীমলীগ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তি ও সমর্থন বোধ হয় তাঁর আর ছিল না। এদিকে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও অবনতি ঘটে যাচ্ছে। দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পথে দ্রুত ছুটে চলেছে, সন্দেহ আকাশ বাতাস বিষিয়ে তুলেছে। সেদিন সেই সাংঘাতিক অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লবকারীদলও যদি তৈরী থাকতো, তবে **তাদের স্থানীয় অঞ্চল দখল করে দীর্ঘকালীন গৃহযুদ্ধ করার পথ গ্রহণ করা ছাড়া বোধহয় কোন গত্যন্তর থাকতো না।** মোটকথা কি অহিংস, কি সহিংস কোন সংগ্রামই হঠাৎ তৈরী হয় না। তারজন্য দীর্ঘকালের প্রস্তুতি, সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার ও প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা চাই। তা নাহলে মরণকালে ঔষধ নাই। তা নাহলে বোকার মতো ইতিহাসের মার খেয়ে যেতে হবেই। সব বামপন্থী, প্রগতিপন্থীদেরই সেদিন চরম মার খেতে হয়েছিল, গভীর লজ্জা হজম করতে হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে বলা যায় যে গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে অন্তত নিজের পতাকা নত করেন নি। তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। তিনি মৃত্যুপথে একাই চলতে দ্বিধা করেন নি। এবং শেষপর্যন্ত প্রাণ দিয়ে অবস্থার একটা চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটিয়ে যান। যদিও ভারতবিভাগের সমস্যার সমাধান তাতে হয় নি, তবুও এই খণ্ডিত ভারতে অপেক্ষাকৃত প্রগতির পথের দ্বার আবার তিনি মুক্ত করে দিয়ে গেলেন, প্রগতিশীলদের বাঁচিয়ে গেলেন এবং ভারতে প্রগতিমূলক রাজনীতির ধারা চালু রাখা সম্ভব হলো, সব প্রগতিবাদীর পক্ষেই।

গান্ধীজী আলাপ আলোচনার মধ্যস্থ হিসেবে সার্থক রাজনীতিক ছিলেন না। যার ফলে ভারতবর্ষকে অযথা অনেক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে বা ভারতের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে, এমন ধরণের উক্তি কোন কোন মহল থেকে উঠেছে। মৌলানা আজাদের বইতেও সে ধরণের অভিযোগ আছে। প্যারেলালজী কিন্তু দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে আলোচনার মধ্যস্থ হিসেবে গান্ধীজী কখনও ভুল করেন নি। এই বিতর্কের একটু আলোচনা করা যাক্।

সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র মস্ত। আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ না করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ওঠেই না, আবার সংগ্রাম শুরু করে দিয়েও আলাপের ক্ষেত্র খোলা থাকে এবং সংগ্রাম শেষপর্যন্ত আলাপ আলোচনার অনুকূল অবস্থা তৈরী করেই বিরতি প্রাপ্ত হয়। এই আলাপ আলোচনার ব্যাপারটি অতি জটিল ও সূক্ষ্ম ব্যাপার। এমন অনেক দেখা যায় যে সংগ্রামে জয়ী হয়েও কেউ কেউ সন্ধিপত্রে উপযুক্ত জয় আদায় করে নিতে পারে না, আবার এও দেখা যায় যে সংগ্রামে সুবিধা না করতে পারলেও আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু আদায় করে নেয়। কূটনৈতিক বুদ্ধির তারতম্যে এই জাতীয় ফলাফলের তারতম্য ঘটে যায়।

কারো কারো মতে গান্ধীজী সংগ্রাম পারদর্শী হলেও শেষপর্যন্ত কূটনীতিতে পেরে উঠতেন না, রাজনৈতিক চালে ভুল করতেন। আবুল কালাম আজাদের মত অনেকটা তাই, India Wins Freedom-বইতে সে নালিশ বর্তমান। স্বয়ং দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনের এই অভিযোগ ছিল। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণে আসেন। রাউলাট এক্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জালিওয়ানাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ ব্যাপারে মুসলমানদের তীব্র অসন্তোষ ও স্বরাজের দাবি নিয়ে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন শুরু হয়েছে। আলীভাইরা (সৌকত আলী ও মহম্মদ আলী) বন্দী, দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র, এরা সবাই জেলে। দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার জন্যই হোক আর শান্ত করার জন্যই হোক, রাজপুত্রকে বিলেত থেকে আনানো হয়, রাজভক্তির প্রাবল্যে দেশভক্তির নতুন জোয়ারকে ডুবিয়ে দেবার আশায়। কংগ্রেস, খিলাফৎ সকলেই তাঁর ভারত ভ্রমণকে ব্যর্থ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, যাতে রাজপুত্র কোথাও জনতার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পান। বোম্বাইএ রাজপুত্রের নামার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট দাঙ্গা লেগে যায়, রাজভক্ত এবং রাজবিরোধীদের মধ্যে। যদিও গান্ধীজীর অনশনেই সেই দাঙ্গা শান্ত হয়। বড়লাট লর্ড রিডিং বুরবক বনতে থাকেন, কেননা শোনা যায়, প্রাদেশিক লাটসাহেবদের আপত্তি সত্ত্বেও বড়লাট নিজেই অগ্রণী হয়ে রাজপুত্রকে আনান এবং ভারত ভ্রমণ সম্মানের সঙ্গে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নেন। তাই রাজপুত্রের সম্মান ভারতবাসীরা রাখছে না দেখে বড়লাট বড় চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়েন। এই সময়ে কতিপয় মডারেট রাজনৈতিক মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা চালান। যার প্রেরণাতেই হোক, বড়লাট ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে যদি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করা হয় এবং প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতা আসার কালে তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনায় কোন বাধা বা অসহযোগের আবহাওয়া সৃষ্টি না হয়, তবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের দাবি সম্বন্ধে সুবিচারের জন্য একটা গোলটেবিল বৈঠক কলকাতায় বসাতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাব মডারেট নেতাদের মারফৎ গান্ধীজীর কাছে নেওয়া হয়। অনেক নেতা তখন জেলে। গান্ধীজী তখন বাইরে, সবরমতী আশ্রমে। গান্ধীজী প্রথমটায় একটু রাজি হয়েও পরে তিনি গররাজি হন। এ প্রস্তাব আলিপুর জেলে দেশবন্ধুর কাছেও পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর সাথে মৌলানা আজাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র, এঁরাও সবাই ছিলেন। গান্ধীজী প্রস্তাব নাকচ করেছেন শুনে জেল থেকেই দেশবন্ধু, আজাদ ও শ্যামসুন্দরবাবু তা পুনর্বিবেচনা করার জন্য গান্ধীজীর কাছে তার পাঠান। এবং তাতে জানান যদি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং বিনাবিচারে বন্দী করার আইন ও প্রথা বন্ধ করা হয় তবে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠক-এ যোগ দিতে রাজি হওয়া উচিত এবং আন্দোলন স্থগিত রেখে কলকাতায় রাজপুত্রের ভ্রমণে বাধা না দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে। গান্ধীজী তবু অনমনীয় থাকেন কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজি হন, যদি গোলটেবিলের বৈঠকের পূর্বেই গোটা কয়েক মোদ্দাদাবি বড়লাট প্রথমেই স্বীকার করে নেন, তার মধ্যে একটি হলো আলীভাইদের ও অন্যান্য খিলাফৎ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া, যারা সৈন্য ও পুলিশবাহিনীতে কোন ভারতীয়কে যোগ না দেবার জন্য ফতোয়া দেওয়ার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু বড়লাট তাতে রাজি নন। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কাউকে

কাউকে সন্তুষ্ট করে কাউকে অসন্তুষ্ট করে একটা প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়ে দেওয়ার মতলব এই বড়লাটের ছিল বলেই মনে হয় এবং পরবর্তী ইতিহাসের নজীরে এই কথারই সায় পাওয়া যায়। যাই হোক, তথাপি মডারেটদের তরফ থেকে চেষ্টা বন্ধ হয় না। কিন্তু সন্ধিপ্রস্তাবের অনুকূলে তখন সময় খুব কম ছিল, কেননা, রাজপুত্র তখন ভারতভ্রমণ শেষ করে এনেছেন এবং কলকাতায় আসা আর বিলম্বিত করা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাব বাতিল হলো।

দেশবন্ধুর মতে গান্ধীজী একটা তালগোল পাকিয়ে ফেললেন, জেদের বশে হাতের কাছে সমস্ত সুযোগ পেয়েও নষ্ট করলেন। তিনি নাকি খুব রেগে যান। আবুল কালাম আজাদের মতও তাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও এই অভিযোগ করেছেন, তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম্' বইখানিতে। মুক্তির পরে ১৯২৩ সালে মাদ্রাজের এক জনসভায় গান্ধীজীর নাম উল্লেখ না করেও দেশবন্ধু বলেন, "You bungled it and mismanaged it and now ask the people to spin and do the work of charka alone...' ইত্যাদি। অনেক মডারেট নেতার মতে গান্ধীজী যদি কূটনীতি বুঝতেন তবে ঐ গোলটেবিল বৈঠকে, ১৯২২ সালেই, তিনি এতটা আদায় করে নিতে পারতেন যা ১৯৩১ সালে বিলেতের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আন্দোলন করে, গান্ধী -আরউইন প্যাক্ট্ করেও আদায় করতে পারলেন না এবং ১৯৩৫ সালের রিফর্ম নাকি ১৯২২ সালেই পাওয়া সম্ভব হতো ইত্যাদি। কেননা তখন হিন্দু-মুসলমান মিলন ছিল, ভারতব্যাপী ঐক্য ছিল। কিন্তু আলীভাইদের মুক্তি দেবার অনিচ্ছা থেকেই কি বোঝা যায় না যে ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার মতলবেই ওই জাতীয় টোপ ফেলছিল? ধোকা দিয়ে রাজপুত্রের রাজভ্রমণের মুখ-রক্ষা করার জন্যই ওই প্রস্তাব এনেছিলেন, এই জাতীয় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাছাড়া ভারতের উপর ক্রমাগত অত্যাচারের ধারাবাহিক যে ছবি রয়েছে পরবর্তীকালের ইতিহাসে, তাতে কি সত্যিই কেউ বলতে পারে যে অতো পূর্বেই ইংরেজ ভারতকে স্বরাজ অথবা স্বায়ত্বশাসন দিতেও প্রস্তুত ছিল? সে কার্যটি ঘটতে দেশ ও বিদেশের ঘাটে বহু জল গড়াতে হয়েছে। তাছাড়া মালব্যজী নিজেই প্রকাশ করেন যে, বড়লাট নিজে থেকে ভারতের কোন দাবি মেনে নেবার প্রস্তাব বা সর্ত মালব্যজীর কাছে রাখেন নি। মালব্যজী নিজের উৎসাহেই একটা আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র বা সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে এই জাতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মাদ্রাজের জনসভায় যখন দেশবন্ধু প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করেন, গান্ধীজী তখন জেলে। কাজেই তাঁর কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী কৃষ্ণদাস এই বাদানুবাদ ও পরস্পর দোষাদুষির ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য কিছু কিছু কাগজপত্র প্রকাশ করেন এবং তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বলেন যে গান্ধীজীই দেশবাসীকে একটা ধোঁকা থেকে রক্ষা করেছেন এবং মালব্যজী ও দেশবন্ধুর কথা শুনলে ভারতকে অযথা কতগুলি অপমানের গ্লানি সহ্য করতে হতো।

জয়াকার তাঁর মূল্যবান আত্মজীবনীতে (দি ষ্টোরি অব মাই লাইফ, ভলিউম—১) সেই সময়কার ইতিহাসের ব্যাপারে অনেক আলোকপাত করেছেন। তিনি তখন নিজে

একজন মডারেট কংগ্রেস নেতা ছিলেন। এইসব আলাপ আলোচনার প্রচেষ্টায় তিনি একজন মূলে পাণ্ডা ছিলেন বলে বলা যায়। তাছাড়া মডারেট মাত্রেরই ধারণা যে রাজনীতিতে সাক্ষাৎ সংগ্রামের প্রয়োজন করে না, দেশের ঐক্য সাধনমূলক কিছুটা গঠনমূলক কাজ আর রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির প্রয়োগেই যাবতীয় কার্য হাসিল করা যায়। জয়াকার সেই দলেরই লোক এবং তিনি বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোক। তৎকালীন কথাবার্তার খুঁটিনাটি তাঁর বইতে আছে। তিনিও একথা দাবি করতে পারেন নি যে সেদিনকার গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের দাবি মান্য হতে পারতো। বরং তিনি কতকটা সন্দেহই প্রকাশ করেন। কেননা, ইংরেজের যদি সত্যিই ভারতকে সন্তুষ্ট করার কোন প্রয়াস ছিল, তবে রাজপুত্রের কলকাতা পদার্পণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই মাত্র একটি সপ্তাহের মধ্যেই সে উৎসাহ নির্বাপিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ মালব্যজী তাঁর আপোষের প্রোগ্রাম ওখানেই শেষ করেননি। রাজপুত্র চলে যাবার পরেও সর্বভারতীয় নেতাদের বোম্বাইতে জড় করিয়ে একটা সম্মেলন বা কনফারেন্স বসান, যা ইতিহাসে মালব্যকনফারেন্স নামে বিদিত আছে। বিভিন্ন নরম নরম লোক ও নেতাদের—যারা তখনও জেলের বাইরে ছিলেন, তাদেরও একত্রিত করান। স্বয়ং জিন্নাহ সাহেব সেই সভার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। গান্ধীজীও এই সভাতে উপস্থিত থাকেন, যদিও নিজে কোন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন না; কেননা কনফারেন্সের উদ্দেশ্যই ছিল সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ঘটিয়ে দেওয়া। গান্ধীজীর উপস্থিতি একথাই বোঝায় যে গান্ধীজী কনফারেন্সের মূল প্রস্তাবের সর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। সেই প্রস্তাবে একদিকে যেমন দমননীতির প্রত্যাহার, আলীভাইসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী ছিল, অন্যদিকে বারদোলীতে প্রস্তাবিত আইনঅমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার প্রস্তাবও ছিল, এবং এই ভিত্তিতেই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজনের দাবি জানানো হয়। কিন্তু কি হল? বড়লাট তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। যদি ইংরেজ সত্যি সত্যি বদলেছে, তবে তাদের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না কেন? কেবল দু-এক সপ্তাহের জন্যই, রাজপুত্রের সম্মানের প্রয়োজনে কি ইংরেজের মতি পালটে গিয়েছিল? এতো ক্ষণস্থায়ী মতির উপর নির্ভর করে সত্যিকার কোন বোঝাপড়া হতো কি?

দেশবন্ধু এবং পরে সুভাষচন্দ্র অবশ্য বলেছেন যে, হ্যাঁ, ইংরেজ সেদিন মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল, রাজপুত্রের সম্মানরক্ষা করার দায় ছিল তার। কিন্তু যে মুহূর্তে তার সেই দায় চলে গেল, তখন ইংরেজ বড়লাটের আর কোন গরজ রইলো না। তাদের মতে কোন বোঝাপড়ার পক্ষে সত্যিকারের কোন মন বা হৃদয়ের

পরিবর্তনের দরকার করে না, কেবলমাত্র চাপ, অবস্থার চাপের উপরেই মানুষ যা কিছু দিতে বা নিতে রাজি হয়। কাজে কাজেই গান্ধীজীর মতানুযায়ী ইংরেজচরিত্রে নৈতিক পরিবর্তনের (যেমন সেদিন গান্ধীজীর একটা দাবি ছিল, ইংরেজ পাঞ্জাবে যে বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার করেছে, তারজন্য অনুতাপ প্রকাশ) আশা করা, অথবা হৃদয় পরিবর্তনের কথা রাজনীতিতে অচল, কূটবুদ্ধি ও কূটচাল ও চাপই হলো আসল কথা।

কিন্তু গান্ধীজীর কাছে রাজনীতির অর্থ অন্যরকম, তাতে নীতিবিগর্হিত কোন ব্যাপার নেই। চাপ, প্রভাব, আঘাত, প্রত্যাঘাত ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগ্রাম থাকবে বটে, কিন্তু যেখানে গিয়ে তার সমাধান হবে সেখানে কোন স্থায়ী নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি হওয়া চাই। না হলে সাময়িক সুবিধার বা এডভানটেজের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সন্ধিসর্ত অতি সত্বরই আবার বানচাল হয়ে যাবে। তাঁর মতে ইংরেজের পক্ষে একটা সত্যিকারের পরিবর্তন না এলে ভারতের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হতে পারে না। অতএব দেশবন্ধু, নেতাজী অথবা মৌলানা আজাদের আলাপ আলোচনার ধারার কৌশল ও লক্ষ্য গান্ধীজীর থেকে পৃথক হতে বাধ্য। আবার যারা মডারেট রাজনৈতিক, যারা কোন সাক্ষাৎ সংগ্রাম না করেই রাজনৈতিক চাপ দিয়েই কাজ হাসিল করেন, অথবা অন্যের সংগ্রাম নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার করে নেন (যেমন জিন্নাহ), তাদের আলাপ আলোচনার শাস্ত্রটি আরো আলাদা।

অতএব এই আলাপ আলোচনা বা নিগোশিয়েসনের শাস্ত্রটি এক নয়। এক এক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এক এক রকমের কৌশল নির্গত হয়। কাজেই কে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আপোষকারী, এর বিচার করতে হলে অনেক মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। এবং সেখানে একমত হওয়া শক্ত। তাছাড়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে কোন্ নেতার আলাপ, আলোচনার ফল ও তাৎপর্য কি, এর পরিপূর্ণ বিচার কোন কালেই হয়তো হবে না। কেননা জটিল ও বহমান অবস্থার মধ্যে দুই বিবদমান পক্ষের বোঝাপড়ার চক্রজাল যেভাবে জড়িয়ে আছে, তাকে খুলবে কে? ইতিহাসের সেই আলো-আঁধারের অন্ধকার যুগের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করবার মেহনৎ করবে কে? নিঃস্বার্থভাবে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করবে কে? যে দল যখন ক্ষমতায় আসীন হবে, সেই দলেরই চেষ্টা হবে সমস্ত ইতিহাসকে নিজেদের মত সমর্থন করে দেখাবার কুশলতায়। ইতিহাস বারবারই পুনর্লিখিত হবে, পার্টি বা দলের আপন গরজে ও স্বার্থে। এবং লোকে যে বলে ইতিহাস বর্তমান রাজনীতির প্রলম্বন মাত্র, একথাও অগ্রাহ্য নয়!

আমি গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনা বিষয়ক ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করিনি, এবং তা করা আমার ক্ষমতা ও আয়ত্বের বাইরে। অত দলিলপত্র ও গোপন দলিলপত্র আমার পক্ষে দেখা কোন কালেই সম্ভব হবে না। যারা তৎকালীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তারা যদি কিছু লিখে যান, তবেই দেশবাসী কিছু জানতে পারবেন। মৌলানা আজাদ, ভি. পি. মেনন, এম. আর. জয়াকার, শীতলবাদ—এরা যেমন কিছু কিছু সংবাদ দিয়ে গেছেন, তাঁদের বইতে, তেমনি আজও যে সমস্ত নেতা জীবিত আছেন,তাঁরা যদি সত্যপ্রকাশে অগ্রসর হন, তবে দেশবাসী ভারতের রাজনীতি ও ইতিহাস বুঝতে বিস্তর সাহায্য পাবে। আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। গান্ধীজীর মূল দার্শনিক, ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক মতামতগুলিকে বিচার করে দেখা ও বাম-পন্থীদের কাছে সেগুলিকে উপস্থিত করা। আলাপ-আলোচনা গান্ধীজী সারা জীবনে অনেক করেছেন, তার কতটুকু ভুল আর কতটুকু শুদ্ধ, তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমার নেই, সেই তথ্যও আমার কাছে নেই। অতএব কী হতে পারতো, যদি গান্ধীজী অমুক অবস্থায়, অমুক ধরণের আলাপ আলোচনা না করতেন, এই জাতীয় সুদূর পরিকল্পনা বা স্পেকুলেশন, এর মধ্যে আমি যেতে চেষ্টাই করি নি।

প্যারেলালজী তাঁর বৃহৎ দুই খণ্ড বইতে দেখাতে চেয়েছেন যে আলাপ আলোচনার মতো জটিল ব্যাপারেও গান্ধীজী সর্বদা নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়েছেন। এধরণের দাবি হয়তো গান্ধীজীও করতেন না। গান্ধীজী এই আলাপ আলোচনার ব্যাপারেও যুক্তির বাইরে instinct বা small still voice বা premonition ইত্যাদির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হতেন, এই জাতীয় ধারণার সৃষ্টি করেছেন প্যারেলালজী। অর্থাৎ আগে গান্ধীজী 'নীরব আদেশের' অপেক্ষায় থাকতেন এবং তারপর যুক্তি চালাতেন! এ ধরণের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা, রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণের পক্ষে অবোধগম্য। এবং আমার পক্ষেও দুর্বোধ্য ব্যাপার। কাজেই প্যারেলালজীর কথা আমাকে সমর্থন করতে হলে তা করতে হবে অন্ধভক্তি দিয়ে। সেরকম দাবি আমার নেই। কিন্তু যতটুকু বুঝেছি, তাতে উল্টে যারা বলেন যে, গান্ধীজী লড়াই করতেন বেশ বটে, কিন্তু আলাপ আলোচনা করতে পারতেনই না, এ ধরণের কথাও হাস্যকর। তবে একথাও বুঝেছি যে গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনা কূটনীতি নয়, চাণক্যনীতি নয়, এই জাতীয় চিন্তাধারা দিয়ে গান্ধীজীর কোনও কাজই বোঝা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর কাছে শত্রু-মিত্র প্রভৃতি কথাগুলির তাৎপর্যই আলাদা। শেষজীবনে তিনি যখন বড়লাটদের অথবা ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কথা বলতেন, তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে যেতেন না। হয় তিনি কেবলমাত্র নিজের

প্রতিনিধি হয়েই যেতেন, নয়তো বলা যায়, তিনি সকল মানুষ, এমন কি 'ইংরেজের প্রকৃত স্বার্থ' (ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ নয়) রক্ষা করতেও যেতেন। যাই হোক, ভারতের স্বাধীনতা বা ক্ষমতার হস্তান্তর ও দেশবিভাগ ইত্যাদি পর্যায়ে গান্ধীজীর আলাপ আলোচনার কোন প্রাধান্য ছিল না। সেখানে প্রধান মধ্যস্থরা ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ, এঁরাই মুখ্য আপোষকর্তা। সেখানে গান্ধীজীর স্থান গৌণ। প্যারেলালজীর 'লাস্ট ফেজ'-এ একথা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শেষপর্যন্ত এই সব নেতারা নিজেদের দায়িত্বেই দেশবিভাগ ইত্যাদি সহ ক্ষমতা হস্তান্তরের যাবতীয় সর্ত তৈরী করেন এবং অনেক সময় গান্ধীজীকে পরে সে সংবাদ জানান। হয়তো গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে তাঁর আলাপ আলোচনায় কংগ্রেস নেতারা খুশী হবেন না। তাইতেই তিনি নিজেকে আড়ালে টেনে নিয়ে যান, তাছাড়া তখন তিনি দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের জন্যই রাজধানী থেকে দূরে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

অতএব গান্ধীজী সর্বদাই ঠিক আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা করতে পারতেন অথবা কখনই তা পারতেন না, এই জাতীয় চরম কথা বলতে আমি পারবো না। রাজনীতিক হিসেবে হয়তো তিনি তেমন সার্থক নাও হতে পারেন, নেতা বা প্রবক্তা রূপে সম্পূর্ণ সক্ষমতা দেখাতে পারলেও। এই প্রসঙ্গে জয়াকার-এর জীবনচরিত থেকে কয়েকটা কথা তুলে দিচ্ছি। সবাই জানেন যে গান্ধীজী গোখেলেকে সব চাইতে বেশী ভক্তি করতেন। গোখেলেকে তিনি তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত কাজের বিবৃতি ও কৈফিয়ৎ দিতেন, সাহায্য চাইতেন, পরামর্শ নিতেন। ভারতসরকার একবার গোখেলেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা দেখে আসবার জন্য পাঠিয়েছিল। সেই সময় গান্ধীজীর যাবতীয় কার্যপদ্ধতি দেখবার সুযোগও হয়েছিল গোখেলের। ভারতবর্ষে গান্ধীজীকে সবচেয়ে বেশী পরিচিতি করিয়ে দেন গোখেলে এবং শেষপর্যন্ত গান্ধীজীকে নানা চাপ দিয়ে ভারতে ফিরিয়ে আনেন। গান্ধীজীকে ভারতের রাজনীতিতে নামাবার জন্য। গান্ধীজী তখনও দেশে ফিরে আসেন নি, একদিন জয়াকার গোখেলের কাছে গিয়ে গান্ধীজীর কথা পাড়েন এবং কথায় কথায় তাঁর নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা বলেন, গান্ধীজীর সম্বন্ধে, গোখেলের কাছে। গোখেলে তখন জয়াকারকে বলেন, "Yes, I think this personality is going to play a a great part in the future history of Indla. "Mark my words", he added, "You are much younger than I am. I may not live to see the day, but I visualise it clearly before me, that Gandhi is going

to be the vanguard of a great movement when some of us are gone. Remember, that on occasion when passions of the people have to be raised to great heights of emotion and sacrifice or to be bronght into close vision of high ideals, Gandhi is an admirable leader. There is something in him which at once enchains the attention of the poorman and he establishes, with a rapidity which is his own, an affinity with the lowly and the distressed. "But be careful", said Gokhale, "that India does not trust him on occasions where delicate negotiations have to be carried on with care and caution and where restraint and tact will make for the success, acting on the principle that half a loaf is better than no bread. He has done wonderful work in South Africa, he has welded the different sections of Indians into one patriotic and united community, but I fear that when the history of the negotiations, which it was his privilege to carry on at one stage, is written with impartial accuracy, it will be found that his actual achievement were not as meritorious as is popularly imagined". (Story of my life···M. R. Jayakar, page, 317, Vol—I)

জয়াকারের মতো লোক নিশ্চয়ই একথা বানিয়ে বলবেন না। গোখেলে গান্ধীজীর মীমাংসা পেঁছানোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখেছেন, একথাও ভাববার মতো কথা। কিন্তু জয়াকারের মতো রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে গোখেলের এই রায়টার উপরই গুরুত্ব দেবার ঝোঁক বেশী থাকাই স্বাভাবিক। গান্ধীজীকে গোখেলে যতটুকু দেখে যেতে পেরেছেন, তার উপর ভরসা করে যে চরম রায় গোখেলে দিয়েছেন, সেই রায় কি গান্ধীজীর বিশাল জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ক্রিয়াকলাপ গোখেলে দেখে যান নি। তবুও গোখেলের মতো গুণগ্রাহী ও দূরদর্শী ব্যক্তির কথা, বিশেষ করে গান্ধীজী সম্বন্ধে, কোনও অন্ধ গান্ধীবাদীর পক্ষেই বোধহয় অবহেলা করা সম্ভবপর নয়। এই গোখেলেই ১৯০৯ সালেই লাহোরে কংগ্রেস ডেলিগেটদের কাছে বলেছিলেন,

"Fellow delegates, after the immortal part which Mr. Gandhi has played in Indian affairs (in South Africa), I must say it will not be

possible for any Indian, at any time, here or any other assembly of Indians, to mention his name without deep emotion and pride. Gentlemen, it is one of the privileges of my life that I know Mr. Gandhi intimately and I can tell you that a purer, a nobler, a braver and more exalted spirit has never moved on this earth. Mr. Gandhi is one of those men, who living an austerely simple life themselves and devoted to all the highest principles of love of fellow beings and to truth and justice, touch the eyes of the weaker breathern as with magic and give them a new vision. He is a man, who may be well described as a man among men, a hero among heroes, a patriot among patriots and we may well say that in him Indian humanity, at the present time, has really its highest watermark."

একথা সত্য যে গান্ধীজীর মধ্যে যে দ্বৈত সত্ত্বা ছিল, যে রিফরমিস্ট ও রিভোলিউশন অর্থাৎ চরিত্রসংশোধনকারী ও বিপ্লবী সত্ত্বা, তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো, তাতে অনেক সময়েই বিষম সংকটের সৃষ্টি করতো। ফলে কখনও কখনও তিনি অত্যন্ত বেশী আলাপ আলোচনা করতেন, মীমাংসার জন্য। আবার কখনও বা প্রবল উদ্যমে সবেগে ছুটে চলতে চাইতেন। এই যে দ্বন্দ্ব তাঁর, এ হলো স্টেটস্‌মেন ও প্রোফেটের বা কূটনীতিজ্ঞ ও প্রবক্তা, এই দুই সত্ত্বার দ্বন্দ্ব। সুভাষচন্দ্র যখন দোষারোপ করেন যে, কেন গান্ধীজী সেদিন দেশবন্ধুর কথা মতো লর্ড রিডিঙের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করতে এগোলেন না, তখন হয়তো কারও কারও কাছে এটা বিসদৃশ মনে হবে যে আপোষ বিরোধী বিপ্লবী সুভাষ কেন সেদিন আলাপ-আলোচনার উপর এতটা বিশ্বাস রাখতে গেলেন। অনেক 'বিপ্লবীবাদীকেই' আজকাল বলতে শুনতে পাই, আজাদের পক্ষ হয়ে, গান্ধীজীর ভুল দেখাবার উৎসাহে। অথচ আজাদের বইতে অনেক ক্ষেত্রেই আপোষের মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, এমন কি ১৯৪২-এর আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। জয়াকার দেখাতে চেষ্টা করেছেন, গান্ধীনীতি তিলক ও মহারাষ্ট্রস্কুলের বিপরীত, এবং মহারাষ্ট্রস্কুলের জন্মদাতাই হলেন তিলক মহারাজ। সেই মতে 'যাহা পাও, তাই গ্রহণ করো, বাকিটার জন্য লড়তে থাক', এই বোঝায়। এই কথাই বলেছেন গোখেলে যে, half a loaf is better than none.। জয়াকার আফশোষ করেন যে, তিলকের মৃত্যুর ফলেই গান্ধীজীর বেপরোয়া নীতি দেশে প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। সে যাই হোক,

যদি এই 'মহারাষ্ট্রনীতি' পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে কোন কালেই বিপ্লবের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়, সর্বদাই একটা আপোষকামী মনোবৃত্তি প্রবল হতে বাধ্য। এবং জয়াকারের দল তাই চাইবেন। কিন্তু অনেকসময় বিপ্লববাদীরা এই অজুহাতে গান্ধীজীকেও আক্রমণ করেন। তখন তাদের বক্তব্য বোঝা দায় হয়। অবশ্য বিপ্লববাদীদেরও কখনও reform গ্রহণ করতে হয় না, তা নয়। কিন্তু আপোষ বিরোধী মনোবৃত্তি ছাড়া বিপ্লববাদ জিইয়ে রাখা শক্ত। এই তথাকথিত মহারাষ্ট্রস্কুল শুধু মহারাষ্ট্রেই ছিল না, ভারতের সর্বত্রই ছিল, আজও আছে। আপোষ ও বিপ্লব তাই একটা চিরকালের ধাঁধাঁ, মীমাংসার আলাপ-আলোচনা ও সংগ্রাম-প্রস্তুতি তাই এতো স্ববিরোধী ব্যাপার বলে মনে হয়। যদিও ইতিহাসের দীর্ঘ পটভূমিকায় এই স্ববিরোধীতা তত মারাত্মক বলে মনে হয় না, যেমন মনে হয় ক্ষণকালের উত্তপ্ত রণক্ষেত্রে। কেননা কর্মপন্ধতি আলাপ অলোচনার ক্ষেত্রকে সাহায্য করতে পারে, আবার আলাপ আলোচনাও সংগ্রামকে সহায়তা করে। যেমন reform-কে বিপ্লবের কাজের সাহায্যেও লাগানো যায়, আবার বিপ্লব বিরোধীতার কাজেও লাগানো যায়।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় প্যারেলালজীর বইতে একটা কৌশলে এই দ্বন্দ্বকে পরিহার করে যাবার চেষ্টাটা। আমার মতে, এই যে তিনি কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন নি, কী কারণে গান্ধীজী পণ্ডিত নেহেরুকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন। দেখা যায় যে, বেশ ভেবে-চিন্তে এবং অনেক সময় নিয়েই গান্ধীজী এই ঘোষণা করেছিলেন। প্যারেলালজীর এই বই পড়ে মনে হবে যে এ কেবল গান্ধীজীর নেহেরুর উপর ভালোবাসা থেকেই বুঝি বা সম্ভব হয়েছে। অথবা পণ্ডিত নেহেরুর যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু যোগ্যতার অর্থ কী? সেখানে আদর্শের, মতবাদের, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কি কোন স্থান বা বিচার নেই? যদি নেহাৎ শাসন-তান্ত্রিক যোগ্যতার কথাই ওঠে, তবে বোধহয় প্যাটেল নেহেরুর চেয়ে যোগ্যতর শাসক ছিলেন। কোন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যেতে হবে, এমনই বা কী প্রয়োজন ছিল? যোগ্য লোক আপন নিয়মেই গণতান্ত্রিক উপায়েই অভিষিক্ত হতে পারতেন। কেন এই ধরণের বাছাইয়ের প্রয়োজন হলো? তথাকথিত গান্ধীবাদী তো আরো অনেকেই ছিলেন, যারা মতবাদের দিক থেকে, আনুগত্যের দিক থেকে নেহেরুর থেকে আরোও বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন, গান্ধীজীর কাছে। এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র আসছেন না, কারণ তিনি তখন ভারতের বাইরে, হয়তো বা মৃত। পণ্ডিত নেহেরু যন্ত্রসভ্যতায় বিশ্বাসী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন, বড়জোর এগনোষ্টিক, তিনি জীবন ধর্মে কঠোরতা মানেন না ইত্যাদি। এ হেন লোককে কেন গান্ধীজী তাঁর

ও অনুসন্ধানের অনেক কথা অপ্রকাশিত থেকে যেতো হয়তো বা। তথাপি তার sectarian (সেক্‌টেরিয়ান) ও spiritualistic bias (স্পিরিটুয়েলিষ্টিক বায়াস)-টা লক্ষ্য না করে উপায় নেই। তিনি গান্ধীজীর spiritual quest (স্পিরিচুয়েল কুয়েস্ট)-এর উপর এতো জোর দিয়েছেন যে মনে হবে গান্ধীজীর শেষপর্যন্ত এইটিই বুঝি বা একমাত্র কথা। যেমন, 'রামনাম' সর্বপ্রকার রোগের ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের কাজ করতে পারবে, এটা প্রমাণ করার উপরে এতো বেশী ঝোঁক দেওয়ার কী অর্থ? চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো শারীর বিজ্ঞানের শক্তি, আর 'রামনাম' হলো ভগবৎশক্তি। তাহলে দুটিকে যদি মানতে হয়, তাহলে যেন একটি সৎকাজের ভগবান, আর অন্যটি অসৎ কাজের ভগবান বা জীন! এই জাতীয় একদেশদর্শিতা অন্ধকার গলিতে পেঁছে দেয়, যা কিছু বস্তুজগৎ ও বিজ্ঞান—তা হলো শয়তানের সৃষ্টি, একে অস্বীকার করাই হলো মানুষের খেয়ে না খেয়ে একমাত্র কাজ। মানুষের বুদ্ধি, বিচার, বিজ্ঞান, এদের দরকার নেই, কেবল রামনাম বা ভগবদভক্তি হলেই হলো! অথচ এই জাতীয় কথার ঠিক বিপরীত কথা, গান্ধীজীর লেখা থেকেই অনেক অনেক দেওয়া যায়। প্যারেলালজী স্বীকার করবেন কিনা জানি না, এসব বিষয়ে জোর দিয়ে গান্ধীজীকে একজন বিজ্ঞানবিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের স্রষ্টা রূপে দাঁড় করাবার উৎসাহ দিয়ে ফেলেছেন, এবং তাতে গান্ধীজীর প্রতি লোকের ভুল ধারণাই হতে পারে। যাক্‌ এই বইয়ের আলোচনা এই পর্যন্তই।

এখন নাম্বুদ্রিপাদ ও হীরেণ মুখার্জীর বই দুখানি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে শেষ করি। ভারতীয় কমিউনিষ্ট জগৎ মনে করেছিলেন যে গান্ধীজী মরে ভূত হয়ে গেছেন, তাঁর জীবন ও কর্মের ব্যর্থতা এতো বেশী যে তা আপনিই ইতিহাসের গর্ভে চাপা পড়ে যাবে। কাজেই গান্ধীজীকে নিয়ে কোন বই লেখার দরকারই নেই। বাস্তবিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত বই দু-খানি ছাড়া, বা পূর্বেও কোনদিন গান্ধীজী সম্বন্ধে কোন বই বা কোন যোগ্য সমালোচনামূলক লেখা কোনও কমিউনিষ্ট ইতিপূর্বে লেখেন নি। এই বই দুটি লেখার পূর্বে গান্ধী সম্বন্ধে যে বক্তব্য ও নীতি এতকাল ভারতীয় ও পৃথিবীর কমিউনিষ্ট জগতে চালু ছিল, তা হলো রজনীপাম দত্তের 'ইণ্ডিয়া টুডে' বইটিতে যা আছে, তাই। সেখানে গান্ধীজীকে ভারতীয় বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে ধার্য করা আছে, বিপ্লববিরোধী আপোষকর্মীই শুধু নয়, সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সহায়ক হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে তাঁকে। এই নির্দেশ থেকেই গান্ধী সম্পর্কে ভারস্বরে এতো নিন্দাবাদ ও মুর্দাবাদ চলে এসেছিল এতোকাল এবং রুশ-এনসাক্লোপিডিয়াতেও এই ব্যাখ্যাই গ্রথিত ছিল। কিন্তু কালে

কালে রুশদের মত পালটালো, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা রূপে তাঁকে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা করা হলো, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ঘোষণা করতে হলো ও স্বীকার করতে হলো, একটা গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ধারা দেশের মধ্যে চালু আছে বলে মানতে হলো, বিশ্বে শান্তির সহায়ক হলো ভারত ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে ভারতীয় কমিউনিস্টদেরও মতটা কিছুটা বদলাবার দরকার হলো। এবং গান্ধীজী সম্পর্কে সতর্কতামূলক উক্তিও সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হলো। ইতিমধ্যে রজনীপাম দত্ত 'ক্রাইসিস অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' বই লিখলেন এবং গান্ধীজী সম্পর্কে কালোপযোগী উদার ধ্যানধারণা প্রকাশ করলেন এবং ব্যক্তি হিসেবে তাঁর অনেকটা মর্যাদা স্বীকৃত হলো।

এই নতুন পরিস্থিতিতেই প্রথম বই লিখলেন নাম্বুদ্রিপাদ, 'মহাত্মা এণ্ড দি ইজম্' এবং দ্বিতীয় বই লেখেন, হীরেন মুখার্জী, 'গান্ধীজী'। নতুন কোন থিসিস কিন্তু এতে নেই, যা রজনীপাম দত্ত লেখেন নি, তাঁর 'ইণ্ডিয়া টুডে' বইতে, কেননা সেই মুখপত্র একই। অর্থাৎ গান্ধী হলেন ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বময় নেতা। তবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীরও একটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিক ছিল, যার জন্য সংগ্রামের ভয় দেখিয়ে গান্ধী ভারতের জনগণের নেতৃত্ব করেছেন। কিন্তু যখনই জনগণ বিপ্লব করতে অগ্রসর হয়েছে তখনই তিনি তা চূর্ণ করে দিয়েছেন, ইত্যাদি। অর্থাৎ পুস্তকের মূল যুক্তিটি সেই পূর্বেরই এবং একই। এবং তা থেকে তিনি এক পাও এগোন নি। তবে সুরটা নরম, শ্রদ্ধাশীল এবং চাতুর্যপূর্ণ। 'গান্ধী ও ইতিহাস', নামক অধ্যায়ে আমি মার্কসবাদ থেকে যে সূত্র আসে, তাতেও যে এই বিচার সঠিক নয়, তা দেখাবার চেষ্টা করেছি এবং চীনের নয়া গণতন্ত্রের তাৎপর্য ভারতীয় পটভূমিকায় কতদূর প্রযোজ্য তারও আলোচনা করেছি এবং সেই সূত্র থেকে গান্ধীজীর স্থান ও শ্রেণী কোথায়, তারও বিচার করেছি। আমি তার পুনরাবৃত্তি করবো না। আমার এই বই লেখার প্রধান লক্ষ্য হলো, এটা দেখানো যে কমিউনিস্ট ও মার্কসীয় মতবাদের দিক থেকেও গান্ধী-বিচারে বিরাট ভুল হয়েছে এবং গান্ধীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে ধার্য করলে সাম্প্রতিককালের কোন ঘটনা বা বর্তমান ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, মার্কসবাদকেই দুর্বল ও অকেজো করা হয় এবং নিজেদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুলগুলির কোন সত্যিকার বিশ্লেষণ বা বিচার বা সংশোধন করা সম্ভব নয়। নাম্বুদ্রিপাদজী এতো কম তথ্যের উপর এবং হালকাভাবে ও অতি সরলতার সাথে গান্ধীজীর মতো জটিল চরিত্রকে একটিমাত্র ফরমুলার সাহায্যে দেখতে চেয়েছেন যে, সকল সত্যিকারের ঐতিহাসিকেরাই বলবেন যে এ কাজ উচিত হয় নি। অধ্যাপক মুখার্জী অবশ্য অনেক বেশী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয় নিয়ে

বই লিখতে চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় তাঁর বইয়ের প্রতি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে, উক্তির কোন ত্রুটি আসার তো কথাই নেই। তিনি একজায়গায় বলেছেন, There is nothing so crude however, what is known as a "party line" on Gandhi··· অর্থাৎ তিনি কোন পার্টি লাইনের হুইপের ভয় করে লেখেন নি, যদিও পার্টির মধ্যে গান্ধীজী সম্বন্ধে একটা সাধারণ মতৈক্য আছে। কিন্তু তাঁর বইয়ের সারবস্তু সেই একই পার্টি লাইন, যা একদা পাম দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টু ডে' বইতে এঁকে দিয়েছিলেন, পরে নাম্বুদ্রিপাদ পুনরায় প্রকাশ করেছেন কতকটা সংস্কৃত ঢঙে। অর্থাৎ গান্ধীজী বুর্জোয়া, গান্ধীজী প্রতিক্রিয়াশীল। তবু হীরেনবাবু স্বাধীনতার ইতিহাসে গান্ধীজীর দানটা ছোট করে দেখান নি, বরং বারে বারে পার্টি লাইনের সীমানা প্রায় অতিক্রম করে ফেলেছিলেন, আর কি। কিন্তু সজ্ঞানেই হোক আর স্বভাবেই হোক, আবার পার্টি লাইনের দোহাই দিতে ভুলে যান নি। নাহলে হয়তো revisionism বা সংশোধনবাদের দায়ে পড়তে হতো! নাম্বুদ্রিপাদ যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র করে দেখিয়েছেন গান্ধীর দানকে he was only polite, that's all বলা যায়। মূল বক্তব্য শেষ পর্যন্ত সবারই এক, নতুন চিন্তা কারোরই নেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই দুই বইতে কোথাও ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নিজের কাজ কি, গান্ধীজীর কার্যকলাপের পালটা তারা কি কাজ ও কি কথা কখন বলেছেন, এবং সেখানে তুলনামূলক কোন বিচার চলে কি না, অথবা সেখানে তাদের কোন গলদ বা ভুল অতীতে ছিল কি না, তার এতটুকু মাত্র উল্লেখ পর্যন্ত নেই! অর্থাৎ তাদের আত্মসমালোচনার কোন অবকাশ ও অবসর নেই! ভারতীয় কমিউনিষ্ট-পার্টি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেন নির্ভুল কাজ করে গেছে, তাই বোধহয় একদম চুপ! গান্ধীজীকে বিচার করা হচ্ছে, তা কমিউনিষ্টপার্টি নিজের কথা বলবে কেন? বলতে হবে বই কি, কেন না যা দেখছি, তা কোন চোখ দিয়ে দেখছি, তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে বৈ কি। এই নৈঃশব্দ অথবা কৌশলে এড়িয়ে যাবার ছলনা, নীরব সাফাইয়ের চেষ্টার জন্য এই দুটি বইতেই সত্যি কোন সার্থক ও আন্তরিক সমালোচনা আছে বলে কেউ স্বীকার করবেন না। যদি সত্যিই নিজেদের বিচারে অতীতে কোন ভুল থেকে থাকে, তার প্রকাশ্য সমালোচনা ও স্বীকৃতি যদি না থাকে, তবে সেই গ্লানিটাকে অযথা পুষে রাখা হয় মাত্র। নাহলে ইতিহাসের বিচার হবে কি করে? কেন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনে, নেতা হতে পারলো না, কেন তাদের কেউ গান্ধীজীর কাছ থেকে দেশের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে পারলেন না, কেন চীনের কাছে তাদের দীনতা প্রকাশ করলো?

ভারতীয় কমিউনিস্টপার্টির পক্ষ থেকে এসবের ব্যাখ্যা করা দরকার এবং গান্ধীজীকে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা না করে কেবল নানাপ্রকার কষ্টকল্পিত বিকৃত যুক্তি ও বিকৃত তথ্য দিয়ে নিজেদের অতীতকে বোঝা যাবে না এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণেও ভুল হতে থাকবে। কমিউনিস্টদের হেয় করা বা নিন্দিত করা, আমার উদ্দেশ্য নয়, বা প্রচলিত কতকগুলি গালিগালাজ বর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, সত্যিকার সমালোচনা হোক, সত্যিকার বিচার হোক, তবেই দেশে সুস্থ ও সুন্দর রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হবে।

তাছাড়া এই দুই বিখ্যাত দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট নেতার বই দুখানির বক্তব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার এমন বিকৃতি আছে যে দেখে দুঃখিত হতে হয়। তাছাড়া যুক্তিই বা কি? যে গান্ধী একজন বুর্জোয়া মাত্র, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট অধ্যাপক কী মহৎ আশা পোষণ করেন, দেখুন, "And as the peoples of the world move forward and desire for peace on earth and goodwill among all men approaches accomplishment, the voice of Gandhi will be heard ever more clearly. No lebel be put on his thought but the expansive one of humanism.......(Gandhiji, page 209) অধ্যাপক মহাশয় হয়তো এখানে গান্ধীজীর উপরে বুর্জোয়া লেবেল জুড়তে দ্বিধা করেছেন, কিন্তু পার্টি লাইন তো রয়েছে? এতো ভাল কথা ও এতো মহৎ আশা তিনি গান্ধীজীর জীবন ও কথা থেকে কি করে আশা করতে বললেন? আজকের এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মৃতপ্রায় যুগের বুর্জোয়া নেতা, গান্ধীজীর কাছ থেকে? তাহলে তাঁর মার্কসবাদ থাকলো কোথায়? হয় মার্কসবাদ বদলাতে হয়, নয়তো গান্ধীর শ্রেণীবিচারটা বদলাতে হয়। তিনি কোনটি করতে প্রস্তুত?

আর কমরেড নাম্বুদ্রিপাদের বিপত্তি বা dilemma-টা দেখুন। তিনি লিখছেন, It was this growing gulf between him and his colleagues that made his life tragic in the post independence months even before that life came to a tragic end......If weexamine this growing gulf between him and his colleagues. The last days of his life that we come arrive at the objective all-sided assesment of Gandhiji, the man and his mission. This growing gulf was the manifestation of the reality that Gandhiji's insistence on certain moral values which had once been helpful to the bourgeoisie, but became in the last days of his life, a hindrance to it (page, 119)

অর্থাৎ তার মানে কি এই যে, গান্ধীজী মরবার সময় বুর্জোয়া রূপে মরেন নি? ঠিক মরবার কয়েকদিন আগেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর নীতিজ্ঞান ও তাঁর শ্রেণী চেতনা এক নয়? হঠাৎ এই পরিবর্তন ও সত্যদর্শনের কারণ? আবার স্বীকৃতি! যখন এই দ্বন্দ্ব দেখা দিল, একমাত্র তখনই গান্ধীজীর সম্বন্ধে সত্যিকার objective বিচার করা সম্ভব হলো, কার পক্ষে? নাম্বুদ্রিপাদের পক্ষে? তবে

এতোকাল তাঁদের বিচার objective ছিল না? তবু যাই হোক, নাম্বুদ্রিপাদ গান্ধীজীকে শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াদের থেকে আলাদা করে দেখতে পেয়েছিলেন, যদিও কয়েকটি মাসের জন্য মাত্র। তিনি আবার বলেছেন, "We may, therefore, conclude by saying that Gandhiji became the Father of the Nation, precisely, because, the idealism to which he adhered in the years of anti-imperialist struggle became a practically useful political weapon in the hands of the bourgeosie; furthermore, that he became more or less isolated from the bourgeosie in the latter days of his life, because his idealism did in the post-independence years become a hindrance to the self interest of the bourgeosie." এর সোজা বাংলা হলো এই যে, বুর্জোয়ারা যখন দেখলো যে গান্ধীজীকে দিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষা হচ্ছে তখন তাঁকে জাতির পিতা বলে ঘোষণা করলো, আবার তারা যখন দেখলো তাঁকে দিয়ে তাদের লাভ হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে, তখন তাঁকে তাড়িয়ে দিল। এইজন্যই গান্ধীজী ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতা? চমৎকার যুক্তিজাল বটে! আবার শুনুন, এই বুর্জোয়া নেতার একান্ত প্রিয় শিষ্য বিনোবাজী সম্বন্ধে নাম্বুদ্রিপাদ বলে চলেছেন, The objective which Bhave placed before the people is as revolutionary as any socialist or communist would have; it is that very basic principle, "from each according to his capacity, to each according to his needs," বুর্জোয়া গান্ধীর একান্ত প্রিয় শিষ্য কমিউনিস্টদের মতে বিপ্লবী? কি করে হলেন?

'মহাত্মা এণ্ড দি ইজম্' পুস্তকের বক্তব্য সম্পর্কে এখানে সমস্ত গোজামিল দেখাতে যাওয়া, এই বইতে সম্ভব নয়, বাস্তবিক তার দরকারও নেই। তাই আবার বলি, এই জাতীয় বই এঁদের কাছ থেকে আশা করতে পারি নি।

গান্ধীজীর জীবন ও সংগ্রাম আলোচনা করার সময় এই জাতীয় লেখকদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি অতি সাধারণ শান্তিপ্রিয় লোক, উদারপ্রকৃতির লোক, কি করে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এসে পড়লেন, তার ক্রমবিকাশমান বেদনাপূর্ণ চিত্রটি বুঝবার এতটুকু চেষ্টা নেই, যেমন করে হোক, একটি দুর্বল কথা বা খুঁত পেলেই হলো, সেটিকে নিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে তাঁর সমস্ত চেষ্টাকে বিকৃত ও কুৎসিৎ করে দেখাতেই হবে। এটা কি যুক্তিযুক্ত বা সুরুচিপূর্ণ? গান্ধীজীর জীবনে ও সংগ্রামে ভুল ছিল না কোথাও, একথা কেউ বলবে না, তিনি নিজে তো নন‌ই। তিনি সর্বজ্ঞ, এমন দাবি কখনও করেন নি। যদিও কোন কোন ভক্ত তাঁকে সর্বজ্ঞ রূপে প্রতিপন্ন করতে চান, এমন কি অবতার বলে চালাতেও খুবই ব্যস্ত। কিন্তু আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা দুটি-একটি কথা দিয়ে তাঁর

সমগ্র জীবনকে ব্যাখ্যা করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। যেমন, কেন তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার দিকে কয়েকদিন গুজরাটে সৈন্য সংগ্রহ করতে লেগেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য, ব্যস, ঐ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কি রজনীপাম দত্ত, কি নাম্বুদ্রিপাদ, কি হীরেন মুখার্জী, প্রমাণ করতে ছাড়েন নি এবং বারে বারে কপচাতে ছাড়েন নি যে তিনি আসলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী কখনও হতে পারেন নি ইত্যাদি। তাঁদের বোঝাবার উপায় নেই যে, গান্ধীজীর ক্রমবিকাশটা এসেছে তিক্ত অভিজ্ঞতাবলী থেকে ও বাস্তব উপলব্ধির ভিতর দিয়ে। সেকথা আমি বইতে আগেই আলোচনা করেছি। পেশোয়ারে গুলি করার হুকুম অমান্য করে কিছু গাড়োয়ালী সৈন্য কোর্টমার্শালের বিচারে ১৯৩১ সালে দীর্ঘমেয়াদী সাজা পান। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের সময় তাদের মুক্তি আদায় করা সম্ভব হয়নি। এবং বিলেতের কোনও এক খবরের কাগজের প্রতিনিধির নিকট গান্ধীজী নাকি একথা বলেছিলেন যে সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন সৈন্যদের উপরওয়ালাদের হুকুম পালন না করতে তিনি উৎসাহ দেন না। রজনীপাম দত্ত ও নাম্বুদ্রিপাদ এই তথ্যটি দেন, কিন্তু অন্যত্র পাই নি। তবুও এমন কথা যে গান্ধীজী বলতে পারেন না, অন্তত সেইদিনে—তা বলা যায় না। কিন্তু পরবর্তী জীবনে, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের ৮ই তারিখে, ভারতছাড়ার যে দৃপ্তবাণী গান্ধীজী দিলেন তাতে সৈন্যদের প্রতিও গুলি না চালাবার জন্য আহ্বান জানালেন, সেকথা এঁরা কেউ উল্লেখ করলেন না এবং করবেনও না। সেদিন তিনি বলেছিলেন, The soldiers should say to the Government : "Our hearts are with the Congress. We shall obey your orders, but will refuse to fire on our own people."

(Mahatma : Last Phase. Vol II, page-710)

সততার সঙ্গে গান্ধীজীর অনেক কাজ ও অনেক কথারই সমালোচনার ক্ষেত্র আছে যেখানে, সেখানে অন্যায় সুবিধা নিতে যাবার দরকার কি? একদিকে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সততা, সরলতা, চরিত্রনিষ্ঠা ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করা হচ্ছে, অন্যদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাথে তাঁর যখনই অমিল হয়েছে যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে এবং কংগ্রেসের সর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবার ঝোঁক নিয়ে এবং গান্ধীজী কংগ্রেসের দায়িত্ব ত্যাগ করতে যাচ্ছেন, তাতে এই লেখকেরা কোন সততা খুঁজে পান না। গান্ধীজীর যুদ্ধ বিরোধীতাটা তখন মেকী, লোক দেখানো বা লোকভোলানো সম্পর্ক ত্যাগ মাত্র। আসলে একটা admirable arrangement মাত্র, বা বাইরের বিরোধ দেখিয়ে ভিতরে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের সাথেও এই জাতীয় admirable arrangement করেই নাকি গান্ধীজী ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন চালাতেন। এই admirable arrangement—বাক্য বা কথাটি নাম্বুদ্রিপাদের নিজস্ব আবিষ্কার এবং অধ্যাপক মুখার্জী এই শব্দটি ব্যবহার করতে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি—যদিও তিনি যথাতথা প্রশংসামূলক বাক্য ব্যবহার করতেও কার্পণ্য করেন নি। তলায় তলায় এই জাতীয় বোঝাপড়া করে চলাই যাঁর অভ্যাস, যাঁর প্রিন্সিপল

principle, যিনি এভাবে আপোষ বা compromise করে নিতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে এতো ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দরকারই বা কেন ?

মোট কথা, একটা কষ্টকল্পিত ভুল থিসিসের সাহায্যে গান্ধীজীকে বুর্জোয়া নেতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ততোধিক বেগ পেতে হয়েছে। সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে ঘটনাকে অগ্রাহ্য করতে হয়েছে, বিকৃত করতে হয়েছে। ক্ষুদ্র একটি থিসিসের iron jacket বা লোহ খাঁচার মধ্যে যাবতীয় ইতিহাস ঢোকাবার সে কী চেষ্টা, এবং কত ব্যর্থ চেষ্টা ! এদিক ঢুকছে তো ওদিক বেরিয়ে যাচ্ছে, সে এক হাস্যকর পরিস্থিতি ! অথচ এই চেষ্টা বা অপচেষ্টার মৌলিক কোন প্রয়োজন আছে, তা-ও নয়। ক্ষমতা দখলের, বর্তমানে মন্ত্রীত্ব দখলের, বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে গান্ধীজীর সঙ্গে লড়াই আজও এদের প্রয়োজন। যেহেতু অপরপক্ষ গান্ধীজীর নাম করে ক্ষমতায় আসীন, সেহেতু তাদের ক্ষমতা থেকে চ্যুত করার জন্য তাঁরা মনে করেন সত্য হোক, আর মিথ্যা হোক, গান্ধীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলেই কংগ্রেস পরাজিত হবে। আর কংগ্রেস মনে করে, ক্ষমতায় থাকতে হলে বুঝি গান্ধীজীর নামটা একমাত্র রক্ষাকবচ ! নামকীর্তন করে কারোরই রক্ষা নেই শেষপর্যন্ত, গান্ধীজীর নাম করেও নয়, মার্কসের নাম করেও নয়। আসল কথা হলো কাজ বা প্র্যাকটিস। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দরকারি জিনিষ বটে, এবং ক্ষমতা পেলে অনেক সমস্যার সমাধান হয় বটে, কিন্তু ক্ষমতাদখলকারীর যদি গলদ থেকে যায়, তবে তা অচিরে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো নানা উৎকট আতিশয্য সৃষ্টি করতে থাকে। ক্ষমতাই সব কথা নয়, কংগ্রেসও তো ক্ষমতায় আসীন আছে। কোথায়, তার সমস্যা কিছু কমেছে কি ? দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে, না বৃদ্ধি হচ্ছে ? বাম-পন্থীরা ক্ষমতা পাবে এবং কোথাও কোথাও পাচ্ছেও তো। এ আর বেশী কথা কি ? এ জগতে ইতিপূর্বে অনেকেই ক্ষমতায় এসেছে আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। ক্ষমতা পেলেই সব দুর্বলতা দূর হবে না, বরং অনেকক্ষেত্রে বেড়েও যেতে পারে। ক্ষমতায় আসীন হয়ে নতুন করে ইতিহাস লিখলেও না। বইয়ের লেখা ইতিহাসের চেয়ে যা স্থায়ী তা হলো মানুষের চরিত্রের উপর লেখা ইতিহাস। সে ইতিহাস জাতির এবং দলের চরিত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংস্কার ও irrefacible impression রেখে যায়—যা তাদেরকে ভিতর থেকে উদ্দীপিত অথবা উৎপীড়িত করতে থাকে। লেখা দিয়ে তা মোছা যায় না, কর্ম বা কাজ দিয়ে তা তৈরী। ক্ষমতায় আসীন হলে বহু সমস্যার উদ্ভব হবে, দলের মধ্যে ও বাইরে যার সমাধান করতে নির্ভীক বিচার, সত্যিকার আত্মসমালোচনা, সজাগ দৃষ্টির দরকার হবে এবং প্রয়োজন হবে নতুন করে গান্ধীজীর জীবনের সত্য বিচারেরও। আমি নিশ্চয় করে জানি মার্কসিস্ট জগতও গান্ধীজীকে আবার নতুন করে বিচার করবেন।

পরিশেষে, গান্ধীবাদী হোক আর মার্কসবাদীই হোক, সবারই একথা খেয়াল রাখতে হবে যে জনতার সাথে যুক্ত হবার সাধনাটাই সমস্ত শক্তির আধার। গান্ধীজী সর্বদা নীচের দিকে, দরিদ্রের দিকে ঝুঁকে থাকতেন। দরিদ্রতম, দীনতম লোকের সন্ধান তাঁর একটি মস্ত সাধনা। কিন্তু আজ কংগ্রেস ক্রমশই উপরতলার উপর

নির্ভরশীল হতে চায়। শুধু কংগ্রেস কেন, বামপন্থীদের নজরও উপরের দিকে, উপরটা, মন্ত্রীত্বটা দখল করতে পারলেই বুঝি সব কিছু করা যায়, এমনি একটা ভাব। ফলে তলা বা base-টা যায় দূরে সরে। এই মূলহীন বৃক্ষ ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার নীতির সাহায্যেই গান্ধীজী একা সমস্ত বামপন্থীদের হার মানিয়ে রেখেছিলেন। তত্ত্বের দিক থেকে সে মতবাদ যতই কেন না বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিশীল হোক, যদি সে মতবাদ কার্যত বিরাট জনগণের সাথে যুক্ত হবার সহায়ক ও উদ্দীপক না হয় তবে তা বৃথা হতে বাধ্য। বেকন বলেছেন, It is not what men eat, but what they digest, that makes them strong, not what we gain but what we save, that makes us rich ; not what we read, but what we remember, that makes us learned, and not what we preach, but what we practice that makes us Christians. These are great but common truths, often forgotten, the spendthrift, the bookworm and the hypocrite.। এই জাতীয় warning গান্ধীজী বারবার দিয়েছেন, মানুষকে ভুলে মতের লড়াইকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তাঁর একটা সাবধানবাণী দিয়ে আমরা আমাদের বই শেষ করি, "Note down these words of an old man past the age of three score and ten ; in the times to come people will not judge us by any creed we profess or the lebel we wear or the slogan we shout but our work, industry, sacrifice, honesty and purity of character. They will want to know what we have actually done for them. But if you do not listen, if taking advantage of the prevaling misery and discontent of the people, you sit about to accentuate and exploit it for party ends, it will recoil upon your head and even God will not forgive you for your betrayal of the people."

(Last Phase. Vol II, page-255)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। 'হরিজন' পত্রিকা
২। The Story of my Experiments with Truth
—M. K. Gandhi.
৩। The Political Philosophy of Mahatma Gandhi.
—Prof. G. N Dhawan,
৪। "Young India"—Periodical.
৫। Mahatma—D. G. Tendulkar. (8 vols.)
৬। Mahatma : Last Phase—Pyarelal (Vol I & II)
৭। My Days with Gandhi—Prof. N. K. Bose. (N. K. B.)
৮। Studies in Gandhism. Do
৯। Non Violence in Peace and war—Pyarelal.
১০। Introduction to Class Struggle in France—F. Engels.
১১। Mahatma and the Ism—E. M. S Namboodiripad.
১২। Satyagraha—R. R. Diwakar.
১৩। Collected Works—Lenin.
১৪। Mind of Mahatma Gandhi—Prabhu and Rao.
১৫। Satyagraha or the Service of Capitalism
—Saumyendra Nath Tagore.
১৬। Satyagraha—Dr. Buddhadeb Bhattacharyya.
১৭। Attend to Peoples Need—Mao—Tse—Tung.
১৮। Autobiography—Jawaharlal Nehru
১৯। স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২০। Capital—K. Marx
২১। Economic Problems of U. S. S. R—J. Stalin
২২। Auti Dühring—F. Engels
২৩। Capitalism, Socialism or Villagism—Dr. B. Kumarappa.
২৪। Soviet Communism—A New Civilization
—Sydney & Beatrice Webb.
২৫। Dialecties of Nature—F. Engels
২৬। Mahatma Gandhi—Romain Rollaind
২৭। Modern Review—1924—Ed. R. Chatterjee
২৮। রবীন্দ্র রচনাবলী

২৯। Cross Roads—Netaji Research Bureau
৩০। India of my Dreams—R. K. Prabhu
৩১। Discovery of India—Jawaharlal Nehru
৩২। The Correspondences of Marx and Engels
৩৩। This was Bapu—Prabhu
৩৪। Letters to a Disciple : Noakhali -Mira Ben.
৩৫। Utopias—Luis Mumford
৩৬। Works of J. Stalin
৩৭। New Democracy—Mao—Tse—Tung.
৩৮। Speeches and Writings of Gandhi—1918.
৩৯। Gandhiji—Hiren Mukherjee
৪০। Story of my life—M. R. Jayakar.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	বর্তমান পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
৮	১৫	"I must reduce myself to zero, so long as a man does not do this of his free own will but himself last among his fellow creatures, there is no salvation for him.'.	"I must reduce myself to zero. So long as a man does not of his own free will put himself last among his fellow creatures, there is no salvaion for him. Ahimsa is the farthest limit of humility,"
৪৯	৮	এখানো	এখানে
৫৬	৮	noral	moral
৫৬	১২	একজন	একদল
৫৭	৭	ন	না
৫৭	১১	পাওয়া সব	পাওয়া সম্ভব
৮৩	২৪	অমাম্য	অসাম্য
১০৫	১৩	নিম্নতা	নিম্নতম
১২১	৬	destractaction	destruction
১২২	২৩	মধ্যে	—
১২৫	১৩	with	without
১২৫	১৪	requising	requiring
১৩৮	১৩	দৃষ্খিভঙ্গীর	দৃষ্টিভঙ্গীর
১৫৪	৩০	পারি	পারে
১৫৫	১৪	ধরাম্বাধা	ধরাবাঁধা
১৯৬	৩৪	appointments	accomplishment
২৪৬	৯	concerted	converted
২৫২	২১	countries	country's
২৫৩	১৪	দেষারোপ	দোষারোপ
২৫৬	৩৪	cericature	caricature
২৭৫	১৬	aggrate	aggregate
২৮৩	২৬	condititions	conditions
২৯৮	২৪	of	on
৩০৮	২৮	শান্ধি-শিষ্য	গান্ধি-শিষ্য
৩৩৯	৩৪	চরিত্র দর্শন	চকিত দর্শন
৩৪৯	১	গান্ধিয়ান	গান্ধিয়ানা